বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

[প্রথম খণ্ড]

বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

প্রথম খণ্ড

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

: পরিবেশক :

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

VARDHAMAN : ITIHASH O SAMSKRITI
(The History and Culture of Burdwan District)
Volume : one
Jajneswar Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯০ ।

প্রকাশক :
শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী
৫এ, শান্তিনগর বাই লেন,
পোঃ ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া),
জেলা-হুগলী ।

প্রচ্ছদ :
শ্রীপৃথ্বীশ সেন
৭৮, বি. কে. ষ্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী ।

মুদ্রক :
অরুণকুমার হেঁস
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯ ।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় অভয়াকালী চৌধুরী (বাবা)

ও

শ্রীমতী হৈমবতী চৌধুরী (মা) কে

বিষয়সূচী

	মুখবন্ধ — অশোক মিত্র	[এক]
	ভূমিকা —	[পাঁচ]
প্রথম অধ্যায়	দেশ পরিচিতি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভূমি পরিচিতি	২৭
তৃতীয় অধ্যায়	নদনদী ও জনজীবন	৫৬
চতুর্থ অধ্যায়	প্রাচীন পর্ব	৮৭
পঞ্চম অধ্যায়	প্রাগৈতিহাসিক যুগ	১১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	পথ-পরিচিতি	১৬২
সপ্তম অধ্যায়	জলপথ-পরিচিতি	১৯৭
অষ্টম অধ্যায়	একটি বিস্মৃত জনপদ : গঙ্গারিডি	২৫১
	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	২৮৭
	নির্ঘণ্ট	২৯৪
	বর্ধমান জেলার মানচিত্র	১
	রেনেলের মানচিত্র, ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ	১৭৭
	আলোকচিত্র	

চিত্রসূচী

১। বীরভানপুরের প্রস্তরায়ুধ (খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ)
২। প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ : বনকাটি
৩। ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ : পাণ্ডুরাজার ঢিবি
৪। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু (খ্রীস্টপূর্ব ১০ম-১৩শ শতক) : ঐ
৫। পাণ্ডুরাজারঢিবিতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল
৬। অজয়কুনুর নদের সঙ্গমস্থল
৭। পোড়ামাটির মূর্তি : পাণ্ডুরাজার ঢিবি
৮। শীলমোহর (খ্রীস্টপূর্ব ১২শ-১৪শ শতক) : পাণ্ডুরাজার ঢিবি
৯ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু (খ্রীস্টপূর্ব ১০ম-১৩শ শতক) : ঐ
১০ মৃৎপাত্রের গঠন ভঙ্গিমা : ঐ
১১ বৌদ্ধ স্তূপ (৭ম-৯ম শতক) : ভরতপুর
১২ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবায়তন (৯ম-১০ম শতক) : গোস্বামীখণ্ড
১৩ তীর্থঙ্করগণের মূর্তি খোদিত প্রস্তর ফলক (৯ম-১০ম শতক) : সাতদেউলিয়া
১৪ প্রাচীন শিখর দেউল (৯ম-১০ম শতক) : সাতদেউলিয়া
১৫ ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (১১শ শতক) : দাঁইহাট-বিকিহাট
১৬ জামগ্রামের সিংহলাঞ্ছন মূর্তি
১৭ যুগল তীর্থঙ্কর মূর্তি : রায়না
১৮ অভিচারবিষ্ণু (৮ম শতক) : চৈতন্যপুর (মঙ্গলকোট)
১৯ মাতৃকা মূর্তি : পাণ্ডুরাজার ঢিবি
২০ প্রস্তর নির্মিত শিখর দেউল (৮ম শতক) : বরাকর
২১ দশবতার মূর্তি খোদিত দ্বারপার্শ্ব (৮ম-৯ম শতক) : দামুন্যা
২২ জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ : বাবলাডিহি (মঙ্গলকোট)
২৩ ব্রোঞ্জ নির্মিত ঋষভনাথ মূর্তি (১১শ শতক), কেলেজোড়া (আসানসোল)
২৪ বুদ্ধ মূর্তি (৭ম-৯ম শতক) : ভরতপুর
২৫। ত্রিভঙ্গ বিষ্ণু : (১১শ শতক) সিজনা (মন্তেশ্বর)
২৬ বৈশ্রবন-মূর্তি : (৮ম-৯ম শতক) কাঞ্চননগর
২৭ প্রস্তর নির্মিত শিব মূর্তি (১০ম শতক) : আদ্রাহাটী
২৮ বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত বিষ্ণুলোকেশ্বর মূর্তি (১০ম শতক) : আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত

২৯ বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত চামুণ্ডা মূর্তি (১০ম শতক) : আশুতোষ মিউঃ-এ রক্ষিত
৩০ বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত হরিহর মূর্তি (৯ম শতক) : ঐ
৩১ জগৎগৌরী মূর্তি : মণ্ডলগ্রাম (মেমারী)
৩২ নৃত্যরত গণেশ মূর্তি (পাল যুগ) : কেতুগ্রাম
৩৩ বহুলাদেবী : কেতুগ্রাম
৩৪ কঙ্কালেশ্বরী মূর্তি : কাঞ্চননগর
৩৫ মনসা মূর্তি : মণ্ডলগ্রাম (মেমারী)
৩৬ ইন্দ্রাণী মূর্তি : কুড়মুন (বর্ধমান)
৩৭ মাসির সেতু : নৈহাটী,-সীতাহাটী (কেতুগ্রাম)
৩৮ শিল্পীর তুলিতে বর্ধমান রেলষ্টেশন উদ্বোধনের দৃশ্য (৩.২.১৮৫৫)
৩৯ কঙ্কালেশ্বরীর নবরত্ন মন্দির (১৮শ শতক) : কাঞ্চননগর
৪০ হোসেনশাহী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (১৬শ শতক) : নূতনহাট
৪১ বলরামের পীড়া-দেউল (আঃ ১৭শ শতক) : বোড়ো বলরাম
৪২ রাজগঞ্জ অস্থল (১৮শ শতক) : বর্ধমান শহর
৪৩ সর্বমঙ্গলা মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক : বর্ধমান শহর
৪৪ টেরাকোটা ফলক : বৈদ্যপুর (কালনা)
৪৫ যোগাদ্যা দেবীর মন্দির (১৮শ শতকের ২য় দশক) : ক্ষীরগ্রাম
৪৬ গোপালের শিখর মন্দির (১৬শ শতক) : আমাদপুর (মেমারী)

প্রচ্ছদ চিত্র :

সাতদেউলিয়ায় প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে খোদিত জৈন মূর্তি।
উপরে উপবিষ্ট ঋষভনাথ ও তৎসহ বৃষলাঞ্ছন এবং নিম্নে কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান ১৪৮টি তীর্থঙ্কর মূর্তি খোদিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, নূতন দিল্লী, চিত্র নং ১, ২, ৩, ১২
আর্কিয়োলজিক্যাল ডাইরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চিত্র নং ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০,১৯
মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র নং ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭
আশুতোষ মিউজিয়াম : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চিত্র নং ২৮, ২৯, ৩০
জৈন ভবন, কলিকাতা (সম্পাদক : গণেশচন্দ্র লালওয়ানী), চিত্র নং ১৩, ১৬, ১৭
মদনমোহন মুখোপাধ্যায় (বোড়ো বলরাম), চিত্র নং ৪১
স্বর্গীয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস. কর্তৃক গৃহীত ও তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা
ডাঃ সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত, চিত্র নং ৩১-৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬
অমল রায়, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ভুবনেশ্বর সার্কেল), চিত্র নং ২২
তারাপদ সাঁতরা, চিত্র নং ১৪, ৪৩, ৪৪

ABBREVIATIONS

Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal	S.H.A.I.B
The History and Culture of the Indian People	H. C. I. P.
Journal of the Asiatic Socity	J. A. S. B.
Indian Historical Quarterly	I. H. Q.
Indian Antiquary	Ind. Ant.
Journal of Bihar and Orissa Research Society	J. B. O. R. S.
Epigraphia Indica	E. I.

মুখবন্ধ

ছাত্রাবস্থায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ে ও লেখায় জর্জ গ্রিয়ারসনের ভাষার শ্রেণীবিভাগ বিষয় আলোচনা যদিও পড়েছি, তবুও সে-বয়সে গ্রিয়ারসনের মূল বই পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। প্রথম সুযোগ হয় ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাসকর্মান্তে যখন পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হই, এবং সেই উপলক্ষে আমার ভাষাগুরু শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও যতীন্দ্রমোহন দত্ত (যমদত্ত) আমাকে গ্রিয়ারসনের বই দেখতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর বিরাট ও অক্ষয় কীর্তির প্রথম খণ্ডটিতে (অন্য সমস্ত খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবার পর একেবারে শেষে) গ্রিয়ারসন তাঁর প্রচেষ্টার একটি সারাৎসার লেখেন যেটি ২য় সংস্করণে প্রথম খণ্ড। বৃদ্ধ বয়সে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি নিজের কথা লিখতে গিয়ে বলেন, কি করে তিনি ভাষালোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়ে তাঁর অধ্যাপক তাঁকে ভাষাবিষয়ে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পর ভারতবর্ষে এসে তিনি এদেশের প্রতি ঋণবদ্ধ কৃতজ্ঞতায় চিন্তিত হন, ঋণ তিনি কিভাবে শোধ করবেন! নিজের অধ্যাপকের কথা স্মরণ করে তিনি ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। সেই সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে, তাঁর গুরু বলেছিলেন, 'যে কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাও, সে-কাজ ত তুমি প্রাণ দিয়ে যথাসাধ্য করবেই; কিন্তু মনে রেখো, মানুষ হিসাবে যদি নাম রেখে যেতে চাও তাহলে এমন কাজে প্রবৃত্ত হবে যার জন্য তুমি পারিশ্রমিক আশা করবে না, তোমার কাজই হবে তোমার একান্ত পুরস্কার এবং সেই কাজের জন্যই ভবিষ্যত তোমাকে মনে রাখবে।' ১৯৬১ সালের ভারতীয় সেন্সাসের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আমি ভারতের সর্বত্র আমার সুযোগ্য সহকর্মিদের গ্রিয়ারসনের এই বাণী স্মরণ করিয়ে একটি পত্র লিখি এবং তার আশ্চর্য সুফল ফলে। ১৯৬১ সালের আগে ভারতের সেন্সাস সম্বলিত করে মোট বইয়ের সংখ্যা প্রকাশিত হতো, উর্ধ্বপক্ষে দেড়শ'। ১৯৬১ সালে আমার সহকর্মিরা ভারতের জাতীয় জীবনে, জনগণনা ও তার বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের খণ্ডগুলি ছাড়া, আরো বাইশটি বিষয়ে মোট চোদ্দশ' বই লেখেন ও প্রকাশিত হয়। মন্দির, মেলা, ক্ষুদ্রশিল্প, হস্তশিল্প, লোকাচার, লোকশিল্প, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক শিল্পগত নগরায়ন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বহু গূঢ় বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সর্বভারতীয় চিত্র, প্রতিটি প্রদেশে আলাদা করে প্রকাশিত হয়। তাঁরা ভারতের একটি বিশ্বকোষ প্রস্তুত করেন বললেও অত্যুক্তি হবেনা। এবং এসব কাজের জন্য তাঁরা এককড়িও বেশী পারিশ্রমিক পাননি, বরং চাকুরি-জীবনে উন্নতি বা স্বীকৃতি পেতে তাঁদের অনাবশ্যক বিলম্ব হয়। ভাষার ক্ষেত্রেই

শুধু বলি। আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত নিগম ও তাঁর সহকর্মীরা সুনীতিকুমারের উৎসাহোক্তির ফলে গ্রিয়ারসন-কৃত বিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন করেন, যার স্বীকৃতি বিশ্বের ভাষাতত্ত্ববিদরা অকুণ্ঠভাবে দিয়েছেন। তাছাড়া সকলের প্রয়াসে এমন অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষার বিশদ ব্যাখ্যা হয়েছে যা পূর্বে কখনও হয়নি। উপরন্তু পণ্ডিতবর সুকুমার সেন ও তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিতদের সহযোগে এমন দুই খণ্ড ভারতীয় সংবিধানের সবগুলি ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ পুনর্লিখিত ও মুদ্রিত হয়েছে যা আগে আদৌ সম্ভব হয়নি। অথচ এই ধরনের কাজের উপযোগী সংস্থা ভারতের নানাস্থানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে সেখানে এসব কাজ কোনদিনই হাতে নেয়া হয়নি। শ্রীযুক্ত নিগম, ডাঃ মহাপাত্র এবং অন্যান্যরা নিরহঙ্কারে, নীরবে, সবিনয়ে এসব কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং করছেন, যা শুধু এদেশের পণ্ডিত মহলে নয় সারা পৃথিবীতে আগ্রহের সাড়া পাওয়া গেছে।

মুখবন্ধে এই প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশ্যে ভারতের সেন্সাস কর্মিদের কাজের ঢাক পিটানো নয়। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী যে মহৎ যজ্ঞে নিতান্ত একা প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানোই আমার অভিপ্রায়। ইউকো ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ একটা শাখা অফিসের অন্যান্য সহকর্মিদের সঙ্গে তাঁর প্রতিদিন কাটে; যিনি বিনা পারিশ্রমিকে এই মহৎ ব্রতে নেমেছেন, তিনি যে অন্য সাধারণ ব্যাঙ্ক-কর্মীর মত তাঁর মাইনে পাওয়া কাজে গাফিলতি করবেন না, তা আমি আন্দাজ করতে পারি। আমি যখন সরকারী কাজে প্রবৃত্ত হই তখন যামিনী রায় মহোদয় আমাকে বলেছিলেন, 'যেকাজে তোমার অন্ন আসবে তাতে কখনও গাফিলতি করবে না, বাবা, তাহলে তোমার নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি হবে, এবং তোমার অভীপ্সাধীন কাজেও ফাঁকি পড়বে।'

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, 'বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়তে দিয়েছেন তা সবটি দেখে ও মোটামুটি পড়ে আমি বিশেষ চমৎকৃতবোধ করেছি। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে মোট তিন খণ্ডে কাজটি সম্পন্ন হবে। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সততা ও গবেষণা কাজে অতি উত্তমশ্রেণীর উদ্যমের প্রমাণ প্রতি পৃষ্ঠায় আছে। আমাদের দেশে গবেষণা যে এত পঙ্গু হয়ে আছে, তার প্রধান কারণ সততার অভাব ও বিনা স্বীকৃতিতে পরস্বাপহরণ করার প্রবৃত্তি। এটি সব দেশেই আছে, তবে এদেশে এই প্রবণতা ও প্রবৃত্তি তুঙ্গে। অন্য-পক্ষে ত কথাই নেই, বিনয় ঘোষও বাদ যান না। মৌলিক গবেষণার মূল কথাই হল, পরের প্রতিটি উক্তি অকপটে ও বিস্তৃতভাবে স্বীকার করা। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাই করেছেন এবং প্রতি পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ রেখে গেছেন। অনেকে বলবেন, এটি সংকলন। এ প্রসঙ্গে কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি কোন সমালোচক সম্বন্ধে লিখেছিলেন, যিনি এত

লোকের উক্তি এত অকপটে, এত সুন্দর এবং মনোজ্ঞ, এবং স্থানকালপাত্র নিখুঁত-ভাবে বিচার করে উদ্ধৃতি করতে পারেন, তাঁর মনস্বিতা ও মৌলিক চিন্তাক্ষমতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

শ্রী চৌধুরী একাহাতে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় কত বড় প্রয়াসে প্রণোদিত হয়েছেন তা শুধু তিনি বা তাঁরাই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, যাঁরা এ ধরনের কাজ কিছুটা করেছেন। ১৯৫৬ সালের সেন্সাসের পর যখন আমি প্রতি জেলার গেজেটিয়ারের নূতন সংস্করণে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার হাতে শুধু যে যাবতীয় বই ও মুদ্রিত রচনার অবারিত সম্ভার ছিল তা নয়, প্রতিটি তথ্যের সাম্প্রতিক মূল্যের বা যাথার্থ্যের যাচাইকল্পে আমার অন্তত পঞ্চাশজন সহকর্মী প্রতি জেলার নানা স্থানে ব্যাপৃত ছিলেন যাঁদের ঋণ বইয়ে স্বীকার করে আমি সার্থক বোধ করি। উপরন্তু আমার ছিল প্রতি জেলায় অবাধে সর্বত্র বিচরণ ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ ও অন্বেষণ করার সুযোগ সুবিধা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নিজ নিজ জেলা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রচুর দেখা যাচ্ছে। এবিষয়ে সর্বপ্রকৃষ্ট জেলা মুর্শিদাবাদ। বহরমপুরের স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রাণরঞ্জন চৌধুরী এবিষয়ে পথিকৃৎ পদের অধিকারী। তিনি বহু রচয়িতা, পণ্ডিত ও গবেষক একত্র করে ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও সুললিত মন্তব্যপূর্ণ কয়েক খণ্ড বই প্রকাশ করেছেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু স্বয়ং লিখেছেন, তিনি যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন, একা উদযাপন করা ঠিক সম্ভব নয়। বিশেষ করে তিনি যখন সাম্প্রতিক অবস্থার বিবরণ ও বিশ্লেষণে আসবেন। তবুও তিনি যে নিজের মাতৃভূমির প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় ও আগ্রহে গিরিলঙ্ঘনের মত দুঃসাহসিক কাজে ইতিমধ্যেই এতখানি সাফল্য লাভ করেছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানোই আমার এই সামান্য মুখবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অশোক মিত্র

৫০৫, যোধপুর পার্ক,
কলিকাতা-৭০০০৬৮।
১লা মে, ১৯৯০।

ভূমিকা

ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বর্ধমানবাসী ঘনরাম চক্রবর্তীর রচনায় আছে—'বর্ধমান দেশ ভাই সভাকার নাভি'। সুকবির এই আত্মশ্লাঘায় কল্পনা বিলাসের কোন চিহ্নমাত্র নেই। সুপ্রাচীনকাল হতে বর্ধমানের পুরাতাত্ত্বিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সুখস্মৃতিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবহেলিত হয়ে অবক্ষয়ের প্রহর গুণছে; বর্ধমানের প্রাক্-ইতিহাসের কাল অতিক্রম করে রাজনৈতিক যুগের ইতিহাসসহ আর্থ-সামাজিক আলোচনা ও সংস্কৃতির বিচ্ছিন্ন সূত্রাবলীকে একত্রে গেঁথে কালক্রমানুপর্যায়ভিত্তিক ইতিহাস রচনার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সাময়িক প্রয়োজনে এর অংশবিশেষের উপর সময়ে সময়ে ক্ষীণ আলোকপাত করা হলেও ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কোন গ্রন্থ এযাবৎকালের মধ্যে রচিত বা প্রকাশিত হয় নাই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বর্ধমানের গুরুত্ব এতই অধিক যে, এ জেলাকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মূল অংশের যে কোন ইতিহাস রচনা করলে তার অঙ্গহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে। প্রকৃত অর্থে, বর্ধমানের কোন পূর্ণাঙ্গ লিখিত ইতিহাস না থাকায় মাতৃ-ভূমির প্রতি দায়বদ্ধ ঋণের কথা স্মরণ করে শ্রমসাধ্য শুভ প্রয়াসের প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়েছি।

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে ইংরেজদের অবদানকে অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। একাজে প্রধান পথিকৃৎ হলেন বুকানন হ্যামিলটন, হেনরী ব্লকম্যান, উইলিয়াম হাণ্টার, হেনরী বেভারিজ প্রমুখ বিদেশী মনীষিবৃন্দ। হাণ্টারের 'Statistical Accounts of Bengal' (২০ খণ্ড) ও 'Imperial Gazetters' (২৬ খণ্ড) প্রকাশিত হলে, সেগুলি থেকে প্রারম্ভিক সূত্র গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা গেছে। বিংশ শতকের প্রথম দশক হতে জেলা গেজেটিয়ারগুলি সম্পাদনার ও প্রকাশনার পর ঐ আদর্শে রচিত স্থানীয় ইতিহাস প্রকাশের উদ্যমসমূহ প্রশংসনীয় ছিল। নামে ইতিহাস হলেও এগুলি জেলা গেজেটিয়ারকে অনুসরণ করেছিল মাত্র। তবে ব্যতিক্রম যে ছিল না এমন নয়। এবিষয়ে সতীশচন্দ্র মিত্রের রচিত যশোহর-খুলনার ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বইটি রচনায় লেখক শুধু কৃতিত্বের স্বাক্ষরই রাখেন নি, সেটি যে একান্তই মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দেশীয় আদর্শানুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় রচিত "ক্ষিতীশ

বংশাবলী চরিত" হল এদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসের এক প্রাচীনতম নিদর্শন।

গ্রন্থাকারে বর্ধমান সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল উনবিংশ শতকের শেষভাগে। এর মধ্যে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের জেলাশাসক W. B. Oldham-এর রচিত 'Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan Districts'। পুস্তকটির পরিশিষ্ট অংশটি (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) ঐতিহাসিক ও জাতিতত্ত্বের একটি মূল্যবান সরকারী প্রতিবেদন হলেও এর অনেকাংশ পুরোপুরি মেনে নেওয়ায় অসুবিধা আছে। অন্যদিকে J. C. K. Peterson কৃত বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারে এই জেলা সম্পর্কিত বহু তথ্য প্রকাশিত হলেও এটি ইতিহাসের সহায়ক গ্রন্থ মাত্র। সীমানা পুনর্বিন্যাসের ধারাবাহিক ইতিকথার উত্তর পেতে হলে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মনোমোহন চক্রবর্তীর 'A Summary of the changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916' গ্রন্থটি ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাছাড়া শহর বর্ধমানসহ অন্যান্য শহর সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ভোলানাথ চন্দ, রেভাঃ জেমস্ লঙ প্রভৃতি লেখকেরা।

বাংলা ১৩২২ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'বর্দ্ধমানের পুরাকথা' এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উজানী-মঙ্গলকোট বিবরণী যে ইতিহাসের ধারা অনুসরণে রচিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য মাত্র। ১৩২১ সালের (১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে) চৈত্র মাসে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর (পৈতৃক নিবাস মাথরুণ) অনুপ্রেরণায়, মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবের উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে বর্ধমান শহরের গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'। মূল সভাপতি ব্যতীত সেদিনের সভায় বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের যে সমাবেশ ঘটেছিল তা একমাত্র কলিকাতা ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় নাই। বঙ্গের সুধীবৃন্দ কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধাবলী সাহিত্যসভার স্মারকগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ সুবৃহৎ গ্রন্থে বর্ধমান সম্পর্কিত বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ে রাজা বনবিহারী কাপুরের অনুপ্রেরণায় (ইনি বিজয়চাঁদের পিতা) ও রাজবাড়ির দপ্তরখানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদি ও অন্যান্য মূল্যবান তথ্য সরবরাহের সাহায্যে রাখালদাস মুখোপাধ্যায় রচনা করেন 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' (বর্ধমান, ১৩২১ সাল)। তবে প্রচুর তথ্যসম্ভারে এটি অলঙ্কৃত হলেও বইটি প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বর্ধমান রাজবংশের গৌরবজনক অধ্যায়গুলিকে বিধৃত করা।

সুদীর্ঘকালের মধ্যে সমগ্র জেলা নিয়ে ইতিহাস রচনার কোন শুভ প্রচেষ্টা না হলেও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। তন্মধ্যে জন্মভূমি, প্রসূন, শক্তি, দামোদর, পল্লীবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। বিগত শতকের শেষভাগ হতে Asiatic Society, Indian Antiquary, Calcutta Review, Bengal Magazine, Calcutta Magazine,

ইত্যাদি এবং বর্তমান শতকে Bengal Past & Present, Indian Historical Quarterly, Modern Review, Bihar & Orissa Research Society, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বর্ধমান সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা বা অন্যস্থান হতে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাগুলির স্বল্প স্থায়িত্বের জন্য প্রকাশিত বিষবস্তুগুলি কালের অতলতলে তলিয়ে গেছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক প্রকাশিত Epigraphia Indica, Epigraphia Indo Musalmania, Ancient India, Indian Archaeology : A Review, Director-General's Report ইত্যাদি সরকারী প্রতিবেদনে বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত পুরাতত্ত্ব, শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি সম্পর্কিত উপাদান হতে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

জাতিতত্ত্ব বিষয়ে 'সেন্সাস রিপোর্ট' ছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ডাল্টন, রিজলে, নগেন্দ্রনাথ বসু, অশোক মিত্র, হরিচরণ বন্ধু, সঞ্জীবকুমার বন্ধুর রচনা-সমূহের যথেষ্ট অবদান আছে। শ্রীঅশোক মিত্রের সম্পাদনায় Census Hand Book, Burdwan District, 1951, Tribes and Castes of West Bengal ও পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলায় (৫ম খণ্ড) বর্ধমানের কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু তথ্যানুসন্ধান ব্যতীত ওল্ডহামকে অনুসরণ করতে গিয়ে জাতিতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বিনয় ঘোষ অনেক অসংলগ্ন তথ্য দিয়েছেন।

বর্ধমান সম্পর্কিত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অনেক ঘটনা, কবি গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্রপুরাণ, ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত, সিয়র মুতাক্ষরিণ, রিয়াজু-স-সালাতিন, তারিখ-ই-বাংলা, তারিখ-ই-বাংলা মহব্বৎজঙ্গ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে জানা যায়। A. G, Bower রচিত 'History of Bansabati Raj' নামক পুস্তিকায় পাটুলি-নারাণপুরের জমিদারগণের উক্ত স্থান ত্যাগের পর হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া ও শেওড়াফুলিতে তাঁদের প্রতিষ্ঠার কাহিনী জানা যায়।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান শহরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলন উপলক্ষ্যে নারায়ণ চৌধুরী ও বলাই দেবশর্মা সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থে বর্ধমান বিষয়ক ৫/৬টি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া কলিকাতাস্থ বর্ধমান সম্মিলনীর স্মারক গ্রন্থ দুটিতে জেলার বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে রচিত বহু প্রবন্ধে নূতন নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'বর্ধমান পরিচিতি', যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী। তবে গ্রন্থের প্রথমভাগ অর্থাৎ রাজনৈতিক ইতিহাস পিটারসনের গেজেটিয়ারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই। সংস্কৃতি ও লোকতত্ত্ব সম্পর্কিত অধ্যায়গুলির উপর তাঁরা সুন্দর-ভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন।

সমসাময়িককালে বর্ধমান জেলা সম্পর্কিত ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়), 'কাটোয়া দর্শন' (ডঃ কালীচরণ দাস), 'কাটোয়ার ইতিকথা' (বঙ্কিম ঘোষ), 'পূর্বস্থলীর ইতিকথা' (জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য), 'বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস' (আবদুল গণি), 'শ্রীপাট কুলীনগ্রাম', 'Sibi King Vessantara his Country and Cultural Heritage' (Dr. A. K. Choudhury), 'The Excavations at Pandu Rajar Dhibi' (P. C. Dasgupta), ও 'Howrah Perspective' (Dr. Kalyan Kr. Ganguli) এবং গবেষণারত বর্ধমানের দুই কৃতী সন্তান ডঃ গোপীকান্ত কোঙার ('বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা') ও ডঃ আবদুস সামাদ-এর বর্ধমান রাজবংশের সাহিত্যানুরাগের কাহিনীর বিষয়সূচী বিশেষ দিকের আলোচনাকে নির্দেশ করেছে। লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও জেলার রচনাকারগণের মধ্যে ডঃ রফিকুল ইসলাম ও মহঃ আয়ুব হোসেন আজও তাঁদের সংকলন ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মূর্তিশিল্প ও লোকশিল্প নিয়ে এযাবৎকালের মধ্যে কোন গ্রন্থ রচিত না হলেও বিখ্যাত পণ্ডিতগণের রচনা হতে বিষয়ভিত্তিক উপাদান সংগ্রহ করা যাবে, তবে সেই সঙ্গে গ্রাম গ্রামান্তরে গিয়ে সমীক্ষারও প্রয়োজন আছে। সম্প্রতিকালে 'বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি' এবং 'বর্ধমান চর্চা' নামক দু'খানি সংকলন গ্রন্থে কয়েকটি সীমিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা 'রাঢ়ের গ্রাম দেবতা', প্রয়াত ঐতিহাসিক ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যালের 'Social Mobility of Bengal' ও 'বাংলার কীর্তনের ইতিহাস' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত) গ্রন্থে বর্ধমানের ধর্ম, গ্রামদেবতা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে লাল মাটির বুকে। প্রত্নক্ষেত্রগুলির অসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় হল এই যে, একমাত্র বীরভানপুর ব্যতীত এগুলির কোন পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাসহ কোন প্রতিবেদন আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অথচ এ কাজের দায়িত্বে ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে। তাছাড়া সরকারীভাবে মেদিনীপুর (দু'খানি গ্রন্থ) সহ ৬টি জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক গ্রন্থ ও ত্রিশ বছরের মধ্যে ১৩টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হলেও বর্ধমানের পুরাকীর্তি ও গেজেটিয়ার প্রকাশের কোন উদ্যোগ নাই এবং আশু প্রকাশের কোন সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না।

স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ একটা ত্রুটি থেকে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হল অসুবিধাজনক আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে গৌরব-জনক তথ্যকে তুলে ধরার প্রবণতা এবং সে কারণেই আঞ্চলিক ইতিহাস প্রায়ই

একদেশদর্শীদোষে দুষিত হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে আঞ্চলিক গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে বিপথে চালিত করতে বা আড়ালে রাখতেও পিছপা হন না। এবিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকারের সতর্কবাণীটি উল্লেখ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি, যা আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর পূর্বে বর্ধমান শহরে বাংলার সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। "ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে পরিমাণে অতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিবে, যে পরিমাণে অতীত উপদেশগুলি বর্তমানে লাগাইতে পারিবে, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণমন উচিত পথে ধাবিত হইবে। সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া সামনে উপস্থিত করে। অতীতকাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ।...ইতিহাস লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণপঞ্জী দিতে বাধ্য। আইনের পুস্তক যেমন গুড়ীগুড়ী অক্ষরে ছাপা নজীরের উল্লেখপূর্ণ না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বার্জাইস অক্ষরে ফুটনোট আবৃত হওয়া আবশ্যক, ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে। ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি হয়।"

স্থানীয় অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত তথ্যসমূহকে সম্বল করে বর্ধমানের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বকে কালের ক্রম অনুসারে সাজালে যে ফসল আসবে তা থেকে এই প্রাচীন জনপদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে এবং সম্যক বিশ্লেষণের দ্বারা বঙ্গ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসে বর্ধমানের অবদানের কথা জানা যাবে। সমগ্র বিষয়টির গুরুত্ব ও বিশালত্ব চিন্তা করে এবং কাজটি যে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও অসাধ্য জেনেও এই বিরাট ও মহৎ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সচেষ্ট হই। শুভানুধ্যায়ীদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা অবশ্যই আমাকে সাহস দিয়েছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ের উপর সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে কোন লিখিত গ্রন্থ রচিত হয় নাই। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে দেখা যায়, যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে বর্ধমান হল অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র। বর্ধমান জেলা সম্পর্কিত কোন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণও প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে।

রাঢ়ের মধ্যমণ্ডলে অবস্থিত বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থটি সুধীজনের হাতে তুলে ধরার পূর্বেই সবিনয় নিবেদন করি যে, আমি কোন পুরাকীর্তির প্রত্নস্থল আবিষ্কার বা কোন প্রাচীন লিপি অথবা পুঁথির সম্পাদনা কার্য করি নাই। অতি সাধারণভাবে ছ-সাত বছর ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে জেলাবাসীর সঙ্গে মিশেছি এবং পরিভ্রমণ ও মেলা-মেশাকে সম্বল করে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের ধারার সঙ্গে বর্ধমানের সংস্কৃতির যোগসূত্রকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাকে সার্থকরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'বর্ধমান' ও 'বর্দ্ধমান' উভয়বিধ বানানকে অনুসরণ করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা অথবা প্রাচীন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'বর্দ্ধমান' এবং অন্যত্র 'বর্ধমান' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

জেলাটি আয়তনেও যেমন বিরাট, তেমনি এর ভাণ্ডারে আশ্রয় নিয়ে আছে অফুরন্ত তথ্যরাজি। অবসর সময়ে ও ছুটির দিনে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাকীর্তিগুলির ফটোগ্রাফ নিতে শুরু করি, যাতে ঐ নির্দশনগুলি কালের কুটিল আবর্তে ধ্বংস হলেও প্রমাণ বা নজির হিসাবে উত্তর-সূরিদের জন্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দেওয়া যায়। তথ্য সংগ্রহের সময়ে শারীরিক কষ্ট যে পরিমাণ হয়েছে তা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়েছে জেলাবাসীদের সহৃদয় ব্যবহার ও আন্তরিক শুভেচ্ছায়, এরজন্য তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। জেলাবাসীদের অনুগ্রহে কোনদিনই পথসন্ধান, আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হই নাই। একাজে প্রথম হতেই যাঁদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছি তন্মধ্যে আমার স্বগ্রামবাসী অগ্রজ-প্রতিম শ্রীসঞ্জীবকুমার বন্ধু, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (বর্ধমান), শ্রীসনৎ কুমার চক্রবর্তী, (ক্ষীরগ্রাম), ডঃ কালীচরণ দাস (কাটোয়া), শ্রীঅচিন্ত্য মল্লিক (জাতীয় গ্রন্থাগার), মহম্মদ আয়ুব হোসেন (রাজুয়া), আনন্দ্যুল্লা মহম্মদ আকবর, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত (বর্ধমান), শ্রীশরদিন্দু সামন্ত (নন্দীগ্রাম) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সহযোগিতার জন্য তাঁদের সকলকে ও অন্যান্যদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একাজে নিঃস্বার্থভাবে সকল সময়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন আমার প্রতিবেশী শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ (উত্তরপাড়া), অধ্যাপক শ্রীসর্বেশ্বর চৌধুরী (ক্ষীরগ্রাম) ও সহকর্মী শ্রীগৌতম মল্লিক (শ্রীখণ্ড)। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমার অধুনা বাসস্থান উত্তরপাড়া একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এবং এ কাজের জন্য এখানকার গুণীজনের নিকট নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেছি, বিশেষ করে শ্রীতারকনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর দত্ত, শ্রীহিরন্ময় ঘোষ, শ্রীদিলীপ-কুমার বন্ধু, শ্রীভবেশ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রারম্ভিক পর্বে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'বর্ধমান' পত্রিকায় 'বর্ধমানের নদনদী,' 'অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ', 'বর্ধমানের ইতিহাস প্রসঙ্গে' ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর শ্রীতারাপদ সাঁতরা সম্পাদিত 'কৌশিকী' পত্রিকায় 'ইন্দ্রাণীর পুরাকীর্তি' প্রকাশিত হলে, বিষয়টি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল বলে দাবী করতে পারি। উত্তরপাড়ার 'আনন্দ' গোষ্ঠীর সাহিত্য-মুখপত্রে বর্ধমান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ ব্যতীত 'দর্শক', 'পথে প্রান্তরে', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি পরিমর্জিত হয়ে গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও INTACHএর যৌথ উদ্যোগে এবং অধ্যাপক ডাঃ ডি. কে. চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় 'Heritage of'

Burdwan' আলোচনাচক্রে বর্ধমানের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, নদনদী অর্থনীতি, লোকউৎসব প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহু গুণীজন আলোকপাত করেছিলেন। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে 'বর্ধমান জেলার জনজীবনের উপর নদনদীর প্রভাব' বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, যা বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে নিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১০ই মার্চ তারিখের 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। জেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক এরূপ আলোচনাচক্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য।

গ্রাম-গ্রামান্তরে সংগৃহীত তথ্যরাজি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হতে ক্রমাগত তাগিদ আসতে শুরু হয়। দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার দ্বারা তথ্য সংগ্রহের যেমন বেদনাও আছে, তেমনি সেগুলিকে প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেবার আনন্দও আছে। বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত অধ্যায়গুলি সম্পর্কে দু'এক কথা বলারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনার প্রারম্ভিক পর্বে রাঢ় পরিচিতির রূপরেখা আলোচনা করে বর্ধমান পরিচিতির পর্যালোচনা করলে সমগ্র বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে। তবে ইতিপূর্বে ইতিহাসের আলোকে রাঢ় সম্পর্কিত তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয় নাই। মূল বিষয়কে না জেনে তার অংশবিশেষের পর্যালোচনা করলে প্রতিপাদ্য বস্তুর যথেষ্ট অঙ্গহানির সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই একালের বরেণ্য ঐতিহাসিক আরনল্ড জে. টয়নবির মন্তব্যকে পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করে বর্ধমানের ইতিহাস শুরু করার পূর্বে রাঢ় সম্পর্কিত তথ্যাবলীকে তুলে ধরা হয়েছে। টয়নবির ভাষায় বলা যায়—'In order to understand the parts, we must first focus our attention upon the whole, because this whole is the field of study which is intelligible in itself.' (A Study of History, VOL. I. p. 26)।

ভৌগোলিক পরিচিতিসহ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে আধুনিক বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য গ্রন্থটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যাতে এক নজরে সমগ্র জেলাটিকে চেনা যায়। প্রাচীন বর্ধমানের বর্ধিষ্ণু গ্রাম-গঞ্জসমূহ নদীতীরেই গড়ে উঠেছিল এবং কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাচীন অর্থনীতি ও জনবিন্যাসের উপর প্রভাববিস্তারকারী নদনদীগুলির অবদানের কথা স্মরণ রেখে নদনদী প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে অনেক কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও সমগ্র রাঢ়ের প্রত্নস্থলগুলির কোন সমীক্ষা প্রকাশিত হয় নাই বা সীমিতক্ষেত্রে কয়েকটী প্রত্নস্থলের প্রতিবেদন হাতে এসেছে। রাঢ়ের প্রাচীনতা বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য গঙ্গারিডি জনপদের তথ্যভিত্তিক আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়ভুক্তির পরিকল্পনায় রাঢ়-বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্ধমানের সম্পর্ক, বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস, বর্গী হাঙ্গামা, বর্ধমানের ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার, কৃষি-শিল্প, যৌথ অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা, জনজীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ইত্যাদি অন্তর্গত করার ইচ্ছা আছে। বর্ধমানে বর্গী হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ কবি গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এই খণ্ডে সংযোজন করার বাসনা আছে।

তৃতীয় খণ্ডের পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়-সূচীতে গ্রাম-বিবরণীসহ বর্ধমানের সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া 'দেখি পুরী বর্ধমান', 'বিলুপ্ত জনপদ ইন্দ্রাণী', শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও কেতুগ্রাম, অম্বিকা-কালনা, মঙ্গলকোট, গৌরাঙ্গপুর, বোড়ো বলরাম, সেলিমাবাদ, চুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানের বিশেষ বিবরণ তালিকাভুক্ত করা হবে। এই বিরাট জেলার পুরাকীর্তির প্রামাণ্য তালিকা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে মন্তব্য করা যায় যে, আড়াই হাজার গ্রাম সমবায়ে গঠিত জেলার পুরাকীর্তির তালিকা প্রণয়নের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সংযুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হলে দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণ হতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত না থাকলে গবেষণামূলক গ্রন্থ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা আছে। মূল্যবান গ্রন্থাগার ও সমমর্মী গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থরচনা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত না থাকার জন্য প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা ও অসহযোগিতা লাভ করলেও অধিকাংশ স্থানে অকুণ্ঠ সমর্থন আর সহযোগিতা লাভ করেছি। গবেষণাকার্যে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীতে এবং এর গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীদের নিকট সকল সময় যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার (কলিকাতা শাখা) গ্রন্থাগারিক অনুজ-প্রতিম শ্রীদেবপ্রিয় দাশগুপ্তের সহযোগিতা ও তাঁর সহকর্মীদের মধুর ব্যবহারের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। গবেষণাকার্যে রেফারেন্স বই সংগ্রহের প্রচুর সমস্যা থাকা সত্বেও নিজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত তারাপদ সাঁতরা, শ্রীঅমিত রায়, ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, শ্রীতারকদাস মিত্র, শ্রীসুধীন দে প্রভৃতির নিকট হতে সহযোগিতা লাভের জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থান হতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কোন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণের তেমন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এ বিষয়ে কিছুটা অভাব পূরণ করেছেন শ্রীসঞ্জীবকুমার বন্ধু, মহম্মদ আয়ুব হোসেন, ডঃ গোপীকান্ত কোঙার মহাশয়। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট

লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রন্থাগার হতে যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করেছি।

আলোচ্য গ্রন্থের 'প্রাগৈতিহাসিক পর্ব'টি রচনার বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীসুধীন দে। তিনি এই সুবৃহৎ অধ্যায়টির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পাঠ ও পথনির্দেশ করায় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ উভয়ই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রবীণ বয়সেও অমূল্যসময় দান করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পাণ্ডুলিপির ভাষা ও সম্ভাব্যস্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য এম. এ, ডি. ফিল। আর সকলের নেপথ্যে সকল সময়ে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তারাপদ সাঁতরা নিরলসভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। শ্রীসাঁতরার সাহায্যের ফলে বিনা ক্লেশে গ্রন্থটি প্রকাশনার জটিল আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু মুদ্রণ যন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজসাধ্য নয় এবং এ বিষয়ে সকল ক্রটির দায়দায়িত্ব আমার। এ ছাড়া শ্রীসাঁতরার নিজস্ব সংগ্রহ ও ফোটোকপিগুলি ব্যবহার করতে দেওয়ায় গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এঁদের নিকট আমার সকল সময়ে অবারিত দ্বার এবং ব্যক্তিগত ঋণের শেষ নাই। এসকল সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞজনেরা ধন্যবাদের কোন আশা না রাখলেও এঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মূল পাণ্ডুলিপি হতে প্রেসকপি তৈরী করার ন্যায় দুরূহ ও বিরক্তিজনক কাজের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেয়েছি আমার সহকর্মী অনুজপ্রতিম শ্রীপ্রশান্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীরাধাবিনোদ পালের সহযোগিতায়। আমার অন্যান্য সহকর্মীদের নিকট হতেও সকল সময়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেছি।

'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের মূল্যবান মুখবন্ধ রচনা করেছেন শ্রীঅশোক মিত্র আই. সি. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)। প্রবীণ বয়সেও অতি মূল্যবান সময় ব্যয় করে সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ ও প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধনের উপদেশ দান করে গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীমিত্রের বাল্যজীবন ও কর্মজীবনের একাংশ অতিবাহিত হয়েছিল বর্ধমানে এবং সেকালের বর্ধমানের মানুষের নিকট 'অশোক মিত্র' ছিল একটি পরিচিত নাম। এই দিক হতে বিচার করলে তিনিও বর্ধমানের মাটির কাছে দায়বদ্ধ আছেন।

গ্রন্থটি মুদ্রণের জন্য র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশনের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকুমার হেঁস ও তাঁর প্রেসের কর্মীবৃন্দ এবং পুস্তক বিপণির স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দারের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বর্ধমানবাসী শ্রীপৃথীশ সেন (অধুনা

উত্তরপাড়া) এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণামূলক দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজের জন্য সর্বাগ্রে সময় ও মনঃসংযোগের প্রয়োজন। সকল প্রকার সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আর সেই সঙ্গে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে কাজকে সফল করে তোলার জন্য সাধারণভাবে ঋণ স্বীকার করে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরীকে ছোট করতে চাই না। এরূপ ত্যাগ স্বীকারের জন্য যে বিশেষ আন্তরিকতার প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার কোন অবকাশ নাই। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের কাজে আমার কন্যা কুমারী রূপশ্রী ও পুত্র শ্রীমান জ্যোতির্ময়ের নিকট হতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছি।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বর্ধমান জনপদে বসবাস করে আসছে। তাই এর ইতিহাস ও সংস্কৃতি নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই প্রাচীন জনপদকে জানতে তথ্যভিত্তিক আলোচনাকে অনুসরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। একক প্রচেষ্টা ও সীমিত আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে এরূপ বিরাট কাজের প্রথম খণ্ডের রচনার দায় দায়িত্ব কতখানি পালন করতে সক্ষম হয়েছি, সে বিচারের ভার পাঠকের। তবে আর্থিক দায়-দায়িত্বের কিছুটা সুরাহা হলে হয়ত গ্রন্থটিকে আরও কিছুটা উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। 'বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র প্রথম খণ্ডে প্রারম্ভিক পর্বের যে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এর দ্বারা বর্ধমান তথা বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিগণ যদি আগ্রহান্বিত হন বা তাঁদের নিকট এটি আদৃত হলে আমার শ্রমকে সার্থক বলে মনে করি, আর সেই সঙ্গে স্মরণ করি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"।

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া)

মহালয়া,
১লা, আশ্বিন, ১৩৯৭ সাল।

প্রথম অধ্যায়

দেশ পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলটি 'রাঢ়' নামে পরিচিত তার প্রায় মধ্যবর্তী অংশে বর্ধমান জেলার অবস্থিতি। বর্ধমান জেলা ২২°৫৬´ হতে ২৩°৫৩´ পর্যন্ত উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৪৮´ হতে ৮৮°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উত্তর অক্ষাংশ) দুর্গাপুর, গুসকরা, পোখলা, জামালপুর, মেড়তলা প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। বর্ধমান জেলার উত্তর ভাগে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ও বীরভূম জেলা, দক্ষিণে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা, পূর্বভাগে ভাগীরথী নদী, হুগলী ও নদীয়া জেলা এবং পশ্চিমে বরাকর নদ, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলা অবস্থিত। তবে জেলার অধিকাংশ স্থানে বরাকর, দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী নদী প্রাকৃতিক সীমা রচিত করে অন্যান্য জেলা হতে তার অবস্থানকে পৃথক করেছে। একই প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত হয়েও নবদ্বীপ নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কেন, এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ২৫০ বছর পূর্বেও নবদ্বীপ ছিল ভাগীরথীর পূর্ব তটে। বর্তমানে পরিবর্তিত ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ যে অবস্থা দেখা যায়, তার দ্বারা বিচার করলে উত্তর পাওয়া যাবে না। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হতে বরাকর নদের পূর্ব তীর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে জেলার দৈর্ঘ্য ২০৮ কিঃমিঃ। পশ্চিম ভাগে অজয় নদের দক্ষিণ হতে দামোদরের উত্তর কূল পর্যন্ত ভূভাগের সর্বনিম্ন বিস্তৃতি প্রায় ২০ কিঃমিঃ। আবার জেলার পূর্বাংশে সর্বাধিক বিস্তৃতি দেখা যায় উত্তরে কুলা নদী হতে দক্ষিণে দামিন্যা পর্যন্ত অংশে। এই অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৫ কিঃমিঃ। সমগ্র জেলার আয়তনের হিসাব করলে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিভাগের অনুপাতের পরিমাণ হল ৭০:৩০। সেকারণে হান্টার, পিটারসন প্রমুখ মনীষিগণ মন্তব্য করেছেন যে, বর্ধমান জেলার মানচিত্রের আকৃতি অনেকটা হাতুড়ীর ন্যায়। আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার ভূখণ্ডটি হল হাতুড়ীর হাতল এবং বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা মহকুমা এই হাতুড়ীর মাথার সদৃশ।

সুলতানী আমলে, মোগল যুগে বা মুর্শিদকুলি খাঁ-র শাসনকালে সমগ্র জেলা পরিমাপের কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে ভূমি হতে উৎপাদিত শস্যের উপর ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হত। কিন্তু ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে চাকলা বর্ধমানের দেওয়ানী লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, লণ্ডনের ডিরেক্টরবর্গের

এক পত্রে কলিকাতা সহ কোম্পানির অধিকৃত চাকলা তিনটির প্রকৃত আয়তন নির্ধারণের নিমিত্ত জরিপ কার্য শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনটি চাকলার জরিপের কথা বলা হলেও, কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল চাকলা বর্ধমানের উপর। কারণ, সারা বাংলাদেশের মধ্যে আলিবর্দী খাঁর আমলে সর্বাধিক রাজস্ব চাকলা বর্ধমান থেকে আদায় হত। ঐ বৎসরেই জেমস্ রেনেলকে সার্ভেয়ার নিযুক্ত করে কলিকাতায় পাঠান হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের রিপোর্টে দেখা যায় সমগ্র চাকলার পরিমাণ ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল এবং ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৫৪-৫৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সার্ভে রিপোর্টে বর্ধমান জেলার আয়তন নির্ধারণ করা হয়। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার স্থান বিনিময় কার্য শেষ হয় এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ারে পাওয়া যায় বর্ধমান জেলার মোট আয়তন ২৬৮৯ বর্গমাইল। সার্ভে রিপোর্টে আছে সমগ্র জেলার আয়তন ২৭০১ বর্গমাইল। সম্ভবতঃ নদীতীরবর্তী স্থানসমূহের ভাঙনের ফলে ভূভাগের আয়তনের পরিমাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টে জানা যায় জেলার মোট আয়তন ৭০২৪ বর্গ কি:মি: ভূভাগের মধ্যে ৪৭৫'৪ বর্গ কি:মি: অঞ্চলে ৪৯টি শহরের অবস্থিতি এবং অবশিষ্ট ৬৫৪৮'৬ বর্গ কি:মি: জুড়ে গ্রামাঞ্চল গড়ে উঠেছে। জনগণনানুসারে জেলার মোট লোকসংখ্যা ৪৮,৩৫,৩৮৮ জনের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৪৮,৬০৩ জন এবং ২২,৮৬,৭৮৫ জন। পুরুষের সংখ্যা অধিক হওয়ার প্রধান কারণ হল, কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল প্রসারণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল সহ বিহার, ওড়িশা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হতে কর্মোপলক্ষে প্রচুর শ্রমিক-কর্মচারীর আগমন ও বসবাস স্থাপন। ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব হতেই দেখা যায় এই জেলায় আদিবাসীসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতি বসতি স্থাপন করে আসছে। এদের আদি বাসস্থান যে এ অঞ্চলেই তাতে সন্দেহ নাই। আজও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ তফসিলী ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর অধিবাসী।

বিগত ১২৫ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল মোট ৪টি, যথা : বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও দাঁইহাট। শহরগুলির অবস্থিতি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে এবং পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন ছিল নদীপথ। বর্তমানে নদীগুলির অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় নদীতীরবর্তী গ্রাম ও শহরগুলি পূর্বেকার সমৃদ্ধিলাভে বঞ্চিত। কালনা, দাঁইহাট ও কাটোয়ার নদীতীরবর্তী গঞ্জগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে স্থলপরিবহনের উন্নতি হওয়ায় পুরাতন গঞ্জগুলি লুপ্ত হলেও বর্ধমান ও কাটোয়া শহর দু'টি নূতন রূপ নিতে শুরু

করেছে। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে প্রথম শহর রানীগঞ্জ এবং ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আসানসোল শহরের পত্তন হয়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল মোট ৬টি। বার্ণপুর ও কুলটিতে লৌহ-ইস্পাত কারখানা ও অণ্ডালে রেলওয়ে কলোনী স্থাপনের ফলে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আরও ৩টি নূতন শহরের পত্তন হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গঠন, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা ও দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ফলে আরও কয়েকটি শহরের পত্তন হয় বর্তমান শতকের ষাটের দশকে এবং ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে মোট শহরের সংখ্যা হয় ২২টি। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ৪৯টিতে গিয়ে পৌছায়। সমগ্র জেলায় শহরের সংখ্যার হিসেবে দেখা যায়, দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমায় ৪২টি শহর গড়ে উঠেছিল এবং এদের মধ্যে রানীগঞ্জ ব্যতীত কোনটিই ১০০ বছরের অধিক পুরাতন নয়। অপরপক্ষে কৃষি অঞ্চলে প্রাচীন ৪টি শহর ব্যতীত নূতন শহর পত্তন হয়েছে মাত্র ৩টি (মেমারী, গুসকরা, পানুহাট) অর্থাৎ মোট আয়তনের $\frac{4}{5}$ অংশ নিয়ে বিস্তৃত কৃষি অঞ্চলটিতে ৭টি মাত্র শহর হয়েছে এবং ১৪০০ বর্গ কিঃমিঃ অঞ্চলের মধ্যে আছে ৪২টি শহর। খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর নিয়ে বিস্তৃত দক্ষিণ অঞ্চলে একটিও শহর নাই। আবার কৃষি অঞ্চলের ৪টি বিন্দুতে অর্থাৎ, কাটোয়া, বর্ধমান, কালনা ও গুসকরা ছাড়া বিস্তৃত অঞ্চলে কোন শহর পত্তন হয় নাই। অপরপক্ষে মঙ্গলকোট, শ্রীখণ্ড, ক্ষীরগ্রাম, কুলীনগ্রাম, কেতুগ্রাম, চাণ্ডুলি, পাটুলী, অগ্রদ্বীপ, সমুদ্রগড়, বাঘনা-পাড়া, সেলিমাবাদ, কোটশিমুল, জাড়গ্রাম, দামিন্তা, খণ্ডঘোষ, রায়না প্রভৃতি ধর্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলরূপে খ্যাত প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি আজ ক্ষয়িষ্ণু।

সমগ্র জেলায় ৬৫৪৮·৬ বর্গ কিঃমিঃ নিয়ে গ্রামাঞ্চল এবং এর অধিবাসী সংখ্যা ৩৪,১৪,২১৯ জন এবং ৪৭৫·৪ বর্গ কিঃমিঃ অঞ্চলে ১৪,২১,১৬৯ জন অধিবাসী নিয়ে ৪৯টি শহর গড়ে উঠেছে। মোট ২৬৭৯ টি গ্রামের মধ্যে ১০৯ টি মৌজায় জনবসতি নাই, অর্থাৎ জেলার গ্রাম সংখ্যা ২৫৭০টি। ৫৯টি শহরের মধ্যে বর্ধমান, আসানসোল, কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট ও রানীগঞ্জ মিউনিসি-প্যাল শহর, দুর্গাপুর, নিউটাউনশিপ ও কোকওভেন নোটিফায়েড এলাকা এবং অবশিষ্ট ৪২টি নন্‌মিউনিসিপ্যাল শহররূপে ঘোষিত। জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের নিমিত্ত আছে জেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদের অধীনস্থ ৩৩টি ব্লক, ৩১টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ২৯৪টি অঞ্চল-পঞ্চায়েত।

জেলার সদর শহর বর্ধমান (২৩°১৪′ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৭°৫১′ পূঃ দ্রাঘিমাংশ) বাঁকা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। রেলপথে ও সড়কপথে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমান শহরের যোগাযোগ আছে। বর্তমানে যে স্থানে শহরটি বিস্তৃতি লাভ করেছে, ২০০-৩০০ বছর পূর্বে এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলপূর্ণ। অতীতের বর্ধমান শহরকে খুঁজতে

হলে রাজবাড়ীর পশ্চিম অঞ্চল হ'তে শুরু করে কাঞ্চননগরের পথে যেতে হবে। নবাবহাটের ১০৯ শিব মন্দির ও তালিতের গড় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে রেলপথের সম্প্রসারণ ও অফিস আদালত স্থাপনের ফলে শহরটি পূর্বদিকে বিস্তৃতিলাভ করতে করতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। শেরশাহের ও আওরঙ্গজেবের আমলের মসজিদ, পীর বহরাম ও খাজা আনোয়ারের সমাধি, রাজবাড়ি, বর্ধমানেশ্বর শিব, নবাবহাটের শিবমন্দির, সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির, কৃষ্ণসায়র, কমলাকান্তের কালীবাড়ি, বিদ্যাসুন্দর কালী, বাঁকার ব্রীজ, কঙ্কালেশ্বরী মন্দির, গোবিন্দদাসের বাসগৃহ, বিজয়তোরণ প্রভৃতি পুরাকীর্তির নিদর্শনাবলী বর্ধমান শহরের গৌরবকে বর্ধিত করেছে। সর্বোপরি মেহেরউন্নিসা, শের আফগান ও সেলিমের কাহিনী বর্ধমান শহরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র জেলাকে ৬টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : বর্ধমান (২), আসানসোল, দুর্গাপুর, কাটোয়া ও কালনা। মহকুমাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করে থানার সৃষ্টি হয়েছে। থানার আয়তনের অনুপাত সর্বত্র সমান নয়। প্রয়োজন অনুসারে থানা এলাকা কোনটি ক্ষুদ্র, আবার কোনটি বৃহৎ। চিত্তরঞ্জনের ন্যায় ২১ বর্গ কি:মি: আয়তন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র থানার সৃষ্টি যেমন হয়েছিল, পক্ষান্তরে ৫৬০ বর্গ কি:মি: আয়তনবিশিষ্ট আউসগ্রাম থানা এলাকাও রয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, শিল্পাঞ্চলে নানা ধরনের উপদ্রব অধিক হওয়ার জন্য ঐ সকল স্থানে থানা এলাকার পরিধি ক্ষুদ্র ; কিন্তু কৃষিপ্রধান এলাকায় উপদ্রব ও অশান্তি কম হওয়ায় আউসগ্রাম, ভাতাড়, বর্ধমান, মেমারী, মঙ্গলকোট, রায়না প্রভৃতি বৃহৎ এলাকাভুক্ত থানাও রয়েছে।

মহকুমাভিত্তিক থানার তালিকা :

	১	২	৩	৪	৫
থানার নাম	আয়তন কি: মি:	গ্রামসংখ্যা (মৌজা)	জনবসতি-বিহীন মৌজা	শহরের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
মহকুমা—বর্ধমান উত্তর					
বর্ধমান	৪০৬·৯	১৫৩	১০	১	৩,৬১,৪১৩
ভাতাড়	৪১৪·৪	১০৭	২	×	১,৭৯,২৫৩
আউশগ্রাম	৫০৬·২	১৪৯	৭	১	১,৭৪,১২১
গলসী	৩৭৩.১	১২৫	×	×	১,৭৩,৫৯২

মহকুমা—বর্ধমান দক্ষিণ					
মেমারী	৪২৭.১	২১৯	১	১	২,৭৫,১৭৭
জামালপুর	২৬২.৯	১২৩	২	×	১,৭১,২২৩
রায়না	৪৭৮·৬	২০৭	১২	×	২,২৭,১২০
খণ্ডঘোষ	২৬০·৩	১১১	৫	×	১,২৩,৫৬৯
মহকুমা—আসানসোল					
আসানসোল	৮০·৭	৩২	×	২	২,৫৪,২০৬
হীরাপুর	৬৩·৮	২১	১	২	১,৪৩,৫৯২
কুলটি	৮৪·২	৪০	১	৯	১,৯১,২৬৫
সালানপুর	১১৩·২	৭৩	৮	১	৬৬,৮৮১
চিত্তরঞ্জন	২১·৭	৩	১	১	৫২,৪৪৩
বরাবনী	১৫৫·২	৫০	×	১	৭৮,৯৩১
জামুরিয়া	২৩৪·৭	৬৪	৭	৭	১,৭৩,৯৩৮
রানীগঞ্জ	৮৫·০	২১	১	৭	১,৫২,৫৯৮
মহকুমা—দুর্গাপুর					
দুর্গাপুর	১৬০·১	২	×	১	৩,১৩,৩১৩
নিউ টাউনসিপ	১৩·৩	৫	× দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত		৫,৯৭৬
কোক ওভেন	৪৭·০		ঐ		
বুদবুদ	১৯৭·৬	৬০	৪	১	৯৩,৯৪৯
ফরিদপুর	১৪০·২	৫০	৩	×	৬৯,৬৯০
কাঁকসা	২৮০·৯	৮৯	৬	১	৯৬,৮৯৩
অণ্ডাল	১৮২·৯	৪০	১	৯	১,৮৯,৯৯০
মহকুমা—কাটোয়া					
কাটোয়া	৩৪০·০	১৩৩	১১	৩	২,৫৬,৩৭২
কেতুগ্রাম	৩৫৫·১	১২২	৫	×	১,৮৫,৮৩৬
মঙ্গলকোট	৩৬৪·৯	১৩২	৩	×	১,৭৭,১৪০
মহকুমা—কালনা					
কালনা	৩৪৭·৬	২১৪	৪	১	২,৬১,৫০৫
পূর্বস্থলী	৩৪৪·৫	১৯০	৬	×	২,৩৫,৩৪৫
মন্তেশ্বর	৩০৫·৪	১৪৪	৮	×	১,৫৭,০৭৭
	৭০২৪·০	২৬৭৯	১০৯	৪৯	৪৮,৩৫,৩৮৮

উপরের তালিকা-সূচী হতে শাসনকার্যের প্রয়োজনে জেলা বিভক্তি-করণের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার পূর্ব ইতিহাস এবং অতীতের শাসনবিধির ক্রমবিবর্তনের ধারা বর্ধমান জনপদে যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার আলোচনার ক্ষেত্র অতি বিশাল, কিন্তু অপ্রতুল উপাদানের জন্য সে আলোচনা সংক্ষেপে করা হচ্ছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল জনপদ নামে পরিচিত ছিল। বেদে জনপদের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীকালে রচিত বৈদিক সাহিত্যে জনপদের পরিচয় আছে।[১] পানিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পানিনির একটি সূত্র (৭/৩/১৪) হতে জানা যায় পূর্বদেশে ঐ সময়ে গ্রাম ও নগরে জনবসতি ছিল। অর্থশাস্ত্রে জনপদনিবেশ অধ্যায়ে (১৯শ প্রকরণ) বর্ণিত আছে জনপদের একক অর্থাৎ শেষ বিভাগ গ্রাম এবং সেখানে অন্যূন একশত ও সর্বাধিক পাঁচশত ঘর লোক বাস করত। আটশত গ্রাম সমবায়ে 'স্থানীয়' এবং চারশত গ্রামের সমষ্টি 'দ্রোণমুখ'। দু'শত গ্রাম নিয়ে 'কার্ব্বটিক' ও দশখানি গ্রামের সমবায়ে 'সংগ্রহণ' স্থাপিত ছিল। মৌর্যযুগে ক্রমপর্যায়ে জনপদ বিভাগটি হ'ল, রাজ্য (কোন বিশেষ অঞ্চল)-স্থানীয়-দ্রোণমুখ-কার্ব্বটিক বা খার্ব্বটিক-সংগ্রহণ-গ্রাম।[২] স্কন্দপুরাণে কুমারিকা খণ্ডে প্রত্যেকটি জনপদের অধীনে গ্রামসংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গুত্তরনিকায়, মহাবস্তুঅবদান, সুত্তনিপাত ও ভগবতী সূত্রে ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে। এগুলি ষোড়শ মহাজনপদ নামে প্রসিদ্ধ।[৩]

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে খোদিত তাম্রশাসন ও শিলালেখতে জনপদ ও তার অধীনস্থ বিভাগগুলির কিছু উল্লেখ আছে। বর্তমানে যে অর্থে প্রদেশ বোঝায় তা ঐ সময়ে ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। ভুক্তির অধীনস্থ অঞ্চলগুলি বিষয় বা মণ্ডল; আবার ভুক্তির অধীনস্থ ভুক্তির উল্লেখও আছে।[৪] বিষয় বা মণ্ডলের অধীনস্থ ছিল বীথি,[৫] কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বীথি অপেক্ষা মণ্ডল ক্ষুদ্রতর জনপদ।[৬] বীথির অধীনস্থ ছিল গ্রাম এবং গ্রাম ছিল শাসনকার্যের ক্ষুদ্রতম একক, অর্থাৎ কোন জনপদের গঠনপ্রণালীতে গ্রাম ছিল রাষ্ট্রীয় বিভাগের ক্ষুদ্রতম অংশ। নির্দিষ্ট কোন জনপদকে নির্দেশ না করে বৃহত্তর অর্থে কোন আঞ্চলিক জনপদের উল্লেখও শিলালিপিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয় গিরিলিপিতে[৭] উত্তির লাঢ়ম ও তক্কন লাঢ়ম-এর উল্লেখ শাসন বিভাগে বর্ণিত কোন জনপদকে না বোঝালেও একটা বিশেষ অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খ্রীস্টপূর্ব যুগে 'বর্দ্ধমান' নামক কোন জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কল্পসূত্র, আচারঙ্গসূত্র ও জৈন উপাঙ্গে রাঢ় দেশের উল্লেখ আছে এবং এই জনপদ, রাজমহলের দক্ষিণ হতে কপিসা নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাম্রশাসনে

বর্দ্ধমানভুক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে গোপচন্দ্রের মল্লসারুল শাসনে।[৮]
গোপচন্দ্রের পূর্বে কুমারগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনে (৪৪৪ খ্রী:) পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উল্লেখ আছে। মনে হয় গুপ্তযুগেই বাংলা দেশ দুটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ভুক্তি দুটির সৃষ্টি হয়েছিল। মল্লসারুল তাম্রশাসনে বীথি নামক ক্ষুদ্রতর জনপদের উল্লেখ আছে। অন্যান্য তাম্রশাসনে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি, উত্তর রাঢ় ও পশ্চিমখাটিকা নামক অঞ্চল 'মণ্ডল' নামে অভিহিত হয়েছে। গোপচন্দ্রের ফরিদপুর তাম্রশাসনে ও শশাঙ্কের এগরা তাম্রশাসনে 'বিষয়' নামক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটিই বর্তমানে 'জেলা' শব্দের সমার্থক। দানকৃত গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্বস্থ আঞ্চলিক নাম হ'তে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগে শাসনকার্যে গ্রামগুলির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় ছিল না।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয় গিরিলিপি হ'তে অনুমান করা যায় যে, বর্দ্ধমান-ভুক্তি দুভাগে বিভক্ত ছিল, যথা: উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। পুরাণ, মহাভারত, ও সমসাময়িক সাহিত্যে সুহ্ম, সুহ্মোত্তর, ব্রহ্ম, প্রসুহ্ম জনপদের উল্লেখ হ'তে উত্তর রাঢ়কে ব্রহ্ম বা সুহ্মোত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়কে সুহ্ম নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমান জেলাটি অতীতে সুহ্ম ও ব্রহ্ম বা সুহ্মোত্তর উভয় বিভাগের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয়।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত 'বর্দ্ধমান' জনপদ অপেক্ষা তাম্রশাসনে বর্ণিত বর্দ্ধমানভুক্তির বিস্তৃতি ছিল অধিক। তাম্রশাসনে যে অঞ্চলটি বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত ছিল, বৃহৎসংহিতায় সেই অঞ্চলেই তাম্রলিপ্ত ও বর্দ্ধমান নামক দুটি জনপদের অস্তিত্ব দেখান হয়েছে। স্কন্দ পুরাণের উক্তি অনুসারে চৌদ্দ হাজার গ্রাম নিয়ে বর্দ্ধমান জনপদটি গঠিত ছিল। বর্দ্ধমান ভুক্তি অর্থেই প্রযোজ্য হতে পারে, অন্যথায় এ কথাটি পুরাণকারের অতিশয়োক্তি। পাল ও সেন আমলে বর্দ্ধমানভুক্তির অধীনস্থ ক্ষুদ্র জনপদগুলি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হলেও অর্থশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বিভাগ ও উপবিভাগের ক্রমগুলি বলবৎ ছিল।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে যে জনপদগুলির উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কয়েকটি আংশিক ও পূর্ণ রাজ্য বর্ধমানের অন্তর্ভূক্ত ছিল, যথা: অপারমন্দার, উচ্ছাল, নিদ্রাবলী, ঢেক্কুর, শিখরভূম প্রভৃতি। একাদশ / দ্বাদশ শতকে গৌড় রাজ্যের মধ্যে রাঢ় জনপদের অবস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং রাঢ় জনপদ উত্তর ও দক্ষিণ দুটি বিভাগে পরিচয় লাভ করে।[৯] 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে রাল অঞ্চলের উল্লেখ আছে—যা রাঢ় দেশের নামান্তর।

মুসলমান আমলে প্রথম দু'শো বছরে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার জন্য বিভাগ বা জেলা প্রভৃতির অস্তিত্ব বা গুরুত্ব ছিল না। মুসলমান শাসকেরা 'গৌড়ের সুলতান'—এই মাত্র ছিল তাঁদের পরিচয়। পরবর্তীকালে লক্ষ্মণাবতী হ'তে

সমগ্র বঙ্গদেশ শাসন করা সম্ভব না হওয়ায় সুবর্ণভূমি ও সপ্তগ্রামে উপ-শাসন কর্তার কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়ে সাজলা-মখবাদ[১০] নামে একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়; এর অধিকাংশ স্থান বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ শতকে বাংলার সুলতান বা শাসকের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার জন্য শেরশাহ্ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র বঙ্গদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। এছাড়া শেরশাহের আমলে উপবিভাগ বা বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এর পূর্বেই বর্ধমান, কালনা, সেলিমাবাদ ও মঙ্গলকোটে সম্ভবতঃ কাজী বা ফৌজদার শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল।

মোগলসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করা হয় এবং ১৫৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বাংলা সুবাকে ১৯টি সরকারে পরিণত করা হয়। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সরিফাবাদ, সরকার সুলেমানাবাদ, সরকার সাতগাঁও এবং সরকার মাদারণের উল্লেখ আছে।[১১] বর্তমান জেলা মোগল আমলের ৪টি সরকারের প্রায় মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হওয়ায় চার সরকারের অধীনস্থ পরগণাগুলির অস্তিত্ব ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের রাজস্ব মানচিত্রে পাওয়া যায়।[১১ক] বর্ধমান নামে কোন সরকার ছিল না; সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত মহল বর্ধমানের উল্লেখ আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং এর রাজস্ব ছিল ৪৬৯০৩½ আকবরশাহী (রৌপ্য) মুদ্রা। সুবার অন্তর্গত সরকার ও সরকারের অন্তর্ভুক্ত পরগণা নামক উপবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠুরূপে রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং কোন একজনের হাতে রাজস্ব আদায়ের অধিক ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা। তাছাড়া সাম্রাজ্যের দূরতম প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত ঐ সকল পরগণা বা সরকার হ'তে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্য ছিল এই বিভাগের মুখ্য কারণ হিসাবে অনুমান করা যেতে পারে। এই সময়ে বর্ধমানে ফৌজদারের কার্যালয় ছিল। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, সুলতান সুজা ও আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ ও মাদারণ বা সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহল বা পরগণাগুলির কোন পরিবর্তন হয় নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি বা জাফর খাঁ বাংলায় সুবাদার বা নাজিম নিযুক্ত হয়ে টোডরমল্ল ও সুলতান সুজার বন্দোবস্তের পরিবর্তন সাধন করেন। জাফর খাঁ-র সময়ে সমগ্র বাংলা সুবাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করা হয় এবং ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই চাকলাগুলির অস্তিত্ব ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাকলাগুলির আয়তন হ্রাস করে 'জেলা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বাংলা সুবার অন্তর্গত চাকলা বর্ধমান আয়তনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হলেও এই চাকলা হতে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় হত। সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদের অধিকাংশ ও সাতগাঁয়ের কয়েকটি পরগণা এবং

মান্দারণের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে বর্ধমান চাকলা গঠিত হয়[১২] এবং ৬১টি পরগণা এই চাকলার অধীনস্থ ছিল।[১৩] জাফর খাঁর মৃত্যুর পর নবাব সুজা-উদ্-দিনের আমলে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ আরও কয়েকটি পরগণা অধিকার করে বর্ধমান চাকলার আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। এই সময়ে বর্ধমান চাকলার বিস্তৃতি ছিল উত্তরে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিয়দংশ এবং দক্ষিণে কপিসা নদীর (কাঁসাই) তীরবর্তী অঞ্চল ধরে রূপনারায়ণ নদের মোহনা পর্যন্ত। পূর্ব ভাগে ভাগীরথী নদীর পশ্চিমকূল (সাতসৈকা পরগণা বাদে) ও সরস্বতীর পশ্চিমকূল হ'তে পশ্চিমে পঞ্চকোট পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিষ্ণুপুর জমিদারীর কিয়দংশ বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বঙ্গদেশের মধ্যে এটিই ছিল বৃহত্তম চাকলা। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের নিকট দেওয়ানী লাভের পর সরস্বতী নদীর পূর্বকূল ও সাতসৈকা পরগণা, বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই চাকলার আয়তন আরও বেড়ে যায়।[১৪] রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ভাগীরথীর পশ্চিমকূল বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও শাসনকার্যে এই অঞ্চল ২৪ পরগণা জেলার অধীনস্থ ছিল। বিশালায়তনের চাকলাটির শাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই অগস্টের এক পত্রে বর্ধমানের জন্য এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করে লণ্ডনের ডিরেক্টরবর্গের নিকট অনুমতি চাওয়া হয়েছিল।[১৫] এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্রে জনপদটির বিশালতার জন্য বহুক্ষেত্রে Burdwan Province-এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। জাফর খাঁর আমলে বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত পরগণাগুলির নামের কোন তালিকা পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত রাজস্ব বিষয়ের তথ্য ও সর্বশেষে প্রাপ্ত বাংলা ১২০১ সালের (১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ) পুলিস ট্যাক্সের রিটার্ণ থেকে চাকলা বর্ধমানের পরগণাসমূহের নামের তালিকা পাওয়া যায়।[১৬]

বর্ধমান	সাহবাদ	পাটুলী	কুবিজপুর
খণ্ডঘোষ	বাঘা	সমরশাহী	সেনপাহাড়ী
সেরগড়	গোপভূম	সেলামপুর	চম্পানগরী
ছুটিপুর	নলহি	বগড়ী	মজফরসাহী
রানীহাটি	হাভেলী	মনোহরসাহী	আজমৎসাহী
রাইপুর	অখোয়া	পলাশী	ফৈজুলপুর
ইন্দ্রাণী	ধেঞা	মহম্মদপুর	আমিরাবাদ
চন্দ্রকোণা	বরদা	ব্রাহ্মণভূম	জাহাঙ্গিরাবাদ
ভুরশুট	চিতুয়া	জাহানাবাদ	মণ্ডলঘাট
সাতসৈকা	বোড়ো	বরডা	পাটমহল
বালিগড়ি	পাণ্ডুয়া	এক্তারপুর	সেলিমাবাদ
বক্সিপুর	পৈনান	খোসলপুর	হাভেলী মান্দারণ

চৌমহ	আরসা	বালিয়া	মজফ্ফরপুর
পাইকান	হাতীকান্দা	চন্দননগর	শাহশিলামপুর
ধাড়সা	শিখরভূম	খালোড়	জয়পুর
বালীচুঙ্গা			

উপরোক্ত তালিকা হতে হেস্টিংসের সময়ে শিখরভূম পরগণা চাকলা বর্ধমান হতে বিযুক্ত করে পাঁচেতের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে বিষ্ণুপুর পরগণা বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। গঞ্জ মুরশিদপুর (কাটোয়া) পরগণা না হয়েও পরগণার গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ উক্ত তালিকায় ইন্দ্রাণী ও গঞ্জ মুরশিদপুর পৃথকভাবে দেখান আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের প্রথম ভাগে রাজস্ব আদায়ই ছিল কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরবর্তীকালে জেলার সীমানা নিরূপিত হয়। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী গভর্ণরের এক আদেশবলে পাঁচেৎ (পঞ্চকোট) ও বিষ্ণুপুরের জন্য পৃথক কালেক্টরী অফিস স্থাপিত হয়েছিল।[১৭] কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ডিরেক্টর-বর্গের নির্দেশে গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিল সুষ্ঠুভাবে বঙ্গদেশ শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বর্ধমান চাকলার ন্যায় এক বিশাল অঞ্চলকে শাসন করা এবং উক্ত অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এরূপ কোন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাও ছিল না। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে মেজর রেনেলের সার্ভে রিপোর্টে জানা যায় সমগ্র চাকলার আয়তন ছিল ৫১৮৪ বর্গমাইল।[১৮] রেনেলের রিপোর্টে আরও পাওয়া যায় যে, সমগ্র চাকলার গ্রামসংখ্যা ছিল আট হাজার এবং গড়ে প্রতি পরিবারে ৪ জন হিসাবে লোকসংখ্যা ধরে মোট লোকসংখ্যা ছিল ১৩,৬০,০০০ জন। ঐ সময়ে প্রতি বর্গমাইলে বর্ধমান চাকলায় ২৬৩ জন লোক বসবাস করত। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ১লা জুলাই গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে কালেক্টর মার্শার (Mercer) আনুমানিক ভিত্তিতে তৎকালীন বর্ধমানের লোকসংখ্যা গণনার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দেখা যায়, ঐ সময়ে লোকসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রেনেলের সময় অপেক্ষা মার্শারের সময়ে জেলার আয়তন কমে গিয়েছিল।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কাউন্সিলে প্রস্তাব রাখা হয় যে, বর্ধমান জেলার উত্তর ও পূর্ব সীমা, অজয় ও ভাগীরথীর প্রবাহ পথ ধরে চিহ্নিতকরণ করা হবে। কেতুগ্রাম থানাকে (মনোহরসাহী পরগণা) বর্ধমান হতে বিচ্ছিন্ন করে বীরভূমের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ এবং নবদ্বীপ শহরকে নদীয়া হতে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমানের সঙ্গে সংযোগ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে উক্ত প্রস্তাব রূপায়িত হয় নাই। সম্ভবতঃ নদীয়া রাজের প্রবল আপত্তিতে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা স্বরূপ ছিল।[১৯] স্বাধীনতার পরেও নবদ্বীপকে বর্ধমানের সঙ্গে যোগ করার

প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়; যার ফলে উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে পারে নাই।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচেৎ ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ বাদে চাকলা বর্ধমানের আয়তনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বরদা, ব্রাহ্মণভূম, চন্দ্রকোনা ও চেতুয়া পরগণা মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যদিও ঐ পরগণাগুলি বর্ধমান রাজের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর ও জঙ্গলমহল বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ঐ সালে ২৭শে ডিসেম্বরের এক আদেশ-বলে রায়পুর, শ্যামসুন্দরপুর, খয়রাসোল, ফুলকুসুমা, সিমলাপাল, ভেদিয়াদেই এই ছয়টি জঙ্গলমহলকে বর্ধমান জেলা হতে বিচ্ছিন্ন করে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জুলাই সাতসৈকা ও সরস্বতীর পূর্বতীর অঞ্চল বর্ধমানে যুক্ত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জেলার বিশালতার জন্য একজন কালেক্টরের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার অসুবিধার জন্য ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ৩৫নং রেগুলেশনের ক্ষমতাবলে পৃথক হুগলী জেলার (বর্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলা) সৃষ্টি হয় এবং একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনস্থ রাখা হয়। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলার কালেক্টরী অফিস স্থাপিত হওয়ার পূর্বে ঐ জেলা বর্ধমানের কালেক্টরের অধীন ছিল। ঐ বৎসরেই বগড়ী পরগণা বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বর্ধমান ও হুগলীর সীমারেখার পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং এই সময়ে পাণ্ডুয়াসহ অন্যান্য কয়েকটি ছিট মহলের অংশ বর্ধমান হতে হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে পার্বত্য অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি পৃথক জেলা প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ১৮নং রেগুলেশন বলে জঙ্গলমহল জেলার সৃষ্টি হয়। বর্ধমান জেলার সেনপাহাড়ী, সেরগড়, কোতলপুর বাদে বিষ্ণুপুর পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার ৬টি পরগণা জঙ্গল মহলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ৯ই অক্টোবরের এক আদেশ-নামায় অজয়ের প্রবাহপথটি বর্ধমান জেলার উত্তরাংশের পশ্চিমভাগ ও বীরভূম জেলায় দক্ষিণাংশের সীমারেখারূপে চিহ্নিত হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের ব্যয়ভার হ্রাসের জন্য জঙ্গলমহলকে পুনরায় ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটান হয়েছিল এবং একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনে বাঁকুড়াতে সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়।

হুগলী জেলা ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান হ'তে পৃথক হলেও ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলা বর্ধমান কালেক্টরীর অধীনস্থ ছিল এবং ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর জন্য পৃথক কালেক্টরী অফিসের সৃষ্টি হয়।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দে কোতলপুর থানাকে বর্ধমানের অধীনে রাখা হয়েছিল। দু' বৎসর পরে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের প্রস্তাবে লেফটন্যাণ্ট জ্যাকসনকে এই অঞ্চলের জেলাগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব অর্পণ করায় তিনি সীমিতভাবে পুনর্বিন্যাসের রিপোর্টে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে বাঁকুড়া জেলা শাসনের প্রস্তাব পেশ করেন।[২১] কিন্তু এই প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে রূপায়িত হয় নাই।

বরাভূমের রাজা বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র লছমন সিং ভূমিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন এবং লছমনের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে ইংরাজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলে বন্দী অবস্থায় তিনি মেদিনীপুর জেলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে লছমনসিং-এর পুত্র গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে (১৮৩২-৩৬ খ্রীঃ) পুনরায় আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে সেনপাহাড়ী, সেরগড় ও বিষ্ণুপুরকে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য সীমান্ত এজেন্সী গঠিত হয়, অর্থাৎ জঙ্গল মহল হতে বিচ্ছিন্ন করে শাসনকার্যের পুনর্বিন্যাসকল্পে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (রেগুলেশন নং ১৩)।

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে পৃথক পশ্চিম বর্ধমান জেলার সৃষ্টি হলে বর্ধমানের কালেক্টরের অধীনে একজন জয়েণ্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। তিনি বিষ্ণুপুর, কোতলপুর ও ইন্দাসের কর্তৃত্বে ছিলেন। পুনরায় ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুলাই-এর এক আদেশবলে বাঁকুড়া নামক একটি নূতন জেলার সৃষ্টি করা হয়। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে আউসগ্রাম, পোখনা ও ইন্দাস অঞ্চল বাঁকুড়া হতে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ইন্দাস ও বুদবুদকে বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে লেফ: জ্যাকসনের (Lt. Jackson) তত্ত্বাবধানে বর্ধমান জেলার থানা ও মহকুমাগুলি জরিপ করে জেলার সীমানা পুনর্গঠনের সুপারিশের ভিত্তিতে জেলার অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃসীমানা পরিবর্তনের বিষয়গুলি পরবর্তীকালে বিবেচিত হয়েছিল।

১৮৫৫-৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সার্ভে রিপোর্টে এই জেলার আয়তন ছিল ১৭,২৩,২৭০ একর বা ২৬৯২·৬৩ বর্গমাইল এবং ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই সমগ্র জেলাকে ২১টি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। শাসনকার্যের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নবগঠিত বিভাগগুলি মহকুমার সংজ্ঞা লাভ করে। অবশ্য বর্ধমানের সদর মহকুমার সৃষ্টি ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে বুদবুদ, ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কাটোয়া, ঐ বৎসর মে মাসে রানীগঞ্জ ও জুন মাসে জাহানাবাদে (বর্তমান আরামবাগ) মহকুমা সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কালনা শহরটিও একটি মহকুমা সদররূপে পরিচিতি লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে,

এই সময়ে কাটোয়া, দাঁইহাট ও কালনা শহর তিনটি নৌবাণিজ্যের উপযোগী স্থান হিসাবে অন্তর্দেশীয় বন্দররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[২২] মহকুমার অধীনস্থ বিভাগগুলি পরগণা নামে অভিহিত হলেও ঐ বিভাগসমূহ বর্তমান সংজ্ঞানুসারে থানায় রূপান্তরিত হয় এবং নিম্নলিখিত থানাগুলি মোগল আমলের পরগণা অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর হলেও প্রায় সকলক্ষেত্রেই পূর্ব নাম বজায় ছিল।[২৩] এই সময়ে শাসন ও রাজস্বের উপবিভাগগুলি পৃথক ছিল না।

১। অম্বিকা	২। আজমৎসাহী	৩। ইন্দ্রাণী
৪। খণ্ডঘোষ	৫। গোপভূম	৬। চম্পানগরী
৭। ছুটিপুর	৮। জাহাঙ্গীরাবাদ	৯। ধেঞা
১০। নলহি	১১। মনোহরশাহী	১২। বাঘা
১৩। বর্ধমান	১৪। রানীহাটি	১৫। সমরসাহী
১৬। সাতসৈকা	১৭। সেনপাহাড়ী	১৮। মজঃফরসাহী
১৯। সাহাবাদ	২০। সেরগড়	২১। হাভেলী

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, জাহানাবাদ, বুদবুদ ও রানীগঞ্জ—এই ৬টি মহকুমা নিয়ে বর্ধমান জেলা গঠিত ছিল এবং এই বছরে প্রথম জনগণনায় সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার পরিসংখ্যা পাওয়া যায়। ৬টি মহকুমার লোকসংখ্যা ছিল ১৮,৬১,৬৬৩ জন। ঐ সময়ে বর্ধমান জেলার মোট ৩৫১৩ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে ৫১৯১টি গ্রাম ও শহরের সংখ্যা ছিল ৬টি। মহকুমার উপবিভাগ অর্থাৎ থানা নামের প্রথম পরিচয় ঘটে এই সময়েই (পরগণার পরিবর্তে 'থানা' নাম ব্যবহৃত হয়)। অবশ্য পূর্বের ন্যায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পরগণা বিভাগের প্রচলন অবলুপ্ত হয় নাই। মহকুমা-ভিত্তিক জেলার অন্তর্ভুক্ত থানা বিভাগের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়:

বর্ধমান (আয়তন—৮৪১ বর্গ মাইল): বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, ইন্দাস, সেলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া ও সাহেবগঞ্জ।

কাটোয়া (আয়তন—৪০৭ বর্গ মাইল): কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট।

কালনা (আয়তন—৪৩১ বর্গ মাইল): কালনা, ভাতুরিয়া ও মন্তেশ্বর।

জাহানাবাদ (আয়তন—৬৪১ বর্গ মাইল): জাহানাবাদ, কোতলপুর, গোঘাট ও রায়না।

বুদবুদ (আয়তন-৬৭১ বর্গ মাইল): বুদবুদ, আউসগ্রাম ও সোনামুখী।

রানীগঞ্জ (আয়তন-৫৩২ বর্গ মাইল): রানীগঞ্জ, কাঁকসা ও নিয়ামৎপুর।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুন বর্ধমান মহকুমা হতে ইন্দাস থানা, বুদবুদ মহকুমা হতে সোনামুখী থানা ও জাহানাবাদ মহকুমা হতে কোতলপুর থানা বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা (মহকুমা সদরসহ)

হুগলী জেলায় যুক্ত হয় এবং রায়না থানা, বর্ধমান সদর মহকুমার অংশরূপে পরিগণিত হয়। ঐ বৎসরেই ২৭শে সেপ্টেম্বর বুদবুদ মহকুমার অবলুপ্তি ঘটেছিল। এইভাবে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে স্থান বিনিময় কার্য ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল এবং গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্জ, সেলিমাবাদ, নিয়ামৎপুর ও ভাতুরিয়া বাদে অন্যান্য থানাগুলির পরিচিতি ঐ সময় হতে অপরিবর্তিতরূপে চলে আসছে। কিন্তু ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের পরগণা বিভাগ আজও বলবৎ আছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল অগ্রদ্বীপ অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে আসানসোল শহরটি পৌরসভার অধীনে আসে এবং রানীগঞ্জের পরিবর্তে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে আসানসোল মহকুমা শহরে রূপান্তরিত হয়।[২৪]

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ৪টি মহকুমাসহ ২৩টি থানার উল্লেখ আছে, যথা :

বর্ধমান—বর্ধমান, মেমারী, জামালপুর, রায়না, খণ্ডঘোষ, গলসী, কাঁকসা ও আউসগ্রাম।

আসানসোল—আসানসোল, রানীগঞ্জ, অণ্ডাল, জামুরিয়া, ফরিদপুর, দুর্গাপুর, কুলটি, বরাবনী ও সালানপুর।

কাটোয়া—কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট।

কালনা—কালনা, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর।

১৯১৯-২০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ নিম্নলিখিত ৬টি মিউনিসিপ্যালিটি শহরের তথ্য জানা যায় —

	স্থাপিত	জনসংখ্যা	রেটপেয়ার্স মোট	জনসংখ্যার সঙ্গে রেট পেয়ার্সদের অনুপাত
বর্ধমান	১লা এপ্রিল, ১৮৬৫	৩৫,৯২১	৭,৮৮১	২১·৯%
কালনা	১লা এপ্রিল, ১৮৬৯	৮,৬০৩	২,৬৯৪	৩১·৩%
কাটোয়া	১লা এপ্রিল, ১৮৬৯	৬,৯০৪	২,৪৮৮	৩৬·৩%
দাঁইহাট	১লা এপ্রিল, ১৮৬৯	৫,৩৪২	১,৩৮০	২৫·৮%
রানীগঞ্জ	১লা এপ্রিল, ১৮৭৬	১৫,৪৯৭	১,৭৫১	১১·৩%
আসানসোল	১লা অক্টোবর, ১৮৯৬	২১,৯১৯	২,৬০৬	১১·৪%
		৯৪,১৮৬	১৮,৭৯৯	১৯·৯%

উপরোক্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, রানীগঞ্জ ও আসানসোল শহরে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল অল্প, অর্থাৎ ঐ শহরে বহিরাগত চাকুরীজীবীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাঁরা রেটপেয়ার্স তালিকার আওতা বহির্ভূত জনসংখ্যা।

উত্তরোত্তর জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জেলার পশ্চিম অঞ্চলে কয়লাখনি, কলকারখানা ও ডি-ভি-সি-র বিভিন্নমুখী পরিকল্পনার ফলে থানাগুলির ওপর অত্যধিক চাপ পড়তে থাকে। ফলে কালক্রমে থানার সংখ্যা বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পর্যায়ে জেলার অন্তর্ভুক্ত থানাগুলির আয়তন বা শাসন বিভাগের বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই। কিন্তু উপরোক্ত কারণে আসানসোল মহকুমার প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর অত্যধিক চাপ ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গঠিত হওয়ার ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করে দুর্গাপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। গলসী ও আউশগ্রাম থানার কিয়দংশ নিয়ে বুদবুদ থানা, আসানসোল ও কুলটি থানার কিয়দংশ নিয়ে হীরাপুর থানা এবং সালানপুর থানার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করে চিত্তরঞ্জন শিল্পাঞ্চলের জন্য চিত্তরঞ্জন থানার সৃষ্টি হয়। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপুর থানাকে ভাগ করে দুর্গাপুর, কোকওভেন ও নিউটাউনশিপ নামক তিনটি থানা গঠিত হয়েছিল। অনুরূপ কারণে বর্ধমান সদর মহকুমাকে দু'ভাগ করে বর্ধমান উত্তর ও বর্ধমান দক্ষিণ নামক দুটি মহকুমার সৃষ্টি হয় ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই রায়না থানার ১৪৭ নং মৌজা (Notification No. 3920 P.L.) হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বর্ধমান জেলার আয়তন ৬ বর্গ কিঃ মিঃ পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

অর্ধশতাব্দীর সংখ্যাতত্ত্ব বিচারে জেলার অতীত ও বর্তমানের তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়:

	১৯৩১	১৯৭১	১৯৮১
মহকুমার সংখ্যা	৪	৫	৬*
থানার সংখ্যা	২৩	২৭	২৯
গ্রাম সংখ্যা	২৬৩১	২৬০৯	২৫৭০
শহরের সংখ্যা	৯	২২	৪৯
জনসংখ্যা	৫,৭৫,৬৯৯	৩৯,১৬,১৭৪	৪৮,৩৫,৩৮৮

* ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান সদর থানা দুভাগে বিভক্ত হওয়ায় মহকুমার সংখ্যা ১টি বেড়েছে।

তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্ব হতে দেখা যায় যে, গ্রামসংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এই ক্রমহ্রাসমানের কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জেলার পশ্চিম অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল গঠিত হওয়ায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি শহরাঞ্চল গঠিত হয়েছে। কিন্তু কৃষি অঞ্চলে এই পরিবর্তন ধারার কোন প্রভাব নাই।

বর্ধমান জেলার বিভাগ বা উপবিভাগের জল্পনাকল্পনা কিন্তু এখানেই থেমে যায় নাই। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১০ই অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এক খবরে প্রকাশ যে, "আসানসোল জেলার দাবি আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে"। ১৯৫৬

সালে আসানসোলকে নিয়ে পৃথক জেলা গঠনের দাবি উঠলেও,পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দাবি মেনে নেন নাই। কিন্তু ১৯৮১-৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি সুপারিশ করে প্রতি বিশ লক্ষ জন-সংখ্যার জন্য পৃথক জেলা গঠনের এবং ঐ অভিমত অনুসারে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণা জেলা ভেঙ্গে আরও তিনটি নূতন জেলা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে ২৪-পরগণা জেলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়।

পৃথক আসানসোল জেলার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে যে, প্রশাসনের স্বার্থে জেলাকে দু'ভাগ করা যেতে পারে। জেলাকে ভাগ করে যদি প্রশাসনিক অবস্থা সুষ্ঠু করা যায় তাহলে ৫৬টি জেলা নিয়ে গঠিত বিহার রাজ্যের মূল সমস্যা সমাধান হয়ে যেত; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নাই। আসানসোল হতে বর্ধমানের দূরত্বকে যথেষ্ট বড় করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কেতুগ্রাম থানার জন্য একটা পৃথক জেলা গঠন করা হোক; কারণ কেতুগ্রামের দূরতম অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা আসানসোল হতে অধিক কষ্টসাধ্য। দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে যে নগর উন্নয়ন পরিষদ আছে পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র তা অনুপস্থিত। কলিকাতা হতে কোচবিহারের দূরত্ব অধিক এবং রাজধানীর সঙ্গে কোচবিহারের কষ্টসাধ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলায় হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভবপর নয় নাগপুরে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্থানান্তরিত করা।

পৃথক আসানসোল জেলার দাবিদারগণ কেবলমাত্র কয়লাখনি, শিল্পোন্নয়ন ও ডি. ভি. সি-র প্রতি লক্ষ্য রেখে এই দাবী তুলেছেন। তাঁরা একেবারেই কৃষি অঞ্চলের অবদানের কথা ভুলে গিয়েছেন এবং পৃথক জেলারূপে বিভক্ত হলে দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলের বাইরেও শিল্পোন্নয়নের দাবী আসবে এবং কৃষি অঞ্চলেও কলকারখানা স্থাপনের দাবি উঠলে তা নস্যাৎ করা যাবে না। কিন্তু শত প্রচেষ্টাতেও দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য কৃষি অঞ্চলভুক্ত করা সম্ভবপর হবে না। নূতন জেলাটির অর্থনীতি কেবলমাত্র খনি ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল হলে যদি কোন কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসে তাহলে সমগ্র জেলাটির জনজীবন বিপর্যস্ত হবে, কারণ শত চেষ্টায় এই জেলাকে কৃষিঅঞ্চলভুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই। সেক্ষেত্রে আসানসোল জেলার মোট আয়তন হবে মাত্র ১৯০০ বর্গ কিঃ মিঃ অঞ্চল নিয়ে। সে দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তুলনামূলকভাবে প্রশাসনিক ব্যয় হবে অত্যধিক। অপরপক্ষে ১৯০০ বর্গ কিঃমি অঞ্চল নিয়ে যদি একটা জেলা (আসানসোল) গঠনের দাবীকে মেনে নেওয়া হয় এবং বর্ধমান মহকুমার অধিবাসীগণ যদি দাবী তোলেন যে এই

মহকুমাকেও পৃথক জেলার মর্যাদা দেওয়া হোক, তাহলে সে সময়ে রাজ্য সরকার কি এই দাবি মেনে নিতে পারবেন? বর্ধমান মহকুমার আয়তন প্রায় ৩১০০ বর্গ কিঃমিঃ অর্থাৎ আসানসোল-দুর্গাপুর অপেক্ষা অনেক বেশি। সংখ্যাতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমার যৌথ লোকসংখ্যা ১৮'৭৪ লক্ষ এবং কেবলমাত্র বর্ধমান মহকুমার একক লোকসংখ্যা ১৬'৮৫ লক্ষ।

নূতন আসানসোল জেলার সৃষ্টি অপেক্ষা শিল্পাঞ্চলের যে সমস্যাগুলি প্রবল আকারে বেড়ে চলেছে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অধিক। এই সমস্যাগুলির সমাধান না করার জন্য শিল্পে সঙ্কট ও তার ফলে কর্মসংস্থানের সমস্যা বেড়ে চলেছে। কয়লাখনি অঞ্চলে ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রধান সমস্যা। কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি দফতরের রিপোর্টটি এখনও কার্যকরী হয় নাই। শিল্পাঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমাকে নিয়ে পৃথক জেলা গঠন করা হলে সাময়িকভাবে শিল্পাঞ্চলের মানুষ হয়ত উপকৃত হবে ঠিকই, কিন্তু পুনর্বাসন, জমিরূপান্তর, ধ্বস ও খনিদুর্ঘটনা এসব মূল সমস্যার যদি সমাধান না হয় তা'হলে পৃথক জেলা সৃষ্টি করে খনি ও শিল্প অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। তা'ছাড়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খনি অঞ্চলে যেভাবে বাসগৃহ নির্মাণের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি প্রায় ৬০০ বর্গমাইল অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লা তুলে নেওয়া হয় তা'হলে বাসস্থানের সঙ্কট এড়াতে এই অঞ্চলের লোককে হয়ত আরও পূর্বে সরে যেতে হবে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথা বিচার করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাই বিচিত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তা'হলে বীরভূম ও বাঁকুড়ার ন্যায় ছোট জেলাগুলিকেও বিভাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর নয়। ভৌগোলিকভাবে বিভাগ করে পৃথক জেলা সৃষ্টির পূর্বে চিন্তা করা প্রয়োজন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং এই ধরনের অর্থনীতি কেবলমাত্র খনি ও শিল্প নিয়ে এদেশে গড়ে উঠতে পারে না। যতই শিল্পোন্নয়ন হোক না কেন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি হল কৃষি নির্ভরতা। সে কারণে বৃহত্তর স্বার্থে অঞ্চলগুলিকে এভাবে গঠিত করতে হবে যাতে কৃষি ও শিল্প সমাজজীবনে পরস্পরের সহায়ক হয়ে ওঠে।

পাদটীকা :

১। *Vedic Index*, Macdonell & Keith, Vol. I, P. 273.

২। অর্থশাস্ত্র, (অনুঃ) রাধাগোবিন্দ বসাক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩।

৩। *H. C. I. P (The Age of Imperial Unity)*, Ed. Dr. R. C. Majumdar' p. 1.

৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XXII, p. 155.

৫। *Indian Epigraphical Glossary*—D. C. Sircar, p. 379.

৬। *Ibid.* p. 195.

৭। *E. I.* Vol. IX, p. 231-33.

৮। *E. I.* Vol. XXIII, p. 159-61.

৯। *J. A. S. B*, 1908, p. 287.

১০। *Inscriptions of Bengal*—Samsud-din Ahmed, Vol. IV, p. 69.

১১। *Statistical Accounts of Bengal*, W. W. Hunter, Vol. IV, p. 138. In the Ain-I-Akbari, Bardwan is mentioned as Mahal or, Pargana of Sarkar Sharifabad and was assessed at 18,76,142 dams or 46903½ Akbarsahi rupees of 175 grains troy silver each. The greater part of present district belonged to Sarkar Sharifabad, Sulaimanabad and Madaran.

১১। *Ain-I-Akbari*, Vol. 2, p. 153-55.

১২। K. A. L. Hill's Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Burdwan (1927-34), Vol. I, p. 18. Sharifabad covered the main portion of the present Burdwan District, Madaran included Asansol Sub-division with otherwards to the west. Salimabad included most of the present Hooghly and south-eastern portion of Burdwan.

১৩। *Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan*, J. C. K. Peterson, p. 145.

১৪। *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal* (1757-1916)-Rai Monmohan Chakrabatti, p. 29.

১৫। *Fort William Corrospondence*, Vol. IV, p. 461.

১৬। *West Bengal District Records, Burdwan* (*Letters Issued*), p. 384.

১৭। *Ibid.*—Rai M. Chakrabatti, p. 6.

১৮। *The East Indian Gazetters of Hindustan*—Walter Hamilton, Vol. I, p. 298.

১৯। K. A. L. Hill, p. 18.

In 1793, it was decided—Ganges should form the boundary between Burdwan and Nadia and it was further decided that save for Ketugram the Ajoy should form the natural boundary of the district.

২০। *Ibid,* p. 18.

২১। *Ibid,* p. 18.

In 1814, Government sanctioned a boundary survey by one Lt. Jackson, following which extensive minor adjustments of external boundaries and reorganisation of thanas within the districts were proposed by the Magistrate and accepted by the Government.

২২। *Ibid,* p. 5.

২৩। *Maps on Revenue Survey of India,* 1854-57.

২৪। *Bengal District Gazetteers, Burdwan,* p. 184.

পরিশিষ্ট—১

BURDWAN*

Area (1916) 2691 Sq. Miles Population (1911) 15,38,377

Ceded by Mir Kasim in 1760. At that time Burdwan Zamindari comprised—modern Burdwan (except Satsikka), Hooghly and Howrah (except the riparian strip east of the Saraswati), Midnapore (Ghatal and in Sadar, the thana Garhbeta and northern parts of thanas Salbani and Kespur), Bankura (thana Raipur) and Birbhum (3 small strips north of Ajoy).

Just before the Permanent Settlement Bisenpur was added. Burdwan then included—Burdwan (except Satsikka), Howrah and Hooghly (except the riparian strip east of the Saraswati), Midnapore (Ghatal and north Sadar), Bankura (except north Sadar) and Birbhum (3 small strips).

Year of order	Changes in jurisdiction since Permanent Settlement	Remarks (reason and authority for changes)
1793	Six Jungle Mahals (Raipur, Syamsundarpur, Khursal, Phulkusuma, Simlapal & Bheliadehi) transferred to Midnapore	Administration efficiency. Governor-General's order dt. 27th December, 1793.
1794	Satsikka, and the riparian strip east of the Saraswati transferred from Nadia	Administrative convenience order dt. 11th July, 1794.
1795	Hooghly (including Howrah) separated	Heavy work. Reg. XXXVI of 1795.

* A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757—1916

By—Rai Monmohan Chakrabatti, Bahadur, M.A.,B.L.

1795	Pargana Bagri transferred to Midnapore	Heavy work. Reg. XXXVI of 1795.
1795-1807	Pargana Pandua with other mahals transferred to Hooghly	Adjustment of Zilla boundary between Hooghly and Burdwan. Order dt. 8th December, 1795, February, 1798, 22nd January, 1807, 22nd February, 1807.
1801	Bagri transferred to Midnapore fiscally	Public convenience. Order dt, 26th February, 1801.
1805	Pargana Senpahari, Shergarh and Bisenpur minus thana Kotalpur and pargana Balsye transferred to Jungle Mahals district.	Aboriginal outbreaks. Reg. XVIII of 1805.
1806	River Ajay made the northern boundary	Adjustment of boundary between Birbhum and Burdwan. Order dt. 9th October, 1806.
1809	Revenue collection of Jungle Mahal transferred from Birbhum and Midnapore to Burdwan, under an Assistant Collector placed at Bankura.	Economy. Order dated 27th January, 1809.
1819 (1821)	Hooghly fiiscally seperated	Heavy work. Order dt. 26th February, 1819
1833	Parganas Senpahari, Shergarh and most of Bisenpur transferred from Jungle Mahals.	Outbreaks of aboriginal tribes. Reg. XIII of 1833.
1834	Western Mahals under a Joint-Magistrate-Deputy Collector with headquarters at Bankura.	Heavy work. Order dated 7th July, 1934.

1837	Bankura finally seperated	Heavy work. Order dated 3rd July, 1837.
1848	Thanas Aosgaon, Pothna and Indus transferred from Bankura to Burdwan	For convenience of the public. Order dt. 5th August, 1848.
1851	Thana Indus transferred to Bankura.	For convenience of the public. Order dated 7th February, 1851.
1851	Budbud sub-division transferred to Bankura.	For convenience of the public. Order dated 5th May, 1851.
1872	Thana Keogram from Birbhum	Concurrent jurisdictions of all courts. Notification dated 17th June, 1872.
1872	Thanas Kotalpur and Sonamukhi from Bankura, with thanas Jehanabad and Goghat from Hooghly added.	Administrative convenience. Notification dated 17th June, 1872.
1879	Budbud sub-division abolished and its Indus thana transferred to Bankura, with Kotalpur and Sonamukhi.	Administrative convenience. Notification dated 27th Sept. 1879.
1879	Goghat and Jehanabad thana transferred to Hooghly.	Ditto.

পরিশিষ্ট—২

১৯৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে তুলনামূলক তথ্য

	বর্ধমান	পশ্চিমবঙ্গ
আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭,০২৪·০	৮৮,৭৫২·০
জনসংখ্যা	৪৮,৩৫,৩৮৮	৫,৪৫,৮০,৬৪৭
গ্রামীণ জনসংখ্যা	৩৪,১৪,২১৯	৪,০১,৩৩,৯২৬
শহরের জনসংখ্যা	১৪,২১,১৬৯	১,৪৪,৪৬,৭২১
তফসিলীজাতিভুক্ত জনসংখ্যার হার	২৫·০৯%	২১·৯৯%
উপজাতিভুক্ত জনসংখ্যার হার	৫·৭৫%	৫·৬৩%
শিক্ষিতের হার	৪২·৪৩	৪০·৯৪
ঐ পুরুষ	৫১·২৯	৫০·৬৭
ঐ মহিলা	৩২·৫৬	৩০·২৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)	৬৮৮	৬১৫
দশ বৎসরে জনসংখ্যা বর্ধিতের হার	+২৩·৪৭	+২৩·১৭
স্ত্রী-পুরুষের হার (প্রতি ১০০০ জন পুরুষে)	৮৯৭	৯১১
ঐ (গ্রামাঞ্চল)	৯৩৪	৯৪৭
ঐ (শহরাঞ্চল)	৮১৫	৮১৯
গ্রামসংখ্যা	২৬৭৯	৪১১১২
পরিত্যক্ত মৌজা	১০৯	৩,০৪৪
শহরের সংখ্যা	৪৯	২৯১
গৃহসংখ্যা	৮,৮২,০৫৪	৯৫,৯১,৫০১

লোকসংখ্যার অনুপাতে গ্রাম সংখ্যা

লোকসংখ্যা	গ্রামসংখ্যা	মোট গ্রাম সংখ্যার হিসাবে শতকরা হার
২০০ জন পর্য্যন্ত	১২৭	৪·৯৪
২০০-৪৯৯ জন	৪৮৩	১৮·৭৯
৫০০-১৯৯৯ জন	১,৪৭৭	৫৭·৪৭
২০০০-৪৯৯৯ জন	৪২৪	১৬·৫০
৫০০০-৯৯৯৯ জন	৫৮	২·২৬
১০০০০ জন পর্য্যন্ত	১	০·০৪
মোট	২,৫৭০	১০০·০০

পরিশিষ্ট—৩

সরকার সুলেমানা বাদ

আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় ৩১টি মহল বা পরগণা নিয়ে সরকার সেলিমাবাদ গঠিত ছিল। পূর্বে এই সরকারের নাম ছিল সুলেমানাবাদ। ব্লকম্যান সাহেবের মতে সুলেমান শাহের নামানুসারে সুলেমানাবাদ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে হয় সেলিমাবাদ। সেলিমাবাদের সদর কার্যালয় ছিল বর্তমান জামালপুর থানার অধীনে সেলিমাবাদ গ্রামে। এই সরকার হতে মুঘল সম্রাটের নিকট রাজস্ব প্রেরিত হত ১৭,২৯,৯৬৪ দাম বা ৪,৪০,৭৪৯ আকবর-সাহী মুদ্রা। শাসনকার্য ও শান্তি রক্ষার জন্য ৭০০০ পদাতিক ও ১০০ জন অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিল। এই স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক বসবাস করত।

সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি পরগণার নাম—

১। ইন্দ্রায়িন
২। ইসমাইলপুর
৩। আমুল্যা বা অনলিয়া
৪। উলা
৫। ভুরস্থট
৬। বসুন্ধরী
৭। পাণ্ডুয়া
৮। পাচলোর
৯। বালীচুঙ্গা
১০। ছুটিপুর
১১। চৌমহা
১২। জয়পুর
১৩। হোসেনপুর
১৪। ধারসা
১৫। রায়না হাভেলী
১৬। সেলিমাবাদ
১৭। সাতসিকা
১৮। সহশপুর
১৯। সঙ্গেলী
২০। উমরপুর
২১। সুলতানপুর
২২। আলামপুর
২৩। কুবুজপুর
২৪। নগিন
২৫। গোবিন্দ
২৬। মহম্মদপুর
২৭। মুলঘর
২৮। নাইয়া
২৯। নসঙ্গ
৩০। নীপা (নবিয়)
৩১। কয়েকটি ক্ষুদ্র তালুক

সরকার সরিফাবাদ

আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সরকার সরিফাবাদ ২৬টি মহল বা পরগণা নিয়ে গঠিত ছিল এবং এই সরকার হতে মুঘল সম্রাটের রাজস্ব বাবদ আদায় হত ২৪,৮৮,৭৫০ দাম বা ৫,৬২,২১৮ আকবরশাহী মুদ্রা। এই সরকারের শান্তি রক্ষার জন্য ৫০০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিল। সরিফাবাদে বহুজাতির বসবাস ছিল। সরকার সরিফাবাদের অধীনস্থ মহলগুলির নাম—

১। বর্দ্ধমান
২। বহরর
৩। বরবকসাহী
৪। ভরকোণ্ডা
৫। আকবরসাহী
৬। ভাটছালা
৭। বক্ষি
৮। খন্ত
৯। ধেয়া
১০। মহলন্দ
১১। সোনিয়া
১২। আজমৎপুর
১৩। ফতেসিং
১৪। বাঘা
১৫। খারগ্রাম
১৬ কিরিটপুর
১৭ খণ্ড (ঘোষ)
১৮ নসক
১৯ কোদয়া
২০ কোটমকন্দ
২১। মনোহরসাহী
২২। মজঃফরসাহী
২৩। সুলেমানসাহী
২৪। নতরন
২৫। হোসেন অজিযুল
২৬। বার্জার ইব্রাহিমপুর

সরকার মাদারণ

সরকার সুলেমানাবাদ ও সরকার সরিফাবাদ অপেক্ষা এই সরকারের আয়তন ক্ষুদ্র হলেও এই সরকারের বিস্তৃতি ছিল বর্তমানের পাঁচটি জেলায়। বীরভূম, বর্ধমান, বাকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর—এই পাঁচটি জেলার টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে সরকার মাদারণ গঠিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে একে সীমান্তবর্তী বিভাগ বলা হয় এবং এই কারণেই এর গুরুত্ব বেশী ছিল।

আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় ১৬টি মহল বা পরগণা নিয়ে সরকার মাদারণ গঠিত ছিল। রাজস্ব বাবদ মুঘল সম্রাটের প্রাপ্য ছিল ২,৩৫,০৮৫ আকবরসাহী মুদ্রা বা ৯৪,০৩,৪০০ দাম। এই সরকারের শান্তিরক্ষা ও শাসন-কার্যের জন্য ১৫০ জন অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন এই অঞ্চলে বসবাস করত।

আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সরকার মাদারণের অধীনে ১৬টি পরগণার নাম—

১। পানিহাটী
২। বালগড়ি
৩। বীরভূম
৪। ধওলভূম
৫। চিতুয়া
৬। চম্পানগরী
৭। হাভেলী মাদারণ
৮। সিংভূম
৯। সেরগড
১০। সাহাপুর
১১। কেট
১২। মণ্ডলঘাট
১৩। নাগর
১৪। মিনকবাগ
১৫। হেসোলী
১৬। সমরশাহী

সরকার সাতগাঁও

আইন-ই-আকবরী বর্ণিত একটি অন্যতম বৃহৎ সরকার*। দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের শাসন কেন্দ্র সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও-এর নামানুসারে এই সরকারের নামকরণ করা হয়েছিল। মোট ৫৩টি পরগণা এই সরকারের অধীনস্থ ছিল এবং এর সদর কার্যালয় ছিল সপ্তগ্রামে। বর্তমান বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা ও যশোহর জেলার আংশিক বা বৃহত্তম অংশ নিয়ে সপ্তগ্রামের বিস্তৃতি ছিল। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে যে মোট ৫৩টি মহল বা পরগণার রাজস্ব ছিল ১,৬৭,২৪,৭২৪ দাম বা ৪১৮,১১৮ আকবরসাহী মুদ্রা এবং শান্তিরক্ষার জন্য ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৬০০০ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত ছিল।

আইন-ই-আকবরীতে ৫৩ পরগণার যে নাম পাওয়া যায়—

১। অম্বুয়া	২। ফরাসৎগড়	৩। উকড়া	৪। আনওয়ারপুর
৫। আর্শা	৬। সাতগাঁও	৭ আকবরপুর	৮। বুরন বোধান
৯। পৈনান পনওয়ান	১০। সেলিমপুর	১১ পুড়া	১২। মানিকহাটী
১৩। ব্রহ্মত্তর	১৪। বেলগাঁও	১৫ কালিন্দা	১৬। বাগোয়ান
১৭। বঙ্গাবাড়ি	১৮। বালিয়া	১৯ ফলকা	২০। বরিদহাটি
২১। হাভেলীশহর	২২। হোসেনপুর	২৩ তুরতরিয়া	২৪। হাজিপুর
২৫। বারবকপুর	২৬। ধুলিয়াপুর	২৭ রানীহাটী	২৮। সাদঘাটি
২৯। সকোটা	৩০। শ্রীরাজপুর	৩১ বন্দরবান	৩২। মন্দই
৩৩। শাকহাট	৩৪। কাটশাল	৩৫ ফাতপুর	৩৬। কলিকাতা
৩৭। বকোয়া	৩৮। বারবকপুর	৩৯ খারড	৪০। কন্দালিয়া
৪১। কলরায়া	৪২। মগরা	৪৩ মাহিয়ারী	৪৪। মেদিনীমল
৪৫। মুজফরপুর	৪৬। মুণ্ডাগাদা	৪৭। নাহিহাট্টি	৪৮। নদীয়া
৪৯। শান্তিপুর	৫০।	৫১। হাতীকান্দা	৫২। কোতয়ালী
৫৩। হাতিয়াগড়			

* Statistical Account of Bengal, Vol. I, Geo. & Hist. Notes H. Blochmann, p. 360-64.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমি পরিচিতি

ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ

ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা মানুষের জীবন ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুকূল পরিবেশে মানুষ গৃহ নির্মাণ করে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শিখেছে; অনুরূপভাবে প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে মরুস্থানবাসী বা যাযাবর শ্রেণীভুক্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারলাভের পূর্বে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ভৌগোলিক পরিবেশের ওপরই অধিকাংশ স্থলে নির্ভরশীল ছিল। ঐ যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসমাজ সমতলবাসী, বনবাসী অথবা পার্বত্যবাসী ছিল এবং তাদের জীবনধারণের উপায় ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ। পরবর্তী-কালে বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করলেও বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষ ধরনের সম্পদ আহরিত হয়। অতএব বিজ্ঞান মানুষের কাজের সাহায্যকারী মাত্র; যা প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে না।

কোন দেশের বা অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা পর্যালোচনা করতে হলে সর্বাগ্রেই তাই তার ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য স্মরণীয়—"History cannot be meaningful without a knowledge of Geography. Annals of a country of a given period cannot be correctly evaluated without having an idea of its geopolitical conditions during the relevant age."। একথা একটা সমগ্র দেশের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে প্রদেশ বা জেলার পক্ষেও প্রযোজ্য। ২৪-পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীর জীবন-ধারণের মান ও উপায়ের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সে কারণে বলা যেতে পারে—"বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে জাতীয় জীবন ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং মানুষ ভৌগোলিক পরিবেশকে কতদূর পর্যন্ত স্বকীয় প্রয়োজনে পরিবর্তিত করে জীবনযাত্রাকে অধিকতর সুসহ করে তুলতে সমর্থ হয়েছে তা ইতিহাস পর্যালোচনা ভিন্ন সম্ভব নহে। পরিবেশের বিভিন্নতা অনুসারে যেমন জীবনে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তেমনি উদার বা অনুদার পরিবেশ

জীবনের উন্নতির মাত্রা নিরূপণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং মানুষের সঞ্চরণশীলতাকে অনিবার্য করে তুলেছে।"[১]

ভৌগোলিক পরিবেশ মানবজীবনকে তথা সমাজজীবনকে কিরূপে প্রভাবিত করতে পারে বা করে থাকে, সে সম্পর্কে উনবিংশ শতকে অ্যাডমিরাল মাহান, ম্যাকিণ্ডার এবং স্পাইকম্যান পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আরও পর্যালোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিত কে. এম. পানিক্কর মন্তব্য করেছেন[২]—"Geographical factors themselves have no value except in relation to men. The problem of population, their standards of living, their mental and physical efficiency and their productive capacity are the basis on which a nation's life has to be ultimately built up."। আর একটু উন্নত পর্যায়ের কথা চিন্তা করে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বলেছেন[৩], "In studying the cultural development of any country, the importance of its geographical factors can hardly be minimised. In the early periods of human history, geography determined to a great extent the lives and activities of the people as well as their thought and literature. Geography shaped history largley then, as it does even today all over the world, though in a different manner."।

ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে অবস্থান, আয়তন ও আকৃতি প্রধান স্থান লাভ করেছে। কিন্তু মূল উপাদানগুলি ছাড়াও ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক গঠন, আভ্যন্তরীণ গঠন, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীবজন্তু, খনিজ সম্পদ, নদীপ্রবাহ প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবস্থান ও আয়তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও জলবায়ু' বনজ সম্পদ, নদনদীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। আবার কৃষি ও কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে ভূপৃষ্ঠের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনের পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। অনুরূপভাবে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, মৎস্যচাষের আলোচনার ক্ষেত্রে নদনদীর গতিপ্রকৃতি, অববাহিকা অঞ্চলের গঠনপ্রকৃতি ও বন্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হওয়ার সার্থকতা আছে। ভৌগোলিকভাবে বর্ধমান জেলার দুই-তৃতীয়াংশ সীমারেখা নদীবেষ্টিত অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত হলেও পলিগঠিত ও প্রাচীন শিলাগঠিত ভূভাগে বাস্তুবিদ্যা, বাঁধ, জলাধার, রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেচখাল, সেতু নির্মাণ, নগর পত্তন প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সেকারণে প্রযুক্তি সম্পর্কিত ভূবিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক গঠন ও অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষারও প্রয়োজন। ভূ-জল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পলির গভীরতা ও মূল শিলার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত

হওয়ার জন্য ভূত্বকের বিশ্লেষণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ভৌগোলিক পরিবেশ হল মানবগোষ্ঠীর ক্রিয়াশীলতার ধারক ও বাহক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে উন্নততর জীবনযাত্রা লাভ করা যায় মাত্র।

পৃথিবীর বয়স নির্ণয়কল্পে শিলাস্তরের প্রাচীনতা যেরূপভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সেই বিশ্লেষণ হতে বিভিন্ন সময়ে স্তরীভূত শিলার প্রাচীনতা নির্ণীত হয়েছে, অনুরূপভাবে শিলাস্তরের মধ্যে প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে ঐ অঞ্চলে উদ্ভিদ ও জীবকুলের আবির্ভাব বিষয়ে ধারাবাহিক পর্যালোচনাও করা যায়। কিন্তু বর্ধমান-জেলায় উক্ত বিষয়ে যৎসামান্য উপাদানের সন্ধান মিলেছে। উদ্ভিদকুলের আবির্ভাব যে কয়েক কোটি বছর পূর্বে ঘটেছিল তার প্রধান প্রমাণ মিলেছে গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের মধ্যে কয়লার অবস্থিতি। অতিকায় গণ্ডোয়ানা হ্রদ ক্রমশঃ ভরাট হলে ঐ অঞ্চলে বিশাল নিবিড় বনভূমির সৃষ্টি হয় এবং ঐ অঞ্চলের বনভূমি গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের নীচে চাপা পড়ায় উদ্ভিদের রূপান্তরিত আকারে কয়লার অস্তিত্ব মেলে।

বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে যে শিলাস্তরে প্রাচীন জীবকুলের সন্ধান পাওয়া গেছে, ঐ শিলাস্তর পাঞ্চেৎসংঘ নামে পরিচিত। মধ্য ভারত হতে দক্ষিণ বিহারের মধ্য দিয়ে পাঞ্চেৎ পাহাড় ও রানীগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত শিলাস্তরটির নিম্নাংশ অভ্রমিশ্রিত, ঈষৎ সবুজ সুগঠিত পলিপাথর ও ঈষৎ হলদে বেলে পাথরের স্তর দ্বারা গঠিত। মধ্যস্তরে পলি পাথরের বর্ণ চকোলেট এবং এই পাথরের পুরু স্তরগুলিতে কয়লা পাওয়া যায় নাই। এই স্তরে যে দু-একটি উদ্ভিদ জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা সনাক্ত করা কঠিন। কিন্তু পাঞ্চেৎ শিলাস্তর পরিমণ্ডলে রানীগঞ্জের নিকট দেওলি (২৩° ৩৯′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬° ৫৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) নামক স্থানে ল্যাব্রিনথোডোণ্ট (Labyrinthodonts) শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন প্রাণী ও সরীসৃপ কুলের অস্তিত্ব ভূগর্ভে আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত জীবকুলের জীবাশ্ম পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় নাই। জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খণ্ডিত জীবাশ্মগুলি হতে এই বিরল গোষ্ঠীর প্রাণীকুলের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ একমত নন। হাক্‌স্‌লির (T. H. Huxley) মতে এই মেরুদণ্ডহীন প্রাণীকুল মেসোজয়িক অথবা প্যালিওজোয়িক যুগে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু ল্যাইডেক্‌কারের অভিমত এই যে দেওলির শিলাস্তর ট্রিয়াসিক যুগের এবং এই অঞ্চলের গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরে কোন জলজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। রানীগঞ্জ অঞ্চলে কুকড়াকুড়ি (২৩°৩৭′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°৫৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) কয়লাখনির নিকট ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে মাছের কাঁটার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এবং প্রাপ্ত জীবাশ্মের প্রাণীটি কারবোণিফেরাস ও পারমিয়ান যুগে হ্রদ বা নদীতে বিচরণ করত। আলকুশা গ্রামে (২৩°৩৯′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°৫২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) নিম্ন গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরে পারমিয়ান যুগের জলজ উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বিষয়ে হাক্‌স্‌লি ও লাইগারের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ডঃ হোয়াইট-এর (E. I. White)

মতে ল্যাব্রিনথোডোন্ট গোষ্ঠীর প্রাণীকুলের অস্তিত্ব ছিল কারবণিফেরাস-পারমিয়ান যুগে।[৪]

পুরাজীবিয় অধিকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে মাছের অপেক্ষা উন্নত ধরনের উভচর জীব ইকথিওস্টেগিডের সৃষ্টি হয় এবং এই প্রাণীকুল হল প্রাচীনতম উভচর জীব, যার জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে মধ্যপ্রদেশের বিজরি শিলাস্তরে।[৫] ২৫ কোটি বছর পূর্বে পারমিয়ান ও ট্রায়াসিক যুগসন্ধিলগ্নে লিষ্ট্রসরাস নামক এক প্রাণীর ফসিল রানীগঞ্জে আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬] এটাই হল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সরীসৃপের ফসিল। এরপর আরও উন্নত জীবকুলের আবির্ভাব ঘটেছিল রাঢ় অঞ্চলে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত জীবাশ্ম হতে।

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর এবং বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে ১০০ কোটি বৎসরের মধ্যে। মানুষের বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে ২ কোটি বৎসরের মধ্যে এবং নর-বানর গোষ্ঠীর রামপিথেকাস হতে মানব গোষ্ঠীর বিবর্তনের বয়স ১ কোটি ২০ লক্ষ বৎসরের অধিক নয়। মানব গোষ্ঠীর বিবর্তনের শুরু থেকেই প্রত্নবিজ্ঞানের শুরু। জীবজগতের কোন বিশেষ প্রজাতি বা বর্গের (genus) বিবর্তন সকল সময়ে নির্ভর করেছে মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর, যথা—(১) ভূমির গঠনগত পরিবর্তন, (২) আবহাওয়া পরিবর্তন ও (৩) উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য দুটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবেশের পরিবর্তন।

ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, মানুষের বিবর্তনের সূত্রপাত থেকে উপরোক্ত পরিবর্তন খুবই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। বর্তমান পর্বের (Cainozoic era) শেষ যুগ (epoch) দুটি প্লাইস্টোসিন ও হেলোসীন নামে পরিচিত। প্লাইস্টোসিন পর্বের শুরু হয়েছিল ৩০-৩৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে এবং এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আজ হতে ১০ হাজার বৎসর পূর্বে। তারপর শুরু হয়েছে হেলোসিন পর্ব অর্থাৎ আমরা যে যুগে বর্তমানে এই পৃথিবীতে বিরাজ করছি। প্লাইস্টোসিন কালটি ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বর্তমান পৃথিবীর ভূমিভাগ গঠন এই যুগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে যে সকল প্রজাতির অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে, তাদের বিবর্তনও প্লাইস্টোসিন যুগেই সম্পন্ন হয়েছে। এই কালটি (epoch) আবহাওয়া তত্ত্বে "গ্রেট আইস এজ" বা দীর্ঘতম হিমযুগ নামে পরিচিত।

সামগ্রিকভাবে এই পর্ব ৪টি হিমযুগ (glacial episode) ও ৪টি আন্তর্হিম-যুগে (inter glacial episode) বিভক্ত এবং হিমযুগ অন্তে দেখা গিয়েছিল যে ৪টি প্লাবন যুগ (pluvial episode) ও আন্তঃপ্লাবন যুগ (inter-pluvial episode) তাদের প্রভাব বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে স্পষ্ট। এই প্লাবনের বিস্তার ছিল পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল হতে শুরু করে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম

ও মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের উত্তরভাগ বরাবর ত্রিপুরা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কেরল-তামিলনাড়ু পর্যন্ত।

হিমযুগ ও প্লাবন যুগগুলির আবহাওয়া ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় ভূমির স্তর বিন্যাসের গঠনগত বৈষম্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি হিমযুগ অন্তে তুষারগলা জলের সঙ্গে শিলাখণ্ড ও ভূমিক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে স্তরবিন্যাসে সহায়ক হয়েছে। এই স্তর বিন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বড় বড় প্রস্তর খণ্ড রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধেছে, আর জমাট প্রস্তরের ওপর ক্ষয়জাত পদার্থের স্তর। সর্বোপরি ভূমিক্ষয়জাত পদার্থ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়ে ভূমিক্ষয়জাত মৃত্তিকাস্তর রূপে বিস্তার করে আছে প্রাচীন শিলার উপরিভাগে। শেষ বা চতুর্থ হিমবাহ যুগের আবির্ভাব বর্ধমান জেলায় ঘটেছিল আজ হতে ১০ হাজার বছর পূর্বে এবং হিমবাহ যুগ অন্তে এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় এসেছিল সমতা এবং সেটিই বর্তমানকালের মনুষ্য বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে। ৪র্থ হিমবাহ যুগ অন্তে দামোদর-অজয় নদের সৃষ্টি হয়েছিল। দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চল মনুষ্যবসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বীরভানপুরের প্রত্নক্ষেত্রে।[৭]

আদিম মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন ইতিহাসের যুগকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা: ১। আদি প্রস্তর যুগ বা পুরা প্রস্তর যুগ। ২। মধ্য প্রস্তর যুগ ৩। শেষ প্রস্তর যুগ ও ৪। নব্য প্রস্তর যুগ।[৮] নব্য প্রস্তর যুগটি মনুষ্য জাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে।

ভূতত্ত্ব ঃ

মানব সভ্যতার উন্মেষ ও তার ক্রমবিকাশের ধারা, ঐ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর জীবনধারণের উপায়, আচার-আচরণ, রীতিনীতি প্রভৃতি নির্ভর করে স্থানটির ভূপ্রাকৃতিক গঠন ও জলবায়ুর ওপর। নদীপ্রবাহ ও মানবসভ্যতা বিকাশের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা জনজীবনের রীতিনীতি ও জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক গবেষণারত আছেন। ভৌগোলিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেও মানব সভ্যতার ধারাকে বহুলাংশে চালিত করে। কারণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও জীবনধারণের উপায় গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে এবং আদিম মানবগোষ্ঠী জীবনধারণের তাগিদে স্ব স্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় উন্নত কলাকৌশলের; তার দ্বারাই আহার্য বস্তুর সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়েছিল। রুক্ষ উষর মালভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী ও নদীতীরবর্তী ভূভাগে বসবাসকরী মানবগোষ্ঠীর

জীবনধারণের মান ও পাথেয় হবে ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমোক্ত দলটি নির্ভর করবে পশুপালনের উপর এবং শেষোক্ত দলটি কৃষির উন্নতির জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করবে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। আবার গভীর অরণ্যে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী পশুশিকার করে জীবনধারণের তাগিদে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কলাকৌশল আয়ত্তের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাবে। সেকারণে পার্বত্য অঞ্চল, নদীবিধৌত অববাহিকা, পলিগঠিত সমভূমি, মরুভূমি, অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশ, মালভূমি অধ্যুষিত ভৌগোলিক পরিবেশ মানবসভ্যতার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। যে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ বিচিত্র বা অধিক, সে দেশে সমাজজীবনের বৈচিত্র্যও অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এই সব দিক বিবেচনা করেই বলা হয়, কোন নির্দিষ্ট জনপদ, জাতি বা অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা বা মূল্যায়ন করতে হলে ঐ অঞ্চল বা জনপদের প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একই জনপদ দু-তিন ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত হলে ঐ অঞ্চলের জনজীবনের ধারা বিভিন্ন খাতে বয়ে চলবে। এক কথায় কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ যে ঐ জনপদের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অর্থনৈতিক কাঠামো, ধর্মীয় প্রেরণা, সামাজিক চেতনা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থিতি রাঢ়ের তরঙ্গায়িত ভূভাগের মধ্যে হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদ বাহিত পলিগঠিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই জেলার পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় দুই অঞ্চলের জনজীবনের ধারা এবং জীবনধারণের উপায়ও ভিন্ন প্রকৃতির। এই জেলার পশ্চিমে বিন্ধ্য শ্রেণীর পাহাড় ও উত্তরে রাজমহল পাহাড় এবং ঐ দুটি পাহাড়ের তরঙ্গায়িত রেখাগুলি পূর্ব ও দক্ষিণগামী হয়ে গলসী ও আউসগ্রাম থানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিন্ধ্য কুক্ষি হতে পূর্বমুখে প্রসারিত পাহাড়গুলি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অল্প স্থানেই দেখা যায়, তবে অধিকাংশ স্থলে ভূগর্ভে অবস্থিত পাহাড়গুলি ভূপৃষ্ঠের অনতিগভীরে বিদ্যমান।

রাঢ়ভূমির জন ইতিহাসের তুলনায় এর ভূতত্ত্বের ইতিহাসও বহুগুণ প্রাচীন। আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে প্রাচীনত্ব সূত্রটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিম ভারতের আরাবল্লী পর্বতের সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, হালদা ও অন্যান্য অনুচ্চ ক্ষয়জাত পাহাড়গুলি সমগোত্রীয় এবং এদের আবির্ভাব কালও প্রায় সমসাময়িক। ভাগীরথীর পশ্চিমভাগে অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, শিলাবতী প্রভৃতি নদী রাঢ় অঞ্চলে প্রবাহিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত নদীবাহিত পলি ও শিলাস্তর দ্বারা রাঢ়

অঞ্চল গঠিত। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ ব্যতীত কেবলমাত্র ভূস্তরের উপরিভাগ দেখে আজ থেকে কয়েক কোটি বছর পূর্বে গঠিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূস্তর ও ভূত্বকের গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ করা যায় না। যথার্থ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিমিত্ত বর্ধমান জেলার বনপাসে Geochronology পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম দায়িত্বে। ঐ সমীক্ষার রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

ফার্গুসনের মতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী অববাহিকা অঞ্চল ছিল বঙ্গোপসাগরের আওতায় এবং ঐ সময়ে রাজমহল পাহাড হতে দক্ষিণে রাঢ় অঞ্চল বরাবর ভূভাগ ছিল সাগরের তীরে।[৯] রাঢ়ভূমির মধ্যভাগে বর্ধমান জেলার অবস্থিতি, সে কারণে সহজেই অনুমান করা যায় যে ঐ সময়ে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ ছিল সাগর কূলে।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ দেখে এই জেলাকে পলিগঠিত সমভূমির শ্রেণীভুক্ত করা সমীচীন হবে না। পলির আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে যে শিলাস্তরের অস্তিত্ব মাটির নীচে রয়েছে তা প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়গুলি আরাবল্লী, বিন্ধ্য ও শুশুনিয়ার সমগোত্রীয়। প্রায় ১০।১২ কোটি বৎসর পূর্বে রাঢ় অঞ্চল ছিল টেথিস নামক এক অগভীর সাগরের নীচে (ত্রিপুরা হতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত)। ভারতবর্ষ ছিল দক্ষিণমেরু, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এক বলয়ে যুক্ত।[১০] ভূ-সঞ্চালনের ফলে পৃথিবীর উত্তরভাগে লারেশিয়া নামক প্লেটটি দক্ষিণাভিমুখী হয়ে উত্তর-পূর্বাভিমুখী গণ্ডোয়ানা প্লেটটির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়ে গণ্ডোয়ানা প্লেট, দক্ষিণমেরু ও আফ্রিকা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়। কালক্রমে উভয় অতিকায় প্লেটের চাপের ফলে টেথিস সাগরতলের ভূভাগ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে এবং প্রায় ৭ কোটি বছর পূর্বে ক্রমাগত পার্শ্বচাপের ফলে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়।[১১] গাঙ্গেয় অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চল হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভূভাগ গণ্ডোয়ানা প্লেটের অন্তর্ভুক্ত এবং এই অংশের গঠনপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, অধিকাংশ অঞ্চল আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা থেকে রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। গঠনকার্যের এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৬০-৭০ কোটি বছর পূর্বেই।

হিমালয় পর্বতমালার উত্থানের ফলে গণ্ডোয়ানা ভূভাগে ভূমির অবস্থার বিরাট পরিবর্তন আসে। এ সময়ে আবহাওয়ায় সুরু হল তুষার যুগ বা হিমবাহের যুগ। এই যুগের শেষ পর্বে পৃথিবী শীতল হয় এবং হিমালয় পর্বত হতে হিমবাহগুলির দ্বারা পুষ্ট হয়ে বিপুল জলধারা নেমে আসে গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে।[১২] এর ফলে দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন এবং প্লাবনজনিত জলধারার সঙ্গে পাথর, নুড়ি ও পলি অবক্ষেপণের ফলে গঠিত হয়েছিল রাঢ়ভূমি, যার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল বর্ধমান। ফলে যে পাহাড়গুলি গণ্ডোয়ানা ভূভাগের পূর্বাঞ্চলে মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়েছিল তাদের উচ্চতার অধিকাংশ স্থানকে ঢেকে দেয় পলির আচ্ছাদন। পুরাকালের পলিদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় এই সকল অঞ্চলকে পুরাতন বা প্রাচীন পলি গঠিত ভূভাগ বলা হয়। প্রথম হিমবাহ যুগের শেষ পর্বে তুষাররাশি ও হিমবাহের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল নদনদী। এ সময়ে ভাগীরথী নদীর সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমান ভাগীরথীর খাত পর্যন্ত প্রসারিত শিলাস্তর ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ এবং মাটির নীচে এই শিলাস্তরকে গণ্ডোয়ানা শিলাস্তর বলা হয়।[১৩] মধ্যপ্রদেশ, বিহারের দক্ষিণাংশ, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার ভূ-অভ্যন্তর ভাগের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রতিটি তুষার যুগের শেষে তুষারগলিত জলরাশি বাহিত প্রস্তরখণ্ড-সমূহ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে ও প্রবল জলস্রোতে প্রস্তরখণ্ড-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'তে হ'তে বালুকণা ও মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়ে মূল ভূত্বকের উপরিভাগে ক্রমাগত স্তরের সৃষ্টি করে চলেছে।

মাটির নীচে রয়েছে বিভিন্ন পাথরের স্তর। ঐ সকল স্তরের প্রকৃতি বুঝতে হলে ড্রিলিং-এর সহায়তা নিতে হয়। নলের আকারে কেটে আনা পাথরকে ড্রিলিংকোর বলে; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ঐ পাথরের বয়স নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। বঙ্গদেশে তা বটেই, ভারতবর্ষে প্রথম ভূতত্ত্ব সমীক্ষার কাজ শুরু হয় ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে। অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন নিছক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য সমীক্ষাকার্যের প্রচেষ্টা করে নাই। ঐ বছরে সুমন ও হিটলীর নেতৃত্বে রানীগঞ্জে কয়লা উত্তোলনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় নাই। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে রূপার্ট জোনস, ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে ভোয়েজ, ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ভিক্টর জ্যাকুইমোণ্ট, ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে রেভা: এভারেষ্ট, ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে জি, হামফ্রে ও ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ডঃ রো, কয়লাখনি অঞ্চলে ভূগর্ভে সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করেছিলেন। কয়লাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উত্তোলনের জন্য এ ধরনের সমীক্ষাকার্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে ভি, এইচ, উইলিয়ামস্-কে একটা বিস্তৃত অঞ্চল সমীক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৪৬ ও ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে ঐ সমীক্ষার রিপোর্টে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে Geological Survey of India প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জে, ম্যাকক্লিণ্ডালের নেতৃত্বে রাজমহল, জোসেফ মেডিকোট ও উইলসনের নেতৃত্বে মেদিনীপুর এবং টি, ওল্ডহামের নেতৃত্বে বাঁকুড়া ও বর্ধমানে সমীক্ষাকার্য পরিচালিত হয়। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দে উইলসন ও ব্লানফোর্ড পুনরায় রানীগঞ্জ অঞ্চলে বিশেষ সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গডউইন অষ্টিন, মলেট, ভিন্সেট বল, পি. এন. বসু প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদগণ রানীগঞ্জে কয়লাখনি এলাকা সহ পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য কয়লা স্তরগুলি আবিষ্কারের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান কার্যে ব্রতী ছিলেন। ভিন্সেট বল একদিকে মানভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে

কয়লাস্তরের সন্ধান করেছিলেন, অপরদিকে এই ভূ-বিজ্ঞানী উক্ত এলাকাসমূহে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আয়ুধ ও শিলাস্তর আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ব ও ভূ-তত্ত্ব, উভয় ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বিংশ শতকের প্রথম পাদে কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রের সাহায্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সমীক্ষা-কার্যের ফলে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনুরূপভাবে একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের অবস্থান ও স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্য এগিয়ে গেল। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ই. আর. ঘি-এর প্রচেষ্টায় গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের অভ্যন্তরভাগে কয়লার প্রাচুর্যে ভরা রানীগঞ্জ অঞ্চলটি ভূতত্ত্ববিদগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের নিম্নভাগে আর্কিয়ান শিলাস্তরের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে বর্ধমানের মধ্যাংশ ও পশ্চিমাংশ প্রাচীনতম শিলায় গঠিত ভূভাগ। বর্তমান শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে গভীর ড্রিলিং এর সাহায্যে বাঁকুড়া ও রানীগঞ্জ অঞ্চলের বহুস্থানে ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়েছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কয়লাখাদ ভর্তির জন্য প্রচুর বালির আবশ্যক হয় এবং তাই ভূগর্ভস্থ বালি অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে দামোদর ও অজয় উপত্যকায় ড্রিলিং এর সাহায্যে সমীক্ষাকার্য পরিচালিত হয়েছিল।[১৪]

মানব সভ্যতার উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিকাশ ঘটাতে হলে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পের উন্নতির জন্য খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানের প্রয়োজন এবং এই খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের সময়েই বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ-শিলাস্তর পরীক্ষান্তে দেখা গেছে যে, কঠিন ভূগর্ভের উপরি-ভাগ ক্ষুদ্র বালুকণা ও মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত। বর্ধমান জেলার যে অংশ পূর্বভাগে বিস্তৃত সেখানে নূতন পলির গভীরতা অধিক ; কিন্তু ঢালের উপরিভাগ অর্থাৎ জেলার পশ্চিমাংশে নূতন পলির গভীরতা অল্প এবং কোথাও কোথাও নূতন পলি-আচ্ছাদন অনুপস্থিত থাকায় পশ্চিমাঞ্চলের ভূভাগে ভূতত্ত্ববিদগণ পরীক্ষানিরীক্ষা করার অধিক সুযোগ পেয়েছেন।

ভারতীয় মূল শিলার পূর্বভাগে প্রসারিত অংশটি মোটামুটিভাবে ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় গাঙ্গেয় পলির নীচে চাপা পড়েছে এবং ৮৭° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিমে পলির গভীরতা কম থাকায় তথায় আর্কিয়ান যুগের শিলার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ঐ স্তরের সন্নিহিত স্থানে দামোদর নদের তীরবর্তী অঞ্চলে গণ্ডোয়ানা শিলা ও দুর্গাপুর অঞ্চলে টার্সিয়ারী যুগের শিলার অবস্থিতি রয়েছে। টার্সিয়ারী শিলাস্তরের আদিপর্বে সৃষ্ট গণ্ডোয়ানা শিলাস্তর বৃহত্তর বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর পশ্চিমভাগেই এই শিলাস্তরের অস্তিত্ব আছে। আবার দুর্গাপুর-রানীগঞ্জ অঞ্চলে মায়োসিন পর্বের মধ্যভাগে গঠিত স্তরের সন্ধানও

পাওয়া যায়। ড্রিলিং পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষান্তে দেখা গেছে যে হোলোসিন (Holocene) যুগের সঞ্চিত পলি বর্ধমান জেলার মধ্যাঞ্চলে যে স্তরের সৃষ্টি করেছে, তার গভীরতা ১২০ ফুট থেকে ১২৫০ ফুট পর্যন্ত। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে গণ্ডোয়ানা শিলার ব্যাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আর্কিয়ান যুগের শিলাস্তরটির সন্ধান পাওয়া যায়, মেদিনীপুর হতে বর্ধমান জেলার গলসি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত অংশে। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ক্ষয়কার্যের ফলে স্থানে স্থানে গম্বুজাকৃতি শিলাস্তরের নিদর্শন দেখা গেছে। আর্কিয়ান (Archaeans) যুগের শিলাস্তরের অস্তিত্বের অর্থ হ'ল প্রায় ৯০ কোটি বৎসর পূর্বে এই শিলাস্তরের গঠন কার্য শুরু হয়েছিল এবং এই স্তরটি ছিল ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বমুখে প্রসারিত একটি অংশ। আর্কিয়ান শিলাস্তরের গঠন বৈশিষ্ট্য হল এটি অর্ধবৃত্তাকার ও উপরিভাগ গম্বুজাকৃতি।[১৫] এই স্তরে চুনা পাথর, অভ্র, ডলোমাইট, ম্যাগনেটাইট, ইলামনাইট, ব্যাক্সনডাম, প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতে এই অঞ্চলে কোয়ার্টজ পাথরের তৈরী আয়ুধাবলীর ব্যবহার ও কোয়ার্টজ পাথরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে যে আদিম শিকারজীবী মানুষেরা এই শিলা তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যবহার করত।[১৬] বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে উৎখননের ফলে এই জাতীয় শিলায় তৈরী প্রচুর আয়ুধাবলীর সন্ধান মিলেছে।

বিন্ধ্য গোষ্ঠীর শিলাস্তরে বেলেপাথর ও চুনাপাথরের অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে স্তরবিন্যস্ত হয়ে আছে এবং আর্কিয়ান বা প্রাককেম্ব্রিয়ান যুগের শিলাস্তরের উপর এই স্তরটি অসংযতভাবে পরিব্যাপ্ত হতে দেখা যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিন্ধ্যস্তরটি প্রায় জীবাশ্মবিহীন। এই স্তরের ভূ-তত্ত্বীয় বয়স আর্কিয়ান যুগের পরবর্তী-কালের। পুরাণযুগের পরবর্তী বা প্রাক্ গণ্ডোয়ানা যুগের শিলাস্তরের সন্ধান স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। বিন্ধ্যোত্তর যুগের দীর্ঘ বিরতির পর পার্মিয়ান যুগের শুরুতে ভারতীয় উপদ্বীপের সীমিত অংশে হ্রদ ও নদী বাহিত অঞ্চলে পলি অবক্ষেপণ সুরু হয়। যার প্রভাব বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে দেখা যায়।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে মিডলিকট এই স্তরকে 'গণ্ডোয়ানা' নামে উল্লেখ করেন। মধ্যভারতে যে স্থানে 'গণ্ড' জাতির বাসস্থান ছিল, তথায় প্রথমে এই স্তরটি আবিষ্কৃত হওয়ায় একই শ্রেণীভুক্ত শিলাস্তরের অবস্থিতি অঞ্চলসমূহ গণ্ডোয়ানা অঞ্চল নামে অভিহিত হয়[১৭]। বিন্ধ্যীয় পলল সঞ্চয়ের পর এই মালভূমিতে সুদীর্ঘকাল ধরে শুষ্ক আবহাওয়ার প্রভাব ছিল এবং শুষ্ককাল অন্তে আবহাওয়া অত্যধিক শীতল হওয়ায় পর পর ৪টি তুষার যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রত্যেকটি তুষারযুগ অন্তে বিশালা-কৃতির হিমবাহগুলি গলতে শুরু হলে তুষারগলা জলরাশি এই অঞ্চলের উপর ছড়িয়ে পড়ায় প্রচুর পরিমাণে নুড়ি ও প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা ভূ-স্তরের উপরিভাগকে আচ্ছাদিত

করেছিল। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র হওয়ায় মধ্য ও পূর্ব ভারতের পশ্চিম ভাগ এক বিশাল ও নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত হয়েছিল এবং কালক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে অবদমন ও প্রবল প্লাবনে এই বিশাল অরণ্যসমূহ পলল স্তরের নীচে চাপ পড়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। এই কারণে গণ্ডোয়ানা অবক্ষেপে মূল্যবান কয়লাস্তরের অবস্থিতি বিদ্যমান। বর্ধমান জেলাস্থ রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লা স্তরটি গণ্ডোয়ানা যুগের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে।

গণ্ডোয়ানা স্তরের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়; এই স্তরে স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জীবাশ্ম ও কয়লার প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতি বলয়টি গণ্ডোয়ানা অঞ্চলভুক্ত। গণ্ডোয়ানা স্তরের বর্ধমান জেলার দিকে প্রসারিত অংশটি নিম্ন গণ্ডোয়ানা নামে পরিচিত। নিম্ন গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের মধ্যে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে প্রায় ৬০০ বর্গমাইলব্যাপী সমৃদ্ধ কয়লাখনিগুলি গড়ে উঠেছে। দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত এই কয়লাখনি অঞ্চলের তিনপার্শ্ব আর্কিয়ান শিলাস্তর দ্বারা সীমায়িত। কেবলমাত্র পূর্বপ্রান্ত প্রাচীন পলি ও ল্যাটেরাইটের আবরণে আচ্ছাদিত।

গণ্ডোয়ানা স্তরের উপর টারশিয়ারী যুগে সঞ্চিত পললরাশি স্তরীভূত হওয়ায় গণ্ডোয়ানা স্তরটিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। রানীগঞ্জ হতে দুর্গাপুরের মধ্যে ভূস্তরে মধ্য-মাইওসীন (Middle Miocene) যুগের শিলাস্তর পরিলক্ষিত হয়। এই অংশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভূ-অভ্যন্তরে জলাভূমির অস্তিত্ব।[১৮] বর্দ্ধমান শহরের নিকটে ভূপৃষ্ঠের ১,২৭৫ ফুট নিম্নে যে-শিলাস্তরটি মাইওসীন (Miocene) যুগের এবং মেমারী থানার পূর্বভাগে ভূপৃষ্ঠ হতে ২২৮০ ফুট নিম্নে এই জাতীয় শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। আবার অলিগোসীন (Oligocene) যুগের শিলাস্তরটি বর্ধমানের নিকটে ভূপৃষ্ঠ হতে ৫৩০ ফুট নিম্নে পাওয়া গেছে। এই স্তরটির অস্তিত্ব যে মেমারী থানাতে আছে তাও সমীক্ষার দ্বারা জানা গেছে।[১৯] অল্পাধুনিক (Oligocene) ও মধ্যাধুনিক (Micocene) যুগের অবস্থিতির কাল ছিল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ও ২৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে। কয়েকটি স্থানে এই যুগের শিলাস্তরের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই স্তরের অবস্থিতির কোন স্বাক্ষর নাই। দুর্গাপুরের সন্নিকটে বীরভানপুরের মৃত্তিকার অভ্যন্তরভাগের নমুনা পরীক্ষান্তে দেখা গেছে যে প্রায় ৫ লক্ষ বছর পূর্বে অর্থাৎ প্লাইস্টোসীন পর্বের প্রাচীন পলির স্তরে এই অঞ্চল আচ্ছাদিত হয়েছিল। ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সৃষ্টি এই সময়ে সুরু হয় এবং ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ গভীর বনে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তারপর বর্ধমানে আবহাওয়ায় আসে বিরাট পরিবর্তন। এই সময়ের আবহাওয়া ছিল শুষ্ক ও অত্যধিক উষ্ণ।[২০]

দীর্ঘকাল শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ার পর এই অঞ্চলে নেমে আসে বর্ষণজনিত

প্লাবন। এই পর্বটি হোলোসীন নামে পরিচিত। আজ হতে দশ হাজার বৎসর পূর্বে ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় Holocene বা আধুনিক যুগের গঠন কার্যটি সম্পন্ন হয়। প্রবল বন্যায় ভূত্বকের উপরিভাগে প্লাইষ্টোসীন পর্বের সঞ্চিত পলিরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নূতন স্তরের সৃষ্টি করে, যা প্রাচীন পলির শেষ স্তর নামে চিহ্নিত। হোলোসীন পর্বের পর বর্ধমান জেলার ভূত্বকের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বহু নদনদী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত এবং এই নদীবাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে সুরু হল ব-দ্বীপ গঠনের প্রাথমিক পর্ব এবং হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত পলিরাশির প্রভাবে ভূত্বকের মূল শিলাস্তর ক্রমশঃ গভীরে চলে যায় এবং পলির গভীরতা বা ভূমিভাগের উচ্চতা বাড়তে থাকে। এই সময়ে বর্ধমান জেলায় মনুষ্য বসতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে বীরভানপুরে (২৩°২৯ উ: অ:, ৮৭°১৯' পূঃ দ্রাঃ) উৎখননের সময় মনুষ্য বসবাসের চিহ্ন এবং আয়ুধ পাওয়া গেছে।[২১]

পরবর্তীকালে গঙ্গানদীর ভাগীরথী শাখার দ্বারা বাহিত পলি অবক্ষেপণ ও সঞ্চয় সমগ্র বাংলাকে নূতনভাবে গঠন করতে সাহায্য করে। একটা রুক্ষ শিলা অধ্যুষিত অঞ্চল কিভাবে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিবর্তিত হয়, পশ্চিমবঙ্গ তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ভাগীরথী বাহিত পলি ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে পলির গভীরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পলি সঞ্চয়ের তারতম্যের ফলে নদীসমূহের গতিপথও পরিবর্তিত হয়। জেলার পশ্চিম ও পূর্বভাগের ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের গঠনেরও বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। পলিগঠিত অঞ্চলের মধ্যে কাটোয়ার পূর্ব ভাগ হতে পূর্বস্থলী-নবদ্বীপ হয়ে কালনা পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর অববাহিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলটি পলি সঞ্চয়ের ফলে ক্রমশ উঁচু হওয়ায় এর উপনদীগুলির জলধারাও পরিবর্তিত গতিপথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে ছোট ছোট নদীগুলি যে গতিপথে ভাগীরথীতে মিলিত হত বর্তমানে উক্ত গতিপথ প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়েছে। কালনা মহকুমার নদীগুলি প্রথমে পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ দক্ষিণে বাঁকের সৃষ্টি করে দক্ষিণমুখী হয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করছে। যুগ যুগ ধরে প্লাবনজনিত কারণে পলি সঞ্চয়ের ফলে জেলার পূর্বাঞ্চলে পলির গভীরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নদীখাতের সংযোগ স্থলগুলিতে খাতের গভীরতা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং নদীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে।[২২]

বর্ধমান জেলার ভূতত্ত্বের প্রাচীনতার প্রধান ও উজ্জ্বলতম প্রমাণ হল জেলার পশ্চিম অংশে কয়লাখনির অবস্থিতি। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, দুর্গাপুরের তলদেশ দিয়ে প্রসারিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তা পানাগড ও গলসীতে পৌঁছেছে। গলসীতে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন আছে গ্রানাইট পাথরের পাহাড়। প্রায় তিন হাজার মিটার উচ্চ এই পাতাল পর্বতটি রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের পূর্ব সীমা

রূপে চিহ্নিত হয়েছে।[২৩] ভূস্তরের প্রাচীনতার দ্বিতীয় প্রমাণ হল বরাকর সংঘের (coal belt) দক্ষিণে রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে একটি শিলাস্তর পাওয়া যায়, তা আয়রন ষ্টোন সেল সংঘ নামে পরিচিত। মিহিদানার কৃষ্ণবর্ণ গভীর স্তরটি শৈলশিরার (ridge) আকারে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। অনাবৃত ভূপৃষ্ঠে লৌহ আকরের রং লালচে হলেও ভূ-অভ্যন্তরে লৌহশিলার রং অধিকাংশ সময়ে কালো। এই স্তরের নিম্নভাগে বেলেপাথর দেখা যায়। এই লৌহ স্তর হতে অতীতে বহু খনিজ লৌহের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং ঐ খনিজ লৌহ হতে কুলটীর চুল্লীতে লৌহনিষ্কাশন করা হত।[২৪] অবশ্য কয়লার স্তরের সঙ্গে লৌহস্তর পাওয়া যায় না। কয়লা স্তরের নীচে অঙ্গারহীন স্তরের মধ্যে আছে লৌহশিলাস্তর। অধিক উত্তোলন ব্যয় এবং মানে নিকৃষ্টতার জন্য লৌহখনি ১৯১৩-র পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে এই অঞ্চলে সঞ্চিত আকরিক লৌহের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টন।

পশ্চিমবঙ্গে যে অঞ্চলটি নিম্ন গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের ঐশ্বর্যময় কয়লা সঞ্চয়ের জন্য সুপরিচিত তা হ'ল বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল। খনি অঞ্চলটি উত্তর-দক্ষিণে ১৯ মাইল বিস্তৃত ও প্রায় ৬০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়ে এই কয়লাখনি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। দামোদর উপত্যকার পূর্বভাগে অবস্থিত কয়লাখনি অঞ্চলটি তিন দিকে আর্কিয়ান শিলাস্তর দ্বারা সীমিত হয়েছে। খনি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত মাটির নীচে ও ল্যাটেরাইট শিলার আবরণে আচ্ছাদিত এবং রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমে বরাকর সংঘের পারস্পরিক যোগসূত্র আছে। বরাকর সংঘকে দামোগড়িয়া কয়লা স্তর, লাইকুডি কয়লা স্তর এবং বেগুনিয়া কয়লা স্তর—এই তিনটি অংশে উপবিভাগ করা হয়েছে। বরাকর সংঘের মধ্যে কোনো প্রাণী-জীবাশ্ম পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এর নিম্ন-গণ্ডোয়ানা অঞ্চল উদ্ভিদকুলের একটি সমৃদ্ধ উৎস স্থল।[২৫]

এছাড়া খনিজ তৈল অনুসন্ধানের সময় ভূস্তরের শৈলপ্রকৃতি ও জৈব পরিচয় বিশ্লেষণ করে ভূতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন যে সমুদ্র প্রান্তস্থ মহীসোপান অববাহিকায় লাভা অবক্ষেপনের ফলে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্ধমান ও সন্নিহিত অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ নবজীবীয় স্তরক্রম নিম্নে দেওয়া হল :[২৬]

দেবগ্রাম সংঘ (২৮০০´)... ... ...ক্লে, পলিপাথর ও অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ।
(Devagram Formation)

পাণ্ডুয়া সংঘ (২২০০´)... ... বেলেপাথর, পলিপাথর, সেল ইত্যাদি
(Pandua Formation) ... সোপান রূপের (Shelf facies) অবক্ষেপ।

মেমারি সংঘ (২০০´) ... ক্যালসিয় সেল, গ্লকোনাইট যুক্ত বেলেপাথর
(Memari Formation) ... ইত্যাদি সামুদ্রিক ও মোহনাজ অবক্ষেপ।

বর্ধমান সংঘ (৫০০´) ... স্বাদু ও মিশ্র জলজ বেলেপাথর, লিগনাইটময়

(Burdwan Formation) ··· সেল (পরাগরেণু ও ফোরামিনিফারের জীবাশ্মযুক্ত)।

ভূ-প্রকৃতি :

ভূগর্ভস্থ শিলারাজি যুগ যুগ ধরে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে এবং শিলাস্তরের উপরিভাগ নদীবাহিত পলির আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে ভূত্বকের উপরিভাগে মৃত্তিকার গঠনে সহায়তা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ শিলার ঢাল সাগরাভিমুখী এবং সাগরতীর হতে উত্তর বা পশ্চিমের স্থানসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর অবস্থান লাভ করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এই জেলার ভূপৃষ্ঠের উচ্চতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) ৮৮°২৫´ হতে ৮৭°৪৭´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিমতীর হতে আউসগ্রাম থানার পূর্বসীমা পর্যন্ত এই ভূভাগের উচ্চতা ৪০ মিটার হতে ৫০ মিটারের মধ্যে। মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশে সর্বাধিক উচ্চতা ৫০ মিটার। (২) আউসগ্রাম হতে দুর্গাপুর পর্যন্ত এই ভূভাগের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৮০ মিটার ও (৩) ৮৭°২০´ হতে ৮৬°৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত অঞ্চল অর্থাৎ দুর্গাপুর হতে বরাকর নদের সীমা পর্যন্ত ভূভাগটি হ'ল জেলার সর্বোচ্চ অংশ। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এই অংশের উচ্চতা ৬০ মিটার হতে ১১৫ মিটারের মধ্যে। আসানসোল ও রানীগঞ্জ শহরের সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা হল যথাক্রমে ২৫৭ ফুট ও ৩০৩ ফুট। সামগ্রিকভাবে জেলার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪০ মিটার হতে ১৫০ মিটারের মধ্যে; তন্মধ্যে আসানসোল মহকুমার উচ্চতাই সর্বাধিক। জেলার পশ্চিমে বিন্ধ্যশ্রেণীর পাহাড় পৌরাণিক বিবরণে যা বিন্ধ্যকুক্ষি নামে অভিহিত এবং উত্তরে রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণাভিমুখী শাখাটি প্রসারিত। এসকল পাহাড়ের তরঙ্গায়িত রেখাগুলি পূর্ব ও দক্ষিণগামী। তবে পলির আস্তরণে সুউচ্চ পাহাড়গুলি চাপা পড়েছে, মাত্র কয়েকটি পাহাড় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অনুচ্চ পাহাড় হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বর্ধমানের ভূ-প্রকৃতিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—পলিগঠিত সমভূমি, পলি ও ল্যাটেরাইটগঠিত মিশ্র সমভূমি, ল্যাটেরাইটগঠিত সমভূমি ও রুক্ষ পার্বত্যময় অঞ্চল। চতুর্থ তুষার যুগের শেষে মধ্যভারত ও সাঁওতাল পরগণা হতে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই দামোদর ও অজয় নদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর খাত দিয়ে প্রচুর পলি জেলার পূর্বাংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্বোক্ত পলিকে চাপা দিয়ে নূতন পলির আবরণে আচ্ছাদিত করে। সঞ্চিত পলিরাশি সূর্যের তাপ, বৃষ্টি, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে ল্যাটেরাইট ও পলিগঠিত সমভূমির সৃষ্টি করেছে। পূর্বাঞ্চল ও

পশ্চিমাঞ্চলের মৃত্তিকার তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব ভাগের মৃত্তিকায় সূক্ষ্ম দানার ভাগ অধিক। দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও অজয় নদ দ্বারা বাহিত পলি ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এক নূতন শ্রেণীর মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে। এই শ্রেণীর মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট ধরনের ইক্ষু চাষ হয়।[২৭] অপরদিকে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের মৃত্তিকায় পলির উপাদান বিশেষ না থাকায়, এই কঠিন মৃত্তিকার উপরিভাগে জলধারণের ক্ষমতা পর্যাপ্ত নয় এবং কৃষিকার্যের পক্ষেও লাভজনক নয়।

বর্ধমান জেলার ভূ-প্রকৃতিকে গুণগত মান অনুসারে ভাগ করে দেখা গেছে যে আউশগ্রাম থানার পশ্চিম অংশ হতে বরাকর নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চলটি তরঙ্গায়িত ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই অংশটিকে সম্পূর্ণভাবে ল্যাটেরাইট অঞ্চলভুক্তও বলা বলা যায় না। জেলার শেষ প্রান্তে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় দেখা যায় যেগুলি প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত এবং এই শ্রেণীর পাহাড়গুলি বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব ভাগের প্রসারিত অংশ। বরাকর ও অজয় নদ যেখানে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে, সেই সকল অঞ্চলে এই অনুচ্চ পাহড়গুলির অবস্থিতি। কল্যাণেশ্বরীতে হালদা পাহাড়সহ যে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় বা টিলা দেখা যায় সেগুলির সর্বাধিক উচ্চতা ৫০০ ফুটের অধিক নহে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, হীরাপুর, ও কুলটি থানার মৃত্তিকা রুক্ষ ও পার্বত্যময় অঞ্চলভুক্ত। খনি অঞ্চল হতে পূর্বভাগে প্রসারিত আউশগ্রাম থানা পর্যন্ত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আদর্শস্থল। বর্তমান শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি গভীর শালজঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। এই অঞ্চলের মৃত্তিকার বর্ণ লাল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এটি 'প্রাচীন পলিগঠিত ভূভাগ' নামে আখ্যা পেয়েছে এবং লোককথায় বর্ধমান—"রাঙা মাটির দেশ" নামে খ্যাতি লাভ করেছে। ল্যাটেরাইট অঞ্চলের পশ্চিমাংশে পলির গভীরতা এত কম যে, প্রাচীন শিলার অনুসন্ধানজনিত পরীক্ষাকার্য অতি সহজেই সম্পন্ন হয়।

বর্ধমান জেলার দুই-তৃতীয়াংশ স্থান গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত হলেও আউস-গ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতাড, বর্ধমান, গলসী থানায় গাঙ্গেয় পলি অপেক্ষা অজয়-দামোদরের প্রভাব অধিক। এতদঞ্চল নূতন পলিগঠিত ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত হলেও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে। বৃহত্তর আলোচনার ক্ষেত্রে গাঙ্গেয় সমভূমির পর্যায়ভুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে একে গাঙ্গেয় সমভূমি বলা যায় না। কেতু-গ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমারী থানার পূর্বাংশ গাঙ্গেয় পলি অবক্ষেপণের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। নদীর গতিপ্রকৃতির উপর বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং ভূ-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যতার জন্যই জেলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীগণের জীবনধারণের প্রণালীও ভিন্ন প্রকৃতির।[২৮] পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির অনুকূল পরিবেশের ফলে প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন

হয়। অপরপক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে অপ্রতুল ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে অধিবাসীগণ খনি ও শিল্পকর্মের উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা কৃষিযোগ্য ভূমিকে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণী বিভাগ করা হলেও স্থানীয় প্রথা অনুসারে বর্ধমান জেলার ভূমিকে দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—(১) বাস্তু বা ভিটা ও (২) মথন। বাস্তু বা ভিটা তিন শ্রেণীভুক্ত, যথা—(১) বসতবাড়ী, (২) উদ্বাস্তু বা বসতবাড়িসংলগ্ন স্থান ও (৩) বাগিচার জন্য গ্রাম সংলগ্ন স্থান।[২৯]

বর্ধমান জেলায় কৃষিযোগ্য ভূমি বা মথন শ্রেণীভুক্ত ভূমিকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—শালি ও সুনা বা আউস। সাধারণতঃ শালি জমিতে আমন ধান উৎপন্ন হয় এবং এই শ্রেণীভুক্ত জমি গ্রামের যে অংশে অবস্থিত, তা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি, জলধারণের ক্ষমতা অধিক ও প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। গ্রাম সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি আউশ বা সুনা শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীভুক্ত জমিতে প্রধানতঃ ধান, ইক্ষু, গম, ডাল ও অন্যান্য রবি ফসল উৎপন্ন হয়।[৩০] অধিকাংশ সুনা জমিতে সাধারণতঃ বছরে দু'বার ফসল উৎপন্ন হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে গ্রামসংলগ্ন এলাকায় আবাসগৃহ নির্মাণের ফলে সুনা জমির পরিমাণ প্রায় প্রতি গ্রামেই হ্রাস পাচ্ছে।

বর্ধমান জেলার প্রাচীন গ্রাম ও নগর পত্তনগুলি অধিকাংশই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল এবং সেকারণে গ্রামগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূখণ্ডের উপর, অন্যথায় গ্রামের জলনিকাশী ব্যবস্থারূপায়ণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অধিকাংশ গ্রামের বহির্ভাগ আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের বাগান দিয়ে ঘেরা। নদীতীরবর্তী গ্রামগুলি ব্যতীত অন্যান্য বড় বড় গ্রামের চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করে মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তুর পানীয় জলের জন্য সেগুলি ব্যবহার করা হত। প্রাচীন শাস্ত্রে অনুমোদিত গ্রামপত্তনের ব্যবস্থাসমূহ বর্ধমান জেলার প্রাচীন গ্রামগুলির পরিবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'জনপদ নিবেশ' প্রকরণে আছে—"নদী, শৈল, বন, সৃষ্টি নামক ওষধি বৃক্ষ, দরী (গর্ত), সেতুবন্ধ (আবদ্ধ জলাশয়াদি), শাল্মলী বৃক্ষ, শমীবৃক্ষ ও ক্ষীরবৃক্ষ দ্বারা এই প্রকার গ্রামের সীমান্ত নির্দিষ্ট করতে হবে অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তুর স্থাপন দ্বারা গ্রামে সীমানা নির্দিষ্ট করা হবে।" কৌটিল্য আরও বলেছেন যে গ্রামগুলি পরস্পরের রক্ষা বিষয়ে সাহায্যের জন্য গ্রাম হতে গ্রামান্তরের সীমার ব্যবধান এক ক্রোশ হতে দু'ক্রোশের মধ্যে থাকা উচিত (অধ্যক্ষ প্রচার : ১৯শ প্রকরণ)।[৩১]

পশ্চিমবঙ্গের মোট ভূমিভাগের ৮·৭২ শতাংশ বর্ধমান জেলায়; কিন্তু কর্ষিত বা কৃষিযোগ্য ভূমির হার রাজ্যের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মোট কর্ষিতভূমির ৯·৭৮ শতাংশ এই জেলায় বর্তমান।[৩২] আরও বিশদভাবে বলা যায় যে, বর্ধমান জেলার মোট ভূমিভাগের ৬৬·২৫ শতাংশ কৃষিকার্যের উপযোগী।

ভূমিভাগের অবস্থান অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মৃত্তিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,[৩৩] যথা (১) উচ্চভূমি, (২) নিম্নভূমি ও (৩) চরভূমি। আবার মৃত্তিকার গুণগত উপাদানের তারতম্য অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(১) ল্যাটেরাইট, (২) বালি মিশ্রিত বা বেলে মাটি ও (৩) পলিমাটি বা পলিমিশ্রিত সমভূমির মৃত্তিকা।

ল্যাটেরাইট : এই শ্রেণীর মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন পলির সঙ্গে লৌহ-মিশ্রিত উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। কাঁকর, কোয়ার্টজশিলাচূর্ণ, আগ্নেয়শিলা চূর্ণ উপাদানের সঙ্গে জল ও আবহাওয়ার সংস্পর্শে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে। এতে খারযুক্ত লৌহচূর্ণ ও এলুমিনিয়ম মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু কোন জৈবিক পদার্থ না থাকায়, এই শ্রেণীর মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি নাই। জেলার ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলের পূর্ব অংশে কাদা ও পলি মৃত্তিকা ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার উপরিভাগে আস্তরণের সৃষ্টি করেছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে উক্ত অঞ্চলে ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ধান ও ইক্ষু চাষের পক্ষে উপযোগী। এই ধরনের মৃত্তিকা বর্ষাকালে কর্দমাক্ত ও গ্রীষ্মকালে কঠিন হয়ে থাকে।

দুর্গাপুর অঞ্চলে মৃত্তিকায় নরম বালির ভাগ অধিক হওয়ায় এই ধরনের মৃত্তিকায় কৃষিকার্য ফলপ্রসূ না হলেও ইট ও টালি নির্মাণ ব্যবসা লাভজনক। জেলার পশ্চিম অঞ্চলটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বমুখী বর্ধিত অংশ হওয়ায় এতদঞ্চলের ভূমি অসমতল, শুষ্ক এবং পাথর ও কাঁকর মিশ্রিত হওয়ায় কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযোগী।

লাল মাটি : দুর্গাপুর মহকুমার পূবাংশ, বর্ধমান মহকুমার পশ্চিমাংশ ও মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশের মৃত্তিকা কঙ্করময় ও মৃত্তিকার রং লালচে ধরনের। মালভূমির প্রত্যন্ত দেশের মাটি সাধারণতঃ পাথুরে ধরনের হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মাটি বালি মিশ্রিত ও এর রং লাল।[৩৪] এই মাটি ক্ষয়িষ্ণু হলেও এর উর্বরতা মাঝারি রকমের, কিন্তু জৈবিক উপাদান বিশেষ নাই। সার ও জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে যথেষ্ট ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আগ্নেয়শিলার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ও ভূত্বকের উপরিভাগের পরিবর্তনের ফলে এই মাটির রং লালচে ধরনের। ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গে সাদৃশ্যগত পার্থক্য না থাকলেও লাল মাটি ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার যথেষ্ট তফাৎ আছে। লাল মাটির স্তর পুরু কিন্তু লৌহযুক্ত—আবার কোথাও কোথাও চুনাপাথরমিশ্রিত। এই অঞ্চলের শাল-অরণ্যটি কলকারখানা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের অজুহাতে ধ্বংস করার ফলে অজয় নদের তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভূমিক্ষয় হচ্ছে।

পলিগঠিত সমভূমি : পলিগঠিত সমভূমিতে মৃত্তিকার প্রকারভেদ বিশেষ নাই। কাটোয়া, কালনা ও বর্ধমান সদর মহকুমার অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকায় দুই শ্রেণীর পলির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমগ্র অঞ্চলের মৃত্তিকা নদীবাহিত

পলি হলেও ভাগীরথী এবং দামোদর-অজয়ের পলিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। ভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চলে কাদার ভাগ অধিক হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ নরম।[৩৫] নূতন পলির গভীরতা প্রধানতঃ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও ক্রমশঃ জেলার অভ্যন্তরভাগে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে অভ্যন্তরভাগে পলির গভীরতা কম। এই ধরনের মৃত্তিকায় জলধারণের ক্ষমতা অধিক হওয়ায় স্বল্প বৃষ্টিপাত বা জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য সম্ভবপর। এই শ্রেণীর মৃত্তিকা নদীবাহিত খনিজ পদার্থ ও প্রচুর পরিমাণে জৈবিক উপাদানের জন্য বিশেষ উপযোগী। পূর্বে দামোদর নদের প্লাবনের ফলে বর্ধমান মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চল এবং মেমারী ও বর্ধমান থানায় প্লাবনজনিত কারণে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চয়ের ফলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্লাবনজনিত পলিসঞ্চয় ন্যূনতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কাটোয়া, পূর্বস্থলী, ও কালনা থানার অধিকাংশ ভূভাগ গড়ে উঠেছে ভাগীরথী নদীবাহিত পলির দ্বারা, ফলে এই নরম মৃত্তিকায় পাট, ইক্ষু, ধান ও শাকসবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খড়্গেশ্বরী ও বাঁকা নদীবাহিত পলি কৃষিকার্যের উপযোগী হলেও এর পরিমাণ যৎসামান্য, কারণ বর্তমানে এই নদী দুইটির উৎস স্থান বর্ধমান জেলাতেই এবং এগুলির দৈর্ঘ্যও অধিক নয়। পলি অবক্ষেপণের জন্য এই নদীদ্বয়ের অববাহিকায় অবস্থিত বর্ধমান' ভাতাড়, মেমারী, মন্তেশ্বর, কাটোয়া, কালনা ও পূর্বস্থলী থানার গ্রামগুলিতে কৃষিকার্যের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের উপর পলিমাটির আস্তরণ কোন নির্দিষ্ট নিয়মে ছড়িয়ে নেই। সর্বশেষ বন্যার গতিপ্রকৃতির ওপর এই বণ্টন ব্যবস্থা নির্ভর করে।[৩৬] তবে সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে নদী অববাহিকার নিকটবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকায় সূক্ষ্ম ও নরম বালির ভাগ অধিক থাকে এবং দূরতম অঞ্চলের মৃত্তিকা এঁটেল জাতীয়। জেলার মধ্যভাগের মৃত্তিকায় এঁটেল জাতীয় উপাদান অধিক। সূক্ষ্ম ও নরম বালি-মিশ্রণের তারতম্য অনুসারে বর্ধমান জেলার পলি শ্রেণীর মৃত্তিকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।[৩৭]

বেলে : হালকা নরম বালির ভাগ অধিক।

দোঁয়াশ : কাদা ও নরম বালির অনুপাত সমান। এই শ্রেণীর মৃত্তিকা প্রধানতঃ উর্বর ও কৃষিকার্যে উপযোগী।

ক) বালি দোঁয়াশ—মিশ্রণের অনুপাতে কাদার ভাগ অল্প, এই শ্রেণীর মৃত্তিকা সব সময় নরম ও ভিজা থাকে।

খ) এঁটেল দোঁয়াশ—মিশ্রণের অনুপাতে কাদার ভাগ কিছু বেশী থাকে ফলে বর্ষার জল সর্বদা মাটির ওপরে দেখা যায়, কিন্তু শুষ্ক হলে মাটির উপরিভাগে ফাটল দেখা দেয়। আবার এই শ্রেণীর

মৃত্তিকা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকলে অল্প বৃষ্টিতে প্রায়ই বন্যার সম্ভাবনা থাকে।

পলি : কাদা ও সূক্ষ্ম নরম বালির সঙ্গে জৈবিক পদার্থ মিশ্রিত থাকায় নরম পলি মাটির সৃষ্টি হয়। যদি বারংবার একই স্থানে প্লাবন জনিত পলি সঞ্চয় না হয় তাহলে কালক্রমে ঐ মৃত্তিকা বেলে মাটিতে পরিণত হয়।

এই জেলার এক একটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে কৃষিযোগ্য ভূমি আছে এবং বিস্তীর্ণ কৃষিযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে গ্রামগুলি অবস্থিত। নদীগুলি যে অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত তার পার্শ্ববর্তী ভূভাগে প্রতি বৎসর পলি ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। এই সকল জমিতে শীত ও বসন্তকালেও কৃষিকার্যের বিশেষ সুবিধা আছে। ফলে গম, আলু, তৈলবীজ ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রাজ্যের কৃষিযোগ্য ভূমির মৃত্তিকাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর—এঁটেল, বেলে, দোঁয়াশ ও বালিমিশ্রিত দোঁয়াশ, এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ :

কোন অঞ্চলের জলবায়ু যেমন মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, অনুরূপভাবে শিল্প, কৃষি ও বনভূমির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বনভূমি প্রত্যক্ষ-ভাবে শিল্প ও জনজীবনের অর্থ নৈতিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। আঞ্চলিক অর্থনীতিতেও বনভূমির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মানব সমাজের বসতি-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অগভীর বনভূমি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গোচারণ ক্ষেত্র হাজার হাজার গৃহপালিত পশুর বিচরণক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই গোচারণ ক্ষেত্রগুলির আশেপাশে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। আবার নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে সভ্য মানুষ হতে দূরে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল আদিম অধিবাসীরা যাদের আদিবাসী বা উপজাতিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। গৃহনির্মাণ, শিল্প, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। আদিবাসীরা কাষ্ঠসংগ্রহ ও গাছের পাতা সংগ্রহকে তাদের জীবিকার প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে গোষ্ঠীভুক্ত সমাজেও সুদূর অতীতকাল থেকে দারুশিল্পে নিযুক্ত একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, যারা এই শিল্পকর্মে যথেষ্ট দক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ ও কলকারখানা স্থাপনের ফলে বনভূমির আয়তন সঙ্কুচিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষির প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বনভূমি ও গোচারণভূমিগুলিও ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। বনভূমি হ্রাসের ফলে বৃষ্টিপাতেও অসমতা দেখা দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে ভূমিক্ষয়ের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একশ বছর পূর্বেও

বর্ধমান জেলার পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল গভীর অরণ্যসঙ্কুল ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য ঝাড়খণ্ড ও সাঁওতাল পরগণার বনভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখনও দুর্গাপুর, আউশগ্রাম, ফরিদপুর ও কাঁকসা থানায় স্থানে স্থানে পলাশ ও শাল অরণ্য দেখা যায়; ঐগুলি এই জেলার অতীতের অরণ্য সম্পদের স্মারক চিহ্নমাত্র। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকেও এ জেলার বনভূমির আয়তন ছিল ৪৬০০০ একর, যা বর্তমানে এক তৃতীয়াংশে দাঁড়িয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের গঠনপ্রকৃতির উপর বনভূমির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাবে বর্ধমান জেলার বনভূমি সৃষ্টি হয়েছিল। লৌহযুক্ত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা শাল অরণ্য বৃদ্ধির সহায়ক এবং অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে এ জেলায় নিবিড় শাল অরণ্য সৃষ্টি হয়েছিল।[৩৮] ভূতত্ত্ববিদগণের মতে সাধারণতঃ গভীর শাল অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে মাটির নীচে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। সুদূর অতীতে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের তলদেশে শাল অরণ্যসমূহ অবদমিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল কয়লার পুরু স্তর।

বর্ধমানের পূর্বাঞ্চলে কৃষি ও পশ্চিমাঞ্চলে কয়লাখনি ও কলকারখানা প্রসার লাভের ফলে ঘন অরণ্য অধ্যুষিত স্থানসমূহে জনবসতি গড়ে উঠেছে এবং আদি-বাসীরা এতদঞ্চল পরিত্যাগ করে আরও পশ্চিমে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে এক সরকারী প্রতিবেদনে তৎকালীন বর্ধমানের জেলাশাসক যে সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে ঐ সকল গোষ্ঠীর সন্ধান জানা যায় না। দু'শ বছর পূর্বে গুসকরা হ'তে বরাকর নদের তীর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অরণ্য হিংস্র জন্তুতে পরিপর্ণ ছিল। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পূর্বে এতদঞ্চল এমন নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল যে লোকে দিবালোকেও একাকী যাতা-য়াত করতে ভয় পেত। দস্যু-তস্কর ও হিংস্র বন্যজন্তুর ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াতের প্রথা ছিল।[৩৯]

'তারিখ-ই-বাংলা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে এ অঞ্চল গভীর অরণ্যে পূর্ণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও হান্টারের 'Annals of Rural Bengal'-এ বর্ণিত আছে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জনবসতি প্রায় নির্মূল হয়ে যায় এবং উক্ত অঞ্চলের গভীর অরণ্যে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রাদি বিশাল জন্তুসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করত।[৪০] বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও কাটোয়া, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, পাটুলী, পূর্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে হিংস্র বন্য জন্তুর প্রায়ই সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। সরকারী প্রতিবেদনেও এর প্রমাণ মেলে।

আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমায় নানা শ্রেণীর ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে শাল, শিশু, সেগুন, খয়ের, অর্জুন, হরিতকী, বাবলা, শিমুল, মহুয়া বৃক্ষ দেখা যায় এবং পূর্বভাগের পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলে বট, অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল খেজুর' বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। ভাগীরথীর উপকূলভাগে প্রচুর আম, জাম,

কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতির বাগান আছে। জেলার পূর্বভাগের প্রায় সকল স্থানে বাঁশ গাছ দেখা গেলেও কাটোয়া, পূর্বস্থলী ও কালনা থানায় উৎপাদন ও গুণগত মানের উৎকর্ষ অধিক। পূর্বস্থলী ও কালনা থানায় ছোট ছোট বনে বেতগাছ জন্মে। বর্তমানে দামোদর ও ভাগীরথীর অববাহিকায় সেগুন ও শিশুগাছ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোপণ করা হচ্ছে।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে এক সরকারী সমীক্ষায় জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট বনভূমি ৫১৭৩ বর্গমাইল এবং বর্ধমান জেলায় বনভূমির পরিমাণ ছিল মাত্র ১২৬·৬০ বর্গমাইল।[৪১] তন্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল ৯০ বর্গমাইল ও যৌথ মালিকানায় ২৫ বর্গমাইল। সরকারী বনভূমি বর্ধমান জেলায় ছিল না। বর্তমানে বনভূমির আয়তন আরও হ্রাস পেয়েছে।

বর্ধমান জেলার অরণ্যের পরিমাণ কম হওয়ায় বন সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রও সীমিত। কিন্তু শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে বনভূমি উন্নয়ন করা আশু প্রয়োজন। জন-বসতি ও শিল্পপ্রসারের ফলে ক্রমাগত কৃষিযোগ্য ভূমি ও বনভূমির চাহিদাও অধিক, যা বনভূমি বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায়। এতৎসত্ত্বেও যে সকল অরণ্যের এখনও অস্তিত্ব আছে, সেগুলিকে রক্ষা করা আশু প্রয়োজন। আউশগ্রাম থানার পশ্চিমা-ঞ্চলের একাংশে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করা হয়েছে, অথচ ঐ অঞ্চলে কৃষিকার্যও সম্ভবপর নয়। সেকারণে হারানো সম্পদের কথা বিবেচনা করে এই বনটিকে রক্ষা করা কর্তব্য। ইতিমধ্যেই মানুষের হাতে বনভূমির যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তা অপূরণীয়। বড় বড় বনভূমির পত্তনের জন্য ভৌগোলিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে এবং নূতন বনভূমি ভূমিক্ষয় রোধের সহায়ক হবে। মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ পাথুরে ধরনের হয় এবং এবং এই পাথরের স্তরের উপর বালিমাটি ও লাল মৃত্তিকার স্তর হতে বৃক্ষাদি ধ্বংস করার ফলে উপরের মৃত্তিকার স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভূমির রুক্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভূমির উর্বরতাও হ্রাস পেয়েছে।

ভূমিক্ষয় নিবারণ, বৃষ্টিপাতের অসমতা দূরীকরণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পুনঃ-স্থাপনের জন্য এই জেলায় বনভূমির উন্নয়ন করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু জনবসতি, শিল্প, ও কৃষিকার্যের জন্য ভূমির চাহিদাও যথেষ্ট। সুতরাং বন উন্নয়নের জন্য সরকারের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, যথা—(১) পশ্চিম অঞ্চলে শাল বৃক্ষ রোপণ; (২) যে সকল স্থানে লাভজনক কৃষিকার্য হয় না, সেখানে বৃক্ষ রোপণের উৎসাহ দান; (৩) ভাগীরথী অববাহিকায় বাগিচা ধ্বংসের প্রতিরোধকল্পে আইন ও (৪) গভীর পলি গঠিত অঞ্চলে সেগুন, শিশু ও বাঁশ উৎপাদনের সুযোগকে কাজে লাগান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমান জেলায় কুটিরশিল্পে বাঁশের ব্যবহার বহুদিন হতে চলে আসছে।

বনসম্পদ রক্ষার জন্য বর্তমানে কিছু সরকারী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে তার ফল সুদূরপ্রসারী। লাভজনক বৃক্ষরোপণ না করে বিদেশী রাষ্ট্রের পরিবেশ

বিজ্ঞানীদের কুপরামর্শ ও উৎসাহে ভারত সরকারসহ রাজ্য সরকার ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় বৃক্ষরোপণের প্রতি যে উৎসাহ দেখাচ্ছেন তার কুফল ভবিষ্যতে মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'দি স্টেটস্ম্যান' পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ, এদেশের পরিবেশ বিজ্ঞানী সুন্দরলাল বহুগুণা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন যে, সমস্ত ইউক্যালিপ্ট্যাস গাছের চারা যেন ধ্বংস করা হয়। এ জাতীয় বৃক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকারক। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে এই বৃক্ষ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর দ্বারা রেয়ন ও সিনথেটিক সুতা অল্প খরচে উৎপাদন হতে পারে। পুঁজিবাদী দেশগুলি অল্প ব্যয়ে অনুন্নত দেশ হতে সহজলভ্য উপায়ে ঐ সুতা আমদানী করতে পারবে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে' পশ্চিমবঙ্গে মহুয়া জাতীয় বৃক্ষ, বাদাম, জাম, বেল, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ উভয় বিষয়ে লাভবান হওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে ভূমিক্ষয়রোধে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নাই। অতএব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত আশু এ বিষয়ে বহুগুণার মন্তব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জনগণের মনের সংশয় দূর করা।

প্রায় সমগ্র বর্ধমান জেলা নদীগঠিত সমভূমি এবং বহু ছোট বড় নদী এই জেলায় প্রবাহিত। নদনদীগুলির উভয় পার্শ্বের পতিত জমি বহুকাল ধরে গোচারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফলে এক শ্রেণীর পেশাদার গোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এগুলিকে ব্যবহার করত এবং প্রধানতঃ নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই গোপপল্লীগুলি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে কৃষির চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঐ সকল গোচারণ ক্ষেত্রগুলিকে কৃষিকার্যে ব্যবহারের ফলে গোচারণক্ষেত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়েছে এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রচুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

বর্ধমানের চরভূমি ও বনভূমির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত। সেকারণে ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য রেখে বন, বনজ সম্পদ ও বন্য জীবজন্তু ধ্বংস করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় বনভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার দূরীকরণের জন্য বর্তমানে সরকার কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।[৪২]

এত গেল একালের কথা। সেকালেও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে বহুবিধ গাছ-পালার অস্তিত্ব ছিল ; যাদের অধিকাংশ আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকক্ষেত্রে গাছের নাম হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই গাছের নামকে কেন্দ্র করে নিশানদিহি মতে গ্রামের পত্তনী হয়ে যে নামকরণ হয়েছিল, তা আজও টিকে রয়েছে সেই হারিয়ে যাওয়া গাছের স্মৃতি অবলম্বন করে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নগরপত্তনের প্রারম্ভে যে সকল গাছপালা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল তার সুন্দর বর্ণনা থেকে বর্ধমান তথা রাঢ়ের বনরাজির পরিচয় পাওয়া যায়।

'মহাবীর হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কাননে।
বন কাটে বেরুণিয়া জনে ॥
শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ
ওকড়া ধুতুরা কাটে আপাঙ্গ
আকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি।
আটসর খাটসর কাটিল নাটা
ভাতুল্যা ভারুল্যা চোর পালিতা
ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী ॥
গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি
পটোলা পারুল্যা ভারদ্বাজী
টাণ্ডুরঝাটি কাল্যানয়া।
হোগল হেঁতাল চামরা কসা
বাতস বেতাস রাখাল শসা
সাঁজ্যোতা পাঁজ্যাতা কাটে সর্ব্বজয়া।
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ গুড়কাঙলী
বাকস বাকসনা পানীসিয়লী
কুলিতা চালিতা কাটিল মারাটি।
নেয়াতি সেয়াতি বরুণা সাঁই
বেউড় বাঁশের অবধি নাই
কেতকী ধাতকী কাটিল বামুনহাটি ॥
সিঁয়াকুল ডামাকুল শিঙ্গার বেত
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত
চিঞ্চার বহুবাঁশ কাল মান্দারি।
দেবধান গড়গড় ময়নাকাঁটা
শালপাণি চাকুল্যা কাটিল জটা
কুকুর ছড়্যা কাটিল গাম্ভারি।
পোণ্ডাতি বিছাতি কাটিল বনশর
বনবাইগুণ পিড়িয়া উড়ুম্বর
পড়াসি পুড়াশি কাটিল ভুরণ্ডী ॥
আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব
শুকনা কাননে মেজাইল দব
সরল ছাড়ি কাটিল যামলা।
ভেফল কাফল করঞ্জাবন
করন্দি মহিন্দি কাটে আসন

এরণ্ড মামুড়ি কাটিল বাবলা ॥
সরল ছাতিম কাটিল নিম
পারুল দেবদারু বরুণাসীম
সিমুল সোনা কাটিল বলিচা।
শিরীষ কর্কট বনচালিতা
বালিগড্যা বাকুলি কুচাইলতা
কুসুম কাটিল নাটাবাঁচ্যা ॥
পালাপাকুড়ি খদিরের বন
কহাকড়া কেল্যাকড়া উলু বেণাবন
ভাটি শঠি কাটিল আদাড়ে।
মাণ্ডার পণ্ডার কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী
নন্দন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে
ঘাটুফুল ঘাটুকাল কাটিল কেয়া
অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জারফল লবঙ্গ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা
টগর তুলসী রাখিল নারঙ্গ ॥
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারিকেল নগর-শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বিল্ববন।
বক শেফালিকা আর কাঞ্চন
করবীকুন্দ করিল স্থাপন
টগর তুলসী রাখিল স্থাপন ॥
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম
মূল বান্ধিবারে আনিল থৈকর।'

বনভূমির প্রাচুর্য না থাকায় বন্য জীবজন্তুও বর্তমানে বিরল ও ক্রমশঃ নিঃশেষিত। বর্তমান প্রজন্মে বিশ্বাস করা কঠিন যে, সুদূর অতীতে একদা রাঢ়ের জঙ্গলে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, নেকড়ে, ভাল্লুক, বন্য বরাহ প্রভৃতি জীবজন্তু নির্ভয়ে বিচরণ করত।[৪৩] অবশিষ্ট অরণ্যাংশে মধ্যে মধ্যে নেকড়ে, হায়না ও বন্য শৃগালের সন্ধান পাওয়া যায়। চিতাবাঘ এই অরণ্যের স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও পূর্বে ছোট-

নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল থেকে এই অরণ্যে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কাঁকসার জঙ্গলে নেকড়ে, হায়না, বন্য বরাহও দেখা যায়। জেলার বনাঞ্চল ও বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলে বনজারু, বেবুন, বাঁদর, হনুমান, বেজী, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়। জঙ্গল ও ঝিলগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের পক্ষী দেখা যায়; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বন মোরগ, পেঁচা, শকুন, টিয়া, পায়রা প্রভৃতি। নদী, খাল, বিল, বৃহৎ পুষ্করিণী ও পার্বত্য অঞ্চলে চন্দ্রবোড়া, কেউটে, গোখুরা, ঢোঁড়া, ঢেমনা গো-সাপ, ছোট আকারের অজগর, কালনাগ ও বিভিন্ন প্রকারের চিতি সাপ দেখা যায়। কয়েকটি স্থানে কুমীরের সাক্ষাৎ মেলে, তবে অধিকাংশই মেছো কুমীর।[88] বর্ধমান জেলার কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামে ঝাঁকলাই নামক এক বিশেষ শ্রেণীর সাপের সন্ধান পাওয়া যায়, যা অন্যত্র দেখা যায় না।

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, শূকর, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কৃষিকার্যে ও গ্রামাঞ্চলে পরিবহনের ক্ষেত্রে গরু ও মহিষ একমাত্র প্রধান অবলম্বন। যান্ত্রিক পরিবহনের উন্নতির ফলে ঘোড়ার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় হাতী, ঘোড়া ও উটের ব্যবহার একেবারেই লোপ পেয়েছে।

জলবায়ু ঃ

বর্ধমান জেলার প্রায় মধ্যাঞ্চল দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৩০' উত্তর অক্ষাংশ) প্রসারিত হওয়ায় এটি ক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত এবং আবহাওয়া উষ্ণ, আর্দ্র ও মৌসুমী বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। গ্রীষ্মকালে এই জেলার আবহাওয়া চটচটে ও অশস্তিকর। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা খুবই কম; কিন্তু পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া এই সময়ে মনোরম। ভাগীরথী অববাহিকায় বিভিন্ন ঋতুতে তাপমাত্রার বিরাট ব্যবধান নাই। অপর দিকে আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমায় শীত-গ্রীষ্মের ব্যবধান বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

অঞ্চল	গ্রীষ্মকাল	শীতকাল
পূর্বাঞ্চল	৩০°সেঃ	১৮°সেঃ
পশ্চিমাঞ্চল	৪২°সেঃ	১৪°সেঃ

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াকে ছ'টি ঋতুতে বিভক্ত করা হলেও বসন্ত ও শরৎ ঋতুর বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতুর প্রভাবই অধিক। হেমন্ত ঋতুও দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ধমান জেলায় এপ্রিল মাস হতে জুন মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মের প্রভাব দেখা যায়। ঐ সময়ে বঙ্গোপসাগরে অস্থায়ী অথচ গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, ফলে জেলার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঘূর্ণিঝড় ও সময়ে সময়ে শিলাবৃষ্টি দেখা যায়, যা কালবৈশাখী নামে আখ্যাত। ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় উপত্যকায় দিবাভাগে অসহ্য গরমের পর বৃষ্টিপাত হলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। অবশ্য কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরবাড়ি ও গাছপালা বিনষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে

শস্যহানি ঘটে। গ্রীষ্মকালে মধ্যভারত হতে আগত উষ্ণ বায়ু প্রবাহের ফলে জেলার পশ্চিমাঞ্চল অধিকতর উষ্ণ ও রুক্ষ। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই চরম ভাবাপন্ন। এই এই অঞ্চলের শাল জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় আবহাওয়ারও চরমাবস্থা বেড়ে গেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্ধমানের জলবায়ু মৌসুমী প্রকৃতির এবং বঙ্গোপসাগর ও ভাগীরথী নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার ব্যবধান অধিক হয় না। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে বর্ধমান জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বর্ষাকাল সুরু হলেও এই সময়ে বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। অবস্থানগত পার্থক্যের জন্য জেলার সকল অঞ্চলে বৃষ্টি-পাতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। (১) গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ সে:মি: হতে ২০০ সে:মি: পর্যন্ত, (২) পশ্চিমাঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০ সে:মি: হতে ১৫০ সে:মি: পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৮০ সে:মি:। বর্ধমান জেলায় মোট বৃষ্টিপাতের ৯০ ভাগ জুন মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে।[৪৫]

সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম জেলা ও বর্ধমান জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে অগভীর অজয় নদের উভয়কূল প্লাবিত হওয়ায় মঙ্গলকোট ও কাটোয়া থানায় প্রায়ই বন্যা দেখা দেয়। অবশ্য বর্ষায় ভাগীরথীর জলস্ফীতির জন্য অজয়ের জল নিষ্কাশিত হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ঐ এলাকা সময়ে সময়ে বন্যা কবলিত হয়। ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে ও জেলার পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দামোদর, বরাকর, বাঁকা প্রভৃতি নদীতে বন্যা দেখা দেয়। ফলে অতীতে বর্ধমান ও কালনা থানা প্রায় বন্যা কবলিত হতে দেখা গিয়েছিল। বন্যার জন্য দামোদরকে 'বর্ধমানের দুঃখ' বলা হত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জন্য ক্রান্তীয় বলয়ের ঘূর্ণিবার্তার ফলে প্রবল ঝড় দেখা দেয়, যা সাইক্লোন নামে কুখ্যাত। বাংলা ১৩৪৯ সালে আশ্বিন মাসের সাইক্লোনে বর্ধমান জেলায় প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এই সময়ে পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। ১৯৫৬, ১৯৭৮ ও ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে নিম্নচাপ-সৃষ্ট প্রবল বৃষ্টি-পাতে প্রায় সমগ্র রাঢ় অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শীতকালে বর্ধমান অঞ্চল সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে। তবে কখন কখন বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতল বায়ু প্রবাহের ফলে আবহাওয়ায় আসে শীতলতা। বৃষ্টিপাতের ফলে শৈত্যপ্রবাহের সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯° সে: পর্যন্ত নেমে আসে। তারপর স্বল্পস্থায়ী সময়ের জন্য বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের পর গ্রীষ্মঋতু শুরু হয়।

১। সমাজ বিজ্ঞানীর ভূগোল—অনিমা ভট্টাচার্য্য ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৭৮.
২। *Geographical Factors in Indian Hist.*—K. M. Panikkar, p. 22.
৩। *The Cultural Heritage of India*, Vol. I, p. 3.
৪। *Reports of The Geological Survey of India*, Vol. LXXV, 1940, p. 4-10.
৫। *Memoirs on G. S. I. (New Series)*, Vol. XLIV, p. 28 & 48.
৬ *Ibid*, p. 10.
৭ *Ancient India*, No. 14, p. 47.
৮ বাঙলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ১.
৯ ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা—সঙ্কর্ষণ রায়, পৃ. ৫.
১০ Caxton—*Atlas of the Earth*, p. 50-51.
১১ *Encyclopedia Britanica*, Vol. 8, p. 883.
১২ *Encyclopedia Britanica*, Vol. 8, p. 884.
১৩। *West Bengal*—Chatterjee & others, p. 1.
"The burial basement ridges in the western fringe of the Bengal basin presumbly kept the basis of Gondwana sedimentation isolated from the main Bengal basin through most of the Tertiary time. Presence of the Durgapur beds possibly estuarine counterpartofsome shallow marine, Middle Miocene formation in West Bengal sub surface near Raniganj."
১৪ *Geology and Mineral Resources of W.B.*—A. Hunday, p.26-27.
১৫ *Geology of India*—D. N. Wadia, p. 85.
১৬ *Ibid*, p. 398.
১৭ ভারতের শিলাস্তর—ডঃ তিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী, পৃ. ১৪৩.
১৮ *West Bengal*, p. 1.
১৯ *West Bengal*—Table-I.
২০ *Ancient India*—No. 14, B. B. Lal, p. 47.
২১ *Ibid*. p. 2.
২২ *West Bengal Dist, Gazetters, Howrah*, p. 11.
২৩ ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিম বাংলা—পৃ. ৬৭.
২৪ ভারতের শিলাস্তর—পৃ. ১৫৪.
২৫ ঐ —পৃ. ১৫০.

২৬। ভারতের শিলান্তর—পৃ. ২৪৬-৪৭.

২৭। *Dist. Census Hand Book, Burdwan,* 1951, A. K. Mitra, p. X.

২৮। *Ibid,* p. ii.

২৯। *Ibid* p. vii.

৩০। *An Account of Land Management in West Bengal,* p. 256.

৩১। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অনু: রাধাগোবিন্দ বসাক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩.

৩২। *A brief Agricultural Geography of West Bengal*—S. N. Mukherji, p. 69.

৩৩ *An Account of Land Management in West Bengal,* p. 129.

৩৪ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়—সুবোধচন্দ্র বোস, পৃ. ৪৬.

৩৫ *India and Pakistan*—Spate & Learmonth, p. 586-87.

৩৬ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়—পৃ. ৫০.

৩৭ *A Brief Agr. Geo. of West Bengal,* p. 32-37.
An Account of land Management in W B. .p. 129 &133.
Dist. Census Hand Book, Burdwan, 1951, p. IX-X.
Agricultural Econ. of Bengal—P. K. Roy, Part-I, p. 63-68.

৩৮। ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা, পৃ. ১২-১৩.

৩৯। *Bengal District Gazetteers, Burdwan,* 1910, p. 14.

৪০। তারিখ-ই-বাংলা মহব্বৎজঙ্গ, পৃ. ৩৮
The Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter, p. 41-43

৪১। *An Account of Land Management in West Bengal,* p. 145.

৪২। *Ibid,* p. 144.

৪৩। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃ. ২৮.

৪৪। *Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan,* J.C.K. Peterson, p. 14.

"The Carnivora of the District comprise leopard, wolf, hyaena, jackal and other smaller species. Leopards are not common but are occasionally found in the villages near Dainhat in the Katwa subdivision. They destroy cattle and goats and have been known to attack men, A leopard was quite recently killed close to the town of Burdwan, and in 1909 a good deal of damage was done by one in Kalna town. Tigers were formerly common in the district, especially in the jungles of the Asansol subdivision adjoining the Santal Parganas, *but*

have now entirely disappeared. Wolves are scarce and are mostly met in the jungles north of Kaksa; they have been known to carry off children. Hyaenas do not commit much mischief as they content themselves with carrion but they occasionally carry off goats and sheep. Wild pigs are numerous throughout the district and do considerable damage to crops; monkey also abound. Poisonous snakes are very common and include several kinds of cobra, the karait and the deadly Russell's viper. Snipe are very numerous in the rice fields during the months of September, October and November and afford excellent sport, while among other game birds are grey and black partridges, pea-fowl and jungle-fowl which are plentiful in the Sal jungles of the Asansol subdivision".

৪৫। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়—পৃ: ৩৬-৩৯.

তৃতীয় অধ্যায়

নদনদী ও জনজীবন

প্রস্তাবনা :

নদী মাতৃ স্বরূপা—মাতৃদুগ্ধে শিশু যেমন শৈশবে লালিত হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, অনুরূপভাবে নদী জলধারা সিক্ত মৃত্তিকারাশি সরস হয়ে শস্য উৎপাদনে সহায়তা করে আমাদের মুখে আহার, বুকে বল, দেহে কমনীয়তা যোগায়। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত একটি ভৌগোলিক পরিসীমায় বর্ধমান জনপদ 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' (৫৮/১৪) ও 'বৃহৎ সংহিতার' (১৪/৭) রচনা কালের যুগ হ'তে পরিচিত হয়ে আছে। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমান জনপদে প্রবাহিত নদনদীগুলির অকৃপণ দান হ'তে এতদঞ্চল বঞ্চিত হয় নাই। মানব সভ্যতা উন্মেষে নদীর অবদান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নদীর সঙ্গে মানুষের জীবিকা ও সভ্যতার নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ নিবিড় সম্পর্ক চিরসত্য ও শাশ্বত। বর্ধমানে প্রবাহিত নদনদীসমূহ যুগ যুগ ধরে খাত পরিবর্তন করে চলেছে এবং এক এক অঞ্চলকে নূতন সাজে সাজিয়েছে। "নদীর একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে"—এ প্রবাদ চিরন্তন সত্য। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী গ্রামসমূহ হয়ত ধ্বংস হয়েছে, আবার জলা বা বিল অধ্যুষিত অঞ্চলে পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট চড়ায় নতুন গ্রাম-নগর পত্তন করা সম্ভবপর হয়েছে।

মানব সভ্যতা ও নদী :

নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগে মানুষ মোটামুটিভাবে একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং এই স্থায়ী জনবসতিগুলি হ'তেই সম্ভবতঃ গ্রাম পত্তনের সূত্রপাত হয়। আদিম মানব সমাজ যেদিন প্রথম আবাসস্থল নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করেছিল, সেদিন তারা আহার্য দ্রব্যের সঙ্গে পানীয় জলের খোঁজে তাদের আবাসস্থল নির্বাচন করেছিল নদীতীরে। জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষ শিকারী জীবন হ'তে পশুপালন ও খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখে এবং পরবর্তীকালে কৃষিকার্যের দ্বারা উপজীবিকার উপায় উদ্ভাবনা মানব-জাতির বসতি ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনশীল বসতি ক্রমে অস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী ও চিরস্থায়ী বসতিতে পরিণত হয়।[১] বর্ধমান জেলায় দামোদরের উত্তর কূলে যে প্রাক্-কৌলাল যুগের এক মানবগোষ্ঠীর বসবাসের চিহ্ন মিলেছে তার প্রাচীনতা প্রায় ৬০০০ বছর বা তার পূর্বের।[২] তাম্রাশ্ম যুগেও মানুষ স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিল নদীতীরবর্তী স্থানসমূহকে। বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রাশ্ম যুগের প্রত্নক্ষেত্রগুলি নদীতীরে অবস্থিত ছিল, যথা—অজয়ের দক্ষিণ তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, কুনুরের তীরে মঙ্গলকোট, খড়্গেশ্বরীর প্রাচীন খাতে বাণেশ্বর-

ডাঙ্গা ও বর্তমান খাতে সাঁওতালডাঙ্গা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রগুলিও নদীতীর হতে অধিক দূরে অবস্থিত নয়।[৩] পূর্বোক্ত অধিবসতি-ক্ষেত্রগুলিতে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র হতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ পাত্রের নির্মাণ-কৌশল পদ্ধতি আয়ত্ত করে স্থায়ী বাসস্থানরূপে নদীতীর বেছে নিয়েছিল। পাণ্ডুরাজার-ঢিবিতে প্রাপ্ত শীলমোহরটি, অনেকের মতে অজয় উপকূলভাগে অবস্থিত অঞ্চলের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগের এক নিদর্শন।[৪]

ঐতিহাসিক যুগে নদী তীরে পাণ্ডবেশ্বর, ঢেকুর, বর্ধমান, উজানী, মঙ্গলকোট, কর্জনা, কাটোয়া, দাঁইহাট, কেতুগ্রাম, পাটুলী, দেন্থুড়, সমুদ্রগড়, অম্বিকা-কালনা, বাঘনাপাড়া, সেলিমাবাদ, বোড়-বলরাম, চম্পাই নগরী, ভরতপুর, সুয়াতা, ভাল্কি, দিগনগর, ডিহি-সেরগড়, বরাকর, কল্যাণেশ্বরী, চুরুলিয়া, উদ্ধারণপুর, নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল ও বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে[৫] উল্লেখিত গ্রামগুলি নদীতীরে অথবা নদীতীর হ'তে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সুবিন্যস্ত। সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসকগণের আধিপত্যের সময় বাংলার তথা বিদেশাগত বণিকগণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাসের নিমিত্ত বেছে নেয়। বণিক বংশের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এ খবর পাওয়া গেছে, যাদের আদি বাসস্থান ছিল সপ্তগ্রামে। মুকুন্দরামের বর্ণনা কেবল মাত্র কবিকল্পনা নয়, নদীতীরবর্তী গ্রামসমূহে বণিককুলের বসতি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারাকে বজায় রেখেছে। নিজেদের সুযোগ সুবিধার কথা বিচার করে বণিককুলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্যরাও নদীতীরবর্তী স্থানগুলিকে গঞ্জ-গ্রাম পত্তনের জন্য বেছে নিয়েছিল, নিজেদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের তাগিদে।

জেলা মানচিত্র ও নদী ঃ

বর্ধমান জেলার মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জেলার চতুঃসীমার অধিকাংশ স্থান নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা অন্যান্য জেলা / রাজ্য থেকে পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে পূর্ব হতে পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে আছে। ভাগীরথী নদী কেতুগ্রাম থানার উত্তরাংশে নূতন গ্রামের পূর্বভাগ ধরে দক্ষিণাভিমুখে কাটোয়া পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে, তৎপরে পূর্ব-দক্ষিণে দাঁইহাট, পাটুলী, পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়, অম্বিকা-কালনাকে ডান পাশে রেখে অঙ্গারসোন গ্রাম পেরিয়ে হুগলী জেলার সীমায় প্রবেশ করেছে। বর্তমানে ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কেতুগ্রাম থানার ৭টি মৌজা, কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপ, কাশীপুর ও কবিরাজপুর, পূর্বস্থলী থানার ১১টি মৌজা ও কালনা থানার ৩টি মৌজা নদীর পরপারে অবস্থিত। অবশ্য ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সার্ভে মানচিত্রে পূর্বোক্ত গ্রামগুলি নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল।

বরাকর নদ ধানবাদ জেলা অতিক্রম করে বর্ধমান জেলার ঘাটকুল গ্রামের পশ্চিমে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে ডিসেরগড়ের ৩ কি:মি: পশ্চিমে শিয়ালডাঙ্গায় দামোদর নদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিতধারা দক্ষিণ-পূর্বমুখে বাঁকুড়া জেলার সীমারেখা রচনা করে খণ্ডঘোষ থানার বনমালিপুর অতিক্রম করে, খণ্ডঘোষ, গলসী, বর্ধমান, মেমারী ও জামালপুর থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোহনপুর পেরিয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। জেলার দক্ষিণভাগে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদ দ্বারা হুগলী ও বর্ধমানের ১০-১২ কি:মি: সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়েছে। বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলায় প্রবাহিত অজয় নদ বর্ধমান জেলার সীমাজুড়ি গ্রাম পেরিয়ে পূর্বমুখী ধারায় সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমারেখা রচনা করে কেতুগ্রাম (পারেঙ্গা গ্রাম) ও কাটোয়া (মালিয়ারী গ্রাম) থানার মধ্য দিয়ে কাটোয়া শহরের উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছে।

নদীখাতের উভয় পার্শ্বে ভূমিক্ষয় জনিত কারণে পার্শ্ববর্তী রাজ্য / জেলা-সমূহের মধ্যে নদী তীরবর্তী অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিহার রাজ্যের মানভূম (বর্তমান ধানবাদ) ও বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে বরাকর নদ প্রবাহিত। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, বরাকর খাতের মধ্যবর্তী স্থান বর্ধমান ও মানভূম জেলার সীমারেখা। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে সমগ্র বরাকর নদের খাত বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং নদীর পূর্বকূল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার সীমারেখা।[৩] ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভূমি-জরিপ বিভাগের মানচিত্রে বরাকর নদের খাতকে বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে, জরিপের (Revisional Settlement) সময় জানা যায় বর্ধমান কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত ঐ অঞ্চল কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট-এর অধিকারে ছিল। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারত ত্যাগের পূর্বে তাঁর বহু কুকীর্তির সঙ্গী কান্ত নন্দীকে সেরগড পরগণার কিয়দংশ উপঢৌকনস্বরূপ দান করে পরগণা কান্তনগরের সৃষ্টি করেছিলেন এবং ঐ পরগণার সীমারেখা ছিল বরাকর খাতের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ জরিপে ঐ অংশকে রাজ্য তথা জেলার সীমারেখা ধরলেও বিহার রাজ্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই।

অজয় নদের খাতের মধ্যভাগ বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমারেখা ধরলেও বিগত ৬৮ বৎসরে (১৯২০ খ্রীস্টাব্দকে ভিত্তিসূচক সময় ধরে) নদীর উভয় তীর, ভূমিক্ষয়জনিত কারণে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে জরিপের সময় স্থির হয়েছে যে, ভূমিক্ষয়ের কথা স্মরণ রেখে পূর্ববর্ণিত সীমারেখাই বলবৎ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দামোদর নদ হতে উপকৃত জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমানের স্থান সর্বপ্রথম হ'লেও দামোদরের সমগ্র খাত বাঁকুড়া জেলার সীমা-রেখায় অবস্থিত; অর্থাৎ কুলটি থানা হ'তে গলসী থানা পর্যন্ত ৭২ কি:মি:

নদীখাত বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। দামোদর নদের উত্তরতীর বরাবর স্থলভাগ বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমারেখা। ভূমিক্ষয়ের ফলে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমা সংকুচিত হওয়ায়, ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে শ্রী এন. সান্যালের নেতৃত্বে "গঙ্গা ফ্লাড কমিশন" স্থির করে যে, প্রাকৃতিক কারণে তীরভূমি ক্ষয়িত হ'লে জেলার সীমারেখা পূর্বোক্ত অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের রেখায় বলবৎ থাকবে। কিন্তু বালি সংগ্রহ বা অন্য কারণে ভূমিক্ষয় হ'লে নদীখাতের উত্তর তীর পর্যন্ত জেলার সীমারেখা ধরা হ'বে।

ভাগীরথী নদী নদীয়া ও বর্ধমান জেলার মধ্যে প্রবাহিত। কেবলমাত্র নদীখাতের পরিবর্তন হেতু কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী ও কালনা থানার যে কয়টি মৌজা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নদীর পরপারে চলে গিয়েছে সেই স্থানে সম্পূর্ণ নদীখাত ও উত্তর তীরস্থ মৌজাসমূহ বর্ধমান জেলার সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে নবদ্বীপ শহরের উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৮ কি:মি: নদীখাতের সম্পূর্ণ অংশ নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। নদীখাতের এরূপ বিচিত্র ধারা অন্যত্র অনুপস্থিত, সে কারণে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার দ্বারা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠের গঠনপ্রণালী ও নদীপ্রবাহ ঃ

বর্ধমান জেলার নদনদীর প্রবাহপথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নদনদীগুলির গতিপথ সাধারণভাবে উচ্চ মালভূমি ও ল্যাটেরাইট অঞ্চল হতে পলিগঠিত সমভূমির দিকে অর্থাৎ পশ্চিম হতে পূর্বে। কিন্তু জেলার মানচিত্রটি পর্যালোচনা করে পাওয়া যাচ্ছে যে ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা হতে নদীগুলির গতিপথ উত্তর-পূর্বাভিমুখী এবং বর্ধমান শহরের দক্ষিণে নদীখাতগুলি দক্ষিণ পূর্বমুখে খাত সৃষ্টি করেছে। অবশ্য অজয়ের গতিপথ ৮৭°৫৪ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রান্ত হবার পর উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়েছে। বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত নদীগুলি মোটামুটি ৮৭°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করার পর দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে ভাগীরথীর উদ্দেশ্যে প্রবাহিত। ব্যতিক্রম দেখা যায় দামোদরের ক্ষেত্রে; বড়শূল অতিক্রম করার পর প্রায় দক্ষিণমুখী দামোদর নদ ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত। অবশ্য কানা দামোদর প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হওয়ার পর খাত পাল্টেছিল; দক্ষিণ মুখের লুপ্ত ধারার চিহ্ন পাওয়া যায়।

রেনেলের মানচিত্র (১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ) লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভাগীরথীর মূলধারা কাটোয়া পর্যন্ত দক্ষিণমুখী, কিন্তু কাটোয়া অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্বমুখী ধারা থেকে একটি ক্ষুদ্র শাখা অগ্রদ্বীপ হতে ব্রহ্মাণী, খড়ি ও বাঁকার জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্তমান বেহুলা ১নং খাতে প্রবাহিত হয়ে কালনার পূর্বে গোকুলগঞ্জে ভাগীরথীতে মিশেছে। অবশ্য মূলধারাটি কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ (দক্ষিণ-প্রান্তে), পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ (উভয় পার্শ্ব), ও কালনার পথে বর্তমান খাতেই প্রবাহিত ছিল। রাজমহল হতে ভাগীরথীর প্রবাহপথ মোটামুটি দক্ষিণাভিমুখী এবং সে হিসাবে

ভাগীরথীর জলধারা অল্পবিস্তর ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ধরে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়া যেখানে উচিত ছিল বাস্তবে কিন্তু তা হয় নাই। এ প্রশ্নের উত্তর, নদীবিজ্ঞান, বিশেষজ্ঞ ও ভূবিজ্ঞানীগণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ৪র্থ হিমবাহ যুগ অন্তে দামোদর নদের সৃষ্টি হলেও, সে সময়ে ভাগীরথী প্রবাহের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দামোদর নদের প্রবল জলরাশি দ্বারা শিলাচূর্ণ ও পলিরাশি অববাহিকা অঞ্চলে ভূত্বকের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে লাভা জাতীয় উপাদানে গঠিত শিলাচূর্ণ দ্বারা এবং জেলার পশ্চিমাঞ্চল লাল ল্যাটরাইট মৃত্তিকায় গঠিত হওয়ায় ঐ সকল ভূ-ভাগকে পুরাতন বা প্রাচীন পলি গঠিত ভূ-ভাগ বলা হয়। একই উপাদানে অজয় নদ বাহিত শিলাচূর্ণ দ্বারা বর্ধমান ও বীরভূম জেলার একাংশ গঠিত হয়েছিল। জেলার পূর্বভাগে সাগরের উপস্থিতির দরুণ নদীর গতিপথ স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম হতে পূর্বে ছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর বিপুল জলধারা বাহিত পলিরাশি ভারতীয় মূল শিলার পূর্বভাগে প্রসারিত অংশটিকে মোটামুটি ভাবে ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অচ্ছাদিত করেছে বা গাঙ্গেয় পলির নীচে চাপা পড়েছে।[৭] অজয় ও দামোদরের জলধারা অপর কোন নদীর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায় জেলার মধ্যভাগ পর্যন্ত নদীদুটির গতিপথে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

অনেকে অনুমান করেছেন যে, দামোদরের প্রাচীন খাত উত্তর-পূর্ব মুখে কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিল[৮]। সম্ভবতঃ খড়ি নদীর খাত বেয়ে ঐ অঞ্চলে ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছিল এবং উইলিয়াম উইলকক্সের মতে পরবর্তীকালে কালনা[৯] ও ত্রিবেণীর পথে কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ অঞ্চল, রাণাঘাট ও যশোর জেলায় বদ্বীপের সৃষ্টি করেছিল। অজয়ের জলধারায় জেলার পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট ব-দ্বীপ দ্বারা এতদঞ্চলে ভূমি ভাগ গঠিত হয়েছিল।[১০] ভাগীরথী প্রবাহের পূর্বেই দামোদর-অজয় নদ দ্বারা এই ভূ-ভাগ গঠিত না হ'লে এই প্রবাহ পথ কাটোয়া থেকে বর্ধমানের পথে তাম্রলিপ্তে সাগরসঙ্গম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নাই। সে কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভাগীরথীর প্রবল জলরাশি বাহিত পলি অজয়-দামোদর নদ গঠিত ভূভাগের উপর পলির গভীরতা বৃদ্ধি করলেও পূর্বে গঠিত মূল ভূখণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে নাই বরং ত্রিমুখী পলি অবক্ষেপণের ফলে বর্ধমানের ভূ-প্রকৃতিতে ঢালের বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়েছে। কাটোয়া শহর অতিক্রম করার পর ভাগীরথী নদীর গতিপথ পূর্বমুখী হয়ে অগ্রদ্বীপের নিকট দক্ষিণ পূর্বাভিমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তার শুষ্ক খাতের পরিচয় রেনেলের মানচিত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু অজয় ও দামোদরের জলধারা ভাগীরথীকে স্বস্থানে প্রবাহিত হতে বারবার বাধা দিয়েছিল এবং ভাগীরথীও ক্রমশঃ নূতন পলি গঠিত বদ্বীপ অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভাগীরথীর খাত

বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে,—'When the epicontinental sea covered the tract now forming the Howrah District, the Bhagirathi joined the various sub-deltas of the Chotanagpur rivers and pushed the Gangetic delta towards the sea and thus intercepted the peninsular streams, which in their turn, pushed the Bhagirathi to the east by the detritus they carried. The sudden bend of the Bhagirathi below Kalna, of the Damodar below Burdwan, of the Darakeswar near Arambagh, of the Silai above Ghatal and of the Holdia near the saline soil limit seem to justify this conclusion. These abrupt bends were most probably the debouching points of the Chotanagpur rivers into the ancient channel of the Bhagirathi or the epicontinental sea.'[১১]।

দামোদর নদের দক্ষিণমুখী প্রবাহ সম্বন্ধে জল-বিজ্ঞানীদের অভিমত হল যে, নদীবাহিত পলিস্তরে গঠিত ভূভাগে ভাঁজের ফলে চ্যুতি রেখার সৃষ্টি হয় এবং সম্ভবতঃ সেই সব চ্যুতি রেখার পথ ধরে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। দামোদর নদ বর্ধমান হ'তে ২০ কিঃমিঃ প্রবাহের পর হঠাৎ দক্ষিণমুখে গতিপথ একই কারণে পরিবর্তিত হয়েছে।[১২] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট জলবিজ্ঞানী সুপ্রিয় সেনগুপ্ত অনুমান করেছেন, "বাংলার ভূগর্ভের কোন ধীরগতি অথচ দীর্ঘস্থায়ী (prolonged) পরিবর্তনের সঙ্গে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের রহস্যটি জড়িত আছে।"[১৩] দামোদরের দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ সম্প্রসারণের ফলে ঐ সকল অঞ্চলে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করায় দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও রূপনারায়ণের প্রবাহপথে বাধা সৃষ্টির জন্য ঐ নদীগুলি খাত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার ভাগীরথীর শাখা নদীগুলিতে প্লাবনের সময় পলি প্রবেশ করায় ঐ সকল শাখা নদীর সঙ্গমস্থলের তলদেশ উঁচু হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কালক্রমে শাখাগুলি সঙ্গমস্থলে বিচ্ছিন্ন হতে অথবা গতি পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদ বাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে ত্রিধারায় সৃষ্ট বর্ধমানের ভূ-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য এসেছে এবং নদীগুলি নদীর ধর্ম অনুসারে নিম্নভূমির দিকে তার প্রবাহপথ খুঁজে নিয়েছে। ফলে এককালের প্রবল জলধারা আজ লুপ্ত অথবা শুষ্ক খাতে পরিণত হয়েছে এবং মুণ্ডেশ্বরীর ন্যায় নূতন খাতে নদী প্রবাহেরও সন্ধান মিলছে।

নদীখাতের গভীরতা হ্রাস ও পরিবর্তনের জন্য একদিকে যেমন প্রাকৃতিক কারণগুলিকে দায়ী করা চলে, অপর পক্ষে বন্যা ও অগভীর খাত সৃষ্টির জন্য মানুষের দায় দায়িত্ব কখনই উপেক্ষণীয় নয়। নদীতীরে বাঁধ, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী হতে জল সংগ্রহ, নদীর সন্নিকটে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণের ফলে বন্যার সময়

নদীবাহিত পলিরাশি প্লাবনভূমিতে ছড়াতে সক্ষম হয় না এবং ঐ পলি নদীগর্ভেই সঞ্চিত হয়ে নদীখাতকে অগভীর ক'রে তোলে।

নদনদী পরিচিতি :

বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত নদনদীগুলির মধ্যে ভাগীরথী, দামোদর, বরাকর, খড়ি ও বাঁকা নদীর গুরুত্ব অধিক এবং জনজীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। দ্বারকেশ্বর নদ মাত্র ১০-১২ কি:মি: জুড়ে প্রাকৃতিক সীমা রচনা করেছে। দামোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরীর সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান শতকে। অবশ্য মুণ্ডেশ্বরী নামক একটি প্রাচীন নদীর উল্লেখ 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' পাওয়া যায়, যা আলোচ্য মুণ্ডেশ্বরী থেকে পৃথক। বল্লুকা, গাঙ্গুর ও বেহুলা (১নং ও ২নং খাত) লুপ্তপ্রায় বিস্মৃত এক নদীখাত। অজয় ও কুনুর খাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় যুগের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল এবং এই অববাহিকায় পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মঙ্গলকোট অবস্থিত। কানা, কানা দামোদর, দেবখাল, ইলসরা, ঘিয়া, হরিণ-খালি, বরাকপুরের খাল, চাঁদা প্রভৃতি নদী দামোদরের মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তমলা, সিঙ্গারণ, নুনিয়া, খুদিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি বর্ষার সময় অববাহিকা হতে জল সংগ্রহ করে দামোদরের খাতে জলধারা নিয়ে আসে, কিন্তু অন্য সময় থাকে শুষ্ক। খড়েশ্বরী, বাঁকা, ব্রহ্মাণী, শিবা, কুজি, কামালের খাল, কাঁটাখাল, ভনওয়ার খাল, কামাখ্যা খাল, খণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি নদী বিভিন্ন খাতে ভাগীরথীর জলধারাকে পুষ্ট করে। বাবলা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে প্রবাহিত নদী হলেও কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ভাগীরথী সঙ্গমস্থলে মিশেছে। সংখ্যায় এত অধিক হলেও ৩-৪টি ছাড়া অন্য নদীগুলির নাব্যতা না থাকায় সীমিত ক্ষেত্রে কৃষিকার্য ব্যতীত ব্যবহারযোগ্য নহে।

এক কথায় বর্ধমান জেলার প্রান্তভাগ ও মধ্যভাগে প্রবাহিত নদনদীগুলির মধ্যে ভাগীরথী, দামোদর, বরাকর, মুণ্ডেশ্বরী, মুণ্ডেশ্বরী খাল, বাঁকা, বেহুলা, রাণাবাঁধ, বল্লুকা, গাঙ্গুর, কানা, কানা দামোদর, অজয়, কুনুর, খড়েশ্বরী বা খড়ি, ব্রহ্মাণী, দ্বারকেশ্বর, চালনা, শিবা, খুদিয়া, নুনিয়া, মায়া, তমলা, সিঙ্গারণ, চাঁদা, দেবখাল, খণ্ডেশ্বরী, কুকুয়া, তুমুনি, গৌরী, ইলসরা, ঘিয়া, হরিণখালি, রত্না, কামাখ্যাখাল, সাঁইনী, পাঠাননালা, ভনওয়ার খাল, কুজি, গৌর, গৌরাঙ্গ, ডুবি, গর্জন, কামালের খাল, কাঁটাখাল, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরও অসংখ্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের খাল বা কাঁদড় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, যাদের অস্তিত্ব বর্ষাকাল ভিন্ন অনুভব করা যায় না।

নদী ও জনবসতি :

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা ৪৮·৩৫ লক্ষ; কিন্তু এই জনসংখ্যা কৃষি, শিল্প, খনি ও কৃষি-শিল্প যৌথ অঞ্চলের মোট সমষ্টি। দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমায় শিল্প বলয় গঠিত হয়েছে। আবার বর্ধমান মহকুমা

কৃষি ও শিল্প উভয়ের উপর নির্ভরশীল। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে এই জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪টি; কিন্তু বর্তমানে ঐ সংখ্যা ২৯টি হয়েছে। গ্রামীণ জনবসতির ঘনত্বের তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জেলার উন্নয়ন শুরু হবার পূর্বে যে জনসংখ্যা ছিল তা প্রায় স্বাভাবিক গ্রামীণ জনবসতি হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যে কারণে মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীলতার জন্য ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দকে ভিত্তিসূচক বর্ষ ধরে বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা মহকুমার জনবসতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষি অঞ্চলগুলির মধ্যে ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলেই লোকবসতির ঘনত্ব অধিক। দামোদর অববাহিকায় অবস্থিত থানাগুলিতে বন্যার প্রকোপের জন্য জনসংখ্যার হার ভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চল অপেক্ষা কম। অজয় অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এবং বনভূমি ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জেলার বৃহদায়তন বিশিষ্ট আউসগ্রাম থানা অপেক্ষা পলি গঠিত মঙ্গলকোট থানার জনবসতি অধিক। স্পেটের মতে, জোয়ার, পলি গঠিত ভূভাগ, বন্যার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম প্রভৃতি এমন ভৌগোলিক পরিবেশে জনবসতির প্রবণতা ও ঘনত্ব দেখা যায়।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অবলম্বনে এই জেলার জনবসতির তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, সুনাব্য অথচ বন্যার প্রবণতা না থাকায় ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের থানাগুলিতে দামোদর বা অজয়ের তীরবর্তী থানাগুলি অপেক্ষা জনবসতির হার অধিক।[১৪]

থানা	নদী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যার হার (প্রতি বর্গমাইল)
কাটোয়া	অজয়+ভাগীরথী	১৩১·৩	৯৮০
কালনা	ভাগীরথী	১৩৪·২	৯১০
জামালপুর	দামোদর+কানা দামোদর	১০১·৫	৭৯৮
পূর্বস্থলী	ভাগীরথী	১৩৩·০	৭৮৭
কেতুগ্রাম	অজয়+ভাগীরথী	১৩৭·১	৭১০
মেমারী	গাঙ্গুর+বাঁকা (প্রাচীন দামোদর)	১৬৪·৯	৭০০
মন্তেশ্বর	বাঁকা+খড়ি	১১৭·০	৬৭২
মঙ্গলকোট	অজয়	১৪০·৯	৬৩০
খণ্ডঘোষ	দামোদর	১০০·৫	৬০১
রায়না	দামোদর	১৮৭.১	৫৯৫
বর্ধমান (বর্ধমান শহর বাদে)	দামোদর	১৪৭·১	৫৩০

ভাতাড়	খড়ি	১৬০.০	৫৩০
আউসগ্রাম	অজয়	২৩১.৮	৪০৪

কৃষির উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমাকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল।

উপরোক্ত থানাগুলির জনবসতির ঘনত্বের তুলনামূলক আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেকটি নদার স্বীয় বৈশিষ্ট্যতার জন্য নদীতীরবর্তী প্রত্যেকটি অঞ্চলে জনবসতির পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নদীর গতি প্রকৃতির উপর জনবসতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের বসবাসের ইতিহাসের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ও তার প্রভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলেও বর্ধমান জেলার প্রধান নদী দামোদর, নদীতীরে গ্রাম পত্তনে বারবার বাধা দান করেছে। গ্রামীণ সভ্যতা নদীতীরে গড়ে উঠলেও ঘন ঘন বন্যার প্রকোপে শস্যহানি, প্রাণহানি ও গৃহহীন হয়ে স্থানীয় মানুষ হয়ত গ্রাম ত্যাগ করে নাই, কিন্তু বৃহৎ গ্রাম পত্তনের মূলে প্রয়োজন যে বহিরাগতদের, তারা দামোদরের বন্যায় ভীত হয়ে সযত্নে পরিহার করেছিল দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চল। অন্যথায় দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলি জনবহুল হয়ে উঠত। গলসী, বর্ধমান, রায়না, খণ্ডঘোষ, মেমারী ও জামালপুর থানায় দামোদরের দুই তীরে (বর্ধমান শহর বাদে) জনবসতির ঘনত্ব কম। বৃহৎ গ্রাম নেই বললেই চলে। মোট ৯২টি মৌজার মধ্যে ৪/৫ হাজার লোকবসতি, গ্রামের সংখ্যা মাত্র দুটি। তুলনামূলকভাবে অজয়ের বন্যার প্রকোপ ও ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় অজয়ের তীরে মাঝারি ধরনের গ্রাম পত্তনের হার দামোদর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে অধিক। পক্ষান্তরে ভাগীরথী নদীর বন্যার প্রকোপের স্বল্পতা হেতু ও উর্বর পলি গঠিত চড়া ভূমির জন্য বড় বড় গ্রাম পত্তন সম্ভবপর হয়েছে।[১৫] অন্যদিকে ভাগীরথী ও দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রাম পত্তনের পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, ভাগীরথীর পলিগঠিত ভূভাগে বন্যার প্রকোপ অল্প থাকায় প্রচুর জনবসতি সম্ভবপর হয়েছে। অপর পক্ষে পলি গঠিত ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঘন ঘন বিধ্বংসী বন্যার কারনে দামোদর মানুষকে করে তুলেছে গৃহহারা।

নিম্নে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টের[১৬] ভিত্তিতে (লেখক কৃত) পরিসংখ্যান তালিকা অনুযায়ী ভাগীরথী, অজয় ও দামোদরের তীরে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত গ্রামগুলির জনবসতির সংখ্যা থেকে উপরোক্ত মন্তব্যের (তালিকায় বর্ধমান, কাটোয়া, দাঁইহাট ও কালনা শহরকে বাদ দেওয়া হয়েছে) সমর্থন পাওয়া যাবে।

লোক সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা		
	ভাগীরথী	অজয়	দামোদর
মোট গ্রাম সংখ্যা	৭৩	৪৩	৯৩
১০ হাজারের অধিক	১	—	—

৬০০০ হ'তে ৮০০০	৩	১	—
৪০০০ হ'তে ৫০০০	৭	—	২
২০০০ হ'তে ৪০০০	১৪	৮	১৩
১০০০ হ'তে ২০০০	১৯	১০	৩৯
১০০০ হ'তে কম	২৯	২৪	৩৯

১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বর্ধমান শহরের গোলাপবাগে, বঙ্গের সুধীজন-বৃন্দের সম্মুখে নদীবিধৌত বর্ধমান জনপদের কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা শুনিয়েছিলেন আমাদের পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন—

"গঙ্গা-অজয় সীকর সিক্ত হেথাকার বায়ু সতত বহে।
হেথাকার সাধু কমলেকামিনী হেরে ভীম কালী দহে॥"

কুমুদরঞ্জনের উক্তি শুধুমাত্র কবি কল্পনা নয়—এ উক্তি বর্ধমানবাসীর শ্লাঘার বিষয়। সত্যই একদিন বর্ধমানের নদনদীগুলির কল্যাণে এ জেলার কৃষি ও বাণিজ্যের সার্বিক উন্নতি ঘটেছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত রাজস্বের পরিমাণ ও শরিফাবাদের বলদের আকৃতির বর্ণনা হ'তে কৃষি বিষয়ক উন্নতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।[১৭] আরও বহু পূর্বে হিউয়েন-সাঙের বিবরণে জানা যায় কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের কথা, যার একাংশ ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলায়। তিনি এ রাজ্যকে শস্যে-ফলে-ফুলে সজ্জিত জনপদরূপে বর্ণনা করেছেন।[১৮]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব ইতিহাসে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কৃষি ও শিল্পে বর্ধমানের উন্নতির কথা এবং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির ফলেই বর্ধমান-রাজ সারা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক রাজস্ব দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণী থেকে জানা যায় সারা ভারতের মধ্যে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যে বর্ধমানের স্থান ছিল প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অঞ্চল ছিল মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলা।[১৯] তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে জনবহুল লাঙ্কাশায়ারের জনসংখ্যা ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৪১৬ জন; সেক্ষেত্রে বর্ধমানের জন-সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৬০০ জন।[২০] তবে নদীর নিম্নপ্রবাহে সমৃদ্ধির সাথে সাথে নানাকারণে বিপর্যয়ও আসে, যা বিগত শতকে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় দেখা গেছে[২১]—'In the lower reaches of the rivers, increase of population leads to the construction of embankments, roads, and railways, which facilitate the silting up of river beds and the change of water courses, leaving a legacy of soil exhaustion, water-logging, and fever for the next generation, if it can, to remedy.'

চীনদেশের হোয়াংহো নদীর ন্যায় দামোদরকে "বর্ধমানের দুঃখ" বলা হ'লেও ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদবাহিত পলিরাশি ও জলধারা সিঞ্চনের ফলে

বর্ধমানের কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভার প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ করলেও কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজন হয় উৎকৃষ্ট ধরনের মৃত্তিকার। ভূপৃষ্টের উপর পলির আস্তরণ কোন নির্দিষ্ট নিয়মে ছড়িয়ে পড়ে নাই। সর্বশেষ বন্যার গতি প্রকৃতির উপর এই পলি-বণ্টন ব্যবস্থা নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, নদীখাতের নিকটবর্তী অববাহিকা অঞ্চলে সুক্ষ্ম ও নরম পলির ভাগ থাকে বেশী পরিমাণে এবং দূরতম অঞ্চলে মৃত্তিকা এঁটেল জাতীয় হয়। দেখা যাচ্ছে, দামোদর ও অজয় নদ বাহিত পলি থেকে ভাগীরথী নদীর অবক্ষেপিত পলির উপাদান কিন্তু পৃথক শ্রেণীর।

ভাগীরথী বাহিত পলিতে কাদার ভাগ বেশী থাকায় এই শ্রেণীর মৃত্তিকায় জল ধারণের ক্ষমতাও অধিক। ফলে অল্প শ্রম ও ব্যয়ে এতদঞ্চলে পাট, ধান, ডাল, ইক্ষু ও তরিতরকারীর উৎপাদন হারও অধিক। ভাগীরথী অববাহিকায় আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল উৎপাদনকারী বাগানগুলি থেকে বহুলোক জীবিকা সংস্থান করে থাকে। অপরপক্ষে জেলার মধ্যভাগ দামোদর ও তার শাখা-প্রশাখার পলিতে গঠিত হওয়ায়, মৃত্তিকাতে কাদার ভাগ অল্প এবং ঐ ধরনের মৃত্তিকায় অল্প খরচে আলু, গম, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্য বর্ধমান, মেমারী, রায়না, জামালপুর, কাটোয়া, ভাতাড়, মন্তেশ্বর থানায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। অজয় অববাহিকার মৃত্তিকায় সুক্ষ্ম পলির ভাগ অল্প হলেও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সংমিশ্রণে গঠিত মাটিতে প্রচুর ধান, গম, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি চাষের দ্বারা লোকে জীবনধারণ করে থাকে। তবে কৃষিক্ষেত্রের জন্য এ অঞ্চলে যে অধিক জলের প্রয়োজন হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই দামোদর নদে বাঁধ বেঁধে খাল মারফৎ জল সরবরাহের দ্বারা ব্যাপক হারে দ্বিতীয় দফায় ফসল উৎপন্নের জন্য এ জেলায় কৃষিতে এসেছে বিপ্লব।

দামোদর নদে বাঁধ নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন স্বাভাবিক বন্যার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে, অপর দিকে অনিয়মিত মৌসুমী বায়ুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বর্ধমানের কৃষিজীবীরা। কিন্তু জলাধার ও বাঁধ নির্মাণের ফলে অববাহিকা অঞ্চলের প্লাবন-ভূমিতে বন্যার পলি সঞ্চয় হ্রাস পাওয়ায় বর্ধমানের মৃত্তিকা তার স্বাভাবিক উর্বরতা হারাতে বসেছে। প্লাবনজনিত ক্ষয় ক্ষতির হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে গলসি, খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর প্রভৃতি থানায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু হওয়ায় ঐসব এলাকায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি দীর্ঘকাল ধরে মৃত্তিকায় স্বাভাবিক উর্বরতা বৃদ্ধি না পায় তাহ'লে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা চিরকাল বর্ধমানের শস্য ভাণ্ডার পূর্ণ থাকবে তো? এ বিষয়ে জেলার প্রত্যেকটি থানার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার নমুনা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ করে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সমাধান ও সংশয় দূর করা আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

কৃষি ছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে নদীর অবদান অপরিহার্য। জল-বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের কারণে নদী তীরবর্তী স্থানগুলিতে কলকারখানা স্থাপন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ডি. ভি. সি তার মূল লক্ষ্য জলসেচ ও বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প থেকে সরে এসেছে। জল-বিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে অধিক মূলধন নিয়োগ করে বেসরকারী-সরকারী শিল্প ও 'রেলওয়েজ'কে তোয়াজ করে চলেছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গত ৪০ বৎসরে কর্তৃপক্ষ মাত্র ১৭ হাজার লোককে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, যা মূল লক্ষ্যের অনেক কম।[২২]

এছাড়া সীমিত কয়েকটি অঞ্চলে অবসর সময়ে মানুষ মৎস্য শিকারীতে পরিণত হয়ে জীবিকার সংস্থান করে থাকে। খড়েশ্বরী ও অজয়ের নিম্নাংশে এবং ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে মৎস্যশিকারজীবী বহুলোক বসবাস করে এবং ছোট ছোট খাল ও কাঁদড়গুলিতে এরাই অবসর সময়ে মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আবার নদীকূলেই অনুকূল জলবায়ুর পরিবেশে প্রস্তুত হয় দেশীয় পদ্ধতিতে প্রচুর তাঁত বস্ত্র। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠনের সময় মৎস্যচাষ ও গবেষণাগারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

বর্ধমান জেলার নদীতীরবর্তী কয়েকটি স্থান এক সময়ে অন্তর্দেশীয় বন্দর রূপে চিহ্নিত হয়েছিল, যথা—বর্ধমান, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা, নাদনঘাট ও নূতনহাট। আজ নদীখাত শুষ্ক, স্বভাবতই ঐ কারণে ঐগুলি আজ তাদের প্রসিদ্ধি হতে বঞ্চিত। অবশ্য স্থলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির মূলে জলপথের অবনতির আর একটা পরোক্ষ কারণ হিসেবে ধরা যায়। নূতনহাট, কাটোয়া, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, পূর্বস্থলী, কালনা, শাদিপুর, জুজুটি, কষ্ঠগোলার ঘাট, কসবা, সিলামপুর, ডিসেরগড় প্রভৃতি স্থানের অসংখ্য ফেরীঘাটে দেশী নৌকায় খেয়া পারাপারের দ্বারা আজও বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বর্তমানে কাটোয়া ও কালনায় যন্ত্রচালিত নৌকার প্রচলন দেখা দিয়েছে। কিন্তু শতজীর্ণ নৌকা ও কর্দমাক্ত ফেরী-ঘাটগুলিতে যাত্রীদের যে অসুবিধা ভোগ করতে হয় তার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। জেলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সময় এই ধরনের অসুবিধাগ্রস্ত ও বিপজ্জনক ফেরীঘাট যাত্রীদের দুরবস্থা দেখার দুর্ভাগ্য অনেক হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর অজয় ও দামোদরের জলপথে কলিকাতায় কয়লা আমদানী করা হত। উলুবেড়িয়া হতে মেদিনীপুর পর্যন্ত একদা একটি দীর্ঘ খাল খননের ফলে দামোদরের সঙ্গে ভাগীরথীর যোগাযোগ আরও কাছাকাছি হয়ে পড়েছিল। এক সময় বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলের বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দামোদরের বুকে ভাসিয়ে কলিকাতায় নিয়ে আসা হত। অনুরূপভাবে রানীগঞ্জের কয়লা অজয়ের

পথে ছোট ও মাঝারি ধরনের দেশী নৌকায় কাটোয়ায় জমা করে, অতঃপর বড় বড় স্টিমারযোগে কলিকাতায় চালান দেওয়া হ'ত। নদীতে নাব্যতা না থাকায় বর্তমানে জালবোনা ও কাঠের কাজ দ্বারা যারা কর্ম সংস্থান ও জীবিকা নির্বাহ করত, তারা কৃষিকার্য বা চাকরিতে কর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বহুল প্রচারিত ও প্রস্তাবিত দামোদরের নৌযোগ্য খালটি বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিক্ষেত্র নষ্ট করে খনন করা হয়েছিল এবং ঐ খালের কঙ্কালস্বরূপ তার শুষ্ক খাতটি আজ কর্তৃপক্ষকে যেন বিদ্রূপ করছে।

বর্ধমান জেলার নদী তীরবর্তী বিশাল বিশাল গোচারণ ক্ষেত্রগুলিতে একদা গোপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল। ফলে এ জেলায় অতীতে প্রচুর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন হত। মানকরে একটা প্রবাদ আছে—

"পরে তসর, খায় ঘি
তার আবার খরচ কি!"

বর্তমানে কৃষিক্ষেত্র বর্ধিত হওয়ায় গোচারণ ক্ষেত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়েছে ; ফলে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এখনও এ জেলার পূর্ব ও মধ্যাঞ্চল গোপ প্রধান। আউসগ্রাম, ভাতাড়, মেমারী, মন্তেশ্বর, মঙ্গলকোট, কাটোয়া, কালনা অঞ্চলের নদীতীরবর্তী স্থানগুলিতে হাজার হাজার গরু বিচরণ করে থাকে। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায় এই জেলায় মিষ্টান্ন শিল্পের প্রসার অতীতেও ছিল—আজও আছে।

সাহিত্যে বর্ধমানের নদী :

মধ্যযুগে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ধমান জেলার নদ-নদীর পরিচিতি ও প্রসিদ্ধির বিষয় জানা যায়। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' ও 'ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ডে' অজয়, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা, বেহুলা, গঙ্গা, দ্বারকেশ্বর, সরস্বতী, শিলাবতী প্রভৃতি নদনদীর উল্লেখ থাকলেও বর্ধমান জনপদের আয়তন হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে সরস্বতী ও শিলাবতী ভিন্ন জনপদের নদী এবং বকুলা নাম্নী নদীটির কোন পরিচয়ই জানা যায় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রাণী জনপদ যে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বর্ধমানের কবি কাশীরাম দাস ঐ জনপদের অন্তর্গত বার হাট ও তের ঘাটকে প্রবাদবাক্যে গেঁথে রেখেছেন। বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়' কাব্যে উজানী, শাঁখাই, কাটোয়া, ইন্দ্রাণী, অম্বুয়া প্রভৃতি প্রচীন গ্রাম-গঞ্জের উল্লেখ আছে। কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র রচিত 'বাসুলী মঙ্গল' কাব্যে দামোদর ও কানা দামোদরের তীরবর্তী বর্ধমান, বড়সোউল, আমদহ, বেউরগ্রাম, হিরণ্যগ্রাম, মউলা, জাড়গ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু স্থানের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দামোদর, বাঁকা, বেহুলা ও গাঙ্গুর নদীর তীরে অবস্থিত দুবরাজপুর, নবখণ্ড,

জুজুটি, বর্ধমান, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, দেপুর, আমাদপুর, গেগরঘাটা, বোয়ালিয়া, হাসানহাটী, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর প্রভৃতি প্রাচীন স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, বল্লুকা বা ভল্লুকা নদীর তীরে উল্লুক বাহনসহ ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর "শ্রীধর্মমঙ্গল" কাব্যে লাউসেনের ময়নাগড় থেকে গৌড় পর্যন্ত স্থলপথে যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গার জলের ন্যায়, ধর্মঠাকুরের উপাসকগণের কাছে দামোদরের জলের পবিত্রতাকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীধর্মমঙ্গলে (পৃঃ ২০২) আছে—

"অশেষ পাতক হরে পায় ব্রহ্মপদ।
ভুবনে বিখ্যাত এই দামোদর নদ॥"

মাণিক গাঙ্গুলীও তাঁর ধর্মমঙ্গল (পৃঃ ৪২৪) কাব্যে—'আন্দের গঙ্গা দামোদর' বা অজয় নদের তীরে ঢেকুরগড়ে লাউসেন শিবির স্থাপন করে—"লঙ্কায় বসিলা যেন দাশরথি রাম", ইত্যাদি উল্লেখ করতে ভুলেন নাই। বিপ্রদাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, নিরঞ্জনের পূজার উদ্দেশ্যে শিব বল্লুকার তীরে পূজার সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের রচনায় মধ্যযুগে বর্ধমানের গ্রাম-গঞ্জ, নদনদীর পরিচয় ও বণিকগোষ্ঠীর বাসস্থান সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তা থেকে এই জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত হতে পারে। মুকুন্দরাম ছিলেন স্থানীয় কবি এবং তাঁর শক্তিশালী লেখনীতে তৎকালীন দেশ ও সমাজের পরিচয় জানা যায়। ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি অজয় ও ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ডুমুরদহ, উজানী, চাকন্দা, কুমারখালা, থানাঘাট মৌনা, গড়পাড়া, হুসনপুর, দৌলতপুর, কাঁকড়া, খাকসা, গাঙ্গবাডা, কুলীনপাডা, বেলেডা, চরকি, অঙ্গারপুর, রসুই, সোনালিয়া নবগ্রাম, শাঁকাই, উদ্ধারণপুর, নৈহাটী, ইন্দ্রাণী, কাটোয়া, ললিতপুর, ভাউসিংহ, মেটেরি, বেলনপুর, চণ্ডীগাছা, পূর্বস্থলী, নদীয়া, পাড়পুর, সমুদ্রগড়, অম্বুয়া প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করেছেন। সেকালে সদাগরদের বাণিজ্যযাত্রা বিরতির সময় দহ বা নদীর হ্রদাকৃতি অংশে নৌকা ডুবিয়ে রাখার রীতি ছিল, যা আধুনিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে পোতাশ্রয়। চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

"পূর্ব্ব হতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরি লইয়ে সাধু গেল তার কূলে॥"

মুকুন্দরামের বর্ণনায় বণিকগণের বসবাসের স্থানসমূহ, যথা—বর্ধমান, চম্পাইনগরী, কর্জনা, দশঘরা, সপ্তগ্রাম, সাঁকো, কাইতি, জাড়গ্রাম, তেঘরা, ত্রিবেণী, পাঁচড়া, বিষ্ণুপুর, খণ্ডঘোষ, গোতান প্রভৃতি গ্রামগুলি ছিল নদীতীরে অথবা নদীর অতি সন্নিকটেই। বেশ বোঝা যায়, বণিকগোষ্ঠীর উজানী, বর্ধমান, চম্পাইনগরী

ও সপ্তগ্রাম অঞ্চলকে ঘিরে বসবাসের অর্থ হল, তৎকালীন বর্ধমান জনপদের শ্রীবৃদ্ধি। এছাড়া নদী তীরবর্তী জৌগ্রাম, শ্রীবাটী, সাতগাছিয়া প্রভৃতি গ্রামে বণিককুলের বসবাসের তথ্য পাওয়া যায়। চণ্ডীদেবীর আদেশে ধনপতি ও শ্রীমন্তের যাত্রাপথে নদনদীসমূহ সম্মিলিতভাবে মগরায় সমবেত হয়, যা থেকে এই বিবরণে রাঢ় অঞ্চলের নদনদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও অবশ্য এর মধ্যে কয়েকটির অস্তিত্ব বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে। কবি বর্ণিত 'মগরা' বর্তমান সাগর-দ্বীপের উত্তরাংশ, যেখানে আদি গঙ্গার খাতে ভাগীরথী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। মুকুন্দরামের সমসাময়িক দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডী গীতিতে অজয়-ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত গ্রাম নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আরও পরবর্তীকালে দ্বিজ রঘুনন্দন (পঞ্চানন্দ মঙ্গল), কবি বিজয়রাম গুপ্ত (তীর্থমঙ্গল), রেভাঃ লঙ্ (On the Bank of Bhagirathi), উইলিয়াম কেরী (Missionary Tour through Hooghly & Howrah), ভোলানাথ চন্দ (Travel of a Hindoo) প্রভৃতির রচনায় অন্যান্য স্থানসহ কালনা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের উল্লেখ আছে এবং ঐ সঙ্গে আরও জানা যায়, কালনার গোকুলগঞ্জে, কাটোয়ার গোলগঞ্জে ও দাঁইহাটের দেওয়ানগঞ্জের বিখ্যাত বাজারে পাথরের মূর্তি, রেশমবস্ত্র, কাঁসা-পিতল দ্রব্য, চাল, গুড়, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হত। উইলিয়ম কেরীর বিবরণে জানা যায়, ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে পূর্বস্থলীর উত্তরে ভাগীরথীর নাব্যতা এমনভাবে হ্রাস পেয়েছিল যে, কোন মাঝারি ধরনের নৌকায় যাতায়াত করা একান্তই বিপজ্জনক ছিল। 'তীর্থ-মঙ্গলে' আছে, ১১৭১ বঙ্গাব্দে গোপীনাথ বিগ্রহ অগ্রদ্বীপে ছিল না। নদীপথেই সেটি নবকৃষ্ণ মুন্সীর কলিকাতাস্থ বাসভবন শোভাবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[২৩]

নদী শাসন ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ :

উনবিংশ শতক হতে বিংশ শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন নদী বিশেষজ্ঞগণ দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে বহু পরামর্শ দিলেও বিদেশী শাসকেরা সেসব পরামর্শ ও সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করেনি। ঐ সময় কানানদীর খাতে হুগলী জেলা, জামালপুর থানা ও বর্ধমান শহরে পানীয় জল সরবরাহ ও ইডেন খাল খনন ছাড়া তাঁরা কিছুই করেন নাই। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যার ফলে ইংরাজ সরকারের চৈতন্যোদয় হয়, যখন দেখা গেল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও পূর্ব রেলপথের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকাল। এই ভয়াবহ বন্যায় কলিকাতার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে খাদ্য ও সৈন্য প্রেরণে বিঘ্ন ঘটায় জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে তখন রাজপথ ও রেলপথ মেরামতের কাজ

সম্পূর্ণ করা হয়।

সাময়িক প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে ডঃ মেঘনাদ সাহা, নলিনীকান্ত বসু প্রমুখ দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল কমিটি ও বন্যা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে আমেরিকার টেনিসী ভ্যালি অথরিটির অনুরূপ দামোদর অববাহিকা উন্নয়নের জন্য বহুমুখী নদীপরিকল্পনা কার্যে রূপায়ণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় টেনিসী ভ্যালি অথরিটির বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার W. D. Voorduin ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে সরেজমিনে তদন্ত করে এক বিস্তারিত রিপোর্টে তাঁর সুপারিশ পেশ করেন।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমদায়িত্বে সংসদে এক আইন বলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি. ভি. সি) বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 'The dream child'-এর সৃষ্টি হল এবং মিঃ ভুরডুইন নিযুক্ত হলেন প্রধান পরামর্শদাতা।

দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্মাণ দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কিন্তু ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের বন্যার পর নানাভাবে চিন্তা করা হয়েছিল। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে লেঃ গারনণ্ট ও ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে লেঃ হয়ওয়ার্ড জলাধারসহ বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে মিঃ হর্ণ প্রস্তাব করেছিলেন বরাকর-দামোদর সঙ্গমের কিছু আগেই জলাধারসহ বাঁধ নির্মাণ করা হোক। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যার পর মিঃ অ্যাডাম উইলিয়াম সুপারিশ করেছিলেন তিলাইয়ার নিকটবর্তী আরও একটি বাঁধ নির্মাণের। ১৯১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দে মিঃ গ্লানের সুপারিশে দেখা যায় দামোদরের উপর পারজোরি, বরাকর নদের উপর পালকিয়া ও উশ্রির উপরে চিত্রায় বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে।[২৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দামোদরের উপর বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা কেবলমাত্র ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যার পর করা হয় নাই। পূর্বে যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ব্রিটিশ সরকার কার্যকর তো করেন নাই বা কোন চেষ্টা ছিল বলেও মনে হয় না। কিন্তু এই বন্যার (১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে) ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করে ও বন্যায় কলিকাতা শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বিদেশী সরকারের টনক নডতে বাধ্য হয়েছিল। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশে ১০টি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব গেলেও শেষ পর্যন্ত ভুরডুইনের সুপারিশ মত ৮টি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের স্থানগুলি ছিল—বরাকরের উপর তিলাইয়া, দেওলহরি (বেলপাহাড়ি) ও মাইথনে, দামোদরের উপর আইয়ার, সোনোলাপুর (পাঞ্চেতের কাছে) ও বেরমোতে, বোকারো নদীর উপর বোকারোতে ও কোনার নদীর উপর কোনারে। সমস্ত বাঁধগুলি নির্মিত হলে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে অভাবনীয় ফল দেখা দিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন সরকারের পরস্পর অসহযোগিতার জন্য

এবং শেষ অবধি মূলধনের অভাবে তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেৎ ও কোনারে চারটি জলাধারসহ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বোকারো ইস্পাত কারখানায় জল সরবরাহের জন্য বিহার সরকার তেনুঘাটে একটি জলাধার নির্মাণ করে এবং বেলপাহাড়িতে আরও একটা জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

ডি. ভি. সি সৃষ্ট হওয়ার পর এই সংস্থার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থাকলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় বন্যার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং পূর্বের ন্যায় এত ঘনঘন বন্যার প্রকোপ এ সকল অঞ্চলে দেখা দেয় না। দুর্গাপুরে ব্যারেজ নির্মাণের ফলে একটা বিরাট অঞ্চল কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। ডি. ভি. সি কর্তৃক প্রায় ৩০০০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের সেচ খাল খননের ফলে প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর একর জমিতে জলসেচ করা বর্তমানে সম্ভবপর হচ্ছে; যদিও প্রস্তাবিত সেচ এলাকার পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ হেক্টর একর।

এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচ হলেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। বাঁধগুলির পিছনে জলাধারে প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চয় করে লক গেটের সাহায্যে নদীর জলস্রোত বজায় রেখে লক গেটের নিম্নে টারবাইন স্থাপন করে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া ঐ প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহ, নৌ-চলাচল, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, ভূমিক্ষয় নিবারণ, মৎস্য চাষ, বিশ্রামাগার প্রভৃতি নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। দুর্গাপুরে তৈরী হয়েছে ৬৯২ মিটার লম্বা ও ১১·৫৮ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যারেজ। মোট কথা ডি. ভি. সি-র বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সুফল-কুফল থাকা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে এই সংস্থা স্থাপনের ফলে বর্ধমান ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি সহ বিহার রাজ্যের একটা বড অংশ কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছে। ভবিষ্যতের আরও উন্নয়নের সবটাই নির্ভর করছে জলাধার ও বাঁধগুলির স্থায়িত্বের উপর। সুতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যতে দামোদর নদের বাঁধগুলি যে বর্ধমান জেলার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ, সেকথা অস্বীকার করা চলে না। সেজন্য পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যই আজ আমাদের পাথেয় স্বরূপ—"It is one of our great national schemes and so we can well congratulate the nation on it."।

ভাগীরথী, দামোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বর নদের উপর সেতুগুলি নির্মিত হওয়ায় এই জেলার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দ্রুত গমনাগমন ও মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে সড়ক পথের সঙ্গে বড় বড় নদীর উপর সেতু নির্মাণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের উপর সদরঘাটের সেতু, চরকি (কাটোয়ার

৭ কিঃমিঃ পশ্চিমে) ও ইলামবাজারে অজয়ের উপর সেতু, খড়ির উপর মন্তেশ্বর ও নাদনঘাটের সেতু ও নবদ্বীপে ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণের ফলে এক কথায় বর্ধমান জেলার সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এছাড়া নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় হুগলী সেতু, বাঁশবেড়িয়ার সেতু ও হাই-ওয়েটি নির্মিত হলে কলিকাতাসহ চব্বিশ-পরগণা জেলার সঙ্গে বর্ধমান জেলার শিল্প অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থায় প্রচুর উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু সড়ক পথে দ্রুততা আনতে গেলে আরও কয়েকটি সেতু নির্মাণের প্রয়োজন; কারণ রাস্তাঘাট থাকা সত্ত্বেও সেতুর অভাবে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি প্রান্তের জনসাধারণকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করতে হয়। সে কারণে অন্ততঃপক্ষে মঙ্গলকোট ও মাতলার (ভেদিয়ার উত্তরে) নিকট অজয়ের উপর এবং জামালপুরে দামোদরের উপর সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দেখা দিয়েছে। তবে সেতু নির্মাণের সময় কর্তৃপক্ষকে নদী গর্ভে থামগুলি প্রোথিত করার সময় সজাগ থাকতে হবে এবং যত কম সংখ্যক থামের ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল, নচেৎ সেতু এলাকার উর্ধ্বাংশে পলিসঞ্চয় জনিত কারণে নদী গর্ভ ভরাট হলে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

অজয়, ভাগীরথী, দামোদর, খড়ি ও অন্যান্য ছোট নদীর তীরে অসংখ্য ফেরীঘাটে দেশী নৌকায় যাত্রী পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ফেরীঘাটগুলি কর্দমাক্ত থাকায় যাত্রী ও মাল পারাপারের সময় আরোহণ ও অবরোহণ কালে যে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে হয় তা ভুক্তভোগীমাত্রই অবগত আছেন। ফেরীঘাটগুলির মধ্যে যেখানে যাত্রীর চাপ অধিক ও নদীতে জলের গভীরতা আছে সেখানে যাত্রীদের স্বার্থে জেটী নির্মাণ করে যন্ত্রচালিত নৌকা ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে যে, বর্ধমানের নদ-নদীগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে এ জেলার প্রাণস্বরূপ। এই জেলার খাদ্য শস্য উৎপাদন, পরিবহণ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীগুলির অবদান এবং জন-বসতির উপর যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দামোদর ও তার প্রধান শাখা মুণ্ডেশ্বরী ব্যতীত অন্যান্য নদীনালার ক্ষেত্রে চরম ঔদাসিন্যের ফলে সেসব নদীগুলি আজ শুষ্ক অথবা বর্তমানে লুপ্ত খাতে পরিণত হয়েছে। কেবলমাত্র বর্ষাকালেই সেগুলির রূপ বোঝা যায়। অজয়ের জলধারাকে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই বললে চলে। এই জেলার নদ-নদীর বিষয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে, সর্বপ্রথমে ভাগীরথী-অজয় সঙ্গমস্থলে অজয়ের মোহনায় ও সেটির অনতিদূরে ভাগীরথীর খাত মধ্যস্থ উদীয়মান চড়া দুটির অপসারণ আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছে। অন্যথায় ঐ ক্রমবর্ধমান চড়া দুটি ভবিষ্যতে আরও উন্নীত হলে তখন বাঁধ দেওয়া সত্ত্বেও কাটোয়া শহরের দিকে ভাঙ্গন ধরার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোন

বড় আকারের বন্যার সময় কাটোয়া সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ প্লাবিত হবার আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাটোয়ার পশ্চিমে বেগুনকোলা ও সুনিয়া নামক গ্রাম দুটি ইতিমধ্যেই বর্ষার সময় প্রায় দ্বীপাকারে বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

খাল বা কাঁদড়গুলির প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ঐগুলি সংস্কার এবং নিম্ন অববাহিকায় বাঁধ দিয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজের অতিরিক্ত জল যদি সেচের জন্য পাঠান হয়, তাহলে রবি মরশুমে চাষের বিশেষ সুবিধা হতে পারে। কাটোয়ার ঘোষহাট ও অগ্রদ্বীপের দশ দুয়ারী বাঁধ থেকে ভাগীরথীর জলকে ঐ অঞ্চলের শুষ্ক খাত দুটি সংস্কার করে প্রবাহিত করলে ভাগীরথীর জলধারা ব্রহ্মাণীর খাত হয়ে খড়ি নদীকে জলধারা পুষ্ট করে পুনরায় ভাগীরথীতে মিশবে। এর ফলে এক বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীগণ যে চাষবাস, নৌ চলাচলের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নাই। খড়ি ও বাঁকার মিলিত ধারার সঙ্গে বেহুলা ১নং খাতের পথে ভাগীরথীর জলধারা প্রবাহিত হলে এবং বল্লকা নদীর সঙ্গে মিলন ঘটালে ভাগীরথীর জলধারায় কালনা ও বলাগড থানায় ব্যাপকহারে রবিশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে, দেবখালের সংস্কার সাধন করে দামোদরের জল যদি দামোদরেই প্রবাহিত করে দেওয়া হয় তাহলে খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানার উত্তরাংশ যে উপকৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে নদী খাতের নিম্ন অঞ্চলে রিভার পাম্প ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট জোর দিতে হবে।

পরিত্যক্ত নদী খাত হ'তে সৃষ্ট বহু বিল বা জলার অস্তিত্ব রয়েছে জেলার পূর্ব অঞ্চলে, যেখানে খালপথে দুর্গাপুর ব্যারেজের জল পৌঁছায় না। সে কারণে ঐ পরিত্যক্ত নদীখাত সৃষ্ট বেতের বিল, কয়ান বিল, পদ্মা বিল, সানতের বিল, চাঁদের বিল, শালকোনা বিল, প্রভৃতি বিলগুলির সংস্কার সাধন করা হলে বর্ষার জল ঐ সকল জলাধারে সঞ্চিত হবে। সেই দিক দিয়ে রিভার পাম্পের সাহায্যে এক-দিকে রবিশস্যসহ খরায় ধান চাষ সম্ভবপর হবে এবং অপরদিকে ক্রমবর্ধমান মৎস্য-চাহিদার যোগানের নিমিত্ত উন্নত ধরনের মৎস্য চাষ প্রকল্প জনপ্রিয় হতে পারে। প্রধানতঃ পূর্বস্থলী, কালনা ও মন্তেশ্বর থানায় অবস্থিত বিলগুলি সংস্কার সাধন করে মৎস্য চাষ ও সেইসঙ্গে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নত ধরনের মীনক্ষেত্র সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে। এই কার্যে নিযুক্ত স্থানীয় লোকেরা যেভাবে আর্থিক ও কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সুবিধা লাভ করবে, সেটা কিন্তু মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। অগ্রদ্বীপ ছাড়িয়ে আরও পূর্বে ভাগীরথীর প্রবাহ-পথ যে ভাবে পাটুলী ও পূর্বস্থলীসহ নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তুলছে, তাতে আশঙ্কা করা যায়, যে কোন বড় প্লাবনে ভাগীরথী তার প্রাচীন প্রবাহপথে নূতন ভাবে প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের বন্যার গতি প্রকৃতি দেখে মনে হয়েছিল যে নদী তার প্রাচীন প্রবাহপথকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দামোদর ও বর্ধমানের বন্যা :

দৈর্ঘ্যে অল্প হলেও দামোদর নদ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের অর্থনীতিতে এত অধিক প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, নদীর খ্যাতি শুধু সারা ভারত কেন পৃথিবীর আরও কয়েকটি বিশেষ দেশে পেঁাছেছে। বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত দ্বিতীয় বৃহত্তম দামোদর নদ জেলার কৃষিতে শুধু বিপ্লবই আনেনি, সেইসঙ্গে বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' এটি মহাগৌরী নামে উল্লেখিত।[২৫] ডঃ আলির মতে বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্ম পুরাণে উল্লিখিত মহাগৌরী, দামোদরেরই নামান্তর।[২৬] অরিয়নের বিবরণে আছে Andomatis নদী Madyandinoi জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উইলফোর্ডের মতে, এটি দামোদরেরই নামান্তর।[২৭] ক্ষেত্রসমাসে বর্ণিত বেদস্মৃতি বা বেদবতী নদীকে উইলফোর্ড দামোদর নামে সনাক্ত করেছেন এবং তাঁর মতে পার্বত্য অঞ্চলে এটিই দেবানন্দ নামে পরিচিত।[২৮] বিহার রাজ্যে পালামৌ ও হাজারিবাগ জেলার আদিবাসীদের কাছে এর নাম 'দামুদা'। 'দামু' শব্দের অর্থ পবিত্র এবং 'দা' শব্দের অর্থ জল; অর্থাৎ হিন্দুদের নিকট গঙ্গা-ভাগীরথীর ন্যায় ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে এটি পবিত্র জলের নদী। উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী, যথা—সাঁওতাল, মুণ্ডা. কুরমি, ভুমিজ, বেদিয়া, লোহার, কুম্ভার প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকেরা দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কোনার, রামগড়, রাজরাপ্পা, তেলকুপী প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘাটে, পূর্বপুরুষদের অস্থি বিসর্জন দিয়ে থাকে।[২৯] দামুদা নাম হতে দেওনদ এবং সেটি সংস্কৃতে দেবনদ বা দামোদররূপে পরিচিত হয়েছে। দেবনদের নাম একালেও লুপ্ত হয়ে যায় নাই; রায়না-জামালপুর থানায় প্রবাহিত দেবখালটি যে সেই দেবনদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে—এমন অনুমান করা যায়।

ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে পালামৌ জেলার ঘুড়ী রেলষ্টেশনের কয়েক মাইল পশ্চিমে ও টোরির নিকটে খামারপত (২৩°৩৭´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৪°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) নামক ১০৬৭ মিটার উচ্চ গিরিশৃঙ্গ থেকেই দামোদর নদের উৎপত্তি। খামারপত ও বীরজংগা পাহাড়ে বৃষ্টির জলে সৃষ্ট "সোনা জুড়িয়া" প্রস্রবণই হল দামোদর বা দেওনদের উৎপত্তিস্থল। 'ধর্মমঙ্গলে' এটি দেবনদ নামেই উল্লিখিত।

উৎসস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত দামোদরের মোট দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিলোমিটার; তন্মধ্যে বিহার রাজ্যের অংশে ২৮৭ কিঃমিঃ ও পশ্চিমবঙ্গের অংশে নদীখাতের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ২৫৪ কিঃ মিঃ। এখন দামোদরের বর্তমান প্রবাহপথটিকে যদি তিন অংশে ভাগ করা যায়, তাহলে সেই তিনটি হল, (১) উৎপত্তিস্থল হ'তে বরাকর-দামোদর সঙ্গমস্থল, (২) বরাকর-দামোদর সঙ্গমস্থল হ'তে বড়গুল, ও (৩) বড়গুল হ'তে ভাগীরথী-দামোদর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত। পার্বত্য অঞ্চলে স্বভাবতই

দামোদরের উপত্যকা বেশ উঁচু; এই অঞ্চলে নদী প্রথমাবস্থায় ৬০০ মিটার উচ্চ অববাহিকায় প্রবাহিত হওয়ার পর ভূভাগের উচ্চতা ৫০০ মিটার হ'তে ২২৫ মিটারে নেমে এসেছে এবং সেইসঙ্গে পার্বত্য উপনদীগুলির জলধারায় পুষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে দামোদরের মোট অববাহিকার আয়তন ২৪,২৩৫ বর্গকিলোমিটার, যার দুই-তৃতীয়াংশ বিহার রাজ্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলা নিয়ে গঠিত। উৎসস্থল হতে ২৪০ কি:মি. পার্বত্য প্রবাহে নদীর ঢালের গড় প্রতি কিলোমিটারে ৬ ফুট এবং পরবর্তী ১৬০ কি:মি: প্রবাহ পথে ঢালের গড় প্রায় ২ ফুট।

সমভূমিতে ১৪১ কি:মি: প্রবাহপথে ঢালের গড় প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ৮ ইঞ্চি। দামোদর উপত্যকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৬'৫ ইঞ্চি এবং মোট বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশ জুন মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে হয়। ফলে নিম্ন প্রবাহে নদীখাতে ঢালের স্বল্পতা হেতু অতি বৃষ্টিতে জলধারা সহজে নদীখাত দিয়ে নিষ্কাশিত হয় না। পার্বত্য প্রবাহে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে জল দ্রুত সমভূমির খাতে সঞ্চিত হওয়ার কারণে বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায়ই বিধ্বংসী বন্যার কবলিত হয়ে পড়ত এবং সেজন্যই দামোদর নদ আখ্যা পেয়েছিল, "বর্ধমানের দুঃখ"।

দামোদরের প্রবাহপথের আলোচনা করে জানা যায় যে, অজয় নদের অববাহিকা অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র বর্ধমান জেলায় শাখা প্রশাখা সহ দামোদর নদের খাতগুলি ছড়িয়ে আছে এবং জেলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাংশে ব-দ্বীপ গঠনে সহায়তা করেছে। জল-বিজ্ঞানীদের মতে নিম্নগতিতে প্রবাহিত দামোদর সুপ্রশস্ত, ধীরবহ ও ব-দ্বীপিয় নদীতে পরিণত হয়েছে এবং পানাগড হতে শক্তিগড় পর্যন্ত অঞ্চলে নদীখাতের প্রস্থ হয়েছে অধিকতর বিস্তৃত। এই অংশে পলি জমে বড বড় চডার সৃষ্টির ফলে সহজেই প্লাবন দেখা দিত। সে কারণে পানাগডের নিকট রণ্ডিয়ায় বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের যে প্রচেষ্টা হয়েছে তার ফলে নদীখাত হয়েছে আরও উঁচু। অথচ ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই জলপথে রানীগঞ্জের কয়লা ও বনভূমির কাঠ কলিকাতায় নৌকাযোগে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল।

দামোদর বাহিত পলিতে বর্ধমান জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে। বর্ধমানকে শীর্ষবিন্দু ধরে পূর্বে কালনা ও দক্ষিণে হুগলী নদীর মোহনা পর্যন্ত এই ব-দ্বীপের বিস্তৃতি। প্রত্যক্ষভাবে সামুদ্রিক প্রভাব না থাকায় এটিকে আভ্যন্তরীণ ব-দ্বীপ বলা হয়। বিগত প্রায় দু'শ বছর ধরে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে দামোদর নদের ব-দ্বীপ গঠনের কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।[৩০] পরবর্তীকালে ভাগীরথীবাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে পূর্বোক্ত ব-দ্বীপের স্বাভাবিক ঢালের প্রান্ত বিন্দুসমূহের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূ-প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীও বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত।

দামোদরের প্রবাহপথের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন সময়ে বহু পরিবর্তিত গতিপথ আজ শুষ্ক। লুপ্ত খাতসহ প্রাচীন দহগুলি নদীর সেই প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করে। অবশ্য সেচ বিজ্ঞানীগণ গতিপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পরস্পর বিরোধী। বিখ্যাত সেচ বিজ্ঞানী উইলিয়ম উইলকক্সের মতে দামোদর নদ ভাগীরথী অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁর মতে বিহার রাজ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বমুখে প্রবাহিত খাতটি বর্ধমান, কালনা, কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ, রাণাঘাট হয়ে যশোরে সাগর সঙ্গমের সৃষ্টি করেছিল।[৩১] পরবর্তীকালে ভাগীরথীর প্রবাহ দামোদরকে দ্বিখণ্ডিত করে পূর্ব ভাগ যমুনা ও পশ্চিম ভাগ দামোদর (গাঙ্গুরের খাত) নামে পরিচিত হয়। আরও পরে সরস্বতীর ধারা তাম্রলিপ্তের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল অর্থাৎ সরস্বতীর খাতে ভাগীরথীর জলধারা সাগরে মিশেছিল এবং ভাগীরথী পূর্বদিকে সরে যাওয়ার পরে সরস্বতী ধারা প্রবল ছিল।[৩২] সরস্বতীর সঙ্গমস্থল আরও উত্তরে সরে যাওয়ায় ঐ শুষ্ক খাতে দামোদর প্রবাহিত জলপ্রবাহ কানা, কুন্তি ও মগরা খালের মারফত নয়া-সরাই-এর কাছে ভাগীরথীতে পড়েছিল। রেনেলের মানচিত্রে এ ধারাটির স্পষ্ট নির্দেশ আছে। উইলকক্স আরও মন্তব্য করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীর সৃষ্টি হওয়ার পিছনে প্রকৃতির অবদান অপেক্ষা মানুষের হাত ছিল অধিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট কাটা খাল থেকে অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু দামোদরের বেলায় এ যুক্তি টেকে না। কারণ প্রাচীন খাতের বালির নমুনা সংগ্রহ করে অধিকাংশ জলবিজ্ঞানী এই মতের বিরোধিতা করেছেন।

কোন কোন জলবিজ্ঞানীর মতে দামোদর নদ প্রথমে বর্ধমান শহর অতিক্রম করে কাটোয়ার পথে প্রবাহিত হত।[৩৩] মনে হয় খড়ি বা খড়্গেশ্বরীর খাত ধরে দামোদরের জলধারা প্রবাহিত হ'ত এবং এই প্রাচীন খাতের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল বাণেশ্বর ডাঙ্গা যেখানে তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৩৪] খড়ি নদীর নিম্নপ্রবাহে সুপ্রশস্ত খাত দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে অতীতের কোন বড় নদীর খাতের উপর খড়ি প্রবাহিত হয়েছে! মনুষ্য সৃষ্ট বাঁধ নির্মাণের ফলে ও বর্ধমান শহরের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য, বাঁকা, গৌরী ও খড়ি নদীকে খালের দ্বারা একদা যোগসূত্রে স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল।[৩৫] কপিল ভট্টাচার্য্যের মতে বেহুলা, বাঁকা ও খড়্গেশ্বরী—এই নদীগুলির গতিপথ পশ্চিম হ'তে পূর্বদিকে ভাগীরথীর অস্তিত্বের পূর্বেই প্রবাহিত ছিল।[৩৬] দামোদরের খাতে অপ্রতুল জলপ্রবাহ ও নদীখাতে ঢালের অগভীরতার জন্য নদীর গতিপথ বারংবার পরিবর্তিত হয়ে কাটোয়া হতে কালনায় ভাগীরথী-দামোদরের সঙ্গমস্থলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে ত্রিবেণী, উলুবেড়িয়া ও বর্তমান সঙ্গমস্থলে এই খাত পরিবর্তনের চিহ্ন আজ সুস্পষ্ট।[৩৭]

দামোদরের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন সময়ে উত্তরে

খড়ি নদীর খাত থেকে দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত সমস্ত লুপ্ত ও প্রবাহিত খাতগুলি দামোদরের ধারা পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধারা পরিবর্তনের কারণে নদীর উপর মানুষের হস্তক্ষেপকে প্রবল বন্যার জন্য দায়ী করা হয়। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বন্যার কারণে বর্ধমান জেলা ২৭ বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৩৮] ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৪৮, ১৮৫০, ১৮৫৫, ১৮৫৬, ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮২, ১৮৯০, ১৮৯৮, ১৯০০, ১৯০১, ১৯০৫, ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২১, ১৯২৩, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৪৩, ১৯৫৬, ১৯৭৮ ও ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের বন্যার মধ্যে ১৭৭০, ১৮২৩, ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৯১৩, ১৯৩৫, ১৯৪৩, ১৯৫৬ ১৯৭৮ ও ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের বন্যার ধ্বংসলীলার আকার ছিল ভয়াবহ। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের বন্যা ছাড়া প্রত্যেকটি বন্যার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হাত ছিল।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্যার ফলে দামোদরের দক্ষিণমুখী আমতার খাতের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ সদস্যবৃন্দ বর্ধমান শহরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের বন্যার পর বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে সেটি দ্রুত রূপায়ণের চেষ্টা হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সঙ্গে বর্ধমানের রাজার চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য রাজস্বের অতিরিক্ত ১৯৩৭২১ টাকা রাজার পক্ষ থেকে কোম্পানিকে দিতে হবে[৩৯] এবং কালেক্টারের তত্ত্বাবধানে ঐ কার্য পরিচালনা করা হবে। মনুষ্য সৃষ্ট বাঁধ নির্মাণের ফলে প্লাবনজনিত পলি পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়াতে না পারায় সেটি নদীখাতে সঞ্চিত হয়ে খাতের গভীরতা কমিয়ে দেয় ও সেইসঙ্গে ঢালেরও হ্রাস হতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে দামোদর, অজয় ও ভাগীরথীর মিলিত জলপ্লাবনে বর্ধমান জেলায় ব্যাপকহারে ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ জানা যায়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বর্ধমান ছাড়িয়ে পশ্চিমমুখে প্রসারণ, ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ ও এই সময়ে স্থানে স্থানে গ্রাম-গঞ্জ ও শহরকে বাঁচানোর জন্য বাঁধ নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। এছাড়া মুচির হানা ও বেগুয়ায় বাঁধ নির্মাণের ফলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দামোদর ও কানা দামোদরের বাঁধ ভেঙ্গে হুগলী জেলার দক্ষিণাংশ ও হাওড়া জেলায় বন্যার জল ছড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া বন্যার জলের একাংশ শ্রীরামপুর মহকুমায় বৈদ্যবাটীখাল ও বালীখালের মধ্য দিয়ে ভাগীরথীতে পড়ত। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল দামোদরের প্রবল বন্যার পর হাওড়ার ফেরিফাণ্ড কমিটির সেক্রেটারী ই, জেন্কিন্স-এর তত্ত্বাবধানে বন্যার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলে। সম্ভবতঃ এটাই ছিল ডানকুনি ও রাজাপুর ক্যানেলের সূত্রপাত। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে জামালপুর থানার সাদিপুরের দক্ষিণে কৃষ্ণপুরে বাঁধ ভাঙ্গায় বাঁধ সংস্কার

বিষয়ে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। অথচ ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজার যে আপস-মীমাংসা হয়েছিল, তাতে সরকার পুরাতন বাঁধ সংস্কার ও প্রয়োজনবোধে নূতন বাঁধ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।[৪০] কিন্তু কার্যতঃ সরকার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। উপরন্তু বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের দায়দায়িত্ব জমিদারগণকে বহন করতে বাধ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন করার বিষয় বিবেচিত হলে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর প্রতিবাদ গভর্নমেণ্ট সকাশে প্রেরণ করেছিলেন।[৪১]

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেলপথ নির্মাণের ফলে বেহুলা ও গাঙ্গুরের খাতে দামোদরের মূল প্রবাহ হ'তে বন্যার জল নিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ খাত দুটি কালক্রমে শুষ্ক হয়ে মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় জল নিকাশের ব্যবস্থা না করে রেলপথ নির্মাণের ফলে বর্ধমান জেলা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা ডঃ মেঘনাদ সাহা, উইলকক্স, মজুমদার, ষ্টীভেনসন মুর কমিটির মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দেন এবং প্রমাণ করেন যে, এক সময়ে বর্ধমান ভারতবর্ষের উর্বরতম অঞ্চল ছিল। রেলপথ বিস্তারের ফলে বর্ধমানের উর্বরতা অর্ধেক কমে যায় এবং দশ বৎসরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়। পূর্বে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ জন লোকবসতি ছিল, কিন্তু বাংলা ১৩৪৬ সালে জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ জনে নেমে আসে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেছিলেন—[৪২]

'If there be anything justice in the world the people of Burdwan are entitled to compensation from the parties concerned, for all these terrible infliction on them. It may be given to them, by imposing a terminal of throughfare tax on the Railway passengers, and utilising the sum so collected to resuscitation of old prosperity of the country by undertaking new constructive works according to well laid-out and well studied plans.'।

এছাড়া তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে,—'কেউ যেন মনে না করেন, আমি পরিহাস করে বলছি যে, বর্ধমানের লোকেদের ক্ষতিপূরণ পাবার দাবি আছে।[৪৩]

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ ও ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে The Bengal Embankment Act-এর দ্বারা সরকার বাঁধ নির্মাণের যথেষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের আইনে অজয় নদের দক্ষিণতীরে গোরাবাজার থেকে কাজলদিঘি পর্যন্ত ৭ মাইল ৩৯৪০ ফুট, বিষ্ণুপুর হতে অর্জুনবাড়ি পর্যন্ত ৪ মাইল ও সিংঘি হতে বামুনিয়া পর্যন্ত ৩ মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ঐ আইনে দামোদরের বাম তীরে শিলিয়া (পরগণা চম্পানগর) হতে আলিপুর (মণ্ডলঘাট পরগণা) পর্যন্ত ১০৭ মাইল,

চাঁচাই হ'তে জয়রামপুর পর্যন্ত দ্বিতীয় বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৮ মাইল ও দামোদরের দক্ষিণ-তীরে উজিরপুর থেকে ডিহি বারাসাত পর্যন্ত ১৮ মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে Bengal Embankment (Act II of 1882)-এ বাঁধ নির্মাণ বিষয়ে সরকার প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে জুজুটি থেকে জামালপুর পর্যন্ত ২২ মাইল দীর্ঘ খালের জন্য ২টি বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, দামোদরের উত্তরতীরে বর্ধমান শহর সংলগ্ন স্থানে যেখানে নদীর গতি পূর্বমুখী সেখানে মোট পাঁচটি বাঁধ (নদীতীরে বাঁধ ১টি+ইডেন খালের বাঁধ ২টি+গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ১টি+রেলপথ ১টি) নির্মাণের ফলে প্লাবনজনিত পলি নদীর বাম তীর বরাবর নিষ্ক্রমণ হতে পারে নাই এবং ঐ পলি নদীখাতেই সঞ্চিত হতে থাকে। ফলে ১৯১৩, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের বন্যায় বর্ধমান জেলাকে রক্ষা করা যায় নাই।

বারবার এরূপ বিধ্বংসী বন্যার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে বিখ্যাত সেচ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম উইলকক্স বাঁধগুলি সম্পর্কে বারবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু পরাধীন দেশে ব্রিটিশ সরকার এই সাবধান-বাণীকে মোটেই আমল দেন নাই। তদুপরি রোণ্ডিয়ার নিকটে দামোদরের উপর আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণের ফলে উচ্চ উপত্যকায় প্রবল বর্ষণের ফলে নদীর খাত ঐ জল বহনে অক্ষম হওয়ায় ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বন্যা দেখা দেয় এবং দৈব-বাণীর মতই স্যার উইলকক্সের ভবিষ্যৎবাণী ফলে যায় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই। দামোদরের মূলখাত ঐ জল বহনে সমর্থ না হওয়ায় বাম তীরে আমিরপুরে বাঁধ ভেঙ্গে বেহুলা-গাঙ্গুরের খাতে প্রবলভাবে বন্যার জল ত্রিবেণীর পথে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে ২০ মাইল রেলপথ ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভেসে যায় এবং সারা অঞ্চল চলে যায় ৬/৭ ফুট জলের তলায়।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর দিল্লীর এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত এক তথ্যে বন্যার এই বিশেষ বিবরণ জানা যায়,—"In July this year the river Damodar swollen by heavy monsoon floods suddenly reverted to the bed it had occupied several hundred years ago. Breaking through the bund which confined it, it swelled up against the embankment of the direct Burdwan-Howrah line, the double track linking Calcutta with North India. The floods reached the top of the embankment which then gave way at many points, the bridges collapsing into the water. Continuing across country and spreading death and devastation for twenty miles, the angry river next reached the main double track line from Calcutta north-

ward running from Burdwan to Howrah via Bandel. This too was breached at many points by the raging floods."[৪৪]।

দামোদরের প্রধান খাতে জল বৃদ্ধি হ'লে বেহুলা, গাঙ্গুর, বাকা, কানা ও কানা দামোদরের খাতে বৃষ্টির জল নিষ্কাশিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নদীর বাম তীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের ফলে পূর্বমুখী স্বাভাবিক গতি প্রথমে বাধা প্রাপ্ত হলেও প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে নদী ভীষণ আকার ধারণ করায় বর্ধমান, মেমারী, কালনা থানার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কপিল ভট্টাচার্য্যের মতে, ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যায় দামোদরের অধিকাংশ জল বেহুলা-গাঙ্গুরের খাতে ত্রিবেণীর নিকটে হুগলী নদীতে পড়েছিল। মানুষ যদি বাঁধ সংস্কার করে দামোদরের গতি নিয়ন্ত্রিত না করত, তাহ'লে হয়ত এই পথে পুনরায় নদীর গতি প্রবাহিত হয়ে বেহুলা-গাঙ্গুরের ধারাকে পুনরায় প্রধান খাতে পরিণত করতো।[৪৫] ১৯১৩, ১৯৩৫ ও ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, সুপ্রিয় সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে, নদী পাড় বরাবর বাঁধ দেওয়ায় দামোদর অববাহিকায় উন্নতির বদলে সামগ্রিক অবনতিই ঘটেছে।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে অজয়ের জলরাশি বিপদসীমার উর্দ্ধে দেখা দিলেও এই বন্যা ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। তবে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে বন্যার জন্য মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতিই ছিল অধিক দায়ী। দু'বার নিম্নচাপের ফলে জুলাই ও অগস্ট মাসে প্রবল বর্ষণের পর ২৭শে হতে ২৯শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বর্ষণের ফলে গোটা দেশ ভয়াবহভাবে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছিল।[৪৬] অবশ্য ব্যাপকহারে জলাধার হতে জল নিষ্ক্রমণের দরুণ বন্যার এই ধ্বংসলীলার আংশিক দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতির উপর মানুষের অহেতুক হস্তক্ষেপ যে অবনতির দিকে টেনে নিয়ে যায় তার ইঙ্গিত বহু আগেই রাধাকমল মুখোপাধ্যায় করে গেছেন :

"Famine and flood equally publish man's crime against nature and nature's stern rebuke. Where formerly were arid wastes, man by his skilful engineering and patient effort, introduces smiling fields. Where again, there were bountiful orchards and fertile fields, man by unskilful interference with natural drainage, brings about agricultural decline and epedemic disease. Everywhere man has thriven in numbers."[৪৭]

সেচ বিশেষজ্ঞ, ভূ-বিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, প্রায় ৭।৮ হাজার বৎসর পূর্বে দামোদর নদ বর্ধমান জেলায় যে প্রবাহপথের সৃষ্টি করেছিল, সম্ভবতঃ ৩ হাজার বৎসর পূর্বে সেটি কালনা ও ত্রিবেণীর পথে ভাগীরথীতে মিলিত হ'ত। দামোদরের প্রধান পরিত্যক্ত খাতাটিতে প্রচুর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সঞ্চিত বালি রাশি এই খাতের প্রাচীনতত্বের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।

উপসংহার :

এ বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। ডি. ভি. সি-র জন্মলগ্ন হ'তে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বলে আসছেন, দামোদরের বাঁধ নির্মাণের ফলে দামোদরের জল ভাগীরথীতে সারা বছর ধরে প্রবাহিত না হওয়ার কারণে কলিকাতা বন্দরের পতন হবে অবশ্যম্ভাবী। জল-বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, মহা-সমুদ্রের আঠাল বালিরাশি ভাগীরথীর খাতে প্রবেশের সময় কেবলমাত্র ভাগীরথীর জলধারা ঐ বালিরাশিকে বাধা দিতে পারে না, সেক্ষেত্রে দামোদরের জলধারা যদি ভাগীরথীর খাতে প্রবাহিত হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। এছাড়া তাঁদের আরও যুক্তি এই যে, বাঁধ নির্মাণের ফলে দামোদরের বন্যার প্রকোপ তো মোটেই কমে নাই। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট তের বার এবং ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট তিনবার দামোদরের বন্যা হয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বাঁধ নির্মাণের পর পুনঃপুনঃ বন্যার ঘটনা কিন্তু যথেষ্ট কমেছে। একথা সত্য যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ফলে বিহার রাজ্যের এক বিরাট অঞ্চলসহ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে রেলপথের প্রসার ও কলকারখানা এই অঞ্চলে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যেখানে আটটির পরিবর্তে পাঁচটি মাত্র বাঁধ নির্মিত হয়েছে সেখানে ডি. ভি. সি তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নাই বা পারবে কিনা আদৌ সন্দেহ আছে। কলিকাতা বন্দরের জন্য একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁরা যদি বিংশ শতকের প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে না লাগিয়ে কলিকাতা বন্দরের পতনকে আহ্বান করেন, তার জন্য নিশ্চয়ই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকে দায়ী করা চলে না। বন্দর কর্তৃপক্ষ ফারাক্কার জলপ্রবাহ ও ভাগীরথীর বুকে পলি অপসারণ প্রভৃতি করণীয় কার্য সম্পর্কে চরম উদাসীন, যার ফলে ডি. ভি. সি-র জন্মলগ্নের পূর্বেই কলিকাতা মৃত-প্রায় বন্দর রূপে ঘোষিত হয়েছিল।

বর্ধমান জেলার প্রাচীন ইতিহাস অপেক্ষা এ জেলার নদী খাতের ইতিহাস ও গুরুত্বপূর্ণ। এ জেলায় প্রবাহিত নদনদীই অতীতে এই জনপদের সমৃদ্ধি এনেছিল; সে কারণে জনপদটি বাড়ছে এই অর্থে বৃধ-(বৃদ্ধৌ) শানচ্ অর্থাৎ বর্ধমান নামে প্রসিদ্ধি। বর্ধমানের গ্রামীণ সভ্যতা ও গ্রামীণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি সকল কালেই নদীনির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগ করে নদীকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করলে অতীত সমৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রের প্রসার লাভ ঘটতে পারে, এই আশা অমূলক নয়। আর সেই কারণেই জেলার সমগ্র নদ-নদী-খাল-বিল প্রভৃতির অতীত খাতের ইতিহাসসহ সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

পাদটীকা :

১। সমাজ বিজ্ঞানীর ভূগোল—অনিমা ভট্টাচার্য ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪২৭।
২। *Ancient India*, No. 14, 1958, p. 38
৩। *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*—P. C. Dasgupta, see plate no. II.
৪। *Ibid*: 27-29; Pre History and Beginning of Civilisation—Dr. A. K. Sur, p. 9.
৫। *Epigraphia India*, Vol. XXIII, p. 159-61, Vol. XIV, p. 156-63.
৬। *Calcutta Gazette*, 1875, p. 219-22.
৭। *West Bengal*—S. Sengupta, p. 1.
৮। *Agricultural Economics of Bengal*, Part-I, P. K. Roy, p. 23.
৯। *Ibid*—p. 20.
১০। *Ancient Irrigation System in Bengal*—W. Willcocks, p. 12.
১১। *W. B. District Gazetters, Howrah*—p. 11.
১২। নদী—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩২।
১৩। ঐ, পৃঃ ৩৩।
১৪। *A Brief Agricultural Geography of W. B.*—S. N. Mukherjee, p. 85.
১৫। *India and Pakistan*—O. H. K. Spate & Learmonth, p. 199. 'Often there is not much in the way of site selection; one place is as good as another, and the village rises are as often as not their own creation, the rubbish of generations. But any discontinuity, any break in the almost imperceptible slope, produces linear settlement patterns, especially notable are the bluffs above floodplains and the margins of abandoned river courses. The bluff villages tend to be larger than those on the drier interfluves; they have the advantage of two types of terrain, the upland doab and the valley-bottom with its tamarisk brakes and the excellent soil of its chars of diaras—the floodplain islands—submerged in the rains and liable to disappear completely in floods, but cropping up again sooner or later. These alluviated areas are often given over to cash crops of high value; near large

towns they are often used for market gardens, easily irrigated by wells taking advantage of the high water-table.'

১৬। *Cencus of West Bengal, Burdwan District*, 1981.

১৭। *Ain-i-Akbari*—Tr. H. S. Jarrett, Vol. II. p. 153-55,

১৮। *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol. II. p. 191.

১৯। *Geographical, Statistical & Historical Description of Hindoosthan*—B. Hamilton, Vol. I, p. 157.

২০। *Ibid.* p. 155.

২১। *The Changing Face of Bengal*—Radha Kamal Mukherjee, p. 15

২২। দেশ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃ: ৩৮।

২৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, ১ম সংখ্যা, পৃ: ৩২।

২৪। দেশ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃ: ৩৮।

২৫। *Geography of Purans*—Dr. S. M. Ali, p. 121.

২৬। *Ibid.* p. 121.

২৭। *Some Historical & Ethnical Aspect of Burdwan Dist.*—W. B. Oldham, p. 2. *Note:* Ibid. p. VI, Damodar—A Sanskrit word, the name of the river on which Burdwan stands, which is identified as the Andomatis of Arrian.

২৮। *Historical Geo. and Topography of Bihar*—M. S. Pandey, p. 80-81.

২৯। দেশ, ২১শে নভেম্বর, ১৯৮৭, পৃ: ১৩।

৩০। দেশ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃ: ৩৬।

৩১। *Ancient Irrigation System in Bengal.* p. 12,

৩২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৯৩ সাল, সংখ্যা ২-৪, পৃ: ৫-৭।

৩৩। *Agr. Econ. of Bengal*, p. 20. 'But before her joining the Hooghly near Kalna she is known to have had followed almost a direct west to east course and discharged her water into the Hooghly at a point in the vicinity of Katwa which is 100 miles north of Calcutta. Gradually she took a south-easterly course changing her point of confluence with Hooghly at the same time until she assumed her present course'.

৩৪। আনন্দবাজার (বার্ষিক সংখ্যা) পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃ: ৬০।

৩৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮।

৩৬। বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, কপিল ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৮৬।

৩৭। *Agr. Econ, of Bengal*, p. 21. 'Actually the river has shifted fanwise making Burdwan as the apex. and the lower reaches beyond that town moved from Katwa, 100 miles to the north of Calcutta to her present confluence with the Rupnarain, some 40 miles down to Calcutta.'

An Account of Land Management in W. B.—A. Mitra, p. 278-287.

৩৮। দেশ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৭।

৩৯। *Imperial Gazetteers*, Vol. IX, p. 101.

৪০। জয়কৃষ্ণ চরিত—অম্বিকাচরণ গুপ্ত, পৃঃ ৬৪-৬৫।

৪১। ঐ, পৃঃ ১৭০।

"The Government of the country in consideration of the general protection afforded to the country and the revenue paid by the people always maintained the public embankments, either by direct state superintendence or by a distinct allowance made to Zaminders for the same. At the time of the accession of the East India Company to the Dewanny, the Maha Raja of Burdwan, who then owned the greater part of the lands which now constitute Burdwan and Hooghly districts and part of Midnapore, was accustomed to receive a distinct allowance of this kind and though large portions of the Raj were sold by public auction at different times, yet the allowance was continued to him, except as regards Mandalghat and Chetwa Pergannas on account of which a small portion was deducted for keeping up separate embankments on those estates. The remainder Rs. 53,000 was paid to the Maha Raja who continued to repair the public embankments of those districts till 1807, when complaints being made of the inefficient mode in which they were kept up the Government thought it proper to resume the grant and undertake the construction and repair of the embankments in the district of Burdwan and Hooghly which are or may be deemed necessary for the protection of the country,

and the Zamindars and Talukdars are not under any obligation to maintain them."

৪২। প্রবাসী, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল, পৃঃ ৫৬৪-৬৫।

৪৩। ঐ, পৃঃ ৪৬৫।

"Let nobody think that when I am proposing that the people of Burdwan are entitled to compensation for the damage done to them, I am not at all jocking. Such a claim is supported by many engineers."

এ বিষয়ে Sir John Benton নামক একজন ইঞ্জিনিয়ারের মন্তব্য হ'ল : "Any blocking of flood water by those proposed new railway lines would increase the damage to crops and in the light of experience of similar works elsewhere, this would lead to demand on the part of cultivators for compensation or for increased water way to pass flood water."

৪৪। *Agr. Econ. of Bengal*, p. 26.

৪৫। বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, পৃঃ ৮৭।

৪৬। নদী—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৪।

৪৭। *The Changing Face of Bengal*, p. 14.

চতুর্থ অধ্যায়
প্রাচীন পর্ব

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা বর্ধমান। প্রাচীন রাঢ় জনপদের প্রায় মধ্যস্থলে বর্ধমান জেলার অবস্থিতি। কিন্তু বর্ধমান নামে পরিচিত জেলাটির সীমারেখা বা বিস্তৃতির কোন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাম্রশাসন ও পুরাণোক্ত বর্ধমান জনপদের বিস্তৃতি ছিল হাল আমলের বর্ধমান জেলা অপেক্ষা বৃহত্তর। প্রাচীন বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করতে হলে বৃহত্তর রাঢ় জনপদের একাংশের প্রাচীনতার সমীক্ষা তথা অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু রাঢ়ের কোন ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতম অংশের এমন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না, যা দিয়ে কেবলমাত্র বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রচনা সম্ভবপর হয়। এ বিষয়ে সচেষ্ট হলে, পর্যালোচনার যে ফসল আসবে তা যে একদেশদর্শীদোষে দুষ্ট হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সর্বশেষ সীমানা পরিবর্তনের বিষয় স্মরণ রেখে বলা যায় যে, বর্তমান বর্ধমান জেলার শেষ বিস্তৃতি নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। তৎপূর্বে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাসমূহের অংশবিশেষ বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহলে বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রচনা প্রসঙ্গে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের অবদান বা তাদের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে অবস্থানগত সুযোগের জন্য মধ্যবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সাংস্কৃতিক প্রভাব জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে কারণে প্রাচীন বর্ধমানের সন্ধান পেতে হলে রাঢ় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে অনুসন্ধান করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

শিলালিপি, তাম্রশাসন, সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে যে স্থানগুলি 'বর্ধমানপুর' বা 'বর্ধমান জনপদ' নামে পরিচিত, তন্মধ্যে রাঢ়ের মধ্যমণ্ডলে অবস্থিত বর্ধমানের প্রাচীনতা সংশয়াতীত। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রাচীন রাঢ়ের ইতিহাসই বর্ধমানের ইতিহাস। এ ইতিহাস নিহিত আছে তার ভূতত্ত্বে, পুরাতত্ত্বে, ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে, ধর্মে ও লেখমালায় এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আলোচনা পর্যায়ক্রমে করা হলেও এ জনপদের প্রাচীনতা সম্পর্কে তথ্য প্রমাণাদিসহ আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে যথেষ্ট।

ভূমি পরিচিতি প্রসঙ্গে সংশয়াতীতভাবে বলা যায় যে, রাঢ়ভূমির প্রাচীনত্ব বাংলার যেকোন অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। অস্ট্রো-এশিয়াটিক কোল ভাষাগোষ্ঠীর

অধিবাসীগণ ছিল এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। আর্য সভ্যতা বিস্তারলাভের পূর্বেই গ্রামপত্তন ও নগর পত্তনের কৌশল আয়ত্তকারী এক জনগোষ্ঠী এতদঞ্চলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল, যার প্রমাণ মেলে পাণ্ডুরাজার ঢিবির ভূগর্ভে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুতে।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কৃত্রিমতাকে বাদ দিলে 'রাঢ়' বলতে বোঝায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, সিংভূম, পুরুলিয়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলকে; যদিও পরবর্তীকালে ভাগীরথীর সমগ্র পশ্চিম ভাগ রাঢ় নামে অভিহিত হয়েছে। সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' শব্দ আছে, তার অর্থ নদীগর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরে জমি।[১] কোল ভাষায় 'রৌড়' শব্দের অর্থ পাথর বা পাথরের নুড়ি ও 'রৌড় দিশম' অর্থাৎ রাঢ় দেশ বা পাথুরে রূঢ়-রুক্ষ মাটির দেশ।[২] এই অর্থে পলিগঠিত ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলকে বাদ দিতে হয়; কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বাসস্থানরূপে সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলটিকে কুলজী-গ্রন্থে 'রাঢ়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে রাঢ়ের সীমানা সকল সময়ে নির্দিষ্ট ছিল না। এ বিষয়ে প্রয়াত ঐতিহাসিক ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন,—"ঐতিহাসিককালে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অর্থে রাঢ়ের সীমানা প্রসারিত হয়েছে। প্রসারিত সীমানা সাংস্কৃতিক কারণেও তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাপকতর অর্থে রাঢ় মেদিনীপুর জেলার পূর্ব অংশ বাদে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সবটা নিয়েই গঠিত। এর মধ্যে একদিকে রয়েছে মালভূমির প্রান্তবর্তী উচ্চভূমি আর অন্যদিকে আছে গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার পূর্বাংশ। রাঢ়ের প্রসার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই হয়েছিল।[২ক]

সর্বপ্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারঙ্গ' বা 'আয়ারঙ্গ সূত্রে' বর্ণিত আছে যে, ২৪তম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর, দুর্গম লাঢ় বা রাঢ়দেশের বজ্জভূমি ও শুব্ভ (সুহ্ম) ভূমি নামে দুই প্রদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিপৎসংকুল স্থানে অবস্থান এবং বালুকা ও লোষ্ট্রাদিপূর্ণ স্থানে উপবেশন করতেন (৯।৩।২)।[৩] সূত্রকার আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাঢ়দেশে ভ্রমণ করা দুরুহ কার্য ছিল এবং সেই দেশের অধিবাসীরা তাঁর উপর অত্যাচার করত। এই জনপদে তিনি বহুবার ভ্রমণ করেছিলেন। বজ্জভূমির অধিবাসীগণ রুক্ষ আহার করায় তারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল এবং তাঁকে দংশনের জন্য ছুক ছুক বা ছু ছু শব্দে কুকুর লেলিয়ে দিত।[৪] অস্ট্রিক ভাষায় ছু-ছু শব্দের অর্থ কুকুর। পশ্চিমাঞ্চলে বাউরী গোষ্ঠীর এক শাখার টোটেম কুকুর; এই আদিম অস্ট্রিক গোষ্ঠী, তাদের মৌলিকতা দাবি করতে পারে। আচারঙ্গ সূত্র থেকে অনুমান করা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে রাঢ়ে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে নাই এবং বাউরী জাতির আদিম কোন শাখা মহাবীরের প্রচারিত ধর্মমতকে বাধা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মাধ্যমে আর্যসভ্যতা রাঢ়ে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল।

রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের পূর্বে জৈনধর্ম সাধারণের মধ্যে

গ্রহণীয় বা সমাদৃত ছিল। ২৩শতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও রাঢ়দেশে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পার্শ্বনাথ আজিও পূজিত। বর্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে পার্শ্বনাথকে শিবরূপে পূজার ঘটনাও দেখা গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রাঢ়ের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত 'সমেত শিখরে' বা পার্শ্বনাথ পর্বতে ২০জন তীর্থঙ্কর কৈবল্য লাভ করেছিলেন। প্রথমাবস্থায় মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মমত প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও রাঢ় অঞ্চল জৈনধর্মের অন্যতম প্রচার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল, যার একাংশ বর্তমানে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং জৈন দেবদেবীগণ প্রচ্ছন্নরূপে হিন্দুদের নিকট আজিও সমাদৃত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশে প্রাচীন শরাক বা শ্রাবকরা গৃহীরূপে তাদের জৈনধর্মের অস্তিত্বকে বহন করে চলেছে। মুকুন্দরামের বিবরণেও শরাক জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

'তেলপত্ত জাতকে' উল্লেখ পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেব সমুহ বা সুমব জনপদের দেশক নামক নগরে জনপদ কল্যাণী সুত্তের ব্যাখ্যা করেন। মূল পালিগ্রন্থে আছে—'সুমুরাঠ্ঠে দেশকম্ নামা নিগমম্'। কিন্তু দেশক নগরের অবস্থিতি জানা যায় না।[৫] কেউ কেউ অনুমান করেন যে, এটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নগর বা নিগম্; কিন্তু উক্ত ধারণা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 'সংযুক্তনিকায়' নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সুহ্মদেশ পরিভ্রমণের কাহিনী বর্ণিত আছে।

আচারঙ্গ সূত্রের পরবর্তীকালে রচিত জৈনদের ৪র্থ উপাঙ্গে প্রজ্ঞাপনাসূত্রে আছে—'কোডিবরিসং বলাঢ়া পন্নবনা' অর্থাৎ. কোটিবর্ষ এবং রাঢ় পুণ্যভূমির অন্তর্গত।[৬] ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে কোন কালে গঙ্গার প্রবাহ উত্তরে থাকলেই কোটিবর্ষ (বাণগড) রাঢ়ের প্রধান নগর হওয়া সম্ভবপর।[৭] কিন্তু দু' হাজার বছর পূর্বে গঙ্গার প্রবাহ যে বর্তমান খাতের উত্তরে দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ মেলে না। পক্ষান্তরে 'মৎসপুরাণে' বর্তমান ভাগীরথীর প্রবাহের স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে, কোটিবর্ষ নগরের অবস্থিতি ছিল বর্ধমান-হুগলী জেলার সীমান্তে রায়না থানায় রত্নালু নদীর তীরে অবস্থিত কোটশিমূল গ্রামে (জে. এল. ২০০)। তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ওখানে মাটির নীচে বিধ্বস্ত মন্দিরনগরী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৮] কিন্তু তৎকালীন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মহকুমা শাসক গৌরদাস বসাকের প্রকাশিত এক নিবন্ধে জানা যায় যে, কোট-শিমূলের ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত দুর্গ বা গড, অট্টালিকা, মসজিদ, ইত্যাদি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত হয়েছিল।[৯] মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে, রাঢ়ের রাজধানীর অবস্থিতি কোথায় ছিল, তার সন্ধান জানা যায় না।[১০] তাছাড়া কোটশিমূল ও কোড়িবরিস বা কোটিবর্ষ সামর্থক শব্দও নয়।

পাতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিষয় শব্দের জনপদ অর্থ প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ আছে—'অঙ্গানা বিষয়ো দেশঃ অঙ্গা। বঙ্গাঃ। সুহ্মাঃ। পুণ্ড্রাঃ।' (মহাভাষ্য ৪ ২।১)। অষ্টাধ্যায়ীতে (৪।২।৫২) বিষয়, জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—'শিবিনাং বিষয়ো দেশঃ শৈব।'[১১] মহাভাষ্যে সুহ্ম বিষয়কে একটি জনপদরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

বিষ্ণু পুরাণে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের জনপদগুলির মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া গেলেও রাঢ়, বজ্রভূমি বা বর্ধমানের কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতে দেখা যায়, বলি রাজার অনুরোধে দীর্ঘতমা নামক এক অন্ধঋষি কর্তৃক রানী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচজন পুত্র উৎপাদিত হয় এবং ঐ পুত্রগণ বালেয় ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত ছিল। বলিরাজার পাঁচজন পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল। পৌরাণিক বিবরণে রাঢ়ের কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু জৈন গ্রন্থে সুহ্মদেশের পরিচিতি প্রসঙ্গে জানা যায় এটি রাঢ়ের অংশ। অনুরূপভাবে, বর্ধমান জনপদের প্রাচীন উল্লেখ থেকে এর অবস্থান ও আয়তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে অসমর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে, যদি না রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র, প্রসুহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মোত্তর ও সুহ্মোত্তর জনপদের ভৌগোলিক অবস্থানের আলোচনা করা হয়।

সুহ্ম জনপদের বিস্তৃতি রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা চিহ্নিত ছিল না। মহাভারতে বর্ণিত সুহ্মদেশ বঙ্গ, প্রসুহ্ম, তাম্রলিপ্ত ও কর্কট জনপদ হতে পৃথক ছিল। ৬ষ্ঠ শতকে রচিত দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতে' উল্লেখ আছে—'সুহ্মেষু দামলিপ্ত' অর্থাৎ মহাভারতে বর্ণিত সুহ্ম জনপদের বিস্তৃতি অপেক্ষা ৬ষ্ঠ শতকে এই জনপদের বিস্তৃতি অধিক ছিল। কিন্তু সভাপর্বে এই জনপদ সাগরকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—"সুহ্মনামধিপং চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ" (সভাপর্ব ৩০।২৫)। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে—'সুহ্মঃ রাঢ়ঃ' (নীলকণ্ঠ টীকা সভাপর্ব ৩০।২৪) অর্থাৎ, সুহ্ম ও রাঢ় জনপদ এক ও অভিন্ন। অর্জুন মিশ্রও এই মতের সমর্থক। কিন্তু আচারঙ্গ সূত্র মতে সুহ্মকে রাঢ়ের একটি অংশ অর্থাৎ আচারঙ্গ সূত্র রচনার সময়ে রাঢ়ের দুটি অংশের মধ্যে প্রথমটি সুহ্মভূমি ও দ্বিতীয়টি বজ্রভূমি। এ বিষয়ে মহাভারতের অপর একটি শ্লোকে পাওয়া যায়—'ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ সপক্ষানতিবীর্যবান' (সভাপর্ব ৩০।১৬), অর্থাৎ সুহ্মের সঙ্গে প্রসুহ্ম জনপদের উল্লেখ আছে, যার অপর কোন প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রসুহ্ম জনপদের অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে হলে সুহ্মের উত্তরসীমা সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। রঘুবংশ (৪।৩৫) ও হর্ষচরিতে সুহ্ম জনপদের উল্লেখ আছে। পার্জিটার সাহেব সুহ্ম জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, সুহ্ম জনপদ রাঢ়ের সমার্থক।[১২] কিন্তু নীলকণ্ঠ ও অর্জুন মিশ্রের টীকায় প্রসুহ্মের কোন উল্লেখ নাই, অথচ মহাভারতে প্রসুহ্মের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ প্রসুহ্ম অপেক্ষা

সুহ্মের খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি অধিক হওয়ায় এবং প্রসুহ্মের উল্লেখ কেবলমাত্র মহাভারতে ব্যতীত অন্যত্র না থাকায় হয়ত টীকাকারগণ প্রসুহ্ম সম্পর্কে নীরব। তবে প্রসুহ্মের অবস্থিতি সুহ্মের সন্নিকটেই। সুহ্মের দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত বা সাগর, সে কারণে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে, এর অবস্থিতি ছিল সুহ্মের উত্তরে[১৩]।

দণ্ডী ও কালিদাসের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত জনপদের উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যায় যে, এই জনপদ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালিদাসের বর্ণনায় আছে কপিসা অতিক্রম করে কলিঙ্গের অবস্থিতি ছিল। জৈন-বৌদ্ধ গ্রন্থ ব্যতীত বৃহৎসংহিতা, কাব্য মীমাংসা (রাজশেখর, ৯ম শতক) ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সুহ্মের উল্লেখ সত্ত্বেও প্রাচীন লেখমালা বা তাম্রশাসনে সুহ্মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না এবং দ্বাদশ শতকে ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মের উত্তর সীমার যে পরিচিতি জানা যায় তা ত্রিবেণী পর্যন্ত (শ্লোক ২৭) এবং যে স্থান থেকে যমুনা নদী ভাগীরথী হতে নির্গত হয়েছে (শ্লোক ৩৩, ব্রহ্ম সীমন্তিনীনাং) তার উত্তর সীমা হতে ভাগীরথী প্রবাহ বরাবর ছিল 'ব্রহ্ম জনপদ'।[১৪] তাহ'লে অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ শতকে সুহ্মের উত্তর সীমা ছিল দামোদরের (গাঙ্গুর-বেহুলার খাত) প্রবাহ পথ পর্যন্ত এবং তার উত্তরে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোত্তর বা সুহ্মোত্তর জনপদের অবস্থিতি। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের পর রাঢ়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুহ্ম শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া গেলেও রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে সুহ্মের কোন গুরুত্ব ছিল না।

রাঢ়ের দক্ষিণ অংশ সুহ্মজনপদরূপে অনুমান করলে অপর অংশ অর্থাৎ বজ্রভূমির অবস্থিতি ছিল এটির উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সুহ্মের উত্তরস্থ জনপদই ব্রহ্ম বা সুহ্মোত্তর নামে পরিচিত হলে বজ্রভূমি ও ব্রহ্ম জনপদ একই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। বজ্র শব্দের অর্থ হীরক বা কঠিন প্রস্তরজাত পদার্থ এবং যে সকল স্থানে হীরক বা সমতুল্য প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, সেই স্থানকে বজ্রভূমি আখ্যা দেওয়া যায়। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে সরকার মন্দারণের অন্তর্গত হরপা নামক স্থানে হীরকের খনি ছিল। কিন্তু হরপার অবস্থিতি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[১৫] সরকার মন্দারণের বিস্তৃতি ছিল হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া জেলা (বিষ্ণুপুর রাজ্যবাদে) ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত।[১৬] এবং এর অধিকাংশ স্থান চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল জাফর খাঁর সময়ে। হরপার পরিচয় অজ্ঞাত হলেও এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত সেরগড় পরগণায় (বর্তমান রানীগঞ্জ অঞ্চল) কালো হীরে বা কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। কালোহীরের রূপান্তরিত আকার হল হীরা। সে কারণে অনুমান করা যায় যে, হরপার অবস্থিতি সেরগড় পরগণা অথবা নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে ছিল এবং এই অঞ্চলের ভূ-পরিচিতি নিঃসন্দেহে বজ্রভূমির আখ্যা পেতে পারে। আবার বর্ধমান,

বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলির পশ্চিমাঞ্চল ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে দামী কোয়ার্টজ পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোয়ার্টজ পাথর, হীরার সমমূল্য না হলেও সমজাতীয় পদার্থ হিসাবে এটিকে বজ্র আখ্যা দেওয়া চলে।

ভগবতীসূত্র ও কল্পসূত্রের টীকায় পণিয়ভূমির উল্লেখ আছে এবং পণিতভূমি বা পণিয়ভূমি ছিল বজ্রভূমির অন্তর্গত। তামিল ভাষায় রচিত 'শিল্পাধিক্রম'-এ উল্লেখ আছে চোলরাজ করিকাল, বজ্রদেশে সমর অভিযান করে প্রচুর ধনসম্ভার লাভের দ্বারা কাবেরীপত্তনম্ নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। বজ্রভূমির উল্লেখ প্রাচীন ভারতে মোটেই অপ্রচলিত ছিল না। ভৌগোলিক বিবরণ ও লেখমালায় বজ্রভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। খারবেলের হাথিগুম্ফায় খোদিত লিপিতে বজ্রদেশের উল্লেখ আছে।[১৭] পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বজ্রভূমির অবস্থিতি হল মগধ ও রাঢ়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলসহ পশ্চিম রাঢ়াঞ্চল। মগধের পূর্বাঞ্চলে ঝাড়খণ্ডসহ বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া অঞ্চলে বসবাসকারী ভূমিজগণ কি অতীতের বজ্রভূমির অধিবাসী? অথবা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত মহাকান্তারক ব্যাঘ্ররাজ কি ঝাড়খণ্ডের অধিপতি ছিলেন?

সুহ্মোত্তর, প্রসুহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মোত্তর জনপদ হল একই জনপদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নামপরিচিতি, অর্থাৎ উপরোক্ত বিভাগগুলি একই অঞ্চলকে নির্দেশ করে, যার অবস্থিতি ছিল সুহ্মের উত্তরে। মৎস্যপুরাণে সুহ্মোত্তর, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত ব্রহ্মোত্তর এবং রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর জনপদদ্বয়ের একত্র উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, ধোয়ীর বর্ণিত ব্রহ্ম জনপদ এবং সুহ্মোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জনপদের অবস্থিতি ছিল দামোদরের প্রবাহপথের উত্তরে।

রাঢ় পরিচিতি সম্পূর্ণ না হলে বর্ধমানের প্রাচীন পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মথুরা থেকে সংগৃহীত ও কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত একটি জৈন মূর্তিতে উৎকীর্ণ আছে যে কর্কশঘরশিতের শিষ্য রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী অটশিক গহবরয় নামক এক শ্রমণের অনুরোধে এই মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রাঢ় হল পশ্চিমবঙ্গের সমার্থক।[১৮] ৯১৩ শকাব্দে (৯৯১ খ্রীস্টাব্দ) রচিত শ্রীধর ভট্টের 'ন্যায় কন্দলি'তে উল্লেখ আছে যে, তিনি দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠীক নগরে জন্মেছিলেন এবং শ্রীধর ভট্টের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণের বসবাস হেতু বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণরাঢ় ও ভূরিশ্রেষ্ঠীর বিশেষ গর্ব ছিল।[১৯] 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে' ও অনুরূপ চিত্র বর্ণিত আছে। ১০৫৯ বিক্রম সম্বতে চান্দেল রাজ ধঙ্গের বা হক খজুর লিপিতে আছে—রাঢ়াধিপতিকে পরাজিত করে তাঁর পত্নীকে বন্দী অবস্থায় চান্দেল দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[২০] বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে খোদিত আছে—সেন বংশের আদি পুরুষ সামন্ত সেন গঙ্গার তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করতেন।[২১] ডাকার্ণব তন্ত্রেও রাঢ়ের উল্লেখ আছে।[২২]

আয়তনের বিশালতার জন্য সম্ভবতঃ পাল আমলে রাঢ় জনপদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। রাজেন্দ্র চোলের (১০২৫ খ্রীস্টাব্দ) তিরুমালাই গিরিলিপিতে উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের একত্রে উল্লেখ আছে। ভোজবর্মনের বেলাভ তাম্রশাসনে, 'উত্তর রাঢ়ায়ং সিদ্ধল গ্রামীয়'[২৩] এবং ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি লিপিতে—"আর্য্যাবর্ত ভূবামি ভূষণমিহ স্থানন্তু সর্ব্বাগ্রিমো গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোস্ত রাঢ়াশ্রিয়ঃ"[২৪]; এই উল্লেখ থেকে জানা যায় যে. উত্তর রাঢ় ছিল অলঙ্কারস্বরূপ এবং বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উভয় রাঢ়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। রাঢ় জনপদ যে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত রাজেন্দ্র চোল ও তৎপরবর্তীকালে রচিত লিপিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে উল্লিখিত—"বংশে তস্যাভ্যু দয়িনি সদাচারচর্য্য পৌঢ়া রাঢ়া" এবং উক্ত তাম্রশাসনে উল্লেখিত—"যথা শ্রী বর্দ্ধমান-ভুক্তস্ত পাতিন্যুওর রাঢ়া মণ্ডলে,"[২৫] উল্লেখ হতে রাঢ় ও উত্তর রাঢ়ের পরিচিতি জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ আছে, যা তাঁর পিতা বল্লালসেনের সময়ে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

পালরাজত্বের শেষ ভাগে রাঢ় ও বরেন্দ্র বিভাগ থেকে অনুমান করা যায় যে, গঙ্গার উত্তর সীমায় বরেন্দ্র এবং দক্ষিণ সীমায় রাঢ় জনপদ অবস্থিত ছিল, যার পূর্বসীমা বরাবর জাহ্নবী প্রবাহিত। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কাজি মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে আছে লক্ষ্মৌতি জনপদের মধ্যে প্রবাহিত নদীর পশ্চিম অংশ রাল (রাঢ়) এবং এই অংশে লক্ষ্মোর (রাজনগর) অবস্থিত ছিল।[২৬] ৪র্থ নরসিংহ দেবের কেন্দুপত্তন তাম্রশাসনে (১৩০০ শকাব্দ) "রাঢ়া বরেন্দ্র যবনী" উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, ১ম নরসিংহ দেব (১২৩৮-৬৪ খ্রীঃ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাঢ় ও বরেন্দ্র অভিযানে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৭] এই ঘটনার সাক্ষ্যও মেলে মিনহাজের বিবরণীতে।

দশম শতকে সোমবংশীয় মহাশিবগুপ্তের পুত্র ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহাভবগুপ্তের বক্রতেনতালি শাসনে—'রাঢ়াফংবল্লিকন্দর বিনির্গতায়' অর্থাৎ, রাঢ়ের ফম্বলিকন্দর নামক স্থান হতে উৎকলদেশে আগমনের কথা জানা যায়। একাদশ শতকে মহাশিব গুপ্ত যযাতির ডুংগরি শাসনে খোদিত লিপিতে আছে—"কলিঙ্গ-কোঙ্গোদ-উৎকল-কোশল স্বয়ম্বর প্রসিদ্ধঃ গৌড় রাঢ়াম্বর প্রকর্ষনোদঘাত মারুতঃ"। ভৌমকর রাজবংশের নৃপতি শিবকরদেবের লিপি থেকে জানা যায় যে, উন্মত্ত সিংহ রাঢ় জনপদ অধিকার করেছিলেন।[২৮]

রাঢ়ের অধিবাসীগণ পররাজ্যে গিয়ে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে খোদিত প্রাচীন লিপিতে। অনুগ্রপন্থী শৈবাচার্যগণের মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বগ্রামনিবাসী বিশ্বেশ্বর শম্ভু বা বিশ্বেশ্বর শিব ছিলেন কাকতীয় বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা গণপতির (১১৯৯-১২৬১খ্রীঃ) দীক্ষাগুরু এবং রাজা গণপতির

আনুকূল্যে অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড লাভ করে বিশ্বেশ্বর গোলকী নামক এক বিশাল শৈবমঠ স্থাপন করেন। এই মাঠে শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত বিদ্যালয়, প্রসূতিসদন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ছাত্র, অধ্যাপক, বৈদ্য ও অন্যান্য কর্মচারী প্রতিপালিত হত। বিশ্বেশ্বর যে রাঢ় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৮৩ শকাব্দে (১২৬১-৬২খ্রী:) গণপতির কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রাজ্ঞী রুদ্রাম্বার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মল্কাপুর প্রশস্তিলিপি হতে জানা যায় যে, বিশ্বেশ্বর স্বীয় জন্মভূমি গৌড়দেশান্তর্গত দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বগ্রামের শ্রীবৎসগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ-গণকে গোলকীমঠের নিকটে তিনশত পুটিকা (প্রায় ২৪০০ একর) পরিমিত ভূমিতে বসিয়েছিলেন। কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীও পারিশ্রমিকসহ মঠে কাজ পাবার অধিকারিণী ছিলেন, এ কথার উল্লেখও লিপিতে আছে।[২৯]

ধোয়ীর পবনদূতে পাওয়া যায় ত্রিবেণী পর্যন্ত ছিল সুহ্মের উত্তর সীমা এবং তার উত্তরে ব্রহ্ম, ব্রহ্মোত্তর বা সুহ্মোত্তর জনপদ। সেকারণে অনেকে সুহ্মকে দক্ষিণ রাঢ় ও ব্রহ্মোত্তরকে উত্তর রাঢ় বলে অনুমান করেছেন এবং দুই জনপদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দামোদর নদ প্রবাহিত। বি. সি. সেন দামোদর নদকে দুই রাঢ়ের সীমারূপে নির্দেশ করেছেন।[৩০] উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় হ'ল বৃহৎ রাঢ় জনপদের দুটি বিভাগ। কিন্তু রাঢ়ের দুই বিভাগের সীমারেখা সম্বন্ধে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাহ্য মতবাদটি হল, অজয়ের প্রবাহপথ দুই রাঢ়কে বিভক্ত করেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কাটোয়া মহকুমাকে উত্তররাঢ়ের অন্তর্ভুক্তরূপে গ্রহণ করলে খড়ি বা খড়্গেশ্বরীর প্রবাহপথকে দুই রাঢ়ের সীমারেখা হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩১]

বর্ধমানের প্রাচীন পরিচিতি একদিকে যেমন বৃহত্তর রাঢ়ের সঙ্গে যুক্ত, অনুরূপভাবে সুহ্ম, ব্রহ্ম, প্রসুহ্ম ব্রহ্মোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও বজ্রভূমির সঙ্গেও যথেষ্ট সমজস্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। সামগ্রিকভাবে বর্ধমান জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দুই রাঢ়ের সীমার মধ্যে অবস্থিত হলেও এই জেলার দক্ষিণাংশ সুহ্ম জনপদের অন্তর্ভুক্ত এবং জেলার উত্তরাংশ ছিল সুহ্মোত্তর জনপদের দক্ষিণসীমা। সেকারণে বর্ধমানের প্রাচীন পরিচিতির সঙ্গে রাঢ় পরিচিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

রাঢ় পরিচিত ব্যতাত বর্ধমানের যে প্রাচীন উল্লেখ আছে তারও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। পৌরাণিক বিবরণ হতে শুরু করে তাম্রশাসনে উল্লিখিত তথ্যের পর্যালোচনা করলে এর সুসমঞ্জস উত্তর মিলবে। 'দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—

'সর্বেষাং বর্দ্ধনান্নিত্যং বর্দ্ধমান মতো বিদুঃ'।

অথবা

'বর্দ্ধমান মনুষংশ্চ গায়ন্তি ভুবি মানবাঃ'।

অর্থাৎ, সমস্ত বস্তুরই এদেশে বর্ধন বা উপচয় হওয়ায় ইহার নাম বর্ধমান অথবা বর্ধমানের অধিবাসীগণ বিভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক যথেষ্ট প্রশংসিত হয়ে থাকেন।

'শব্দকল্পদ্রুমে' আছে—'বর্দ্ধতে ইতি বৃধ-বৃদ্ধৌ শানচ্' অর্থাৎ 'বাড়ছে এই অর্থে' জনপদটির অধিবাসীগণের শ্রীবৃদ্ধি বর্ধন করতে সক্ষম বলে স্থানটি 'বর্দ্ধমান' নামে প্রসিদ্ধ'। বুকানন হ্যামিলটনও এই মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে কৃষিযোগ্য ভূমির অনুপাতে এইস্থানে যে শস্য উৎপন্ন হয়, সারা ভারতবর্ষে অপর কোন স্থানে এত অধিক শস্য উৎপাদিত হয় না; কেবলমাত্র বর্ধমানের পর দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলা ২য় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল।[৩২] এ বিষয়ে বিনয় ঘোষের মন্তব্য হল—নামের একটা ইতিহাস থাকে, "যার বৃদ্ধি হচ্ছে" সেই 'বর্ধমান', এ রকম নিরবয়ব ভাবের আশ্রয়ে নামের উৎপত্তি সচরাচর হয় না।[৩৩]

২৪তম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর রাঢ় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর রাঢ় পরিক্রমার সঙ্গে বর্ধমান জনপদ সম্পর্কিত উল্লেখ জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাবীরের পুরা নাম বর্ধমান মহাবীর। তাহলে মহাবীরের নামের সঙ্গে 'বর্ধমান' শব্দ যুক্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে 'কল্পসূত্রে'র সূত্র বিচার করতে হবে। কল্পসূত্রে আছে—এই বালক [মহাবীর] যখন গর্ভে এসেছে সেই সময় হতেই আমাদের [কুণ্ডপুরবাসী] হিরণ্য বৃদ্ধি, সুবর্ণ বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধি, ধান্য বৃদ্ধি, রাজ্য বৃদ্ধি, রাষ্ট্র বৃদ্ধি, বল বৃদ্ধি, বাহন বৃদ্ধি, কোষ বৃধি, কোষাগার বৃদ্ধি, পুর বৃদ্ধি, অন্তঃপুর বৃদ্ধি, ও জনপদ বৃদ্ধি হয়েছে এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মুক্তা, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন প্রভৃতি সারবস্তুর সম্পদ বেড়েছে (জিন চরিত্র ১০৬)...সুতরাং যখন আমাদের এই বালক ভূমিষ্ঠ হবে, তখন এই সকল গুণের (গৌণ্য) অনুরূপ নাম 'বর্ধমান' রাখা হবে। আজ আমাদের মনোরথ সংক্রান্তি ঘটেছে। সুতরাং এই কুমারের নাম 'বর্ধমান' হউক (জিন চরিত্র ১০৭)।[৩৪] বর্ধমান মহাবীরের নামকরণের সঙ্গে কুণ্ডপুরের শ্রীবৃদ্ধি জড়িত ছিল এবং এই শ্রীবৃদ্ধির হেতু স্বরূপ তিনি বর্ধমান নামে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। আবার বর্ধমান জনপদের নামকরণ সম্পর্কে দেখা যায় যে, শ্রীবৃদ্ধি বর্ধনে সক্ষম হওয়ায় স্থানটি 'বর্ধমান'। দুই ক্ষেত্রেই শ্রীবৃদ্ধি বর্ধিত হওয়ার হেতু স্বরূপ 'বর্ধমান' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মহাবীরের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে এ তথ্যটি স্বীকারে যেমন দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি একে অস্বীকার করাও যায় না। ভগবান মহাবীর ত্রয়োদশ সংবৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে জৃম্ভিকা গ্রাম (জংভিয়গামস্‌স) নগরের বাহিরে ঋজুপালিকা নদীর তীরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় 'কেবল' নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন করেন (জিন চরিত্র ১২০)।[৩৫]

অন্যদিকে জৃম্ভিকা গ্রামের অবস্থিতি বিষয়ে বিশেষ মতপার্থক্য আছে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অধীনস্থ যোগগ্রাম বা জৌগ্রাম অতীতে জম্ভৃকাগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। তাঁর মতে, দামোদর

নদের প্রাচীনতর খাত হতে উজুবালিয়া বা ঋজুকুল (জুলকুল) বা কংসনদীর উৎপত্তি হয়েছে। মহাবীর জোগ্রামে এই উজুবালিয়া নদার তীরে বসেই কেবল জ্ঞান লাভ করেছিলেন।[৩৬] মুণি কল্যাণবিজয়ের মতে এটি হাজারীবাগ জেলায় দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বর্তমান জাম্ভগাঁও। আবার জগদীশচন্দ্র জৈনের মতে, জম্ভ্‌কা গ্রামের অবস্থিতি ছিল পাটনা জেলার পাবার নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু মিথিলাশরণ পাণ্ডের আলোচনায় জানা যায় যে, বর্তমান বরাকর নদ জৈন গ্রন্থে উজুবালিয়া বা ঋজুপালিকা নামে পরিচিত ছিল। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, দামোদর নদকে ঋজুপালিকার সমার্থক ধরা যেতে পারে, যদি কোন সময়ে দামোদর নদ, বরাকরের খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে।[৩৭] নন্দলাল দে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গিরিডির নিকট বরাকর নদ ঋজুপালিকা নামে পরিচিত এবং গিরিডি হতে ১৩ কিঃমিঃ দূরে একটি মন্দির গাত্রে মহাবীরের চরণচিহ্নসহ এক শিলালিপিতে ঋজুপালিকা নদীর উল্লেখ আছে।[৩৮] 'ভগবতী সূত্রে' অনুসারে মহাবীর ছ' বছর পণিয়ভূমি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রানীগঞ্জ অঞ্চলে পণিয়তি কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এ অঞ্চলে চিচুর বিল নামে দুটি গ্রামকে ঋজুর বিল>চিজুর বিল নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই মতে অজয় নদের প্রাচীন নাম ঋজুপালিকা এবং ঐ নদীর সন্নিকটে বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার অধীনস্থ জামগ্রাম প্রাচীন জম্ভ্‌কা গ্রাম। পাল-নৃপতি অজয়পালের নামানুসারে ঋজুপালিকা নদী অজয় নামে পরিচিত হয়েছিল।[৩৯] ডঃ ত্রিপুরা বসুর মতে, কথিত আছে নালন্দা গ্রামবাসী গোশাল মঙ্খলীপুত্র ও মহাবীর বন্ধুভাবে পরস্পর আবদ্ধ থেকে এক সাথে ছ'বৎসর কাল বজ্রভূমির অন্তর্গত 'পণিতভূমি'তে অতিবাহিত করেন।[৪০]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে ডঃ মণ্ডলের মন্তব্যটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তিনি ঋজুপালিকা নদীর প্রবাহপথ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ নামে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোন নদীর সন্ধান পাওয়া যায় না। স্যার উইলকক্সের মতে, জামালপুর থানায় দামোদরের প্রাচীন খাত ইলসরা ও ঘিয়া নামে প্রবাহিত।[৪১] হুগলী জেলায় অবস্থিত জুলকুল গ্রামের সঙ্গে ঋজুপালিকা নদীর ধ্বনিতত্ত্বের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেলেও আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক অবস্থাকে রাঢ় অনুমান না করে জলা অধ্যুষিত স্থান বলাই শ্রেয়ঃ। তাছাড়া তিনি একটি কাল্পনিক মানচিত্রের দ্বারা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ঋজুপালিকা নদী এতদঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু কোন মানচিত্র বা নক্সা যদি সার্ভে দপ্তর বা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত না হয় তাহলে ঐ মানচিত্রের কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকে না, এ মত সর্বজনস্বীকৃত।[৪২]

উজুপালিকা বা উজুবালিকা>ঋজুপালিকা>অজয় (র এর উচ্চারণ অ-এর ন্যায়, যথা, রাম=আম, রাত=আত ইত্যাদি) এরূপ উচ্চারণগত সাদৃশ থাকলেও

অজয়পালের নামের সঙ্গে অজয় নদীকে যুক্ত করা ইতিহাসসম্মত নয়, কারণ অজয়-পাল নামক নৃপতি সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য নীরব। তবে জামগ্রাম ও গড়-দিগম্বরপুর অঞ্চলে ভগ্ন সিংহলাঞ্ছন মূর্তি, সিদ্ধিনাম নামক শিবলিঙ্গ ও পনিয়ন্তি কয়লাস্তরের অবস্থিতির জন্য জামগ্রামের প্রাচীনতাকে অস্বীকার করা যায় না। জৈনসূত্রে মজ্‌ঝিম বা মজ্‌ঝমা পাবার উল্লেখ আছে, যা অনেক পাবাপুরী হতে নালন্দার পথে অবস্থিত হওয়ার অনুকূলে মত দিয়েছেন। কিন্তু বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে জামতাডার নিকট মেঝলা (মজ্‌ঝমা>মধ্যমা>মেঝলা) ও পাবা> পাবিয়া গ্রামের অস্তিত্ব আছে এবং উভয় গ্রামের দূরত্ব ১৩ কিঃমিঃ।[৪৩] এখানেই মহাবীর রাঢ়ের বজ্রভূমি বা পনিয়ভূমির রুক্ষ-বন্ধুর-কঙ্করময় প্রান্তরে ভ্রমণ করেছিলেন। সেকারণেই এতদঞ্চলের প্রাচীনতা ও জৈন ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে নূতন করে সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

মহাবীরের জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, কৈবল্য লাভের পর ভগবান মহাবীর অস্থিকা গ্রাম অবলম্বন করে তাঁর প্রথম বর্ষার রাত্রে বর্ষাবাস করেছিলেন (জিন চরিত্র ১২২)। মহাবীর বর্ধমান প্রত্যেক বৎসর বর্ষার চার মাস (চাতুর্মাস্য) এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতেন। শ্রমণ জীবনের ৪১ বৎসর কোথায় কোন্ বর্ষা অতিবাহিত করেছিলেন তার উল্লেখ কল্পসূত্রে (জিন চরিত্র ১২২) আছে।[৪৪] ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি অস্থিক গ্রাম বা বর্ধমানে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকজন তাঁর প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অকুণ্ঠিত সংযমের সঙ্গে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে "রাঢ়" অঞ্চলের অধিবাসীগণের পক্ষে মহাবীরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা অসঙ্গত নয়। বোধহয় তৎপূর্বে কোন নগ্ন সন্ন্যাসী রাঢ় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন নাই এবং নগ্নদেহে ভ্রাম্যমান মহাবীর স্বামীকে দেখে তৎপ্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বা কুকুর লেলিয়ে দেওয়া লোকালয়বাসী জনগণের পক্ষে কোনমতেই অস্বাভাবিক নয়।[৪৫]

অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান এখানে দ্বাদশতম বর্ষাকাল অতিবাহিত করায় জৈন সমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্ররূপে সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে দ্বাদশতম বর্ষাবাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না; কেবলমাত্র কল্পসূত্রে অস্থিকগ্রামে একটি মাত্র বর্ষাবাসের উল্লেখ আছে।[৪৬]

অস্থিক গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, অম্বল-বর্ধমানই প্রাচীন অস্থিক গ্রাম এবং তাই শহর বর্ধমানের বোড়-হাটের মহন্ত-অম্বল এলাকায় এই অস্থিক গ্রাম।[৪৭] আবার অনেকে শুলপাণি যক্ষ ও অস্থিক গ্রামের সঙ্গে মহাবীর সম্পর্কিত পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করে অট্ঠির গ্রামকে বর্ধমানরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ডঃ বিমলাচরণ লাহা কল্পসূত্রের

টীকার উল্লেখ করে অস্থিক গ্রামকে বর্ধমান নির্দেশ করেও হাথিগাঁও-এর অনুকূলে হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্থান দিয়েছেন।[৪৮] কিন্তু হাথিগাঁও-এর অবস্থিতি হল বাগমতী নদীর তীরে।[৪৯] পাবা থেকে বৈশালী যাওয়ার পথে বাগমতী অতিক্রম করার প্রশ্ন আসে না। বর্ধমান শহর মধ্যস্থ রাজগঞ্জ অস্থল অট্‌ঠিয় গ্রাম নির্দেশ অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য, কারণ অস্থল ও অস্থিক গ্রামের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে অস্থল হল কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠ বা আখড়া। বর্ধমানের রাজগঞ্জে অবস্থিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অস্থলটি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নরহরি দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই অস্থলের প্রথম মহান্ত সুখরামদেব অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন।[৫০] বঙ্গদেশে এরূপ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আখড়া-অস্থলের আরও সন্ধান জানা যায়। অপর পক্ষে 'অস্থিক' শব্দটি অস্থি হতে জাত। আবার কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, সাঁওতাল পরগণা জেলার আটগাঁও পরগণার আদি নাম ছিল অট্‌ঠিয় গ্রাম।[৫১] কিন্তু কল্পসূত্রের টীকায় বর্ধমানকে 'অট্‌ঠিয়' গ্রামরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান।[৫২] পুণমচন্দ বৃদ্ধিচন্দ ঢঢ্‌ঢা কৃত কল্পসূত্রের হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থে আছে— 'অট্‌ঠিয় গাম—বর্ধমান বংগাল মেঁ হৈ।'[৫৩]

মহাবীর স্বামীর জন্মের পূর্বে কুণ্ডিপুরের সকলপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় জাতকের নাম রাখা হয়েছিল বর্ধমান। সম্ভবতঃ সুজলা সুফলা এই জনপদে শ্রমণ জীবনের প্রথম চাতুর্মাস্যে তিনি যে স্থানে আগমন করেছিলেন, সেই স্থান তাঁর পুণ্য সমাগমে 'বর্ধমান' নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের পূর্বেই জনপদটি বর্ধমান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে— "জিন বর্ধমান ছিল—এই জন্যই বর্ধমান নাম।[৫৪] কিন্তু কল্পসূত্রে বর্ণিত বর্ধমান মহাবীরের বর্ধমান নামকরণ করার মূলে কুণ্ডীপুরের শ্রীবৃদ্ধি। বর্ধমান জনপদের নামকরণের মূলে যে কেবলমাত্র ধন-ধান্যের শ্রীবৃদ্ধিই এর কারণ ছিল এবং মহাবীরের নামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অন্যদিকে বর্ধমান মহাবীরের সঙ্গে বর্ধমান নগরের (আলোচ্য বর্ধমান নহে) নাম সম্পর্কিত বিষয়ে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। ১২২৬ বিক্রমাব্দে চাহমান সোমেশ্বরের বিঝোলি (উদয়পুর হতে ১৮০ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে) গিরিলিপিতে খোদিত[৫৫] আছে—"বর্দ্ধতাং বর্দ্ধমানস্য বর্দ্ধমান মহোদয়ঃ"। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বর্ধমান মহাবীরের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে এইভাবেই বর্ধমান নগরের পরিচিতি হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক দেশীয় ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অরিয়ণের বিবরণে পাওয়া যায় 'মেরিডিওনলিস' (Meridionolis) জনপদের মধ্যভাগে 'অন্দোমটিস' নদ এবং কটদুপার (Katadupa) পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে 'অম্যসটিস' নদ। টলেমী বর্ণিত অগনগর, উইলফোর্ডের মতে বর্তমান অগ্রদ্বীপ।[৫৬] সেন্টমার্টিন,

উইলফোর্ড প্রমুখ পণ্ডিতগণ অন্দোমটিসকে দামোদর, কটত্থপাকে কাটোয়া ও অম্যসটিসকে অজয় নদ নামে সনাক্ত করেছেন।[৫৭] অরিয়নের বিবরণে বর্ধমানের কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও এই জেলার অন্যতম একটা প্রাচীন শহর (কাটিয়া), দামোদর ও অজয় নদের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় শতকে টলেমী (Ptolemy) রচিত 'Treatise on Geography' ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণের এক প্রাচীন গ্রন্থ। টলেমীর বিবরণে বরদমান (Bardmana)>ব্রডমন>ব্রদমান (১৩৬° ১৫´ পূঃ দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ ১৫° ১৫´উঃ) নামক স্থানের উল্লেখ আছে।[৫৮] কিন্তু তাঁর ত্রুটিপূর্ণ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ রেখা হতে ব্রদমান বা ব্রডমন নামক স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণ একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ হলেও, ভারতবর্ষের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তিনি পর্যটক ও নাবিকগণের প্রদত্ত বিবরণ থেকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। উক্ত ভৌগোলিক বিবরণের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, টলেমীর মানচিত্র ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য নহে।[৫৯] অনেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বর্ধমান শহরকে টলেমী বর্ণিত 'ব্রডমান' বলে অনুমান করেন। কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে 'ব্রডমান' শহরের যে অবস্থিতি পাওয়া যায়, সেটি সমুদ্র উপকূল হতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে অন্ধ্রপ্রদেশের (প্রাক্তন নিজাম রাজ্য) কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। ১১৬২ খ্রীস্টাব্দে কাকটীয়গণ কর্তৃক বর্ধমানপুর অধিকারের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য শহরটি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল।[৬০] আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, ওড়িশার 'ভবানীপত্তন' ও টলেমী বর্ণিত 'ব্রডমান' এক ও অভিন্ন।[৬১] ৫ম শতকে উৎকলরাজ উমাবর্মনের 'টেক্কলী শাসনে' মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বর্ধমানপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬২] এছাড়া ৭ম শতকে পাণ্ড্যরাজ ভরতবল[৬৩] এবং চতুর্দশ শতকে ৪র্থ নরসিংহদেবের কেন্দুলী তাম্রশাসনে[৬৪] উল্লিখিত 'বর্ধমান' এর অবস্থিতি ছিল বর্তমান ওড়িশা রাজ্যে। 'টেক্কলী' তাম্রশাসনে[৬৫] উল্লেখিত বর্ধমানপুরের অবস্থিতি হল অন্ধ্র রাজ্যে ভিজাগাপত্তম্ জেলার পলকোণ্ডা তালুকের অন্তর্গত বর্তমান বডম। কিন্তু টলেমী প্রদত্ত অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের সঠিক মূল্যায়ন না হলে এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অসমীচীন।

কথাসরিৎসাগরের ২৫তম তরঙ্গে আছে—

"এবং কৃত প্রতিজ্ঞঃ সন্ বর্ধমান পুরাত্ ততঃ।
দক্ষিণং দিশমালম্ব্য স প্রতস্থে তদা দ্বিজঃ॥"

কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত বর্ধমানপুরের অবস্থিতি ছিল মধ্যভারতে বিন্ধ্য-পর্বতের উত্তরাংশে।[৬৬] কিন্তু কথাসরিৎসাগরে অন্যত্র বর্ধমানের উল্লেখ পাওয়া

যায়, যা C. H. Tawny-র মতে আলোচ্য বর্ধমান শহর।[৬৭] সোমদেবের বর্ণনায় আরও পাওয়া যায়, যে কলিঙ্গ রাজকন্যা কলিঙ্গসেনার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান নিবাসী এক চিত্রকর, তাঁর প্রতিকৃতি আঁকার বাসনা করেছিলেন।[৬৮] বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে (৩য় উপাখ্যান) উল্লিখিত বর্ধমান নগরের অবস্থিতিও ছিল সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতে। 'পঞ্চতন্ত্রে' বর্ণিত বর্ধমান নগরের অবস্থিতিও মনে হয় পশ্চিম ভারতে ছিল। মহাভারতে বৃহৎ নগরদ্বার অর্থে বর্ধমানের উল্লেখ আছে, যথা— 'বর্ধমানপুর দ্বারাদভিনিষ্ক্রম্য পাণ্ডবাঃ।' (বন ১১১০) এই বর্ধমানপুরদ্বার বা বৃহৎনগরদ্বার হস্তিনাপুর নগরের উত্তরভাগে অবস্থিত ছিল।

অনেকে অনুমান করেন যে হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে (৬২৮ খ্রীঃ) খোদিত বর্ধমানকোট ও মধ্যপ্রদেশের বাঘৌল তাম্রশাসনে প্রাপ্ত শ্রীবর্ধমানপুর আলোচ্য বর্ধমান জনপদ বা শহর হতে ভিন্ন।[৬৯] কিন্তু অধ্যাপক ডঃ বি. পি. সিংহ ও অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর মতে হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা লিপিতে উল্লিখিত বর্ধমান-কোট ও আলোচ্য বর্ধমান শহর এক ও অভিন্ন।[৭০] ১৫১৭ বিক্রমাব্দে (১৪৫৯ খ্রীঃ) মহারাণা কুম্ভের কুম্ভলগড় তাম্রশাসনে উল্লিখিত বর্ধমানের অবস্থিতি ছিল রাজস্থানের মেওয়ার অঞ্চলের বর্তমান বদনোরে এবং উক্ত তাম্রশাসনে বর্ধমান নামক এক পর্বতেরও উল্লেখ আছে।[৭১]

খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকের পূর্বেই 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' রচিত হয়েছিল বলে স্বীকৃত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাম্রলিপ্তসহ অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বর্ধমান জনপদের উল্লেখ হতে মন্তব্য করা যায় যে, পুরাণোক্ত বর্ধমান ও বর্তমান বর্ধমান নিঃসন্দেহে এক ও অভিন্ন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৮।১৪) আছে—

'কশয়া মেখলামুষ্টাস্তাম্রলিপ্তৈক পাদপাঃ।
বর্ধমানা কোশলাশ্চ মুখে কূর্ম্মস্য সংস্থিতা॥'

পরাশর সংহিতায় তাম্রলিপ্ত, প্রাগজ্যোতিষপুর ও বর্ধমান জনপদের একত্রে উল্লেখ আছে। 'সমাস-সংহিতা'য় পূর্ব ভারতের অন্যান্য জনপদসহ বর্ধমানও উল্লিখিত।[৭২]

'স্কন্দ পুরাণে'র কুমারীকা খণ্ডে (৩৯।১৫৭) ৭৫টি জনপদের মধ্যে বর্ধমানের পরিচিতি হল—'চতুর্দ্দশ সহস্রাণি বর্ধমানং প্রকীর্তিতাম্' অর্থাৎ, চৌদ্দ হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল বর্ধমান জনপদ।[৭৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পৌরাণিক বিবরণে লক্ষ বা হাজার সংখ্যার যথেচ্ছ ব্যবহার আছে। তবে বর্ধমান অর্থে বর্ধমান বিভাগ বা ভুক্তিকে ধরলে চৌদ্দ হাজার না হলেও গ্রাম সংখ্যা নেহাত কম হবে না এবং 'স্কন্দপুরাণ' রচনার সময়ে এই জনপদের যে অস্তিত্ব ছিল, তাতেও দ্বিমত থাকতে পারে না।

বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়' বর্ধমান ও বর্ধমানপুরের পৃথক উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়, 'বর্ধমান' জনপদ অর্থেও 'বর্ধমানপুর' নগর অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে।[৭৪] 'বৃহৎসংহিতা'য় আছে—কূর্মঅর্থাৎ ভারতবর্ষ নবভেদে (নয়টি বিভাগে) বিভক্ত এবং কূর্মের মুখে অর্থাৎ পূর্বাংশে আদ্রা, পুণর্বসু ও পুষ্যা নামক নক্ষত্রত্রয় অবস্থিত হয়ে একটি বর্গের সৃষ্টি করেছে। কূর্মের পূর্বভাগে নক্ষত্রত্রয় যে অঞ্চলে অধিষ্ঠিত, সেই অংশে ২৭টি জনপদের মধ্যে বর্ধমানেরও উল্লেখ আছে, যথা :

'উদয়গিরি ভদ্রগৌড়ক পৌণ্ড্রাৎকলাকাশিমেকলাম্বষ্ঠাঃ
একপদ—তাম্রলিপ্তিক কোশলকা বর্ধমানাশ্চ। বৃঃ, সং ১৭।৭।'

বৃহৎসংহিতায় অন্যত্র 'বর্ধমান' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি কোন স্থান-নামের পরিচয় বহন করছে না। এক্ষেত্রে 'বর্ধমান' সৌভাগ্যের চিহ্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। স্বস্তিক ও বর্ধমান শুভলক্ষণযুক্ত চিহ্ন এবং ইহা শাস্ত্রানুমোদিত।[৭৫]

'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক অষ্টম-নবম শতকে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থে আছে—

"জাতাস্তু নগরম্ রম্যে বর্ধমানে যশস্বিনঃ।"

অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর মতে বর্ধমানের প্রাচীনতা সম্পর্কে কোন সংশয় থাকতে পারে না এবং 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' বর্ণিত আছে যে বর্ধমান নামক এক সুরম্যনগরে 'লোক' নামে এক নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই গ্রন্থ-বর্ণিত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও আলোচ্য বর্ধমান জনপদের উল্লেখ অনৈতিহাসিক নয়। কারণ অষ্টম শতকের পূর্বে ও পরে বর্ধমানের উল্লেখ অন্যত্র বিদ্যমান।[৭৬]

বৃহৎসংহিতার কূর্ম বিভাগের ন্যায় 'অথর্ববেদ'-এর পরিশিষ্টে 'বর্ধমানক' নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। কুব্জিকাতন্ত্রে উল্লিখিত 'বর্ধমানক' এবং বর্তমান বর্ধমান এক ও অভিন্ন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাঢ় জনপদের একাংশ প্রাচীন-কালে বর্ধমান নামে পরিচিত এবং বর্ধমান নগর একটি প্রাচীন শহররূপে গণ্য ছিল। 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' অপর একটি শ্লোকে এই নগরের ইঙ্গিত আছে—

"কামরূপে তথা দেশে বর্দ্ধমানে পুরোত্তমে।"[৭৭]

'বৃহৎসংহিতা'কে অনুসরণ করে 'দেবীপুরাণে'র কূর্ম বিভাগ বর্ণিত হয়েছে। দেবীপুরাণে আছে—কূর্মবিভাগ অনুসারে কালবিশেষে সঞ্চার গণানুসারে গ্রহগণ দেশ বিশেষে শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। কৃত্তিকা হতে ভরণী পর্যন্ত সাতাশটি নক্ষত্রকে নয় ভাগে ভাগ করলে এক এক ভাগে তিনটি নক্ষত্রের সমাবেশ হয়।[৭৮] সেইমত দেবীপুরাণের কূর্মবিভাগ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—

'মাগধাঃ অঙ্গ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গা পূর্বসাগরম্।
মাহেন্দ্রীবিষয়ং গঙ্গা মিলিতা যত্র সাগরে॥
সমতটং বর্দ্ধমানশ্চ শিরোপেতৈর্বিনশ্যতি॥' ৫৬।৬৯-৭০

অর্থাৎ মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পূর্বসাগর, মাহেন্দ্রী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, সমতট ও বর্ধমান জনপদে কূর্মের মস্তকস্থ নক্ষত্রত্রয় ক্রূর গ্রহ-দূষিত হলে, ঐ সকল জনপদ বিনষ্ট হয়।

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' বর্ধমানের উল্লেখ পাওয়া যায় না;

কিন্তু এই জেলার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থানরূপে চিহ্নিত 'মঙ্গলকোষ্ঠক' বা মঙ্গল-কোটের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা :

'উজ্জয়িন্যাম্ তথা পূর্বাম্, পীঠম্, মঙ্গলকোষ্ঠকম।
শুভামঙ্গল-চণ্ড্যাখ্যা যত্রাম্ বরদায়িনী ॥' ১।১৪।১৪

মঙ্গলকোট, উজানী ও কোগ্রামের উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্র ও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়।[৭৯]

'ভবিষ্যপুরাণে' গৌড় জনপদের অবস্থিতি প্রসঙ্গে কণ্টকপত্তন (বর্তমান কাটোয়া) ও বর্ধমানের উল্লেখ আছে[৮০]—

'পদ্মনদ্যা দক্ষভাগে বর্দ্ধমানস্য চোত্তরে।
গৌড়দেশঃ স বিজ্ঞেয়ো গৌড়েশী যত্র তিষ্ঠতি ॥'

এছাড়া 'ভবিষ্যপুরাণ' থেকে আরও জানা যায় যে, পুণ্ড্রদেশ সাতটি জনপদের সমবায়ে গঠিত ছিল, যথা—

'পুণ্ড্রদেশে সপ্তদেশাস্তেষাং নামাণি বৈ শৃণু।
গৌড বারেন্দ্রো নিবৃতিঃ সুহ্মদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
জাঙ্গলো ঝাড়িখণ্ডশ্চ বরাহভূমিরেব চ।
বর্দ্ধমানো বিন্ধপার্শ্বে সপ্তৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥'

অধ্যাপক উইলসন কৃত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদ বার্জেস মন্তব্য করেছেন যে, ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে উল্লিখিত পুণ্ড্রদেশটি সাতভাগে বিভক্ত এবং বর্ধমান জনপদ এর অন্যতম বিভাগ। এই জনপদটি ঘনবসতিপূর্ণ, লোকেরা ধার্মিক, শৃঙ্খলাপরায়ণ, রাজধর্মে অনুরক্ত, ধর্মে মতিমান এবং কৃষিকার্যের দ্বারা তারা জীবিকানির্বাহ করে। প্রায় প্রতিটি সম্ভ্রান্ত গৃহে শালগ্রাম শিলা কুলদেবতারূপে পূজিত হন।[৮১] এই জনপদের প্রধান নগর হাটক এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে ও সরস্বতী নদীর সন্নিকটে অরণ্য সমীপস্থ বিল্বপত্তন নগর। সীমান্তবর্তী স্থানে সামন্তপত্তন নামক নগরের অবস্থিতিও জানা যায়। কিন্তু হাটক, বিল্বপত্তন ও সামন্তপত্তনের ভৌগোলিক পরিচিতি আজও অজ্ঞাত। বর্ধমান জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে আছে—

'বিংশতির্যোজনানাঞ্চ বর্দ্ধমানস্য মণ্ডলম্।
লোকাস্তত্র ভবিষ্যন্তি ভাগ্যবন্তো যুগার্দ্ধকে ॥'

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে উল্লিখিত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকে বর্তমান জেলা ব্যতীত হাওড়া-হুগলীর সম্পূর্ণ অংশ ও মেদিনীপুর, নদীয়া, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্বে বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।[৮২] মোগল যুগে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম ভাগে প্রাপ্ত রাজস্ব বিষয়াদি গ্রন্থে উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। নবাব জাফর

যাঁর সময়ে এই জনপদটি 'চাকলা বর্ধমান' ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে 'বর্ধমান প্রদেশ' নামে পরিচিত ছিল।

'শব্দকল্পদ্রুমে' বর্ধমান শব্দের অর্থ আছে—'ধনিনাং গৃহ বিশেষঃ'। যথা—'স্বস্তিকো বর্দ্ধমানশ্চ নন্দ্যাকর্ত্তাদয়োঽপি চ। ইতি হলায়ুধঃ।' রঘুনন্দনের অষ্টা-বিংশতি তত্ত্বে আছে—'স্বনাম খ্যাত দেশঃ'। যথা :

'প্রাচ্যাং মাগধাশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড় রাঢ়কঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগজ্যোতিষোদয়াদ্রয় ॥
ইতি জ্যোতিস্তত্ত্বে কূর্মচক্রম্।'[৮৩]

'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক অপর একখানি অর্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ধমান জনপদের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। উক্ত গ্রন্থে বর্ধমানের চতুঃসীমা, নদ-নদী, গ্রাম, নগর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অজয় নদের দক্ষিণ থেকে শিলাবতী নদীর উত্তর পর্যন্ত এবং এই জনপদের পূর্বভাগে গঙ্গা ও পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত ছিল। সমগ্র ভূভাগের দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থ ৮ যোজন পরিমিত ভূখণ্ড।[৮৪]

পুরাণ ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ধমানসহ জেলার অন্যান্য স্থানের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ শতকে রচিত 'কুব্জিকা তন্ত্রে' (৭ম পটল) বর্ধমান, অম্বিকা (অম্বিকা-কালনা) ক্ষীরগ্রাম, অট্টহাস (এই নামে ২টি পীঠস্থান, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় অবস্থিত) প্রভৃতি সিদ্ধপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া বৃহন্নীলতন্ত্র, গান্ধর্বতন্ত্র, তন্ত্রসার, তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে ক্ষীরগ্রাম, কেতুগ্রাম ও উজানী প্রভৃতি শাক্তপীঠের উল্লেখ এতদঞ্চলে শাক্ত ধর্মের প্রসার তথা তন্ত্রাচারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সিংহলে রচিত দীপবংশ (৪র্থ খ্রীস্টাব্দ) ও মহাবংশে (৫ম খ্রীস্টাব্দ) লাল>লাঢ়>রাঢ় জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই জনপদের রাজধানী ছিল সিহপুর বা সিংহপুর। মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র বা সাহিত্য বর্ণিত কাহিনীর ঐতিহাসিকতা থাকলে অন্ততঃপক্ষে খ্রীস্ট জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে রাঢ় জনপদের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।[৮৫] হিউয়েন সাঙ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে ফার্গুসন ও স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তরাংশ কর্ণসুবর্ণ রাজ্য ও দক্ষিণাংশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮৬]

একাদশ শতকে কৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ম্' নামক সংস্কৃত নাটকের ৪র্থ অঙ্কে আছে—"অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদঃ। তত্র ভাগীরথী পরিসর-অলঙ্কারভূতে চক্রতীর্থে……" অর্থাৎ, রাঢ় নামে এক দেশ আছে—যথায় ভাগীরথীর নিকটস্থ স্থানের মধ্যে চক্রতীর্থ নামক স্থানটি অলঙ্কারস্বরূপ। কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কাকটা গ্রাম 'চক্রতীর্থ' নামে খ্যাত এবং এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত ছিল।[৮৭] রেনেলের মানচিত্রে (চাকতা) Chackta-র উল্লেখ আছে। উক্ত নাটকের ২য় অঙ্কে আছে—

'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।'

অর্থাৎ, গৌড় একটি অনুপম দেশ, সেই দেশে রাঢ়াপুরী নামে এক নগরী বিদ্যমান। আমার পিতা ভূরিশ্রেষ্ঠিক নগরীর অধিবাসী। ভূরিশ্রেষ্ঠীর পরিচিতি হল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডিহিভূরসুট এলাকা। কিন্তু রাঢ়াপুরীর অবস্থিতি কোথায় ছিল এ প্রশ্ন থেকে যায়। মনোমোহন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, বারোজ ও রেভের মানচিত্রে রাঢ় বা পার নামক স্থানের অবস্থিতি ছিল গৌড়ের বিপরীত ভাগে।[৮৮] কিন্তু টোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় উক্ত স্থানের নাম অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে গৌড়ের নিম্নে গঙ্গা বা ভাগীরথী এবং তার দক্ষিণে অঞ্চল রাঢ় এবং রাঢ় অঞ্চল কখনও কখনও আংশিক বা সামগ্রিকভাবে সুহ্মদেশ নামেও উল্লিখিত হয়েছে।

এখন আলোচ্য রাঢ়াপুরীর সন্ধান পেতে হলে বর্ধমান জেলার মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। দুর্গাপুর হতে ৬ কিঃমিঃ দূরত্বে কাঁকসা থানার অধীনস্থ আড়া (জে. এল. নং ৯১) গ্রামের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি ধ্বংসস্তূপ আছে এবং আড়া হতে শিবপুর যাওয়ার পথে প্রসিদ্ধ রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি ওড়িশার রেখদেউল পদ্ধতিতে আগাগোড়া স্থানীয় বেলে ও মাকড়া পাথরে নির্মিত। স্থানীয় লোকের উচ্চারণে রাঢ়েশ্বর হয়েছেন আড়েশ্বর ও রাঢ়পুরী আড়া গ্রামে পরিণত হয়েছে।[৮৯] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ধ্বংসস্তূপকে কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা যায়।[৯০] ডঃ ত্রিপুরা বসু মন্তব্য করেছেন যে রাঢ়েশ্বরের প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন মন্দিরটি ব্যতীত গ্রামে যত্রতত্র অজস্র খোদিত প্রস্তর খণ্ডও ছড়িয়ে আছে। তন্মধ্যে একটি প্রাচীন জৈন মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্শ্ববর্তী বামুনআড়া বা বামুনয়াড়া গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভুজ শিবমূর্তি, যা গুপ্তোত্তর যুগের বলে অনুমিত হয়।[৯১] রাঢ়েশ্বর শিবের মূর্তি, প্রস্তর নির্মিত মন্দির ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ হতে অনুমিত হয় যে উক্ত স্থান সম্ভবতঃ কৃষ্ণ মিশ্র বর্ণিত রাঢ়াপুরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসহ এই নামে অপর কোন গ্রামের সন্ধান পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক ও আভিধানিক অর্থেও অঞ্চলটি প্রাচীন রাঢ় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রামপালের সামন্তরাজন্যবর্গের মধ্যে অপারমন্দার, শিখরভূম, ঢেক্করী, সঙ্কটগ্রাম, উচ্ছাল প্রভৃতি অঞ্চলের অধিপতিগণের রাজ্য বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ভূমিদান উপলক্ষে রচিত ও প্রচারিত তাম্রশাসনগুলিতে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাসন-কার্যোপলক্ষে প্রাচীন বর্ধমান জনপদের গুরুত্ব ছিল সংশয়াতীত। গুপ্ত যুগে শাসন বিভাগ অনুযায়ী ২টি জনপদ বা ভুক্তির উল্লেখ আছে, যথা—বর্দ্ধমানভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি। ৬ষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে[৯২] উল্লেখিত বর্দ্ধমান-

ভুক্তি ও নবম শতকে নয়পালের ইর্দালিপিতে[১৩] বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তির উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, প্রায় সমগ্র রাঢ় অঞ্চল ছিল বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। অষ্টম শতকে খোদিত চট্টগ্রামের একটি মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ লিপিতে বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেবের জয়স্কন্ধাবার-বর্ধমানপুরের নাম জানা যায় এবং এ বিষয়টি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অভিমত হল বর্তমান বর্ধমান শহর ৮ম শতকের বর্ধমানপুর।[১৪] "বর্দ্ধমানভুক্তি" ব্যতীত এই জেলার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ তাম্রশাসনে আছে। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনখানি ঢেক্করী হতে প্রচারিত হয়েছিল।[১৫] 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত অজয় নদের সন্নিকটে ঢেক্করী বা ঢেকুরগড়ের অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং ধর্মমঙ্গলের অপর একখানি পুঁথিতে পাওয়া যায়, দেবপাল ও ইছাই ঘোষ সমসাময়িক ছিলেন।[১৬] তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ইছাই ঘোষ রূপে অনুমান করা হয়। তাই যদি হয় তাহলে ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক অর্থাৎ আবির্ভাবকাল ছিল খ্রীস্টীয় নবম শতক।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বর্দ্ধমানভুক্তির পরিবর্তে তণ্ডভুক্তি, উত্তিরলাঢ়ম্ ও তক্কনলাঢ়মের উল্লেখ আছে।[১৭] দ্বাদশ শতকে বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ়ের অবস্থিতির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে বর্দ্ধমানভুক্তির আয়তন দক্ষিণে কতদূর বিস্তৃত ছিল সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। আলোচ্য তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে—'যথা: 'শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতডড্-চতুরকে পূর্বে জাহ্নবী (স্র) বন্তী অর্ধসীমা'[১৮] অর্থাৎ দানকৃত বিদ্দারশাসন গ্রামের পূর্বে অর্ধসীমায় জাহ্নবী প্রবাহিত এবং বিদ্দারশাসন গ্রামের উত্তর সীমায় ধর্মনগর। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত খাড়িমণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাড়িমণ্ডলের অবস্থিতি হল, ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে। শাসনকৃত গ্রাম ও তার উত্তর সীমায় অবস্থিত ধর্মনগর গ্রাম, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতডড্ চতুরকের অধীনে ছিল। শাসনকৃত গ্রামের পূর্বে জাহ্নবী প্রবাহিত অর্থাৎ, এটি ছিল আদিগঙ্গার খাত। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে সরস্বতীর প্রাচীন খাত বা বর্তমান ভাগীরথীর ধারা প্রবল ছিল না এবং সেই কারণে ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণ ভাগের পশ্চিমাংশ বা আদিগঙ্গার প্রবাহপথের পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল এবং আদিগঙ্গার পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত। বারুইপুর থানায় ধর্মনগর অবস্থিত এবং বারুইপুরের প্রায় ৬ কি:মি: দক্ষিণে মাইনগর গ্রাম, যেখানে দক্ষিণরাঢ়ী বসুজ কায়স্থগণের আদি নিবাস। তাহলে অনুমান করা যায়, দশম-একাদশ শতকে সরস্বতীর ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হওয়ায় ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণাংশের

পশ্চিম অংশ (আদিগঙ্গার বিশাল জলধারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তিকে পৃথক করে) ছিল দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত।

পালযুগে, সম্ভবতঃ ধর্মপালের সময়ে দ্বিতীয় 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান-স্তূপ' নামক একটি বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান' নামকরণের সার্থকতা এই যে, আলোচ্য স্তূপটি ছিল বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত।[৯৯] এটির নিম্নভাগ নানা কারুকার্য শোভিত ও সমগ্র স্তূপটি চারিটি স্তর বিন্যাসে বিভক্ত ছিল। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার পানাগড়ের সন্নিকটে ভরতপুরে (২৩°২৪´ উঃ অক্ষাংশ ও ৮৭°২৭´ পূঃ দ্রাঘিমাংশ) ইষ্টক নির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে[১০০] এবং এটিই রাঢ় অঞ্চলে এযাবৎকালের মধ্যে আবিষ্কৃত একমাত্র বৌদ্ধ-স্তূপ। সে কারণে ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপটিকে তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ থাকলেও আরও গবেষণা বা অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে পাওয়া গেছে যে, চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎশিঙের সময়ে রাঢ়দেশে দ্বিস্তর সম্বলিত একটি ধর্মরাজিক চৈত্য স্থাপিত হয়েছিল।[১০১] কিন্তু উক্ত চৈত্যটি অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। তুলাক্ষেত্র বর্ধমানস্তূপ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বর্ণিত স্তূপ ও ভরতপুরে আবিষ্কৃত স্তূপের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে, যা দিয়ে প্রাচীন বিবরণসমূহ পুরাতত্ত্বের আলোকে প্রমাণিত হবে।

তাম্রশাসন, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনায় বর্ধমানের প্রাচীনতা প্রমাণিত হলেও ভূ-অভ্যন্তর থেকে আবিষ্কৃত পাথুরে প্রমাণের গুরুত্ব যথেষ্ট এবং এ কারণে সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শিলাস্তরের উপরিভাগে পলিসঞ্চয়-জনিত কারণে ভূত্বকের গঠন ও আবহাওয়ায় কমনীয়তা দেখা দিলে এতদঞ্চলে মনুষ্যবসতি শুরু হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ হেলোসীন পর্বের অন্তে বর্ধমান জেলায় নব্যপ্রস্তর যুগের মনুষ্য অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে বি. বি. লালের নেতৃত্বে অনুসন্ধান ও উৎ-খননের ফলে দুর্গাপুরের সন্নিকটে দামোদরের উত্তর তীরে বীরভানপুর গ্রামে ছ'হাজার বছরের প্রাচীন এক প্রত্নক্ষেত্রে প্রস্তরায়ুধসহ একটি প্রাচীন অধিবসতি আবিষ্কৃত হয়েছে।[১০২] এছাড়া উৎখননের ফলে আউসগ্রাম থানার উত্তরাংশে অজয় নদের দক্ষিণ অববাহিকায় পাণ্ডুক গ্রাম সংলগ্ন পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর প্রাচীনতা রেডিও-কার্বণ পদ্ধতির দ্বারা জানা গিয়েছে। আনুমানিক খ্রীস্ট-পূর্ব ১৫০০ অব্দে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শনাবলীসহ মনুষ্য বসবাসের বাসগৃহও উক্ত-স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ প্রত্নক্ষেত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবসতিতে প্রাপ্ত লৌহ নির্মিত দ্রব্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা ৩০০০ বছরের প্রাচীনত্ব দাবী করে এবং ক্রীটস্ দ্বীপের সঙ্গে বর্ধমানের অধিবাসীদের যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তারও প্রমাণ মিলেছে গোলাকৃতি এক শীলমোহরের নিদর্শন হতে। এছাড়া মঙ্গলকোট,

গোস্বামীখণ্ড, বাণেশ্বরডাঙ্গা, সাঁওতালডাঙা, গঙ্গাডাঙ্গা, রাজারডাঙ্গা, এরুয়াড়, পাঁচুন্দি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীকে তাম্রাশ্মায় যুগের প্রত্নবস্তুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বনকাটি, মঙ্গলকোট ও রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধ হতে প্রমাণিত হয় যে, সুদূর অতীতে এই জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবকুলের বিচরণক্ষেত্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অপর কোন জেলায় এত অধিক সংখ্যক তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রাশ্মীয় যুগ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন বজায় আছে।[১০৩]

প্রত্নযুগ ও প্রাচীন ইতিহাসের যুগে বর্ধমানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, অনুরূপ পরিচিতি মধ্যযুগে রচিত ইতিহাস ও সাহিত্যেও পাওয়া যায়। তবে এ সময়ে বর্ধমান জনপদ ব্যতীত বিভাগ বা উপবিভাগেরও উল্লেখ আছে। মার্কোপোলোর বিবরণে বর্ধমানের পরিবর্তে সরিফাবাদের উল্লেখ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান আমলে জনপদটি সরিফাবাদ আখ্যা পেয়েছিল। ‘শরিফ’ শব্দের অর্থ সম্রান্ত। এই স্থানে সম্রান্তশালী ব্যক্তিগণ বসবাস করায়, জনপদটি এই নামে অভিহিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে সরিফাবাদ ব্যতীত সরকার সুলেমানাবাদ বা সেলিমাবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার সাতগাঁও-এর উল্লেখ আছে। সরকার সরিফাবাদের অন্তর্ভুক্ত মহল বর্ধমানের রাজস্ব ছিল ১৮,৭৬,১৮২ দাম এবং সরিফাবাদের সদর কার্যালয় ও ফৌজদারের কার্যালয় ছিল বর্ধমান শহরে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষ ভাগে লাহোর নিবাসী আবু রায় বর্ধমানের চৌধুরী ও নগর কোতয়ালের পদলাভ করে বৈকুণ্ঠপুর থেকে বর্ধমানে এসে বসবাস শুরু করেন এবং ঐ সময়ে কাঞ্চননগরের দক্ষিণে বারদুয়ারীতে তাঁদের বসবাসের স্থান ছিল বলে জানা যায়।

হিন্দু ও মুসলমান আমলে মন্দির, মসজিদ, গড় বা দুর্গগুলি বরাকর, চুরুলিয়া, গরুই, জামবনী, আড়া, গৌরাঙ্গপুর, সাতদেউলিয়া, আঝাপুর, জৌগ্রাম, কুলিনগ্রাম, খণ্ডঘোষ, কাটোয়া, কালনা, কুলুট, সুয়াতা প্রভৃতি স্থানে নির্মিত হওয়ায় ঐ স্থানগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রাণী শহর একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিলুপ্ত নগরী। ইন্দ্রাণী নগরীর অবস্থিতি ছিল কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যস্থলে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত খাতের দক্ষিণ তীরে বিকিহাট অঞ্চলে। অন্ততঃপক্ষে নবম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল।[১০৪]

১৭২২ খ্রীস্টাব্দে নবাব জাফর খাঁর আমলে সরকার সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, মান্দারণ ও সাতগাঁওকে পুনর্বিন্যাস করে ৬১টি পরগণার সমবায়ে চাকলা বর্ধমানের সৃষ্টি করা হয়েছিল[১০৫] এবং ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চাকলা বর্ধমানের অস্তিত্ব ছিল।

এছাড়া, বর্ধমান জমিদারী বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদারীরূপে যে গণ্য হত[১০৬] তা রেনেলের মানচিত্রে উক্ত তথ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে।

বর্ধমান একটি প্রাচীন জনপদ। এই প্রাচীন জনপদের রাজধানী কি অনুরূপ প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে? প্রতিটি জনপদের একটা সদর কার্যালয়ের প্রয়োজন হয়, যাকে রাজধানী আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বর্ধমান একটা প্রাচীন জনপদরূপে বর্ণিত হলেও, প্রাচীন যুগের বর্ধমানের অবস্থিতি নিঃসন্দেহে বর্তমান অবস্থায় ছিল না। জৈনসূত্র মতে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর কশ্যপ গোত্রীয় চারজন শিষ্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন গোদাস এবং এর ছিল চারটি শিষ্য-শাখা, যথা: (১) তামলিতিয়া (২) দাসী খব্বডিয়া (৩) কোডিবরিসিয়া ও (৪) পোংডবদ্ধনিয়া।[১০৭] অবশ্য রাঢ় রাজধানীরূপে বর্ণিত কোডিবরিস নগরের অবস্থান জানা যায় না।

খ্রীস্টীয় ১ম শতকে প্লিনির বিবরণে আছে, গঙ্গারিডি-কলিঙ্গের রাজধানী ছিল পার্থেলিস। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে দামোদর-ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চল কলিঙ্গের অধীনস্থ ছিল এবং সে কারণে গঙ্গারিড়ি-কলিঙ্গ ত্রি-কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১০৮] নন্দলাল দের মতে, ভাগীরথীর তীরে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর প্রাচীন নাম পার্থেলিস্।[১০৯] ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে, বর্ধমান শহর হতে ৪।৫ কিঃমিঃ পশ্চিমে তালিতপুরের পূর্ব নাম ছিল পারতালিত, যা পার্থেলিসের বাংলা রূপ। কিন্তু এ মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। M.de St. Martin-এর মতে, বর্ধমান শহর প্রাচীন গ্রীক বিবরণে পার্থেলিস নামে উল্লিখিত।[১১০] ওল্ডহাম অবশ্য এই মতকে সমর্থন করেছেন।[১১১] অনেকের মতে বর্ধমানের প্রাচীন নাম ছিল ঈশ্বরপুর।[১১২] আবার ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকে মন্তব্য করেছেন, ('বর্ধমান মহাস্থান, চৌদিকেতে পুষ্পবন') এ শহরের প্রাচীন নাম ছিল কুসুমপুর।[১১৩] কিন্তু ঈশ্বরপুর বা কুসুমপুর নামের কোন প্রাচীন প্রমাণ মেলে না।

প্রাচীন ভারতে রাজধানীর নামে জনপদের নাম অথবা জনপদের নামে রাজধানীর নাম সম্পর্কিত প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ধমান জনপদের প্রাচীন উল্লেখ আছে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' এবং বর্ধমানপুরের প্রাচীন পরিচয় পাওয়া যায় 'বৃহৎসংহিতা', 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' ও কান্তিদেবের তাম্রশাসনে। গোপচন্দ্র ও শশাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য সময়ে রাঢ় শাসিত হত গৌড় অথবা পাটলিপুত্র থেকে। বর্ধমান যে কোন্ সময়ে রাঢ়ের রাজধানী ছিল তার কোন প্রাচীন উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যান্য স্থান-নাম সম্পর্কিত নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় সকল জনপদের স্বনামে একটা নগরের উল্লেখ অছে এবং সেকারণে বৃহৎসংহিতায় বর্ধমানপুরের নাম পাওয়া যায়। হয়ত অতীতে এই বর্ধমানের অবস্থিতি বর্তমান স্থানে নাও হতে পারে; তবে অনুমান করতে বাধা নেই যে, প্রাচীন বর্ধমান শহরের অবস্থান অধিক দূরে ছিল না। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে জৈন পুরাণের

ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করলে বলতে হয়, মানভূম, সিংভূম, বীরভূম ও বর্ধমান এই চারটি স্থান জৈন তীর্থঙ্করদের নামের সঙ্গে জড়িত।[১১৪]

মোগল আমলে সরকার সরিফাবাদের উল্লেখ আছে যা বর্তমানকালের জেলার সমার্থক এবং এই নামে কোন শহরের পরিচয় জানা যায় না। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, শের আফগানকে হত্যা করে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই অঞ্চলকে খাস করেন এবং নূতন নামকরণ করেন বাঢ়-ই-দেওয়ান বা বাঢ়-এ দেওয়ান।[১১৫] কিন্তু এ মন্তব্যেরও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে, বাংলায় বর্ধমান বা 'বোরদোমানের' পার্শী উচ্চারণ বরদওয়ান হওয়া উচিৎ।[১১৬] সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বর্ধমানের নামকরণের কোন সম্পর্ক ছিল না। পক্ষান্তরে, আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী, রিয়াজ-উস্-সালাতিন ও সিয়র মুতাক্ষরিণ গ্রন্থে 'বরদওয়ান' শব্দের উল্লেখ আছে, যার সংস্কৃত বা বাংলা বর্ধমানের পার্শী উচ্চারণের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নাই। 'তারিখ-ই-বাংলা মহবৎজঙ্গ' নামক অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত গ্রন্থে 'বরদওন' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার ইংরাজগণ এদেশে আগমনের পর তাদের উচ্চারণের ভঙ্গিতে বর্দ্ধমান>বর্ধমান বা বরদেওন—এর রূপ নিয়েছিল বরদোমান-এ (Burdomaan), যার পরিবর্তিত ইংরাজী উচ্চারণ হল Burdwan।[১১৭]

বর্ধমান শহরের নামকরণ ও এই শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত এই যে, ধর্মঠাকুরের পূজা বিধানে ধর্ম্মপীঠমালার মধ্যমণি শ্রীবর্দ্ধমান ধর্ম্মপীঠের অবস্থান হচ্ছে সাতগাছিয়ার নিকট বড়োয়াঁ গ্রামে এবং পাথরের মন্দিরের চিহ্নবিশেষ বিলুপ্তপ্রায় নদীখাতের পাশে এখনও বিদ্যমান। তাঁর মতে ধর্মপূজা বিধানোক্ত বর্ধমান নিশ্চয়ই বড়োয়াঁ—ভাষাতত্ত্ব হয়ত তাই বলে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, কোন কারণে শহর বিধ্বস্ত বা নদী বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাজধানী আট-দশ ক্রোশ উজানে আধুনিক বর্ধমানে সরে এসেছিল এবং আধুনিক বর্ধমান শহরের ইতিহাস ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের ওদিকে যায় না।[১১৮] তাঁর মতে "প্রাচীন বর্ধমান শহর অবশ্যই দামোদর অথবা তার শাখা প্রশাখার তীরে অবস্থিত ছিল। এখনকার বর্ধমান দামোদরের তীরবর্তী নয়, দামোদরের শাখা বাঁকা নদীর তীরবর্তী। একদা এই বাঁকা দিয়েই দামোদরের এক প্রধান এবং বারমাস স্থায়ী স্রোত বইত। সুতরাং প্রাচীন বাঁকা অথবা তার শাখা বেহুলা অথবা সমান্তরাল শাখা খড়ি নদীর তীরে এটি অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করতে হয়। শব্দবিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন বর্ধমান নামটির আধুনিক রূপ হওয়া উচিত বডআন্ বা বড়োয়াঁ।"[১১৯]

এ বিষয়ে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মন্তব্য করেছেন যে, জিন-বুদ্ধের পরে এবং ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বেই বল্লুকা-বড়োয়াঁ হতে সরে এসে বর্তমান বর্ধমান, নগরের পত্তন হয়েছে। ৬ষ্ঠ শতকের অনুলিখিত কুব্জিকাতন্ত্র গ্রন্থে শ্রীবর্ধমানে মঙ্গলাদেবীর

পীঠের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে, আদি চণ্ডীমঙ্গল রচনাকার মানিক দত্ত এই নূতন বর্ধমানকেই দেবীপীঠ 'বড় বর্ধমান' বলেছেন। তাঁর মতে বড়য়াঁ অস্থিক গ্রামের জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতি বর্জিত হয়ে বাঁকা নদীর তীরে বর্তমান বর্ধমান নগরের পত্তন হয়েছিল, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য যুগে।[১২০] বর্ধমানের কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের রচনায় আছে—'বর্ধমান হইল বড়োয়াঁ'।

উপরোক্ত তিনজন ব্যক্তিই বর্ধমানের কৃতি সন্তান; সর্বোপরি ডঃ সুকুমার সেন হলেন প্রথিতযশা পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তাঁদের মন্তব্যের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের আলোকে সমস্ত বিষয়ের সমাধান করা যায় না—কেবলমাত্র অনুমানে সাহায্য করে। পুরাণ, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য ব্যতীত কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ব প্রয়োগ করে স্থান সম্পর্কিত বিষয়ের সমস্যার সমাধান করা একান্ত দুরূহ। 'বৃহৎসংহিতায়' বর্ধমান-পুরের উল্লেখ আছে। বরাহমিহির ও হিউয়েন সাঙের বিবরণানুযায়ী জনপদসমূহ বিখ্যাত নগর বা রাজধানীগুলি জনপদের নামেও বর্ণিত হয়েছে। 'বর্ধমান' নামটি ব্যক্তি-নাম, স্থান-নাম ও জনপদ হিসাবে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে,তার প্রচুর প্রমাণ মেলে প্রাচীন লেখমালায়। এমনকি পারসী উচ্চারণেও উচ্চারণভঙ্গীর বিশেষ পার্থক্য নাই। স্থান নামের সংস্কৃতরূপ যে পরবর্তীকালে অপভ্রংশ বা রূপান্তরিত হতেই হবে, এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই; যথা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কাশী, বারাণসী, হরিদ্বার, সিন্ধু, কাশ্মীর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান-নাম অতীতেও ছিল এবং আজও একইভাবেই উচ্চারিত হয়ে আসছে। বৈদিকযুগের কুরুক্ষেত্র ও কোশাম্বী আজও স্বনামেই খ্যাত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত গান্ধার, লিচ্ছবি, সরস্বতী, অবন্তী, অঙ্গ প্রভৃতি আজও তাদের সংস্কৃত উচ্চারণকে বজায় রেখেছে এবং 'বর্দ্ধমানক' শব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অধ্যক্ষ প্রচার—২।৩০)।

ডঃ সেন ও ডঃ মণ্ডলের উল্লিখিত বড়োয়াঁ নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই। মেমারী থানায় বড়োয়াঁ না থাকলেও সাতগাছিয়ার ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে বড়োয়া (জে. এল. নং ৯৯) এবং মেমারীর ৬ কি: মিঃ উত্তরে বড়েয়া (জে. এল. নং ১২৬) নামক দুটি গ্রাম আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বরেঞা থানার সদর কার্যালয়ের নাম বরঞা>বড়য়াঁ (জে. এল. নং ৫৬)। যদি ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন অনুসরণ করতে হয় তাহলে আরও দুটি প্রাচীন বর্ধমান নগরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করতে হয়। কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে বর্ধমান স্থান নামটিকে বড়েয়াঁ অথবা বড়োয়াঁকে বর্ধমানে রূপান্তরিত করা ব্যাকরণসম্মত কিনা বলা যায় না; তবে এটি যে ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ব্যাকরণ সম্মত হলে মুর্শিদাবাদ জেলার বরেঞার অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

মেমারী থানার বড়োয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বল্লুকা নদী প্রবাহিত ছিল এবং একশো বৎসর পূর্বেও এই নদীর জলধারা যে প্রবল ছিল, তা প্রত্যক্ষদর্শীর

বিবরণে জানা যায়।[১২১] যদি নদীখাত শুষ্ক বা পরিবর্তনের ফলে বড়োয়া গ্রামে প্রাচীন বর্ধমানের অস্তিত্ব লুপ্তের কথা স্বীকার করা হয়, তাহলে সঙ্গত কারণে এই জনপদের সদর কার্যালয় ভাটিতে অর্থাৎ আরও পূর্বে অম্বোয়া অথবা নিকটবর্তী বাঘনাপাড়ায় হওয়া উচিত ছিল—যা ইতিহাসের নিয়ম বা নদীর স্বাভাবিক গতি। নদীর ভাটি দেশ শুষ্ক অথচ মনুষ্য হস্তক্ষেপ ছাড়াই উজানের প্রবল প্রবাহের ফলে রাজধানী পরিবর্তিত হয়েছে, এমন নিদর্শন অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই। ভন-ডেন ব্রুকের মানচিত্র (১৬৬০ খ্রীঃ) ও ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃপক্ষে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত দামোদরের পূর্বমুখী ধারাটি প্রবল ছিল।

ধর্মপূজা বর্ধমান অঞ্চলে বহু পূর্বে প্রসার লাভ করেছিল সত্য; কিন্তু বল্লুকার তীরে বড়োয়া গ্রামেই যে ধর্মপূজার প্রাচীনতম পীঠ, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়ে' উল্লেখ আছে যে, পূজার সামগ্রীসহ শিব নিরঞ্জনের আরাধনা করেছিলেন বল্লুকার তীরে। ধর্মমঙ্গলের কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না এবং প্রকাশিত পুঁথির মধ্যে ময়ূরভট্ট ও রূপরামের গ্রন্থের সময়কাল উর্দ্ধতন পক্ষে ৩০০।৩৫০ বছরের অধিক পুরাতন নয়। বড়োয়া গ্রামের প্রসিদ্ধি অতীতে যদি থাকার সম্ভাবনা থাকত তাহলে মুকুন্দরাম, জয়ানন্দ ও রূপরামের গ্রন্থে সেটির উল্লেখ পাওয়া যেত। বড়োয়া গ্রামে অদ্যাবধি এমন কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই যা দিয়ে এই স্থানকে সাহিত্য ও লিপিমালা বর্ণিত বর্ধমান নগররূপে গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য বর্ধমান শহরেও মতিবাগে প্রাপ্ত অষ্ট মুখলিঙ্গ শিব, ভিখারীবাগানের ৩৫০ মন ওজনের ও ১৮ ফুট পরিধি বিশিষ্ট বর্ধমানেশ্বর শিব, বাঁকার খাতে আবিষ্কৃত ১ টন ওজনের ষাঁড়, কাঞ্চননগরে প্রাপ্ত বৈশ্রবন মূর্তি ব্যতীত অপর কোন প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান মেলে নাই। বর্ধমানের নগরদেবী সর্বমঙ্গলা ও কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরীর প্রাচীনত্ব থাকলেও দু'হাজার বছরের প্রাচীনতার দাবী কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই ডঃ মণ্ডলের অধিকাংশ মন্তব্য ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের নাগালের বাইরে।

বর্ধমান শহরের প্রাচীন অস্তিত্ব যে বর্তমান রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার কোন প্রাচীন প্রমাণ বা তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত জুম্মা মসজিদ ও খক্কর সাহেবের মাজারকে ঘিরে মুসলমান আমলের দুর্গের অস্তিত্বের কথা 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্তমান শহর ও নবাবহাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেহুলা নদী প্রবাহিত ছিল, যার শুষ্ক খাত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তরে আজও বর্তমান। সম্ভবতঃ বেহুলা, বাঁকা (পূর্বে দামোদের শাখা ছিল) ও দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন বর্ধমান নগরের অবস্থিতির অনুমান করা যায়। কারণ নদীত্রয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকেও নিরাপদ ছিল। মুকুন্দ মিশ্রের 'বাসুলিমঙ্গল' কাব্যে দামোদরের তীরবর্তী বর্ধমানের অবস্থিতির ইঙ্গিতটিও গবেষণার বিষয়।

পাদটীকা :

১। বিশ্বকোষ—সঃ নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৮১৩।
২। কৌশিকী, ১৯৮৬, শারদীয় সংখ্যা, পৃঃ ১।
২ক। অনুষ্টুপ—চতুর্বিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২।
৩। আচারঙ্গ সূত্র—অনুঃ হীরাকুমারী বোথরা, পৃঃ ৬৮।
৪। ঐ, পৃঃ ৬৯।
৫। *Jatak*—E. B. Cowell, Book-I p. 232. 'This story was told by the Master while dwelling in a forest near the town of Desaka in Sumbha country, concerning the Janapada Kalyani Sutta............It is not yet known where this sutta occurs'.
৬। *Indian Historical Quarterly,* vol-XIV, p. 521.
৭। পালপূর্বযুগের বংশানুচরিত—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃঃ ৫১।
৮। শারদীয়া বিজয়তোরণ, ১৯৮১ খ্রীঃ, পৃঃ ৪৮।
৯। *J.A.S.B,* 1877, Part-I, p. 164-5.
১০। *J.A.S.B,* 1908, Part-I, p. 286-7. 'This Ladha has been reasonably identified with Radha and Subhabhami with Suhma, Vajjabhumi so graphically described, is the rough jungle part on the west. Furthermore, in the 4th Upanga *pannavanna,* the Ariyas or sacred lands included *Kodivarisam va Ladha* (variant Lata) by which is probably to be understood Radha'.
১১। *The Astadhyayi of Panini*—Ed. S. C. Vasu, p. 714.
১২। *J.A.S.B,* 1892, p. 102 : *Ancient Countries in Eastern India*—F. E. Pargiter ; "It appears that Suhma must have comprised the modern districts of Hooghly, Howrah, Bankura, Bardhawan and the eastern portion of Midnapur."
১৩। *I.H.Q,* 1932, p. 528 ; *Some Hist. Aspect of the Inscriptions of Bengal*—B. C. Sen, p. 45.
১৪। *I.H.Q,* 1932, p. 525.
১৫। *Ain-i-Akbari,* vol-II, p. 138. "In the Sarkar of Mandaran is a place called Harpah in which there is a diamond mine producing chiefly very small stones."
১৬। *Ain-i-Akbari,* vol-II, p. 155.
১৭। *S.H.A,I.B,* p. 59.

১৮। *J.A.S.B*, 1909, p. 239.
১৯। *I.H.Q*, 1932, p. 527.
২০। *Epigraphia Indica*, vol-I, p. 145.
২১। *Inscriptions of Bengal*, N. G. Majumder, vol-III, p. 47.
২২। *I.H.Q*, 1932, p. 523.
২৩। *Inscriptions of Bengal*, N. G. Majumder, vol-III, p. 21.
২৪। *Ibid*, p. 33.
২৫। *Ibid*, p. 71-74.
২৬। তবকাত-ই-নাসিরী—মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃঃ ৫৮।
২৭। *Inscriptions of Orissa*, Ed. S. N. Rajguru, vol-V, p. 521.
২৮। *Ibid*, vol-IV, p. 96, 220, 339.
২৯। শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃঃ ১০০-১।
৩০। *S.H.A.I.B*, p. 77.
৩১। *History of Ancient Bengal*, Dr. R. C. Majumdar, p. 14.
৩২। *Geographical, Statistical & Historical Description of Hindoostan*—B. Hamilton, vol-I, p. 157. "That this district (Vardhamāna) continues in a progressive state of improvement is evident from the number of new villages erected, and the increasing number of brick building, both for religious and domestic purposes, nor is there any other portion of territory in Hindoostan that can compare with it for productive agricultural value in proportion to its size. In this respect Burdwan may claim the first rank ; the second may be assigned to the Province of Tanjore in the Southern Carnatic."
৩৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ পৃঃ ১৩০।
৩৪। কল্পসূত্র—অনুঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৫।
৩৫। ঐ, পৃঃ ৯৯।
৩৬। মহাবীর কেবল দর্শন জয়ন্তী স্মরণিকা, (জৌগ্রাম) ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ৭।
৩৭। *The Hist. Geo. and Topography of Bihar* : M. S. Pandey, p. 183.
৩৮। *The Geo. Dict. of Ancient & Mediaeval India*—N. L. Dey, p. 168.
৩৯। শ্রমণ, আশ্বিন, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ১৭৪-৭৬।
৪০। শ্রমণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, সাল, পৃঃ ৪১।

৪১। *Ancient Irrigation System of Bengal*—W. Willcocks, p. 98.
৪২। সাপ্তাহিক বর্ধমান—১১ই মে, ১৯৮৮ খ্রীঃ (লেখক কর্তৃক প্রেরিত পত্র)।
৪৩। শ্রমণ, কার্তিক, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ২১২।
৪৪। কল্পসূত্র—পৃঃ ১০১ ; অস্থিক গ্রাম—১ ভদ্রিকা—২
চম্পা ও পৃষ্টি চম্পা—৩ আলভিকা—১
বৈশালী ও বানিজগ্রাম—১২ পনিতভূমি—১
রাজগৃহ ও নালন্দা—১৪ শ্রাবস্তী—১
মিথিলা—৬ পাপানগর—১
৪৫। ঐ, পৃঃ নয় টাকা চৌদ্দ আনা।
ঐ, পৃঃ ১০১।
৪৭ শ্রমণ, বৈশাখ, ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ১৯।
৪৮ *Mahavira, His life and Teachings*—B. C. Law, p. 32-33.
৪৯ *The Hist. Geo. and Topography of Bihar*, p. 169,
৫০ বংশ পরিচয়, ৪র্থ খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, পৃঃ ১৫১।
৫১ শ্রমণ, কার্তিক, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ২১৪।
৫২ *S.H.A.I.B*, p. 60. "Burdwan (name of a district in Bengal on the west of the Hooghly) seems to have been known in its sanskrit form 'Varddhamāna' in quite early times. According to the Jaina Kalpasutra Mahāvira spent some time in Asthikagrāma. The commentary says that it was formerly known by the name Vardhamāna."
৫৩। শ্রমণ, বৈশাখ, ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ১৯।
৫৪। পৃথিবীর ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড—দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ১৬৩।
৫৫। *Epigraphia Indica*, vol-XXVI, p. 103.
৫৬। *Calcutta Review*—1846, p. 425.
৫৭। *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*—J. W. McCrindle, p. 194-95.
৫৮। *McCrindle's Ancient India as Described by Ptolemy*—Ed. S. N. Majumder Sastri, p. 185.
৫৯। *Cunningham's Ancient Geography of India*, p. 8-10.
The Classical Accounts of India—Dr. R. C. Majumdar, p. 351.
৬০। *H.C.I.P*, vol-V, p. 199.
৬১। *India and Jambu Island*—Amarnath Roy, p. 126.
৬২। *Ins. of Orissa*, vol-I, Part-II, p. 62 ; E.I, vol-XXVIII, p. 298.

৬৩। *Inscriptions of Orissa*, vol-IV, p. 11.

৬৪। *Ibid*, vol-V, p. 521.

৬৫। *E.I*, vol-XXVI. p. 315.

৬৬। *Ancient Geography of India*—A. R. Borooah, p. 22.

৬৭। *The Ocean of Story*—C. H. Tawny, vol-II, p. 171.

৬৮। *Ibid*, vol-IX, p. 53.

৬৯। *Select Inscriptions*—Dr. D. C. Sircar, vol-II, p. 221 & 313.

৭০। *Howrah In Perspective*—Kalyan K. Ganguli, p. 18. 'But the name Vardhmâna had by this time become so well known that there could have been no reason to think that any place other than Vardhamâna was indicated by this document. The practice of issuing land grants from occupied citadel of an enemy appears to have been a common incidence at the time. This can be vouched by the evidence of Bhāskaravarman the ruler of Kamarup, who had issued a land grant from Karnasurvarna, which was the seat of power of his enemy Śasanka.'

Decline of The Kingdom of Magadha—Dr. B. P. Sinha, P. 270-72. "The Banskhera plate of Harsa, dated in the year 22 and granting lands in Ahichchhatrabhukti, was issued from the victorious camp Vardhamāna-koti, where the king appears to have been staying with his vast fleet of ships, elephants and horses. Where the Vardhamāna-koṭī where it could be possible for the vast army and navy of Harsa to be encamped? In our opinion it can be identified with the modern Burdwan in Western Bengal.......According to Bhattashali, Vardhamāna-bhukti was identical with the old division of Rāḍha. Whatever may have been the exact boundaries of the bhukti in the sixth and seventh centuries after Christ, it should be obvious that the name must have been derived from the town or camp Vardhamāna. As Puṇḍra was the capital of Puṇḍravardhana-bhukti, so Vardhamāna also was the capital of the bhukti of the same name. Vardhamāna or modern Burdwan stands very close to the Dāmodara river, and could therefore be quite suitable as a base or camp for

the army and fleet of Harṣa. Of course we know of a Vardhamāna in Kāṭhiawāḍ, which has been identified with modern Vaḍhvān in Eastern Kāṭhiāwāḍ. But the inscription which refers to this Vardhamāna is much later the Banskhera plate of Harṣa. Moreover there is hardly any ground to think that Harṣa conquered Eastern Kāṭhiāwāḍ; and this Vardhamāna or present Vaḍhvān could hardly serve the purpose of a Camp for Harṣa's vast fleet of boats. No doubt there was a Vardhamāna-bhukti in the Valabhi dominion, but it can hardly be identified with Vardhamānakoṭī of Harṣa's inscription. There is a mention of Vardhamāna-pura in Malwa in an inscription of the 15th century. It is probably the same Vardhamāna-pura which is mentioned in an inscription of the Paramāra king Jayavarmadeva. But we feel ourselves justified in identifying the Vardhamānkoti of the Banskhera inscription of Harsa with the modern town of Burdwan. This identification does not go against any known fact, rather it confirms in a remarkable way some of our genuine suspicions. The Banskhera inscription is dated in the year 22, presumably of Harsa's era and therfore should belong to 628-29 A. D. It appears, therefore, that Harsa was master of Western Bengal in 628-29 A. D. The fact that he issued the grant from the 'victorious camp' where was lying with his army and navy may suggest that his conquest of this part of the country may not have been far away from 628-29 A. D."

৭১। *E.I.*—Vol.XXI, p. 278-16.

৭২। *Cosmography and Geo. in Early Indian Literature*—Dr. D. C. Sircar, p. 92.

৭৩। *The Geo. Information in the Skanda Puran*—U. Thakur, p. 295.

৭৪। *Indian Antiquary*, Vol-XXII, p-192.

৭৫। *Brihat Samhita*—Ed. M. R. Bhat, Vol-I, p. 679. 'Svastika and Vardhamāna are two kinds of auspicious diagrams'.

৭৬। *Howrah in Perspective*,—Dr. Kalyan Kr. Ganguli, p. 13-14.

৭৭। *I.H.Q.* 1932, p. 531-32; আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, (সংস্কৃত সং) পৃঃ ৮৯।

৭৮। দেবী পুরাণম্, ৪৬তম অধ্যায়।
৭৯। *Studies in the Upapurans*, Vol-II,—Dr. R. C. Hazra, p. 63.
৮০। *Studies in the Geo. of Ancient & Med. India*—Dr. D. C. Sircar, p. 105.
৮১। *Indian Antiquary*, 1891, p. 421.
৮২। কিন্তু জেমস্ বার্জেসের মতে—"Bardhwan; but how far the limits of the district coincide with those here intended, cannot be conjectured." *Ind. Ant.*, Vol-XX, 1891, p. 421.
৮৩। শব্দকল্পদ্রুম্—পৃঃ ১২৭০।
৮৪। বিশ্বকোষ—১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭।
৮৫। *J. A. S. B.* 1908, p.286.
"So these traditions, Jain and Buddhistic, about Radha existed before the birth of Christ and if the traditions have any historical basis, a country in East India with this name existed in the Fifth Century B. C. at least."
৮৬। *On Yuan Chwang's Travels in India*—T. Watters, Vol-II, p. 193.
৮৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—অশোক মিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭।
৮৮। *J. A. S. B*, 1906, p. 176.
"In the map of De Barros, Rara is put on the west bank of the Ganges, opposite Gour; and Blaev (1650) shows in the same place Para, probably a mistake for Rara. The name disappears from subsequent maps, and cannot be traced in Todarmal's mahals."
৮৯। দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯।
৯ গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২-৪৩।
৯১ কৌশিকী, ১৯৮৫ খ্রীঃ, পৃঃ ১৩-১৪।
৯২ *E. I.* Vol-XXIII, p. 159-61.
৯৩ *E. I.* Vol-XXII, p. 152.
৯৪ *E. I.* XXVI, p. 317
৯৫ *Ins. of Bengal*, Vol-III, p. 157.
৯৬ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯২ সাল, পৃঃ ৮১।
৯৭ *E. I.* Vol-IX, p. 231 & 237.
৯৮ *Ins. of Bengal*, Vol-III, p. 96.
৯৯। *History of Bengal*, Vol-I, p. 485.
১০০ *Indian Archaeology : A Review*—1971-72, p. 50.

১০১। *Buddhist Monument*—Debala Mitra, p. 235.

১০২। *Ancient India*, No. 14.

১০৩। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ‘পঞ্চম অধ্যায়’ দ্রষ্টব্য।

১০৪। কৌশিকী, ১৩৯৫ সাল, পৃঃ ১৬-১৮।

১০৫। *Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan*, 1910, p. 144.

১০৬। Fifth Report, Vol-I, p. 473. "The Zamindari of Burdwan, 5174 British square miles in extent is the most compact, best cultivated and in proportion to its dimension by far the most productive in annual rent to the proprietory sovereign which, under British administration but not only of all such districts within the Soubah of Bengal, but compared to any other of equal magnitude throughout the whole of Hindustan".

১০৭। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, (বর্ধমান শাখা), ১৩৭৯-৮০ সাল, পৃঃ ৪৭।

১০৮। *The Classical Accounts of India*—p. 341.

১০৯। *The Geo. Dict. of Ancient and Mediaeval India*, p. 105.

১১০। *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*, p. 136.

১১১। *Some Hist. and Ethnical Aspects of the Burdwan Dist.*—W. B. Oldham, p. 2 & 15

১১২। বর্ধমান সম্মিলনী—হীরক জয়ন্তী সংখ্যা (কলিকাতা)—পৃঃ ১৫০।

১১৩। *The Travel of a Hindoo*—Bholanath Chunder, Vol. I, p. 151.
বাষ্পীয় কল ও ভারতীয় রেলওয়ে—কালিদাস মৈত্র, পৃঃ ১৩৬।

১১৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬২৫।

১১৫। বর্ধমান সম্মিলনী—পৃঃ ১৫০।

১১৬। *Cont. to the Geo. & Hist. of Bengal*—H. Blochmann, p. 10.

১১৭। *Hobson-Jobson*—Yule & Burnell, (Latest Ed.) p. 130.
"Burdwan, but in its original Sanskrit form Vardhamana, 'thriying prosperous' a name which we find in otolemy (Bardamana), though in another part of India. Some closer approximation to the ancient form must have been current, till the middle of 18th century, for Holwell, writing in 1765, speaks of 'Burdwan', the principal town of Burdomann."

১১৮। বর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ৫৬।

১১৯। বর্ধমান সম্মিলনী, পৃঃ ১৫-১৬।

১২০। শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭১ সাল, পৃঃ ৯৪।

১২১। বর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ১৫।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

প্রাক্-ইতিহাসের ধারা ঃ

বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করে একশ্রেণীর পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলায় কোন সুসভ্যজাতির বসবাস ছিল না। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। সভ্য, সুসভ্য বা অসভ্য—এই শব্দগুলির মাপকাঠি কি? এ ছাড়া উক্ত পণ্ডিতগণ কি উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এ কথা জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। বৈদিক আর্যগণ বা তাঁদের উত্তরসুরিরা যাদের বশীভূত করতে অক্ষম হয়েছিল, সেইসব গোষ্ঠী বা জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল। আর্যসভ্যতা হতে উন্নততর সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল বা কালিবঙ্গানের প্রত্নক্ষেত্রে ও এই সকল সভ্যতাপুষ্ট বসতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সবশেষে আর্যদের দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।[১] এতৎসত্ত্বেও এই সকল সভ্যতা আর্যদের চোখে হীন প্রতিপন্ন হয়েছে; ঋগ্বেদে এর প্রচুর প্রমাণ মেলে।

বাংলার মধ্যে ভূমি বিন্যাস ও অধিবসতির ক্ষেত্রে রাঢ় অঞ্চল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা চলে যে, প্রস্তরযুগ হতে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়ে বাংলা তথা ভারতের মানব সভ্যতার বিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন প্রস্তর আয়ুধের যুগ হতে ঐতিহাসিককাল পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তনের নজিরসমূহ থেকে এক ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। পালজল, সিজুয়া, বীরভানপুর, তুলসীপুর, মহিষদল, ডিহর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, শুশুনিয়া, বনকাটি, রানীগঞ্জ, সুরথরাজার গড়, নানুর, বানেশ্বরডাঙ্গা, সাঁওতালডাঙ্গা, একুয়ার, মঙ্গলকোট, দেপুর, শ্রীপুর, ভরতপুর, গোস্বামীখণ্ড, বালুটিয়া, তাম্রলিপ্ত, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের আশপাশের অঞ্চল, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ এবং বীরভূমের ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর ও অজয় প্রভৃতি নদীসমূহের বিস্তীর্ণ উপত্যকার নানাস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রস্তরযুগ হতে মানবগোষ্ঠী রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করত। অনুরূপভাবে ধাতুযুগেও তাম্রাশ্মীয় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে, যার ক্রমবিবর্তিত রূপ হল নগর সভ্যতা এবং এই সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ ও মঙ্গলকোটে ধারাবাহিক অধিবসতির প্রমাণ।

নৃতত্ত্ববিদগণের মতে আদিম মানব প্রথমে কেবলমাত্র মাংসাশী হয়ে উঠে নাই। কিন্তু এক একটা হিমযুগ অন্তে নিরামিষ জাতীয় খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব ঘটায়, মানুষ বাধ্য হয়ে শিকারের দ্বারা জীবনধারণের উপায় বেছে নেয়। প্রারম্ভিক পর্বে মানুষ নখ ও দাঁতের সাহায্য নিলেও প্রয়োজনের তাগিদে তারা আয়ুধ নির্মাণ ও ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করে। এই সময়ে গাছের ডাল, প্রস্তরখণ্ড, জীবজন্তুর হাড় ও শিং-এর তৈরী শিকারের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

রাঢ়ের প্রত্নতত্ত্ব ও মানবসমাজ :

মেদিনীপুর জেলার লালজল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া এবং পুরুলিয়ার বেলামু পাহাড়ের গুহা-মানবেরা শিকার ও কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাঁসাই নদীর উপনদী তারাফেনী উপত্যকায় লালজল-দেবপাহাড়ে জমাট বাদামী স্তরের ৪০ সে. মি. নীচে প্রাপ্ত নব্যপ্রস্তর যুগের একটি ভগ্ন প্রস্তর বলয় (ring stone) ও কিছু ধূসর লাল রং-এর মৃৎপাত্রের অংশ হতে অনুমান করা হয় যে, সম্ভবতঃ এই স্তরেই নব্যপ্রস্তর যুগের মানবগোষ্ঠীর অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। এই গুহারই অভ্যন্তর থেকে বেশ কিছু হাড়ের অস্ত্র ও বিভিন্ন জীবজন্তুর হাড়ের অংশ পাওয়া গেছে। কচ্ছপের পিঠের শক্ত আবরণের সচ্ছিদ্র অংশ (সম্ভবতঃ মঙ্গলার্থে শরীরে ধারণ করা হোত) এবং শজারুর সচ্ছিদ্র কাঁটা (সম্ভবতঃ সূচ হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকবে) পাওয়া যায়। এই গুহারই অন্য একদিকে একটি প্রস্তর ফলকের শবাধারের মধ্য থেকে অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থাপ্রাপ্ত নরকঙ্কালের অংশ এবং লৌহ-বর্শাফলক পাওয়া গেছে—যে সময়ে মানুষ আবাসগৃহের নির্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় নাই। অতএব প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই গুহায় যে মনুষ্য বসবাস ঘটেছিল সে সত্য এখন প্রতিষ্ঠিত। গুহার বাইরে অন্যদিকে শিলাগাত্রে চিত্রিত (rock painting) পশুটি হরিণ অথবা গবাদিপশুর সমগোত্রীয় এবং রেখার দ্বারা অঙ্কিত সে চিত্রটিতে যে রং-এর ব্যবহার করা হয়েছে, তা লাল, সবুজ ও ক্রীম। এ ধরনের গুহাচিত্রের বয়স নির্ণয় পদ্ধতির উপায় হ'লো সমসাময়িক কালের স্তর বিন্যাসের ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণ বা ঐ স্তরের মধ্য থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর আয়ুধের বয়স নির্ণয়ের দ্বারা। কিন্তু বর্তমানে শিলাচিত্রের সন্নিহিত অঞ্চলের মৃত্তিকাস্তর প্রায় সবটাই জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত চিত্রের বয়স নির্ণয় সম্ভব নয়।[২]

প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ শেষ প্রস্তরযুগে (Late Stone Age) বীরভানপুরে (বর্ধমান জেলা) শিকারজীবী মানুষেরা অধিবসতি স্থাপন করে। প্রস্তরযুগের মানবগোষ্ঠী মূলতঃ ছিল যাযাবর ও পশুশিকারী এবং আরও পরবর্তীকালে খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে উৎপাদনের কলা-কৌশল আবিষ্কারে সক্ষম হয়। নব্যপ্রস্তরযুগে খাদ্য উৎপাদনই জনগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবিকা যার ফলস্বরূপ কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং এই সমাজজীবনের উন্নততর

পর্যায়ে তাম্রাশ্মীয়যুগে সামগ্রিক ভাবে কৃষিজীবিদের দেখতে পাওয়া যায়। কৃষি জীবনের বিবর্তিত রূপ হিসাবে ভারত উপমহাদেশে ধাতুযুগের সূত্রপাতের ফলে পরবর্তী সময়ে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। ধাতু ব্যবহারের প্রাচীন পরিচয় জানা যায় মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান ও লোথালের প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে।

হরপ্পা সভ্যতা তার বিকাশের মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে সরস্বতী ও গাঙ্গেয় অববাহিকার পথ ধরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং পূর্ব ভারতের জনজীবনেও সেই সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব এসে পড়ে। তার ফলে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণ খ্রীঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর কালের মধ্যে তাম্র-প্রস্তাশ্মীয় (chalcolithic) কৃষ্টির অনুসারী জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। একথা বলা যায় যে, সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার কৃষিভিত্তিক উত্তরসূরিগণ রাঢ়ের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহিষদল প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের বিকাশ ঘটায়। এই সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় লোহা ও তামার ব্যবহার, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্পকর্মের সাথে ধর্মীয় প্রেরণা, মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা থেকে। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ ছিল স্থানীয় নগর সভ্যতার ধারক ও বাহকদের পূর্বসূরি। ভারতবর্ষের অন্যান্য তাম্রাশ্মীয় অধিবসতি ক্ষেত্র হতে চাল সংগৃহীত হলেও অন্যান্য খাদ্য বীজেরও সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু বাংলার তৎকালীন অধিবাসীদের মুখ্য খাদ্য ছিল চাল; কারণ খাদ্যবীজ হিসাবে একমাত্র ধানেরই সন্ধান পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত।

মানবগোষ্ঠীর জীবনধারণের পদ্ধতি ও কৃষির অগ্রগতির ক্রমান্বয়ের সামগ্রিক পরিবর্তনের যে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য প্রাকৃতিক প্রভাবেরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আদিম মানব সমাজ ও সংস্কৃতির কোন লিখিত পরিচয় নাই। কেবলমাত্র তাদের দ্বারা ব্যবহৃত বা নির্মিত বস্তু যেমন, হাতিয়ার তৈজসপত্র বাসস্থানের নিদর্শন ইত্যাদি পর্যালোচনা বা পরীক্ষার দ্বারা ক্রমবিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করা যায়।

বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর, এই চারটি জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বাংশ নিয়ে যদি একটা বলয়রেখা অঙ্কিত করা হয়, তা'হলে দেখা যাবে যে, এই বিরাট পরিমণ্ডলে আদিম মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল প্লাইষ্টোসিন যুগে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে সে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা না হওয়ায় প্রকৃত অবস্থা কি ছিল সে সম্পর্কে বর্তমানে সঠিক ধারণা করা যায় না। প্রস্তরা যুধগুলি হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাঢ় অঞ্চলে এক বিশেষ কৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত মানবগোষ্ঠীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এবং এগুলি নির্মিত হয়েছিল তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনে। আবিষ্কৃত পুরাপ্রস্তরযুগের আয়ুধগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা : (১) হাতকুঠার (hand axe), (২) ছেদক (cleaner), (৩) খনত্র (digger), (৪) চাছক (scraper), (৫) ক্ষেপণ গোলক

(bolla)। ক্রমশঃ প্রযুক্তি বিদ্যায় অধিক কৌশলী হওয়ায় বর্শার ফলা (speak point), ছিদ্র করার অস্ত্র (borer), ক্ষুর বা ছুরি জাতীয় অস্ত্র (blade), হাড় বা হাতির দাঁত অথবা হরিণের শিঙে খোদাই করার অস্ত্র (burin) ইত্যাদি তৈরী করে।

এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উক্ত মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রস্তর-আয়ুধসমূহের আবিষ্কার থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুদূর অতীতে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলে ঐ মানবগোষ্ঠীর বিচরণের ক্ষেত্র ছিল। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভিন্সেন্ট বল রানীগঞ্জে কয়লাখনি অঞ্চলে মাকড়া পাথরের (ল্যাটেরাইট) উপরিভাগের মৃত্তিকা থেকে প্রস্তরযুগে নির্মিত হরিদ্রাভ প্রস্তর কুঠার ফলক সংগ্রহ করেছিলেন।[৩] আরও দু'বছর পরে সীতারামপুরের সন্নিকটে একটি খনিতে প্রস্তর নির্মিত কুঠার ফলক পাওয়া গেছে যা ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৪] সম্প্রতিকালে কুনুর নদীর চত্বরে ও বীরভূম জেলার শাল নদীর ধারে কেওরাগ্রামে মসৃণ প্রস্তর কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্ধমান জেলার কাঁকসা অরণ্যের নিকটবর্তী সাতকাহনিয়া, পাণ্ডুরাজার ঢিপি ও মেদিনীপুর জেলার লালগড়ে শিলীভূত গাছের অংশ থেকে নির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমানের অজয় তীরবর্তী বনকাটিতেও অনুরূপ আয়ুধ পাওয়া গেছে।[৫] শিলীভূত কাঠে মানুষের দ্বারা তৈরী যে কোন বস্তু (artified) সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কোন গবেষণা হয় নাই। বাঁকুড়া জেলার বনআশুড়িয়ায় প্রাপ্ত প্রস্তর-কুঠার মসণতার দিকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত প্রস্তরা যুধের সঙ্গে পূর্বভারতে নির্মিত আয়ুধের আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত আয়ুধগুলির গঠন প্রকৃতির মিল আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ ননীগোপাল মজুমদার, দুর্গাপুরে এগেট, চার্ট, যসপার, চালসেডনি ও ফ্লিন্ট পাথরের আয়ুধ লক্ষ্য করেছিলেন এবং উক্ত আয়ুধসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ, অর্ধচন্দ্রাকার, রম্বস প্রভৃতি জ্যামিতিক গঠন পদ্ধতি লক্ষিত হয়েছে। কেবলমাত্র কোন একটা নির্দিষ্টস্থানে আদিম মানবগোষ্ঠী বসবাস করত তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বীরভানপুর, আড়া, বনকাটি, কাঁকসা, সাগরডাঙ্গা, গোপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল হতে ক্রমশঃ অজয়-কুনুর অববাহিকা হয়ে অজয়ের প্রবাহপথ অতিক্রম করে আরও উত্তরে কেতুগ্রাম হয়ে বীরভূম জেলায় সম্ভবতঃ তারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুদূর অতীতে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যে সিংহ, হস্তী, বন্য অশ্ব, মহিষ, জিরাফ প্রভৃতি বন্য জীবজন্তু নির্ভয়ে বিচরণ করত। প্রত্নদ্রব্য সামগ্রী যে সব স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে যে সব স্থান থেকে বর্ধমান জেলার সীমান্ত প্রায় ২৫/৩০ কিঃমিঃ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত।[৬] ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলাস্থ রামগড়ের সন্নিকটে কংসাবতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত সিজুয়া গ্রামে একটি মানব চোয়ালের আংশিক প্রস্তরীভূত অংশ পাওয়া গেছে। এশিয়ায় যে তিনটি স্থানে

নবাকার জীবের প্রাচীনতম নিদর্শন মিলেছে, তার মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শিবালিক গিরিমালা, জাভা ও চীনের চুংকিঙ প্রদেশ অন্যতম। ত্রিভুজাকৃতি এই মহাপরিমণ্ডলের মধ্যে রাঢ়ের অবস্থিতি এবং সহজেই অনুমান করা যায় যে, আদিম মানুষ এই প্রাচীন ভূভাগের সীমানার মধ্যে বসবাস করত। রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যময় উচ্চভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ ব্যতীত মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানার লালজল গ্রামে আদিম গুহামানবের বসতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পলিগঠিত ভূভাগে আদিম মানবগোষ্ঠীর অধিবসতি সম্পর্কে বলা যায়—"নবাশ্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক মসৃণ কুঠার ও অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলির প্রচলন কোন সুনির্দিষ্ট অধিবসতিকে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে সভ্যতার ক্রমন্বয় ধারাকে চিহ্নিত করতে পারে।"[৭]

বীরভানপুর :

বর্ধমান জেলার অজয়-দামোদর অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-গোষ্ঠীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। দুর্গাপুরের সন্নিকটে বীরভানপুর (২৩° ২৯´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭° ১৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) নামক গ্রামে এরূপ একটি প্রত্নক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধসমূহ (Microlithe) প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করছে।[৮] ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে বীরভানপুরের পার্শে নডিহা গ্রামের জমিদার অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় দামোদর নদের উত্তর তীরে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধের সন্ধান পেয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করায় ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট ননীগোপাল মজুমদার এতদঞ্চল পরিদর্শন করে নানাপ্রকার নমুনা সংগ্রহ করেন।[৯] তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৎকালীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক বি. বি. লালের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীলাল এই জেলার কয়েকটি অঞ্চল পরি-দর্শনকালে বীরভানপুর সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু স্বল্প পরিসরে উৎখনন কার্য শুরু হলে চাকরিতে বদলী হয়ে তিনি দিল্লী গমন করায় উৎখনন কার্য স্থগিত থাকে। পুনরায় ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীলালের নেতৃত্বে বীরভানপুর প্রত্নক্ষেত্রে উৎখনন কার্য শুরু হলে ক্ষুদ্রাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি পর্বের ইতিহাস উন্মোচিত হয়। এই উৎখনন কার্য পরিচালনার সময়ে তিনি ১৫ দিন ব্যাপী (২০শে ফেব্রুয়ারী হতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত) দুর্গাপুর অঞ্চলের গ্রামগুলি পরিদর্শন করেছিলেন।[১০]

দামোদর নদের খাতের উত্তর দিক বরাবর সমগ্র প্রত্নস্থলটির বিভিন্ন স্থানে উৎখনন কার্য পরিচালনার দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কার্য অনুষ্ঠিত হয়।[১১] সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এই স্থানের নদীগর্ভের উচ্চতা ১৯৩ ফুট, ষ্টেশন সন্নিহিত অঞ্চলের উচ্চতা ২৬৯ ফুট এবং ষ্টেশন ও নদী খাতের মধ্যভাগের উচ্চতা ২২০ ফুট হতে

২২৬ ফুট পর্যন্ত। অধিবসতি ক্ষেত্রের উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নাংশের মৃত্তিকা অধিক রক্তাভ ও ভূস্তর সুগঠিত। এই স্থানেই ছড়িয়ে ছিল ক্ষুদ্রাশ্মীয় নিদর্শনাবলী এবং ঐ সকল আয়ুধ ব্যবহারকারীদের বসবাসের নিমিত্ত কুটিরের চিহ্নস্বরূপ খুঁটির বহু গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত কোন মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রে পোড়ামাটির তৈরী কোন দ্রব্য বা সংশ্লিষ্ট কোন নিদর্শনাবলীর সন্ধান না পাওয়ায় এগুলিকে প্রাক্-পোড়ামাটি যুগের বা প্রাক্ কৌলালযুগের (pre-pottery age) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১২]

পাঁচটি স্তরে বিভক্ত উৎখনিত প্রত্নক্ষেত্রের সর্বনিম্ন অংশ হতে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের স্তরগুলির ক্রমপর্যায়ের পর্যালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল—

১ম স্তর—শ্বেতাভ ও ক্ষয়প্রাপ্ত বালুকা প্রস্তরের স্তর।

২য় স্তর—ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত প্রাচীন পলিগঠিত স্তর, যা আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবে প্রস্তরের পরিবর্তিত রূপ।

৩য় স্তর—মাকড়া পাথরের গঠিত স্তর।

৪র্থ স্তর—রুক্ষ মোটা দানা সমন্বিত মৃত্তিকা, যেখানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় নিদর্শনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫ম স্তর—হালকা বাদামী রং-এর বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকা।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এক প্রতিবেদনে উক্ত অধিবসতিস্থলের মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, এদের ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় উক্ত নিদর্শনাবলীর নির্মাতাগণ ছিল পশু শিকারী। বাসগৃহের খুঁটির গর্তগুলিও প্রাচীনকালের এবং ঐগুলি প্রত্নস্থলের অধিবাসীগণের কুটিরসমূহের গর্ত বলে অনুমিত হয়। মৃত্তিকার গঠন প্রণালী দেখে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন যে দীর্ঘ আর্দ্রকালের অবসানের পর হেলোসিন পর্বের মধ্যকালে অনুকূল পরিবেশে এই স্থানে অধিবসতি শুরু হয়েছিল। সেই অনুকূল পরিবেশে গহন অরণ্য মধ্যে বিচরণশীল অরণ্যাচারী জীবজন্তু ছিল তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় অর্থাৎ তারা হয়ে উঠেছিল পশু শিকারী এবং অধিবসতি অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে বয়ে যেত প্রবল স্রোত সমন্বিত দামোদর নদ। এরূপ এক নির্মল পরিবেশে নদীতীরে বসবাসকারী ও পশু শিকারজীবী মানবগোষ্ঠী প্রস্তরযুগের শেষ পর্বে দেখা গিয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে তিরুচেন্দুরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিকে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বের বলে নির্দেশ করা হয়েছে; অনুরূপ কারণে বীরভানপুরের ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধসমূহের নির্মাণকালকে একই প্রাচীনত্বে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরে এক আদিম মানবগোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ বর্তমান। নিকটবর্তী দেজুড়ী, মলনদিঘি ও গোপালপুরে অনুরূপ নিদর্শনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রস্তরযুগের শেষ পর্বে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্ম আয়ুধকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর আয়ুধ ছিল পশু শিকারের উপযোগী এবং অপর আয়ুধসমূহ নির্মিত হয়েছিল কৃষিভিত্তিক সমষ্টি জীবনের প্রয়োজনে। মানুষ প্রথমে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে শিক্ষা পায় এবং এই সংগ্রহ প্রবৃত্তি হতে খাদ্যবস্তু উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। আবিষ্কৃত হাতিয়ার সমূহের তালিকা :[১৩]

শ্রেণী বিভাগ	প্রাপ্ত আয়ুধের সংখ্যা	শতাংশ হিসাবে
পাতলা ফলক (Blades)	১০৬ খানা	৩৭.৫
অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ (Lunate)	৪২ „	১৪.৮
তীক্ষ্ণধার আয়ুধ (Point)	৬০ „	২১.২
ছিদ্র করার যন্ত্র (Borers)	১৯ „	৬.৬
খুঁদিবার যন্ত্র (Burins)	১২ „	৪.২
চাঁছিবার যন্ত্র (Scrapers)	৪৩ „	১৫.৩
মোট প্রাপ্ত হাতিয়ার ...	২৮২ „	১০০

হাতিয়ারগুলি প্রধানতঃ মাটির ৩-৪ ফুট গভীরে পাওয়া গেছে এবং এগুলি চার্ট (chart), কোয়ার্টজ (quartz), ক্রিষ্টাল (crystal) বা দানা পাথরে গঠিত।

বীরভানপুরের মাইক্রোলিথিক যুগের মানবগোষ্ঠী জীবনধারণের প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত হয়। সে কারণে এই অঞ্চলের পরবর্তী পর্যায়ের আদিম মানবগোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে পশু শিকারের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন ও খাদ্যোৎপাদন বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। এই পরিবর্তিত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে 'নবপলীয় যুগ' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নবাশ্মীয় সংস্কৃতির আয়ুধসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন আকৃতিতে গঠিত মসৃণ কুঠার। নবপলীয় যুগের নির্মিত মসৃণ কুঠার পশ্চিম রাঢ়ের প্রায় সর্বত্রই আবিষ্কৃত হয়েছে। কাটোয়া শহরে মহকুমা গ্রন্থাগারে এরূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কুঠার সংরক্ষিত আছে।

বীরভানপুর ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান (পশ্চিম ও উত্তর-মধ্যাঞ্চল) ও বীরভুম জেলায় প্রায় ২০-২২টি প্রত্নক্ষেত্রে প্রত্নাশ্মকাল হতে ক্ষুদ্রাশ্মকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নির্মিত কয়েক প্রকার প্রস্তরায়ুধের সন্ধান পাওয়া গেছে। কুঠার ও পশু শিকারের উপযোগী অন্যান্য প্রস্তরায়ুধ ব্যতীত তুরপুন জাতীয় ছিদ্র করার যন্ত্র (awrs) আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার আড়া, সাগরডাঙ্গা, গোপালপুর ও কাঁকসার জঙ্গলে এ-জাতীয় পাথরের অস্ত্র আদিম মানবগোষ্ঠীর শিল্পকলা জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে।[১৪] ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে

রূপনারায়ণ নদের তীরে প্রাচীন তাম্রলিপ্তে উৎখননের সময় একটি নবপলীয় বা নবাশ্মীয় অধিবসতি আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৫] বর্ধমান জেলায় এ যুগের কোন অধিবসতি ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলেও তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রে নবপলীয় পর্বের মসৃণ কুঠার পাওয়া গেছে।[১৬]

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ :

পুরাপ্রস্তর ও শেষ প্রস্তরযুগ অতিক্রম করে আদিম মানব সমাজ এক যুগান্তরকারী সভ্যতার অধিকারী হিসাবে পরিচয় বহন করতে সমর্থ হল। পশু শিকার ও পশুপালনের পর্যায় হতে উন্নীত হয়ে মানুষ সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার ও নির্মাণকৌশল আয়ত্ব করতে সক্ষম হয় এবং আরও পরবর্তীকালে লোহার ব্যবহার তাদের আয়ত্বাধীন হওয়ায় সীমিতক্ষেত্রে ঐ যুগের মানুষ যন্ত্রসভ্যতার সূচনা করে যা পরবর্তীকাল হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ক্রমপর্যায়ে উন্নততর হয়। যেমন সূচাগ্র ফলাযুক্ত হাতিয়ার (points of stone or bone or antler) বা ছেদক (clever celt, axe etc.) ইত্যাদি।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তামার বস্তুর নির্মাণকৌশল ও ব্যবহারের যুগকে তাম্রাশ্ম বা তাম্রাশ্মীয় যুগ নামে অভিহিত করেছেন। তামা ও লোহাকে একত্রে যখন মানুষ তার প্রয়োজনে লাগাতে সক্ষম হল, সে যুগকে প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষায় তাম্র-লৌহের মিশ্র যুগ (Chalco-Ferrow Cultural Period) বলা উচিত। কারণ আরও পরবর্তীকালে ধাতু হিসাবে লোহা যে সময়ে প্রধান স্থান অধিকার করে সে যুগ লৌহযুগ নামে অভিহিত হয়েছে।[১৭]

পাণ্ডুরাজার ঢিবি :

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীক্ষক প্রয়াত দেবকুমার চক্রবর্তী ও ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় অজয় নদের দক্ষিণ তীরে পাণ্ডুক (২৩° ৩৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭° ৩৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) নামক গ্রামে (জে.এল. নং ৫২) তাম্রাশ্মীয় যুগের কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বর্গীয় দাশগুপ্ত কর্তৃক উক্ত স্থান পরিদর্শনকালে কিছু কোশী পাত্র, ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র; কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎভাণ্ডের অংশ আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ হাসমুখ ধীরাজলাল সাঙ্কালিয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের শতবার্ষিকী উৎসবে উক্ত নিদর্শনাবলী দেখে ঐ স্থানটি উৎখনন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রত্নক্ষেত্রটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তীকালের উৎখননের সময় ডঃ সাঙ্কালিয়া, বি. বি. লাল, ডঃ ওয়াই. ডি. শর্মা প্রমুখ বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদগণ পাণ্ডুরাজার ঢিবি পরিদর্শন করেছিলেন।

ভেদিয়া রেল ষ্টেশন হতে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে আউসগ্রাম থানায়

পাণ্ডুক গ্রামে এই প্রত্নক্ষেত্রটি অবস্থিত। জনশ্রুতি এরূপ যে, উক্ত স্থানে পাণ্ডু বা পাণ্ডুদাস নামে এক রাজার গড ছিল এবং ঐ গডটি বর্ত্তমানে একটি বিশাল ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। পাণ্ডুক গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে উচ্চ ভূভাগটি 'রাজাপোতার ডাঙ্গা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে; এই স্থানে পাণ্ডুরাজার প্রাসাদ ছিল এবং নিকটবর্ত্তী খটনগর (জে. এল. নং ৪৯) গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে 'বারাসত' নামক স্থানে উক্ত রাজার ধর্ম্মাধিকরণ ও সৈন্যাবাস ছিল, এরূপ প্রবাদ আছে। এই ডাঙ্গাটির সকল অংশই প্রাচীন ইঁটে পূর্ণ এবং ঐ সকল ইঁটের আয়তন বৃহৎ, কিন্তু পাতলা। রাজাপোতাডাঙ্গার সর্বোচ্চ অংশ ইট ও পাথরে পরিপূর্ণ ছিল, যা প্রাচীন কোন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়। ১৩১৮ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ অজয়ের প্রবল বন্যায় এই ডাঙ্গার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হতে কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছিল। ঐ মুদ্রার এক পৃষ্ঠে রাজমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্তি অঙ্কিত। রাজমূর্তির নিম্নে গুপ্ত-ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শব্দসমূহ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"নরেন্দ্রগুপ্ত।"[১৮] রাজারপোতাডাঙ্গা বর্তমানে "পাণ্ডুরাজারঢিপি" নামে পরিচিত। অতীতে অর্থাৎ প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বে বাংলার সুধীজন উক্ত স্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও এইঢিবির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও উক্ত বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন নাই। উপরোক্ত প্রবন্ধটি বর্ধমান শহরে যে সভায় পঠিত হয়েছিল, সেখানে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার যদুনাথ সরকার, ননীগোপাল মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, যোগেশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বঙ্গের দিকপালগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ঢিবির উপরিভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হতে কণিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল; শোনা যায় উক্ত মুদ্রাটি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে মোট চারবার এই ঢিবিতে উৎখনন কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৯] উৎখননের ফলে অজয় নদের তীরে যে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুরাজার ঢিবি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একটা অন্যতম প্রাচীন জনবসতির গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

প্রথম স্তরটি ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ হতে ১৫ ফুট নিম্নে। হয়ত আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত কারণে বালুকা-প্রস্তর অসংলগ্ন মাকড়া পাথরে পরিণত হয়েছে এবং মাকড়ার দানা মিশ্রিত এই রক্তাভ ভূমিতে প্রথম তাম্রযুগের অধিবসতি স্থাপিত হয়।[২০] প্রথম স্তরের উত্তর পাশ দিয়ে অতীতে একটি নদী প্রবাহের অস্তিত্ব রয়েছে এবং ঐ লুপ্ত খাতের দক্ষিণ তীরে অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। আদিম স্তর বা প্রথম স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে উক্ত মানবগোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায় তার নিদর্শনগুলি হল[২১]—

১। ঈষৎ লালচে অথবা ধূসর রং-এর হাতে তৈরী মৃৎপাত্র যা যথেষ্ট প্রাচীনত্বের দাবী রাখে।

২। হালকা বাদামী রং এর কলস, যার বহিঃভাগ তুষের ছাপ সমন্বিত ; কৃষি-বিজ্ঞানীদের মতে উক্ত তুষ কৃষিশ্রেণীভুক্ত ধান্যের খোসা।

৩। কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণের মৃৎপাত্র, লোহিতোজ্জ্বল ও খয়েরী মৃৎপাত্র।

৪। অভ্রমিশ্রিত বালি মৃত্তিকায় গঠিত হাঁড়ি-কলসী। নদীর পলি হতে এরূপ হাড়ি কলসী নির্মিত হলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্রের দানা (অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে অভ্রচূর্ণ মৃত্তিকার পাত্র তৈরীর সময় মেশানো হোত, কারণ অভ্রের তাপ পরিবাহিতা বেশী) উক্ত পাত্রের বহির্ভাগে দেখা যায়।

৫। প্রথম স্তরে সমাধির মধ্যে ৬টি করোটীবিহীন শব পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে শায়িত এবং এই কঙ্কালগুলি পাওয়া গিয়েছিল লালচে দানা ও ছোপ সমন্বিত বালুকাপ্রস্তরের উপর।[২২]

প্রথম স্তরের উপরিভাগে বালুকারাশি দেখে অনুমিত হয় যে, অজয়ের প্রবল প্লাবনের ফলে এই অধিবসতিটি ধ্বংস হয় এবং কিছুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। শব-দেহগুলি হতে করোটিচ্যুতি কারণের এখনো পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

বীরভূম জেলায় মহিষদলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর অঙ্গার চতুর্দশ (C-14) পরীক্ষান্তে জানা গেছে, এই সভ্যতা খ্রীস্টপূর্ব ১২৮৫±১০৫ অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। সে কারণে অনুরূপ প্রত্নবস্তুর নমুনা হতে বলা যায় যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম স্তরের সভ্যতা আজ হতে প্রায় ৩৫০০০ বৎসরের প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। প্লাবনজনিত কারণে সর্বনিম্ন অধিবসতি স্থানটি কিছুকাল পরিত্যক্ত হওয়ার পর ঐ পরিত্যক্ত ভূমিতে নূতন অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় স্তরের অধিবসতি ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর নিদর্শন হতে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন যে, এই সময়ে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল।

এই যুগের মৃৎপাত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল এক ধরনের থালার ভগ্ন অংশ যার নিম্নভাগ পিলসুজের ন্যায় ফাঁপা দণ্ডের ওপর স্থাপিত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে অনুরূপ পিলসুজাকৃতি মৃৎপাত্র (dish-on-stand) আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের যুগে ব্যবহৃত অন্যান্য মৃৎপাত্রের মধ্যে প্রবাহনালীযুক্ত মৃৎভাণ্ড বা কোশীপাত্র (chanel spouted bowl) শ্বেতাভ ও কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল মৃৎপাত্র, প্রায় স্বচ্ছ ঘি ও সাদা রঙে আঁকা লাল-কালো মৃৎভাণ্ড ও কলস, বহুছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্র (বর্তমানে ব্যবহৃত সহস্রধারা) ও শিরস্ত্রাণের আকৃতিতে গঠিত (helmet shaped) লাল-কালো মৃৎপাত্র। অন্য একটি মৃৎপাত্রে উড়ন্ত পক্ষীর চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

ধাতু আবিষ্কারের বহু পূর্ব হতে মাটিকে প্রয়োজনমত হাতে বা ছাঁচে ঢেলে

গৃহস্থলীর প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে রূপদান করে রোদে শুকিয়ে অথবা আগুনে পুড়িয়ে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সুন্দর কলাকৌশল সে যুগের মানুষের আয়ত্তাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে পাথর অপেক্ষা পলিমাটির প্রাচুর্য যথেষ্ট এবং সে কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের জন্য মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। দুর্গ, রাজগৃহ ও দেবালয় নির্মাণের জন্য মাটির তৈরী ইট রোদে শুকিয়ে এবং কাঠের আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আরও পরে বাস্তব জগতের দৃশ্যাবলী খোদাই করে বা ছাঁচে ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে 'টেরাকোটা আর্ট'র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় স্তরে আবিষ্কৃত নয়টি মানব সমাধির বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব অসীম। এই স্তরে আবিষ্কৃত কুম্ভ-সমাধি ভারতবর্ষ, পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাপ্ত সমাধিগুলির মধ্যে একই স্থানে দুটি শিশু ও তিনটি পূর্ণবয়স্ক শবের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে যেগুলির কঙ্কালসমূহের পায়ের নিম্নাংশ কাটা; এ কারণও কিন্তু অজ্ঞাত।[২৩] ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ও তাম্রনির্মিত দ্রব্যের মধ্যে আছে অলঙ্কার, চুড়ি, কাজলকাঠি, আংটি, মৎস্য শিকারের বঁড়শী, বর্শাফলক ইত্যাদি। কর্তনের নিমিত্ত অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীও আবিষ্কৃত হয়েছে। পুঁতি ও তামার তৈরী কর্ণাভরণ হ'ল উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। হাড়ের তৈরী বর্শাফলক ও তীরের অগ্রভাগ, মৃগশৃঙ্গ হতে নির্মিত তীর ও হাড়ের তৈরী হারপুন, যেগুলি এযুগের মানুষের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই পর্বে অপর একটি আশ্চর্য প্রত্নবস্তু হল সচ্ছিদ্র জলহস্তীর দাঁতের উপস্থিতি। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন যে, সেটি মাদুলির ন্যায় ব্যবহৃত হত। শিমূল তুলায় নির্মিত সরু সুতায় বোনা কাপড়ের ছিন্নভিন্ন অংশ ও পোড়ামাটির গোল তকলি হতে অনুমান করতে কোন অসুবিধা হয় না যে, ঐ যুগের মানুষ বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল এবং তারা সম্ভবতঃ নিজেদের তৈরী বস্ত্র পরিধান করত।

অধিবসতি ক্ষেত্রের অধিবাসীগণ যে পশুপালন করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমগ্র অধিবসতি ক্ষেত্রে গৃহপালিত ও বন্যজন্তুর কঙ্কালের অস্তিত্ব থেকে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর এবং বন্য জন্তুর মধ্যে বন্য বরাহ, নীল গাই, হরিণ ও বিভিন্ন পক্ষীকুলের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই যুগের মানবগোষ্ঠী যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্বীয় বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়ণে যে সকল উপাদানের সাহায্যে সেটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল, বর্তমান দুনিয়ায় তা সাধারণ ব্যাপার হলেও আলোচ্য যুগে এটি সত্যই বিস্ময়কর। গৃহতলগুলি ছিল ল্যাটেরাইট কাঁকর পেটা অথবা চুনের আস্তরণ দেওয়া। অধিবসতি অঞ্চলে কাঠের খুঁটির গর্ত, ছেঁচা বাঁশ (বাঁশকে লম্বালম্বিভাবে চিরে প্রস্তুত করা হয়), কাঠকুটোর চিহ্ন ও ছাপওয়ালা পোড়ামাটির কাজ দেখে সহজেই অনুমিত হয় যে, এই সকল গৃহ ছিল কাদার তৈরী এবং কাঠ ও বাঁশের খুঁটির সাহায্যে নির্মিত। একটি পরিখায় দুটি একই ধরনের লালচে মেঝের মধ্যে একটি হলুদ রং-এর

সরু পথ অথবা উঠানের অংশ দেখা গেছে। ব্যবহৃত গৃহগুলি ছিল গোলাকার, আয়তাকার ও বর্গাকার, যেগুলির ছাউনীতে পাতার ব্যবহার দেখা যায়। পুঁতি, তামা ও অ্যাগেট পাথরের ব্যবহার থেকে অধিবাসীগণের সাজসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। মহিষদলের অনুরূপ পোড়া চাল আবিষ্কার হতে অনুমিত হয় যে, একই সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণে হয়ত একই অঞ্চলে অবস্থিত দুটি সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল! লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, দুটি প্রত্নক্ষেত্রের ব্যবধান ১৫/১৬ কিঃমিঃ এবং ধ্বংসের কারণও একই বলে অনুমান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তরে একটি সমাধির নিকট প্রাপ্ত একখণ্ড পোড়া কাঠ-কয়লা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্যামদাস চট্টোপাধ্যায় তেজস্ক্রিয় অঙ্গার (Radio-carbon) পদ্ধতিতে পরীক্ষান্তে এই স্তরের সময় নির্ণয় করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব ১২১০±১২০ অর্থাৎ, এই স্তরের অধিবসতি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পাণ্ডু-রাজার ঢিবিতে প্রথম পর্বের সভ্যতাটি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতিকালে তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু লক্ষ্ণৌ-এর বীরবল সাহানী ইনস্টিটিউট হতে কার্বন চতুর্দশ (C-14) পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, তৃতীয় স্তরের সভ্যতার স্থিতিকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে। তাহলে দ্বিতীয় স্তরের সভ্যতার উন্মেষকাল ন্যূনপক্ষে আরও তিনশত বৎসর পূর্বে ধরা উচিত, যা কিনা বিজ্ঞান-সম্মত ও ঐতিহাসিক যুক্তিগ্রাহ্য। এই প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্ববিদ কৃষ্ণস্বামীর মূল্যবান অভিমত থেকে জানা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় এই সভ্যতার উত্থান হয় আরও অতীতে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের মধ্যে বিরাট সময়ের ব্যবধান থাকা সম্ভবপর। হয়ত প্লাবনের পর দীর্ঘকাল প্রত্নস্থলটি পরিত্যক্ত ছিল।

উৎখনিত ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ দ্বিতীয় স্তরের অনুরূপ। কিন্তু প্রত্নবস্তুসমূহের গঠন ও গুণগত মানের বিচারে দুই পর্বের পার্থক্য লক্ষিত হয়। ঢিবির সর্বোচ্চ চূড়ার ঢালু অংশে তৃতীয় যুগের এক সারি চুনের প্রলেপ দেওয়া আবিষ্কৃত উনানের মধ্যে ভস্ম ও অস্থিখণ্ড ছিল। এই ধরনের সুবিন্যস্ত উনান মধ্যপ্রদেশের নাভদাতোলীতেও আবিষ্কৃত হয়েছিল। পূর্বযুগের ন্যায় এই স্তরে বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তৃতীয় যুগে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উর্বরতার প্রতীকস্বরূপ একটি পোড়ামাটির ভগ্ন মাতৃমূর্তি, একটি গজদন্ত নির্মিত চিরুণীর অংশ, একটি অক্ষত শ্বেতবর্ণে চিত্রিত প্রবাহনালীযুক্ত লাল-কালো রং-এর মৃৎভাণ্ড। আবিষ্কৃত অন্যান্য মৃৎপাত্রগুলির নক্সা দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষা উন্নততর। এই স্তরেও মৃত্তিকায় নির্মিত পশুর প্রতিকৃতি, কয়েকটি মস্তকবিহীন পশুর পোড়ামাটির প্রতিকৃতি দীর্ঘ কণ্ঠ পক্ষী, যা দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে ময়ূর। এই স্তরে গৃহপালিত পশুর মধ্যে স-ককুদ বৃষ,

গৃহপালিত শুয়োর ব্যতীত সম্বর হরিণ, মোরগ, মহিষ, বন্য ছাগলের হাড়, সাধারণ রত্ন প্রস্তর, তাম্র নির্মিত কানের দুল ও অন্যান্য অলঙ্কার ঐ যুগের মানুষের প্রসাধনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির চতুর্থ স্তরের নিদর্শন থেকে ঐতিহাসিক যুগের যে সূচনা হয়েছিল এমন অনুমান করা হয়। এই স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাল, কালো ও ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের সমারোহ এবং বিভিন্ন আকারের অলঙ্কারের নিদর্শনও দেখা যায়। মৃৎপাত্রগুলির গায়ে কাঁচা অবস্থায় নক্সা কেটে যে পোড়ানো হয়েছিল তা রেখাগুলির রঙের স্থায়িত্ব দেখে অনুমান করা যায় ঐ রেখাগুলি পোড়ানোর পূর্ব অবস্থায় অঙ্কিত। মৃৎপাত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল হাঁড়ি, হাতলযুক্ত কড়াই, অল্পচাপা অগভীর চওড়া পাত্র। মৃৎপাত্রের গায়ে রঙ্-এর প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটি নিচু কানাবিশিষ্ট পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ব্যবহারজনিত কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত। জল সঞ্চয়ের নিমিত্ত বড় মৃৎপাত্র ব্যবহার করা হত, কেননা এই স্তরে মেঝের ওপর দুটি গর্তে মোটা দানার নদীর বালি ছিল অর্থাৎ, বালির উপরে মৃৎপাত্র বসানোর রীতি ছিল। হাপরযুক্ত যে উনানটি পাওয়া গেছে তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, সেটি ধাতব পদার্থ নির্মাণের জন্য ব্যবহারের উপযোগী ছিল এবং উক্ত ধারা অনুসরণ করে এ যুগের কর্মকারগণও হাপরযুক্ত উনান ব্যবহার আয়ত্ত করেছে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির উপরিভাগে পোড়া ইঁটের স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে উৎখননকারীগণ অনুমান করেন যে, এট দশম-একাদশ শতকে নির্মিত। মনে হয় পরবর্তীযুগে মুসলমান অভিযানের সময় এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য এর কোন সঠিক কারণ জানা যায় না। তবে সৈয়াদ বুখারী কর্তৃক এই অঞ্চল অভিযানের কথা শোনা যায়। এই ঢিবির সংরক্ষিত অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাস্তার ধারে একটি বৃক্ষের নীচে অনুরূপ আগুনে পোড়া ইঁটের তৈরি স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উৎখননকারীগণের মতে এটি বৌদ্ধ, হিন্দু অথবা দুই ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত কোন উপাসনাস্থানের ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকের কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তিও পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে বিষ্ণুলোকেশ্বর মূর্তিও আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এই ঢিবির সন্নিহিত পূর্বে যে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটি দেখা যায়, সেখানে দু'টি বিষ্ণুমূর্তি আছে, যা অনেকে দশম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। বর্তমানকালে ঐ ধ্বংসাবশেষের উপর আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে চণ্ডীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

একটি বিতর্কিত শীলমোহর :

পূর্বোল্লিখিত পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় স্তরে আবিষ্কৃত স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত শীলমোহরটি প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রাপ্ত গোলাকৃতি শীলমোহরটির সামান্য অংশ ভগ্ন। শীলমোহরের ঊর্ধ্বাংশে ৮টি রেখা-

চিত্র এবং নিম্নাংশে তিনটি পৃথক চিত্র খোদিত আছে। মাইকেল রিডলে নামক এক ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ শীলের লিপি ও চিত্র পরীক্ষা করে মন্তব্য করেছিলেন যে, শীলটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ক্রীট দ্বীপ হতে আগত। উপরের রেখা চিত্রগুলি ক্রীট দ্বীপের সুপ্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতার রেখালিপি, যা ইংরাজীতে Linear 'A' script এবং নিম্নভাগের চিত্রলিপিটি ঐ দ্বীপের ফ্যেষ্টোস নামক স্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চাকতিতে খোদিত এক ধরনের চিত্রলিপি। মিনোয়ান সভ্যতার দুই ধরনের রেখালিপির মধ্যে Linear 'B' script-এর পাঠোদ্ধার করেন মাইকেল ভেন্টিস ও চ্যাডউইক নামক লিপিবিশারদদ্বয়। 'A' লিপির পাঠোদ্ধার কেউই করায়ত্ত করতে পারেন নাই। কিন্তু মাইকেল রিডলের মতে সেটি মিনোয়ান লেখলিপি অনুসারে A E T E A, যা আতিয়া নামক এক গ্রীক নাবিকের নাম অথবা ঐ শব্দটির তিনটি অংশ AE, TEE ও AH যথাক্রমে যার অর্থ জল, মাছ ও শিরস্ত্রাণ। তাঁর মতে খ্রীস্টপূর্ব্ব ১৫০০ অব্দে বাংলা সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। রিডলের ভাষায় বলা যায়,[২৪]—

"Having obtained the phonetic sounds from the script i.e. Ae Te A we can now reasonably assume that these sounds can be assigned to the pictographic signs. There are three phonetic sounds and three pictographs, we can therefore safely assign the three sounds to the three pictographs (the water, fish and helmet). As it is possible that the pictographs are read from top to bottom, we can give the sign of water (Symbol) the sound Ae, the fish the sound Tee, and the helmet (Symbol) the sound A.

This is the first time that it has been possible to assign the CRETAN pictographs with definite phonetic sounds, it is also the first time an inscription of pictographs and LINEAR 'A' script has been read...

I date the seal of AETEA circa 1500 B.C. Stratigraphical evidence suggest the Phaistos Disc to be circa 1700 B.C.

This seal together with Minoan type vases from Tamralipta, the helmet shaped vase, terracotta boat and other finds from Pandu Rajar Dhibi, point to a strong link between India and Crete during the middle of the second millenium B.C."

এ প্রসঙ্গে প্রীতিমাধব রায়ের মন্তব্যে জানা যায়, যে সমস্ত কারণে রিডলে শীলটিকে মিনোয়ান লিপি বলে মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে একটি হল অঙ্কনভঙ্গী। অথচ মিনোয়ান শীলগুলির স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠ চিত্রভঙ্গীর সঙ্গে পাণ্ডুরাজার শীলের

শিল্পগত উৎকর্ষের কোন মিল নাই বরং শীলের উপর আঁকা মাছের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইষ্টার দ্বীপপুঞ্জের বঙ্গো চিত্রলিপির মাছের সাদৃশ্য বেশী। মিনোয়ান সভ্যতার আবিষ্কারক ইভান্স ও ভেন্ট্রিদের মতে ফেস্টোস চাকতি ক্রীটসে এসেছিল অন্য কোন স্থান হতে এবং ঐ চিত্রলিপি থেকে মিনোয়ান রেখাচিত্রলিপির সৃষ্টি হয় নাই। কেননা ক্রীটে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক শীলের কোনটিতেই যখন একই সঙ্গে চিত্রলিপি ও রেখালিপির ব্যবহার ছিল না। ক্রীট হতে ঐ যুগে নাবিকদের বঙ্গদেশে আসার কোন বাহ্যিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তিনি আরও বলেছেন যে, অঙ্গার-চতুর্দশ পরীক্ষান্তে জানা গেছে দ্বিতীয় স্তরের কাল নিরূপিত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব একাদশ শতকে। সম্প্রতিকালে তৃতীয় স্তরের প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর কাল নিরূপিত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকে। তা'হলে সাতশত বৎসরের ব্যবধানের প্রত্নবস্তুকে সমকালীন বলে দাবী করা যায় না। অথচ 'খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মিনোয়ান লিপির প্রচলন ছিল না। সেলিবিস দ্বীপের বুগীলিপির সঙ্গে শীলের লিপির আশ্চর্য মিল আছে। ব্রাহ্মীগোষ্ঠির এই লিপি কম জটিলতাপূর্ণ। পাণ্ডু-রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রে এই ধরনের রেখাপাত আছে। তাঁর মতে, রেখালিপির পাঁচটি অক্ষরকে বাম দিক হতে সাজালে যথাক্রমে পাওয়া যায়— ন, দ, ঙগ, ক, ত এবং শব্দটি নিঃসন্দেহে সংস্কৃত শব্দ—নদঙ্গ কতঃ। নদঙ্গ শব্দের অর্থ নদীতে বা নদীর সহ যা চলে এবং কতঃ শব্দের অর্থ নির্মলী ফল যা জল পরিষ্কার করে। অবশ্য শীলের উপর অক্ষরগুলি খোদাই-এর কারণ অনুমান করা কঠিন। শীলটি যেহেতু খ্রী: পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর এরান মুদ্রা বা মৌর্যলিপি অপেক্ষা প্রাচীন, সে কারণে এটিকে প্রাচীনতম লিখিত সংস্কৃতের উদাহরণ বলে গণ্য করা যায়।

তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে সে যুগে বাংলার সঙ্গে ক্রীটের সভ্যতার যোগাযোগ প্রমাণিত না হলেও বৃহত্তর ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে, এমন কি অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। জঁপ্রিলুস্কি, সিলভাঁ লেভী, কান, ফ্রেচার, গার্ডিনার, ফেরান্ড, ক্যালেন, ফেলস, হেইন, গেলড্রেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অষ্ট্রিক ভাষার প্রসার, অষ্ট্রালয়েড জাতির মানুষের নৌকার গঠন, ধানের চাষ, পাথরের অস্ত্র নির্মাণরীতি প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনান্তে প্রমাণ করেছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। প্রস্তর-পূজা, টোটেম-যাদু ও শৈবধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। কাজেই ইতিহাসের আগের যুগে সেলিবিস দ্বীপের অধিবাসী বুগীরা আর অজয় উপত্যকার বাঙ্গালীরা একই লিপি ব্যবহার করত, এমন ধারণাকে আর সম্পূর্ণ আজগুবি বলা চলে না।[২৫]

কিন্তু উৎখননকারী দলের নেতা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, রিডলের মতকেই সমর্থন করেছেন। তাঁহার মতে শীলের মধ্যস্থলে অবস্থিত মাছটি প্রকৃতপক্ষে হাতুড়িমুখো হাঙর, যখন তাকে উপর থেকে দেখা যাবে। উত্তর সাগর এবং অন্যান্য সমুদ্রে বিচরণশীল এই প্রাণীর চিত্রণ যে বিস্মৃত কালের নাবিকদের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নাই।[২৬]

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত শীলমোহরটি অধ্যাপক বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী কর্তৃক অন্যভাবে পঠিত হয়েছে। তিনি উৎকর্ষ রেখালিপিগুলিকে 'পণ্যভূম'রূপে পাঠ করেছেন ; উৎকীর্ণ চিত্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল,[২৭]—

"There is no pictographic writing in the seal. It depicts only a landscape having mountains, rivers and isles which rouse the idea that the country refused to in the seal extended from the mountains to the isles with a riverine land in between."

তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও উল্লেখযোগ্য—প্রাপ্ত শীলটির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মিল আছে। নাগার্জুনকোণ্ডা ও উরযুরে প্রাপ্ত লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাপ্ত শীলমোহরটির উৎসস্থল সম্বন্ধে স্বর্গত ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও সন্দেহ পোষণ করে মন্তব্য করেছেন যে, 'এই পর্বে এ ধরনের বিস্তৃত বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্য কোন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।[২৮] কিন্তু ডঃ অতুল সুর রিডলের মতকে সমর্থন করেছেন এবং তাঁর মতে এই স্থানে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[২৯]

নরগোষ্ঠীর পরিচয় :

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল ১৪টি মানব-সমাধি এবং সমাধিগুলির মধ্যে ৬টি প্রথম যুগের এবং বাকি ৮টি দ্বিতীয় যুগের। প্রাথমিক পর্যায়ে মৃতদেহগুলি সরাসরি শায়িত অবস্থায় ছিল। মৃতদেহগুলি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত অর্থাৎ পূর্ব দিকে মাথা এবং পদদ্বয় পশ্চিম দিকে লম্বমান। এই যুগের কঙ্কালগুলি সবই মুণ্ডহীন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্ত্যেষ্টিকর্মের সময় মৃতদেহ উন্মুক্ত অথবা অন্য কোন অবস্থায় রাখার পর সেই কঙ্কাল অথবা সামান্য অস্থি সমাধিস্থ করা হত। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি দুই যুগেই অপরিবর্তিত। দ্বিতীয় যুগের কঙ্কালগুলির মধ্যে একটি কঙ্কালের পায়ের নিম্নাংশ কাটা। ভারতীয় নৃতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বিশেষজ্ঞগণের মতে কঙ্কালটি ছিল ত্রিশ বৎসর অথবা তদূর্ধ বয়স্ক কোন পুরুষের। এই সমাধিটিকে আংশিক সমাধি বলা হয়েছে। অপর একটি সমাধিক্ষেত্রে ৩০ বৎসর বা তদূর্ধ বয়স্ক কোন নারীর অস্থিগুলিকে একত্র করে, তার উপর পশ্চিমমুখী অবস্থায় স্থাপিত করা হয়েছে তার করোটি এবং এর নিকটেই একটি সচ্ছিদ্র লাল রং-এর মৃৎভাণ্ডের অংশ পাওয়া গেছে। ঢিবির পশ্চিম প্রান্তে

একটি পরিখায় পাওয়া গেছে প্রথম যুগের স্তরে দুটি ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকা ও তিনটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের দেহাবশেষ। এ ছাড়া একটি মৃৎপাত্রের ভেতর মাত্র একটি কশের দাঁত আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩০]

ভূ-অভ্যন্তর ভাগে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ সঠিকভাবে কোন্ নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণীত হয় নাই। স্থানটি সাঁওতাল অধ্যুষিত, তাই ঐ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। কঙ্কালগুলি একজন পূর্ণবয়স্ক সাঁওতাল অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতির। তাদের নাকের আকৃতি সাঁওতালদের ন্যায় হলেও মস্তিষ্কের গঠন লম্বাকৃতির। তবে ধাতুর ব্যবহার, নগর বা গ্রাম পত্তনের ধারায় তাদের সমাজজীবন ছিল সাঁওতালদের থেকে পৃথক। এই অঞ্চলের নরগোষ্ঠীর (অতীত ও বর্তমান) দৈহিক কাঠামোর নিম্ন প্রদত্ত তুলনামূলক তালিকা থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অসুবিধা আছে।

'Character	PRD	Brahmin	Uttar R. Kayastha	Bagdi	Ruidas/ Moochi	Santal
Stature	1685·20	1650·43	1683·00	1570·00	1613·94	1606·00
Head Length	180·75	182·13	185·00	180·38	178·09	182·60
Head Breadth	126·50	140·96	142·20	135·92	137·18	141·00
Nasal Height	44·00	50·70	46·70	47·08	47·94	46·40
Cr. Index	70·12	77 40	76·96	75·35	77·03	77·22

Present day populations of Burdwan district have been compared with the ancient inhabitants of Pandu Rajar Dhibi. The Uttar Rarhi Kayasthas are as tall as the people of Pandu Rajar Dhibi. In head length all the samples are close to Pandu Rajar Dhibi except the Uttar Rarhi Kayasthas which is longer. But in head breadth the ancient population of Pandu Rajar Dhibi are distinctly shorter than others. This fact remains true even if the margin for soft tissues is taken into account for the Pandu Rajar Dhibi skulls. Consequently, the shape of Pandu Rajar Dhibi skulls appears more long headed in comparison to others. In nose height Pandu Rajar Dhibi skulls are shorter.'[৩১]

পাণ্ডুরাজার ঢিবি সহ জেলার অন্যান্য তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কৃত নিদর্শনাবলী ও অধিবসতির চিহ্ন থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক হতে এই স্থানের মানবগোষ্ঠী যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে।

কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের নির্মাণ কৌশল ও ধাতুর ব্যবহার তাদের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার ধারাকে যে উন্নত পর্যায়ে উত্তোলিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নাই।

বাণেশ্বরডাঙ্গা :

ভাতার থানার অধীনে ও ভাতার রেলষ্টেশন হতে ৮ কি:মি: পূর্বে বড়বেলুন গ্রামের বাণেশ্বরডাঙ্গায় প্রাপ্ত তাম্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণিত হয় যে, অপরাপর অঞ্চলে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই প্রত্নস্থল আবিষ্কার ও প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র দামোদর ও অজয় নদের তীরভূমি অঞ্চলেই তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে নাই, জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে খড়্গেশ্বরী বা খড়ি নদীর গতিপথে (অবশ্য অতীতে এটি ছিল দামোদরের শাখা নদী) ঐ যুগের মানবগোষ্ঠীর অধিবসতি স্থাপিত হয়েছিল।

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে বাণেশ্বরডাঙ্গার শিবমন্দির পরিদর্শনকালে প্রত্নক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীক্ষক স্বর্গীয় দেবকুমার চক্রবর্তী সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রায় তিনমাস ব্যাপী উৎখনন কার্য পরিচালনার ফলে সুদূর অতীতের এক মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হতে পাণ্ডু-রাজার ঢিবির সমগোত্রীয় এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। উৎখননকালে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির সাধারণ কৌণিক পানপাত্র, কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের মধ্যে বহির্মুখী কানা সমন্বিত ভাণ্ড, অন্যান্য সাধারণ নিদর্শনগুলির মধ্যে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত বেলেমাটির রুক্ষ পাত্র বিশিষ্ট হাঁড়ি বা কলস এবং লৌহনির্মিত তরবারির ভগ্ন অংশ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক পর্বে মানবগোষ্ঠীর বসতি স্থাপিত হয়েছিল রক্তবর্ণের ছোপ সমন্বিত বালুকাময় ও পাললিক স্তরের মৃত্তিকার উপর। ৩নং পরিখায় ঢিবির উপর থেকে প্রায় ১৬ ফুট নিচে এই যুগের গৃহতল-সমূহের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কৃত হয়। এই গৃহতলগুলির আকৃতি ও পরিচয়যোগ্য খুঁটির চিহ্নগুলি ছোট আকারের কুঁড়েঘরের নিদর্শনস্বরূপ বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের বালুকাময় স্তর হতে প্রমাণিত হয় যে, কোন এক সময়ে দামোদরের শাখা নদী অথবা দামোদরের (কেউ কেউ অনুমান করেন যে সুদূর অতীতে দামোদর এই পথে প্রবাহিত হত) প্লাবনজনিত কারণে বালুকারাশি এই অঞ্চলকে আবৃত করেছিল।[৩২]

বাণেশ্বরডাঙ্গার দ্বিতীয় যুগে পুরাবস্তুসমূহের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে। দ্বিতীয় যুগের অধিবসতি স্তরে আবিষ্কৃত কৃষ্ণলোহিত বর্ণের কৌলালের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল—[৩৩]

১। সস্তম্ভ থালির (ডিস-অন স্ট্যানড) ভগ্নাবশেষ।

২। পানপাত্রের ন্যায় ক্রমঃ সঙ্কীর্ণ পাত্রের অংশ।

৩। দু'শ্রেণীর কোশী পাত্র।

৪। সুডৌল কলস।

৫। বহির্মুখী ধারাল কানা সমন্বিত ভাণ্ড।

৬। ফুলের টব বা টিউলিপ ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট পাত্র।

৭। বহির্মুখী ও বৃত্তাংশের ন্যায় উঠে যাওয়া কানা সমন্বিত কলস।

এই স্থানে তৃতীয় যুগে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী পূর্বতন সংস্কৃতি অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ের। মোরামপেটা অথবা চুনের আস্তরণ দেওয়া মেঝেয় তাম্রাশ্মীয় যুগের মৃৎপাত্র, ৪নং ট্রেঞ্চের প্রায় ১০ ফুট নিম্নে একটি ভারী লৌহপিণ্ড ও বাসগৃহ প্রভৃতি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাজজীবন ছিল কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া ডিম্বাকৃতি চুল্লী, পোড়া ইটে নির্মিত ক্ষুদ্রায়তন বেদী (সম্ভবতঃ ধর্মীয় বেদী), কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্রের প্রকৃতি দেখে অনুমিত হয় যে, তৃতীয় পর্বের পর অধিবসতিস্থল দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত ছিল।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ঢিবির শীর্ষদেশে ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষটির উপর প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবের চারচালা মন্দির। বেশ প্রাচীন এই দেবমন্দিরে সংযুক্ত মকরমুখী নালীটি স্বভাবতই পালযুগের কোন কীর্তি তথা ধ্বংসাবশেষের যে অংশ ছিল তারই সাক্ষ্য দেয়। মন্দিরের ভিত্তিমূলে ইটের স্থাপত্যটির প্রাচীনত্ব প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বের। বিভিন্ন ইটের শ্রেণীর আয়তন (বৃহদাকার ইটও আছে) এবং নির্মাণ পদ্ধতির কৌশল ঐ সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাণেশ্বরডাঙ্গার পশ্চিম অংশে ইটের তৈরী বৃত্তাকার স্থাপত্যটি সম্ভবত বৌদ্ধ বা জৈন স্তূপ বলে অনুমান করা হয় এবং হয়তো ঐ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর কোন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হলে উক্ত ভিত্তিবেদীতে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।[৩৪]

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে মহিষদলে বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত কাঠকয়লাসমূহ অঙ্গার চতুর্দশ (C-14) পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বি-সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে এই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সে কারণে অনুরূপ নিদর্শনাবলী হতে নিঃসন্দেহে বলা যায় খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে খড়্গেশ্বরীর তীরে ও বাণেশ্বরডাঙ্গার এই অধিবসতিটি গড়ে উঠেছিল। উৎখননকারীর ভাষায় বলা যেতে পারে—"একদা বিস্মৃত অতীতে সে যুগের জনকোলাহল মুখরিত এই লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষ পুনর্বার প্রমাণ করে বাংলার অতিবাহিত তাম্রযুগের জনসমষ্টির আপন রুচি ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে।"

সাঁওতালডাঙা ঃ

জেলার মধ্যাঞ্চলে অপর একটি প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শন হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কৃষিজীবী ও পশুপালনকারী মানবসমাজ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করেছিল। ভাতার থানার আমারুণ রেল-

স্টেশনের কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে খড়্গেশ্বরী নদীর তীরে আরাগ্রামের সন্নিকটে সাঁওতালডাঙ্গার ক্ষয়প্রাপ্ত ঢিবি হতে প্রাচীন যুগের একই কৃষ্টির কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই স্থানে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার সঙ্গে সুপরিচিত কৃষ্ণ-লোহিত কলসের মধ্যে সংরক্ষিত অস্থির অবশেষ ও তাম্রনির্মিত চুড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভগ্ন কলসের মধ্যে অস্থি সংরক্ষণের নিদর্শনটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরিচায়ক। অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর-দক্ষিণে শায়িত এক মানবসমাধি এবং তৎসংলগ্ন অন্ত্যেষ্টিজ্ঞাপক একটি কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের ভগ্ন কলস এবং কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র ব্যতীত অন্যান্য নানা আকৃতির মৃৎপাত্র, রত্নপ্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন পুঁতি এবং শেষ প্রত্নাশ্মীয় ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধের নিদর্শনাবলী। এই সকল আয়ুধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা প্রস্তরপিণ্ড ও শল্ক ফলাকা দেখে অনুমিত হয়েছে যে, এই নদীর তীরে উপরোক্ত অস্ত্রাদিসমূহ পশুশিকার ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী ছিল।[৩৫]

আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রে কিন্তু অধিক পরিমাণে পুরাবস্তু পাওয়া যায় নাই। মনে হয় সন্নিকটবর্তী খড়্গেশ্বরী নদীর প্রবল বন্যায় উক্ত নিদর্শনাবলী ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকার সঙ্গে ভেসে গেছে। সাঁওতালডাঙ্গার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শন হতে অনুমান করা সঙ্গত হবে যে, এই অধিবসতি ক্ষেত্রে প্রথম যুগে প্রত্নাশ্মীয় ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ব্যবহারকারীগণ বসবাস করেছিল এবং পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলেই তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে উঠে। অধ্যাপিকা শ্রীমতী অমিতা রায়ের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এই স্থানে ঢিবি দুটির মধ্যে প্রথম ঢিবিটির আয়তন ১৫০ বর্গগজ এবং নদীখাত হতে এর উচ্চতা ৩০ ফুট। ঢিবির উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং তার নীচে শক্ত মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রত্নবস্তুসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রাপ্ত কঙ্কালের অবস্থা অতিশয় জীর্ণ। ঢিবির উপরিভাগে পোড়ামাটির পুতুল, সাধারণ রত্নপ্রস্তর, ক্ষুদ্রাশ্মীয় কুঠার, ও আংটীসহ তাম্রনির্মিত কিছু দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ঢিবিটি, প্রথমটি অপেক্ষা আয়তনে ছোট এবং উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত কম। এই ঢিবির উপরিভাগ সমতল, কিন্তু পূর্বভাগ ঈষৎ ঢালু হয়ে নদীর তীরে হঠাৎ নেমে গেছে। দ্বিতীয় ঢিবিতেও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, পোড়ামাটির দ্রব্য, তাম্রখণ্ড ও তাম্রপিণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্থানে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের অবস্থিতি প্রায় অনুপস্থিত; কিছু উজ্জ্বল মৃৎপাত্র এই স্থানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু। সম্ভবতঃ এই নিদর্শনগুলি তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার দৃষ্টান্ত নয়। হয়ত মধ্যযুগে পুনরায় এই অঞ্চলে অধিবসতি গড়ে উঠেছিল।[৩৬]

ধাতুর ব্যবহার :

পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের সময় আবিষ্কৃত লৌহ নির্মিত দ্রব্যসহ একটি প্রাচীন তরবারি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পর্কে স্বর্গতঃ

দাশগুপ্তের মন্তব্য হল,—"During the excavation of 1964 it was dicisively proved that iron was known and probably melted at this site, side by side with the use of copper and microliths in period III in a chronological horizon around 1000 B.C."[৩৭] তাঁর মতে, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার শেষ অধ্যায়ে চিত্রিত মৃৎপাত্র, প্রবাহনালীযুক্ত মৃৎভাণ্ড, পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্র, নব্যপ্রস্তর কালের কুঠার, তামার অলঙ্কার ও লৌহনির্মিত অস্ত্র—সবই এক সঙ্গে ব্যবহার হত।

উপরি-উক্ত মন্তব্যের পর বিষয়টি যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে ও তাঁর এই মন্তব্যটি সমালোচিত হয়েছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় স্পষ্টই বলেছেন যে,[৩৮] ঐ সময়ে পূর্বাঞ্চলে লৌহের ব্যবহার ছিল না। তবে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই জেলার দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমা, বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও মানভূম জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে আকরিক লৌহ পাওয়া যায় এবং বহু প্রাচীন-কাল হতে আকরিক লৌহ ব্যবহারিক কার্যে নিয়োজিত হত। সম্প্রতিকালে সিংভূম জেলার খোওামৌজা গ্রামের পরিত্যক্ত ভূমিতে বহু লোহা তৈরীর চুল্লীর সন্ধান মিলেছে। বিশেষভাবে এই অঞ্চলে অসুরগড়ে হাজার হাজার পরিত্যক্ত লোহা তৈরীর চুল্লী পাওয়া গেছে।[৩৯] সুয়াতার একটি পরিত্যক্ত ঢিবিতে ছোট ছোট লৌহ পিণ্ড দেখা গেছে।[৪০] রাঢ় জনপদের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও সন্নিহিত বিহার রাজ্যের তাম্রখনি হতে সংগৃহীত তামা সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বেও ব্যবহৃত হত।[৪১]

লৌহের ব্যবহার সম্পর্কিত সন্দেহ অবসানের নিমিত্ত, এই দশকে (১৯৮৪-৮৫) পরীক্ষামূলকভাবে নমুনা সংগ্রহের জন্য পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখনন কার্য পরিচালিত হওয়ায় এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকভাবে কালের ক্রমবিন্যাস জানা যায়।[৪২] উদাহরণস্বরূপ:

১। আদি যুগ—খ্রীস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দ হতে খ্রীঃপূঃ ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত।

২। তাম্রাশ্মীয় যুগ রূপে চিহ্নিত খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ হতে খ্রীঃপূর্ব ৯০০ অব্দ পর্যন্ত।

৩। মিশ্র যুগ—(তাম্র ও লোহার ব্যবহার দেখা যায়) খ্রীস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ হতে খ্রীস্ট পূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

৪। এই যুগে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের কৌলাল ব্যতীত বিভিন্ন জীবাশ্মর হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের অস্তিত্ব খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ হতে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের মধ্যে ছিল।

৫। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্ব খ্রীস্টপূর্ব ২০০ অব্দ হতে ২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিস্তৃতি ও কালানুক্রম প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির সর্বস্তরের কাঠকয়লা নিয়ে অঙ্গার-চতুর্দশ (সি-১৪) পরীক্ষা করা হয় নাই বা পরীক্ষার পূর্বে যে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, সেই পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয় নাই। মহিষদলে স্তর বিন্যাসের তুলনামূলক কালানুক্রম:[৪৩]

প্রাচীন লৌহযুগ—খ্রীস্টপূর্ব ৬৯০ অব্দ।
শেষ তাম্রাশ্মীয় যুগ—খ্রীস্টপূর্ব ৮৫৫ অব্দ।
প্রাচীন তাম্রাশ্মীয় যুগ (টি. এফ.-৩৯২)—খ্রীস্টপূর্ব ১০৮৫ অব্দ।
ঐ —(টি. এফ.-৩৯১)—খ্রীঃপূঃ ১৩৮০ অব্দ।

তুলসীপুর উৎখননের পর ডঃ হংসমুখ ধীরাজলাল শাংকালিয়া উক্ত মত সমর্থন করেছিলেন। পঞ্চম স্তর বা প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের ব্যাপ্তিকাল যদি খ্রীস্টপূর্ব হতে ২০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়, তা'হলে অনুমান করা যেতে পারে যে, পাটলিপুত্রে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য অথবা শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে রাঢ়দেশ বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত হওয়ায় বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন সম্পদশালী জনপদসমূহ বিশাল সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মহিষদল, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত পোড়া চাল হয়ত এই ইঙ্গিতই বহন করছে।

সর্বশেষ (১৯৮৪-৮৫) উৎখননটির বিশেষত্ব হল এই যে, এই সময়ে আবিষ্কৃত নিদর্শনাবলীর মধ্যে লৌহ ও লৌহনির্মিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর হাড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরে তাম্রের নিদর্শনসহ লৌহের ব্যবহার আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের লোহা গলানোর ভাটিতে সংযুক্ত পোড়ামাটির নল, কাস্তে, অর্ধভগ্ন তরবারি, ভগ্ন থালার অংশ (দৈর্ঘ্য ৬২ মিঃমিঃ, প্রস্থ ১৮ মিঃমিঃ ও ২ মিঃমিঃ পুরু), ব্রোঞ্জ নির্মিত কানের মাকড়ির আবিষ্কার হতে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে ধাতুবিদ্যা ও তার ব্যবহার ঐ যুগের মানুষের আয়ত্তাধীন ছিল। শ্রীসুধীন দে ও শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, একই সঙ্গে তামা ও লোহার নিদর্শন যে স্তরে পাওয়া যাচ্ছে সেই যুগকে তাম্রাশ্মীয় যুগের পরিবর্তে মিশ্র ধাতব যুগ বলাই সঙ্গত। রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে,[৪৪] "This is again important to mention that iron technology was quite popular in Eastern India, during 1200 B. C.—900 B. C. This also satisfies technologically an early iron age in Eastern India."।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনতিদূরে বর্ধমান, বীরভূম ও মানভূম জেলায় ঐশ্বর্যময় আকরিক লোহার খনি অবস্থিত এবং এই স্থানের জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হত। লৌহপিণ্ড ও লৌহনির্মিত দ্রব্যগুলি দুর্গাপুর ও রাঁচীর ইস্পাত কারখানায় পরীক্ষিত হয়েছে এবং ঐ লোহার প্রায় ১১০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছিল। লোহা আবিষ্কারের পর এই সভ্যতার কালপঞ্জীকে নূতনভাবে সাজান যেতে পারে।[৪৫]

স্তর বিন্যাস	সংস্কৃতির পরিচয়/ যুগ	ভূপৃষ্ঠ হতে স্তরের গভীরতা (মিঃ)	প্রাচীনতা
১	প্রাক-তাম্রাশ্মীয় যুগ	৮	খ্রীস্টপূর্ব ১২৫০ অব্দের পূর্বে

*২ক	তাম্রাশ্মীয় যুগ	৭·৫	খ্রীস্টপূর্ব ১২৫০-১০৫০ অব্দ
২খ	মিশ্র-তাম্রাশ্মীয় যুগ	৬	খ্রীস্টপূর্ব ১০৫০ -৯৫০ অব্দ
*৩ক	মিশ্র-তাম্রাশ্মীয় যুগ	৫	খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতক
৩খ	লৌহ যুগ	৩	খ্রীস্টপূর্ব ৬৩০-৪৫০ অব্দ
৪	প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ (মৌর্য-হতে গুপ্ত যুগ)		খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-৬০০ খ্রীস্টাব্দ
৫	পাল-সেন যুগ	১	অষ্টম-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত
৬	মধ্যযুগ	ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে	দ্বাদশ শতকের পরবর্তীকাল

* চিহ্নিত স্তরগুলিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির অঙ্গার-চতুর্দশ পরীক্ষার দ্বারা কাল নিরূপিত হয়েছে। ২য় স্তরের প্রত্নবস্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও তৃতীয় স্তরের প্রত্নবস্তু লক্ষ্ণৌ-এর বীরবল সাহানি ইনষ্টিটিউটের শ্রীরাজা গোপালন কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছে।

রাঢ়ে লোহার ব্যবহার ও নিষ্কাশনের অপর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে। অতি সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত লোহা গলানোর চুল্লী ও পদ্ধতির বিষয়ে শ্রীসুধীন দের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। মেদিনীপুর জেলার লালজল হতে ১.৫ কিলোমিটার দূরে পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধানের সময় আয়তাকার একটি চুল্লীর সন্ধান পাওয়া যায়। অসুরগোষ্ঠী যে পদ্ধতিতে লোহা গলাতো এখানেও অনুরূপভাবে লোহা গলান হত বলে মনে করা হয়। মাটির উপর জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে তার উপর আকরিক লোহা ঢেলে দিয়ে একটা স্তূপ তৈরী করা হত। পরে স্তূপটিকে আগাগোড়া কাদামাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হত এবং আগুন জ্বালানোর সময়ে বাতাসের অভাবে চুল্লীর মধ্যে যাতে আগুন নিভে না যায় তার জন্যে সচ্ছিদ্র পোড়ামাটির নল (Tuyere) দুই স্তরে চুল্লীর চারপাশে সাজান হত। প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত লোহা চুল্লীর বাইরে জমা হত।

রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন পদ্ধতিতে লোহা গলানোর নিদর্শন পাওয়া গেলেও এখানে অসুর জাতির পরিবর্তে সাঁওতালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে অনুমান করা যায় যে, এতদঞ্চল হতে তারা সাঁওতালদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ বিহারে চলে যেতে বাধ্য হয়। 'অসুর উপকথা' হতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আভাস মেলে। সম্ভবতঃ 'অসুর কহনী' হতে বর্ধমান জেলার সাতকাহনিয়া (থানা, কাঁকসা) গ্রাম-

নামের উদ্ভব হয়েছে। অসুর প্রবাদে লোহাসুরের উপদেশে লাল তীর ছুড়ে লৌহআকর সন্ধানের কাহিনী কি বর্ধমানের লাল মাটিকে (ল্যাটেরাইট) স্মরণ করিয়ে দেয় ? ঋগ্বেদে আর্য ও অসুরের বিরোধ এবং শিব ও বিষ্ণুর দ্বন্দ্বের পৌরাণিক কাহিনীটি মুণ্ডা (বিষ্ণুর উপাসক) ও অসুরদের (শিবোপাসক) বিবাদকে কেন্দ্র করেই হয়ত গড়ে উঠেছিল।[৪৫ক]

প্রাচীন জীবজন্তু :

সম্প্রতিকালে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ) শ্রীসুধীন দে বিহার পুরাবিদ পরিষদ (পাটনা) কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নক্ষেত্রগুলি হতে প্রাপ্ত জীবজন্তুর হাড় সম্পর্কিত এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনাচক্রে তিনি পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত মাছের কাঁটা ও জীবজন্তুর হাড়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর মাছ ঐ যুগের অধিবাসীগণের খাদ্য তালিকায় ছিল। মোরগ, সককুদ গৃহপালিত জন্তু (সম্ভবত: গরু), মহিষ, ছাগল, শূকর প্রভৃতি জীবজন্তুর হাড়ের নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, ঐ শ্রেণীর জীবকে পাণ্ডুরাজার ঢিবির অধিবাসীরা পোষ মানিয়েছিল এবং ঐ যুগের আবহাওয়ায় এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জীবের অস্তিত্ব ছিল। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাম্রাশ্মীয় যুগে মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, দুধ ও মাংস এবং মৃত জীবজন্তুর হাড়ের নমুনা দেখে অনুমান করা যায় যে, তারা এই হাড়গুলি শিল্পকর্মে ও শিকারের নিমিত্ত ব্যবহার করত। শ্রীদের ভাষায় বলা যায়—[৪৬]

"The identified bone remains of different species have been compared with these of the present which provides the evidences of close resemblence. All these species are mainly of hot humid plains living on vegetation. The huge quantity of bone remains of fishes belonging to the family Bagridae (cat fishes) and caprinidae (carps), along with the pieces of plastron of flap shelled aquatic turtle testify that the rivers and natural reservoirs of water were in affluent candition and the areas (relating ferro-chalcolithic culture) were inundated regular by rains. The bone remrins of jungle fewl, para deer, swampdur and jackle from Pandu Rajar Dhibi also testify that the habitate of all these animals and bird was the scrub jungles, and forested areas were also covered with grassy plains in the vicinity of the protohistoric habitation. But majority of animals disappeared from this area long time ago since the jungles decreased."

ভরতপুর ঃ

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বুদবুদ থানার অধীনস্থ ভরতপুর (২৩°২৪´ উঃ অঃ ও ৮৭°২৭´ পূঃ দ্রাঃ) গ্রামে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে স্বল্প পরিসরে উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়েছিল। প্রত্নস্থলটি পানাগড় হতে ৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহ-অধিকর্তা সুশান্ত মুখোপাধ্যায় হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করায় ১৬ বছর পূর্বের উৎখনন কার্যের এখনও কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। তবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভাগীয় মুখপত্রের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সর্বনিম্ন স্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ এবং তার উপর স্তরে তামার দ্রব্য, জীবজন্তুর হাড়ের তৈরী ব্যবহারিক দ্রব্য, নানা রঙ-এর পুঁতি ও অলংকার, বিভিন্ন রং-এর বিচিত্র গঠনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃৎপাত্রসমূহের গঠন ও রং-এর ব্যবহার দেখে এগুলিকে পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদলে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর অনুরূপ বলে দাবী করা হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামের কিউরেটার শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত-র নিকট হতে অবগত হওয়া যায় যে, সর্ব নিম্নস্তরের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ের, যা অঙ্গার-চতুর্দশ (C-14) পরীক্ষান্তে তার সমর্থন মিলেছে। একই মন্তব্য পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তও করেছেন[৪৭] যে, বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে অবস্থিত ভরতপুরের তাম্রাশ্মীয় যুগ যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিসহস্রকের মধ্যভাগে অতিবাহিত হয়েছে তা সম্প্রতিকালে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে রেডিও-কার্বন পরীক্ষার দ্বারা। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, ভরতপুরের ঢিবিতে উৎখননের ফলে যে সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে তা পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমপর্যায়-ভুক্ত এবং ভরতপুরের অদূরে দামোদরের ২ কিঃ মিঃ দক্ষিণে বাঁকুড়ার পোখরনায় আবিষ্কৃত হয়েছে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার অপর একটি প্রত্নক্ষেত্রে।[৪৮]

এই স্থানে উৎখননের ফলে চারটি স্তরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং স্তরগুলিতে বিভিন্ন সময়ের ব্যবহৃত ও নির্মিত প্রত্নবস্তু হতে অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক তথ্য জানা যায়।

১। প্রথম সাংস্কৃতিক স্তরে অর্থাৎ সর্বনিম্নভাগে হরিদ্রাভ মৃত্তিকার উপর ক্ষুদ্রাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্রিত মসৃণ পাত্র, সাধারণ কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র, কাল রং-এর পাত্রের উপর লাল রঙের অলঙ্করণ, ঘিয়ে রং-এর উপর নানা রং-এর অলঙ্করণ, যা মহিষদল ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও মিলেছে। মৃৎপাত্রসমূহের বহির্ভাগে ঢেউ খেলান, উপর-নীচে ও তেরছা নক্সা রেখা চিত্রিত আছে। অন্যান্য প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে হাড়ের তৈরী হাতিয়ার, শাখা যুক্ত হরিণের শৃঙ্গ, নবাশ্মীয় কুঠার, ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, রত্ন-

প্রস্তর নির্মিত পুঁতি আবিষ্কৃত হলেও তাম্রনির্মিত কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। স্বল্প পরিসরে উৎখননের ফলে কোন অধিবসতির চিহ্ন মেলে নাই।

২। দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক স্তরটি হল প্রথম স্তরের ক্রমবিকাশ মাত্র। এই স্তরে উত্তর ভারতীয় চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলালের অংশসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্তরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে মুক্তাঙ্গনে ৫০ সেঃমিঃ ব্যাসযুক্ত একটি উনান ও এর কিছুটা উপরে প্রাক-গুপ্তযুগের মৃৎপাত্র, লৌহসহ অন্যান্য ধাতু এবং কঙ্করময় বালুকাস্তরের উপর কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। তৃতীয় স্তরের নিদর্শনাবলী হতে অনুমান করা হয় যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সভ্যতার ক্ষেত্রে সময়ের অনেক ব্যবধান ছিল। এই স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শন-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বস্তু হল, ব্যবহৃত ইটগুলি রোদে শুকিয়ে গাঁথা হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ এটি গুপ্তযুগের নির্মিত স্থাপত্য বলে অনুমান করা হয়।[৪৯]

৪। চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তরটি ঐতিহাসিক যুগের উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু ও এই স্তরে পঞ্চরথাকৃতি একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। স্তূপের ভিতটি দেখে অনুমান করা হয়েছে যে, এটি ব্যবহৃত ইটের দ্বারা নির্মিত অর্থাৎ কোন ভগ্ন অট্টালিকা হতে ইঁটগুলি সংগ্রহ করে পুনরায় স্তূপে ব্যবহার করা হয়েছে। দামোদরের প্লাবনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবসতিটি মনে হয় দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং পরবর্তীকালে এই স্থানে বৌদ্ধস্তূপটি নির্মিত হয়েছিল।[৫০]

আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রটি ভরতপুর ও মণিরামপুর গ্রামের মধ্যে হলেও ভরতপুর মৌজায় (মৌজা নং ২) অবস্থিত হওয়ায় স্তূপটি ভরতপুরের স্তূপ নামে খ্যাত। স্তূপটির আয়তন ১২.৭৫ মিটার × ১২.৭৫ মিটার। বর্গাকার আয়তনের ইষ্টক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপটির চতুর্দিক কারুকার্য খচিত এবং বৃহদাকার কুলঙ্গিতে ভূমি স্পর্শমুদ্রায় পদ্মাসনের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলির গঠন ও ভাস্কর্য রীতি হতে অনুমিত হয় যে, এগুলি অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল। স্তূপটি সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল।[৫১] আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ বা সংঘারামটি দেখে এই স্থানের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে প্রাচীন সংস্কৃতির যোগাযোগ ছিল বলে মনে হলেও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত কোন প্রচেষ্টা হয় নাই।

বৌদ্ধস্তূপটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১০ মিটার × ১০ মিটার পরিসরে খাত খনন করে দেখা গেছে যে বর্গাকার স্তূপের নিম্নমুখী ধাপগুলি পোড়া ইঁটে নির্মিত হলেও ভিত্তিমূল কাঁচা শুকানো ইঁটের তৈরী।[৫২] সর্বনিম্ন অংশে স্বাভাবিক মৃত্তিকা স্তরের উপর হলদে আভাযুক্ত ১ মিটার পুরু বালিমাটির স্তর। মনে হয় শক্ত এঁটেল মাটিতে ইঁটের গাঁথুনির স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকার জন্য ভূমিভাগ বালি দিয়ে ভর্তি করার রীতি ছিল। তারপর বালির উপর চুনাপাথর ও পাথরের নুড়ি বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কাঁচা ইঁটের ভিত নির্মাণ করা হয়েছিল।

ভিতের উপর আগুনে পোড়া ইটের দ্বারা স্তূপটির গঠনকার্যের সমাধান হয়েছিল। গাঁথুনির মশলার জন্য বালি ও চুনের ব্যবহার ছিল। ইটের আয়তন ছিল দু'শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা ৩০×২৮×৭ সেঃমিঃ ও ৪৮×২১×৬ সেঃমিঃ। দু'রকম ইটের ব্যবহার হতে অনুমান করা হয় যে, কোন প্রাচীন সৌধ হতে সংগৃহীত ইঁট (৩০×২৮×৭ সেঃ মিঃ) পুনরায় এই স্তূপের নির্মাণকার্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। স্তূপের উদ্গত অংশ পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত এটিকে ইহার পঞ্চরথাকৃতি স্থাপত্য বলা হয়। গাঁথুনির বহির্ভাগে চুনের প্রলেপ ব্যবহারের চিহ্ন দেখা যায়। দেওয়ালের বর্ধিত অংশে কুলঙ্গির মধ্যে বেদীর উপর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের মোট কুলঙ্গি সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর না হলেও ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট ৬টি কুলঙ্গিতে যে বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলির আকার হল, যথাক্রমে ২৯×১৮×৫½ সেঃমিঃ, ২৮×১৯½×৫ সেঃমিঃ, ২৮×১৮×৫½ সেঃমিঃ, ২৭×১৫×৫ সেঃমিঃ, ৩০×২১×৭ সেঃমিঃ ও ২৩×১৪×৫ সেঃমিঃ। এছাড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নরম বালি পাথরের কয়েকটি বৌদ্ধমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান এই যে, স্তূপটির স্থাপত্য নিদর্শন ওড়িশার রত্নগিরি স্তূপের অনুরূপ। সর্বসাকুল্যে মোট এগারটি বুদ্ধমূর্তি (তন্মধ্যে ২টি ভগ্ন) আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫৩]

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথিতে 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ'-এর উল্লেখ আছে।[৫৪] সমগ্র রাঢ়ে, আলোচ্য স্তূপটি ব্যতীত অপর কোন বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয় নাই। সে কারণে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ এই ভরতপুরেই তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

বিবিধ প্রত্নক্ষেত্র :

পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলা অপেক্ষা বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থলের সংখ্যা অধিক। পূর্বোক্ত প্রত্নস্থল ব্যতীত এই জেলার বিভিন্ন স্থান হতে প্রাচীন যুগের প্রস্তরায়ুধ, মৃৎপাত্র ও ধাতুনির্মিত সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে। এ পুরাবস্তুগুলি পাওয়া গিয়েছিল আকস্মিকভাবে এবং পরবর্তীকালেও এ ধরনের সংগ্রহ ব্যতীত অপর কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

অজয়-কুনুর অববাহিকায় অজয় নদের দক্ষিণতীরে কাঁকসা থানার বনকাটিতে একটা বৃক্ষের জীবাশ্ম (wood fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পুরাপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং এ জাতীয় শিকারের উপযোগী হাতকুঠার ব্রহ্মদেশের অনিয়াথিয়ান কৃষ্টির সমগোত্রীয় বলে অনুমান করা হয়। এই বৃক্ষজীবাশ্ম নির্মিত আয়ুধের বয়স আনুমানিক দেড় লক্ষ হতে দু'লক্ষ বছর।[৫৫] বনকাটিতে মধ্যপ্রস্তর যুগের ও নব্যপ্রস্তর যুগের বহু প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে,

যেগুলি বীরভানপুর কৃষ্টির সমগোত্রীয়। বনকাটির পশ্চিমে অর্থাৎ কয়লাখনি অঞ্চলে কার্বোনিফেরাস যুগের জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনতিদূরে গোস্বামীখণ্ডের (২৩° ৩৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭° ৩৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) মাঠের মধ্যে মাকড়া পাথরের এক বিশাল স্থাপত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নস্থলের দক্ষিণে আউসগ্রাম থানার সমৃদ্ধশালী ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার অবস্থিতি। সমগ্র প্রত্নস্থলের আয়তন হ'ল ২১.১৫ মিটার × ১১.৪০ মিটার এবং তন্মধ্যে দেবায়তন বা স্তূপটি ৮.৪০ মিটার × ৬.২৫ মিটার পরিমিত স্থান জুড়ে আছে। দেবায়তনটি ল্যাটেরাইট পাথরের জমাট খণ্ড দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং স্থাপত্যটির দেওয়ালে সংস্কারের চিহ্নও দেখা গেছে। স্থাপত্যের নিম্নদেশে প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিকে দশম শতকের বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল শিখিবাহন কার্তিকেয় ও একটি সূর্যমূর্তি। এখানে প্রাপ্ত শিরস্ত্রাণ পরিহিত মানুষ্যমূর্তির মস্তকটি পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত এক প্রাচীন মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মূল স্তূপের দক্ষিণে ইটের তৈরী বেদীতে ঠেস দিয়ে বসার ব্যবস্থাও ছিল (বেঞ্চের আকৃতির)।[৫৫]

সাতদেউলিয়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি জৈনমূর্তির পৃষ্ঠপটে ১৪৮টি তীর্থঙ্করের মূর্তি শোভিত ফলকটি খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকের বলে অনুমান করা হয়।[৫৬] গলসীতে দুটি উঁচু ঢিবিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মৃৎপাত্র সংগৃহীত হয়েছে। খণ্ডঘোষে প্রাপ্ত প্রাচীন যুগের মৃৎপাত্রগুলি যথেষ্ট মূল্যবান উপাদান। মেমারী থানার মণ্ডলগ্রামের একটি প্রাচীন ঢিবি ও রাইগ্রামের সন্নিকটে হাতীপোতার ডাঙায় লাল-কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র ও গাঢ় লাল রঙ-এর পাত্রে কৃষ্ণবর্ণের পালিস করা মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমান থানার মায়া নদীর তীরে কল্যাণপুর গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মৃৎপাত্র ব্যতীত ঐতিহাসিক যুগের অন্যান্য নিদর্শনাবলী পাওয়া গেছে।[৫৭] মণ্ডলগ্রামের ঢিবিটি প্রত্নতত্ত্বের দিক হতে বিচার করলে একটা সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পুরাক্ষেত্রে পরিণত হতে পারত; কিন্তু সরকারীভাবে উৎখননের জন্য কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। ১৯৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দে অ্যার্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার (কলিকাতা শাখা) পক্ষ হতে ডঃ বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাইগ্রাম পরিদর্শনকালে মধ্য-যুগের স্থাপত্য নিদর্শনসহ বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন।[৫৮]

আড়াগ্রামে ভূপৃষ্ঠের ১.৯১ মিটার গভীরে ১ নং টেঞ্চের পঞ্চম স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু (Charcoal) সি-১৪ পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে (খ্রীস্টপূর্ব ৯১০ অব্দ) উক্ত স্থানে অধিবসতি ছিল।[৫৯] কেতুগ্রাম থানার পাঁচুন্দী গ্রামে বহু হিন্দু ও জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মূর্তিশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান। রাজুয়াবাসী মহম্মদ আয়ুব হোসেনের নিকট রক্ষিত বালুটিয়া গ্রামে প্রাপ্ত কৃষ্ণবর্ণের স-নাল পানপাত্রটি তাম্রাশ্মীয় যুগের সমগোত্রীয়।

এই পানপাত্রটির বহির্ভাগে দুটি খাঁজ আছে। দামোদর নদের উত্তর অববাহিকায় পানাগড়ের নিকটস্থ শিউলীবুড়ির ডাঙ্গাতে ক্ষয়প্রাপ্ত ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে তাম্রাশ্মীয় যুগের কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রসহ বহু চিত্রিত মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত নিদর্শনাবলীর সমগোত্রীয়।[৬০] একুয়ার গ্রামে যক্ষের ডাঙ্গা বা যখেরডাঙ্গায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলি তাম্রাশ্মীয় যুগের বলে অনুমান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক স্থানটি সমীক্ষা করার সময়ে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র, ঈষৎ লাল রঙ-এর চিত্রিত মৃৎপাত্র, নবাশ্মীয় ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ সংগৃহীত হয়েছিল।[৬১] গুসকরার সন্নিকটে ধনটিকরীর একটা ঢিবির উপরিভাগেই কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে চিত্রিত পাত্র, স-নাল পানপাত্র ও ঈষৎ লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬২] ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, গঙ্গাডাঙ্গা ও মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ও মৃৎপাত্রসমূহের সঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও সুরথরাজার ঢিবিতে (বীরভূম) প্রাপ্ত নিদর্শনের সাদৃশ্য আছে।[৬৩] পাণ্ডুরাজার ঢিবি হতে ১০ কিঃমিঃ পূর্বে কুনুর নদীর উত্তর তীরে বসন্তপুর (২৩°৩৩´ উঃ অঃ ও ৮৭°৪১´পূঃ দ্রাঃ) গ্রামের ঢিবিতে ও গঙ্গাডাঙ্গায় ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধসহ প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমগোত্রীয় বলে মনে করা যেতে পারে। দুর্গাপুরের সন্নিকটে গোপালপুর গ্রামে প্রস্তরযুগের শেষ পর্বের প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া গোস্বামীডাঙ্গা, ধনটিকরীডাঙ্গা, বসন্তপুর, রাজারডাঙ্গা, কালিকাপুর ও গঙ্গাডাঙ্গায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি তাম্রাশ্মীয় কৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের গুণগত মান, গঠনপ্রণালী ও রঙ-এর ব্যবহারের সঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির তুলনা করা চলে এবং বসন্তপুরে তামার পিণ্ডও আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬৪]

মঙ্গলকোট :

বর্ধমান শহর হতে ৩২ কিঃমিঃ উত্তরে প্রাচীন বাদশাহী সড়কের ধারে অজয়-কুনুর অববাহিকায় মঙ্গলকোট থানা এলাকার অন্তর্ভুক্ত মঙ্গলকোট গ্রামটি অবস্থিত। প্রত্নক্ষেত্র হিসাবে গ্রামটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, যা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিরল। মঙ্গলকোটের ইতিহাস কেবলমাত্র রাজা বিক্রমকেশরীর পূজিতা দেবী মঙ্গলচণ্ডী, লোচনদাসের পাট বা সুলতানী আমলের মসজিদ বা মাজারের ইতিহাস নয়। ৬ কিঃমিঃ বিস্তীর্ণ প্রত্নক্ষেত্রটিতে নবাশ্মীয় যুগ হতে শুরু করে মৌর্য যুগ, শুঙ্গ যুগ, কুষাণ যুগ ও গুপ্ত যুগের নিদর্শনাবলী-সহ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ লাভ ঘটেছিল। কিন্তু সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে কোন সময়েই এস্থানে উৎখনন কার্য পরিচালিত না হওয়ায় মঙ্গলকোষ্ঠ বা মঙ্গলকোটের ইতিহাস কিংবদন্তী পর্যায় হতে বাস্তবে সামান্যমাত্র উন্নীত হয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বার্ষিক

প্রতিবেদনে প্রকাশিত যৎসামান্য উল্লেখ হতে এই প্রত্নক্ষেত্রের ধারাবাহিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য ঢিবগুলির উপরে বা সন্নিকটে জনবসতির জন্য উৎখনন কার্যের পক্ষে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলকোট পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি কিছু ধর্মস্থান ও সুলতানী আমলের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন মাত্র। মঙ্গলকোটের প্রধান প্রত্নস্থলটি নূতনহাট হতে মঙ্গলকোট যাবার পথে গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত। প্রত্নক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ৭০ বিঘা এবং এর উচ্চতা ১০ ফুট থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত। কিন্তু সমগ্র অঞ্চলটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন মঙ্গলকোটের ব্যাপ্তি ছিল উজানী-কোগ্রাম, নূতনহাট, মঙ্গলকোট, বক্সীনগর, খড়বাজার, পদিমপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে।

বর্তমান শতকের ষাটের দশকে মঙ্গলকোটে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হয়েছিল এবং সংগৃহীত পুরাবস্তুসমূহের মধ্যে প্রাচীনযুগের তাম্রমুদ্রাগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। শ্রীএককড়ি দাসের এক প্রতিবেদনে মঙ্গলকোট থেকে যে সব দ্রব্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। পীরপুকুরের ঈশানকোণে ভূগর্ভস্থিত একটি পাকা ইঁটের গাঁথুনি, যেটিতে ৮´ ফুট × ৪´ ফুট আয়তনের ছাদ ছিল।

২। মাটির নীচে পোড়ামাটির বেড় দিয়ে তৈরী অসংখ্য কূপ।

৩। পোড়া চালের সঙ্গে ধানের খোসার নিদর্শন হতে অনুমিত হয় যে, এটি কোন অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও নালন্দাতে অনুরূপ পোড়া তুষ সহ চালের অস্তিত্ব দেখা গেছে।

৪। আদি পাঠান যুগের টেরাকোটা ফলক।

৫। মৃৎপাত্রের মধ্যে একটি মাঝারি ধরনের পাত্র, ভাঙ্গা কুঁজোর পশ্চাৎ ভাগ, পালিশকরা কাল রঙের চিত্রিত তৈজসপাত্র, মাটির প্রদীপ, পাথরের ভাঙ্গা থালা, কেশর বিশিষ্ট খেলনা ঘোড়া ও হাতীর শুঁড় উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রোমান পটারীর অনুরূপ বাদামী রঙের একটি পাত্রের তলদেশ দেখে অনুমান করা হয় যে বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে এটি এসেছিল।

৬। দুটি সাদা রঙের ক্রিস্টাল ও একটি খয়েরী রঙ-এর বীড।

৭। আবিষ্কৃত চারটি তাম্রমুদ্রা ভারতীয় যাদুঘর কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছিল; হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী চিহ্নিত মুদ্রাগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে নির্মিত মৌর্যযুগের মুদ্রা।

৮। ঢিবির নীচে প্রাপ্ত অস্থির অবশিষ্টাংশগুলি ভারতীয় জীবতত্ত্ব বিভাগের মতে গরু, শূকর ও কচ্ছপের হাড় বা খোলস।[৬৪]

সম্প্রতিকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখনন কার্য পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রত্নস্থল সম্পর্কিত আংশিক তথ্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করা যায় যে, এর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে প্রচুর প্রত্নসম্পদ লুকিয়ে আছে। সর্ব নিম্নভাগের স্তরে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র, নবাশ্মীয় কুঠার, বালুকা প্রস্তরে নির্মিত থালা, চিত্রিত ও চিত্রবিহীন মৃৎভাণ্ড বা কলস, নালিযুক্ত পানপাত্র, ধূসরবর্ণের নক্‌সা সহ মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির পুতুল প্রভৃতির আবিষ্কার তাম্রাশ্মযুগের স্বাক্ষর বহন করছে।[৬৬]

কুনুর নদীর তীরে একটা ছোট নবাশ্মীয় কুঠারসহ অন্যান্য প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ঐ কুঠারটি কাটোয়া মহকুমা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। পুঁতি ও রত্ন প্রস্তরের সংখ্যাও নগণ্য নয়। উৎখননের সময়ে প্রাপ্ত পোড়া চালের নিদর্শন পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মঙ্গল-কোট হতে ২৫ কিঃমিঃ দূরে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের যে সমারোহ দেখা যায় সেগুলিও মঙ্গলকোটের সমগোত্রীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মঙ্গলকোট উভয় স্থানই অজয় অববাহিকায় অবস্থিত। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা ও শীলমোহর আবিষ্কার হতে এই স্থানের ঐতিহাসিক পর্বের প্রাচীনত্বকে যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে সন্দেহ নাই। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র হল মঙ্গলকোট।

ভূ-অভ্যন্তর ভাগ হতে প্রাপ্ত কয়েকটি হাড়ের নমুনা থেকে ভারতীয় জীবতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষান্তে জানান হয়েছে যে, এগুলি গরু, গৃহপালিত শূকর ও কচ্ছপাকৃতি জীবের। অনুরূপ জীবজন্তুর নিদর্শন পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত প্রাকারটিকে অনেকে পোতাশ্রয় মনে করেন। কারণ বহু প্রাচীনকাল হতে বিগত শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অজয় নদ ছিল সুনাব্য। মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত এরূপ এক বিশাল প্রাকারের সন্ধান কাটোয়া থানার বহরমপুর গ্রামে দেখা গেছে যা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অজ্ঞাত। মঙ্গলকোটে খনিত একটি ঢিবির মধ্যে ঐতিহাসিক যুগের কূপও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনতিদূরে অনুরূপ ২-৩টি কূপের সন্ধান মিলেছে। এইস্থানে গুপ্ত পূর্ব যুগের একটি জৈন তীর্থঙ্করের দিগম্বর মূর্তি কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে যার দুপাশে মাল্যদানরত গন্ধর্ব ও তীর্থঙ্করের দুদিকে খোদিত দুটি হংস। এই মূর্তি অপেক্ষা কিছু বড় আকারের একটি মূর্তি নিকটবর্তী বাবলাডিহি গ্রামে ন্যাংটেশ্বর শিবরূপে আজও পূজিত। বাবলাডিহির জৈনমূর্তি হল পার্শ্বনাথের, অনুরূপ উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তি ক্ষীরগ্রামেও আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৬৭]

কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধিশালী মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রের কোন সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত না হলেও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু হতে সভ্যতাকে ৬টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১। তাম্রাশ্মীয় যুগ আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ।
২। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-কৌলাল যুগের মৃৎপাত্রগুলি হস্তিনাপুরে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর সমগোত্রীয়।
৩। কুষাণ যুগের পানপাত্র, প্রাকার, কুষাণ মুদ্রা, পোড়ামাটির মূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।
৪। গুপ্ত যুগের শীলমোহর ও মৃৎপাত্র।
৫। মুসলমান আমলের প্রথম পর্বে ব্যবহৃত উজ্জ্বল নীলবর্ণের পাত্র।
৬। স্বাধীন সুলতানী ও মোগল আমলের সৌধাবলী। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, এই স্থানে প্রাপ্ত কোন নিদর্শনই রেডিও-কার্বন পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করা হয় নাই।

পণ্ডিতগণের মতে গুপ্ত যুগে মঙ্গলকোট অঞ্চলটিতে এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সম্প্রতিকালের উৎখননের ফলে ঐ সময়ে নির্মিত এক প্রাচীরের নিদর্শন মিলেছে। উৎখননকারীগণ মঙ্গলকোটে মাটির নীচে যে প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন তার সঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সৌসাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর নিদর্শনের সাক্ষী এখনও হিন্দু দেবালয়গুলিতে বিরাজিত।[৩৮]

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল, The Statesman পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখনিত মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রপ্রস্তর যুগ হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মাটির নীচে পাকা ইঁটের তৈরী গৃহের ভগ্নাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী. কুষাণ ও গুপ্তযুগের ব্যবহৃত শীলমোহর, মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত প্রস্তর, ছাঁচেঢালা তাম্রমুদ্রা ও টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি প্রত্নসম্ভার হতে অনুমান করা হয়েছে যে, কুষাণ ও গুপ্তযুগে মঙ্গলকোটে একটা সমৃদ্ধশালী নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মানব-শব সমাধি দেওয়ার রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে এবং তাম্রপ্রস্তর যুগের রীতি অনুযায়ী সমাধির সন্নিকটে কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণের মৃৎপাত্রের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সরকারীভাবে আবিষ্কৃত না হলেও ব্যক্তিগত উদ্যমে তাম্রাশ্মীয় যুগের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল মঙ্গলকোট থানার দেবপুর-শ্রীপুর গ্রামে। অজয় নদের অনতিদূরে অবস্থিত দেবপুর-শ্রীপুর গ্রামকে ঘিরে বহু জনশ্রুতি ও প্রবাদ গড়ে উঠেছে। স্থানীয় মজা-জলাটি হয়ত অতীতের কোন নদীপ্রবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই স্থানে প্রাপ্ত বিচিত্র রং-এর মৃৎপাত্রগুলিকে মঙ্গলকোটের সমগোত্রীয় বলে দাবী করা হয়েছে। ক্যানেল খননকার্যের সময় বহু গোটা ও ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের মধ্যে মাটির কড়াই-এর হাতল, কুঁজোর মুখ, বিভিন্ন আকারের ভোজন পাত্র (বর্তমান বাটির ন্যায়), পোড়ামাটির পুতুল, যক্ষিণীর মূর্তি, নবাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ প্রভৃতি সামগ্রীর আবিষ্কারকে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বলে অনুমান করার

যথেষ্ট কারণ আছে। এছাড়া গুপ্তযুগের রীতিতে খোদিত বিশ্রামরত ষাঁড়ের ও একটি ত্রিশূলের ছাপ হতে ঐতিহাসিক যুগের ধর্মীয় চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[৬৯]

দেবপুর-শ্রীপুরের নিদর্শনাবলীর আবিষ্কারক শ্রীএককড়ি দাসের মতে,—[৭০] "দেবপুরের উত্তর প্রান্তে একটি বিরাট মাটির ঢিবি আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এটা নাকি মহারাজা দেবাদিত্যের প্রাসাদ ছিল। এই ঢিবির উত্তর থেকে পূর্ব সীমান্ত বরাবর এখনও একটা স্বতন্ত্র মজা গড় আছে। লোকমুখে শোনা যায় এককালে অজয়ের স্রোত এই ঢিবির নীচ দিয়ে বয়ে যেত। এই ঢিবির উপর থেকেই পাওয়া গিয়েছিল উপরিউক্ত প্রাচীন গুপ্তযুগের শীলমোহরটি।... এক জায়গায় ইঁটের তৈরী এক বিরাট গাঁথুনিটিকে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এটা একটা প্রাসাদ ছিল। তাছাড়া ঢিবির নীচে ও পার্শ্ববর্তী জায়গায় বড় বড় ইঁটের গাঁথুনি দেখা যায়। ইঁটের আয়তন ১২×১২ফুট এবং গ্রামের পশ্চিম মাঠে সাধারণত দেড়/দু'ফুট মাটির নীচে এ ধরনের প্রচুর ইঁটের নমুনা পাওয়া গেছে। শ্রীপুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের এক অঞ্চলে এখনও কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। একস্থানে কতকগুলি কৃষ্টাল ও অন্যান্য পাথরের টুকরা বা কোয়ার্টজপাথর প্রাপ্তি প্রভৃতির জন্য বিশেষজ্ঞগণ মনে করেছেন যে এই স্থানে পাথরের কারখানা ছিল। তাছাড়া পোড়া-মাটির যে সকল প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে, সেগুলি আশুতোষ মিউজিয়ামে দান করেছি। সামান্য খননকার্য চালালে এখানে প্রাচীন যুগের সাক্ষীস্বরূপ অনেক প্রত্নদ্রব্য মিলবার আশা আছে। এখান থেকে যে সব প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে সেগুলির অধিকাংশই পোড়ামাটির এবং এগুলি যে মঙ্গলকোটের সমসাময়িক, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কোন সন্দেহ নাই।"

প্রতিবেদকের শুভ প্রচেষ্টাকে যদি কাজে লাগান যেত তা'হলে হয়ত পাণ্ডু-রাজার ঢিবি অথবা মঙ্গলকোটের ন্যায় অপর একটা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভবস্থলরূপে বর্ধমানকে আরও সমৃদ্ধ করত। কারণ পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রথম মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়েছিল উৎখননের প্রায় ৫০ বছর পূর্বে এবং সে সময়ে প্রত্নস্থলটি কোন গুরুত্ব লাভ করে নাই।

প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত তাম্রযুগ ও তাম্র-লৌহ-মিশ্র যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কুনুর নদীর তীরে রাণীপোতারডাঙ্গা, দামোদরের তীরে অঙ্গদপুরের গ্রামরক্ষীতলা প্রত্নতত্ত্বের দিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বর্তমান দশকে বসন্তপুর, সিলুট, বেরেণ্ডা, কাঁটাটিকুরী, প্রভৃতি স্থান হতে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র সংগৃহীত হয়েছে।[৭১]

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার ধারা ও বিস্তৃতি :

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আবিষ্কৃত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে পাণ্ডু-রাজার ঢিবি ও মঙ্গলকোট বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আদিম মানুষ যে দিন গোষ্ঠীবদ্ধ হতে শিখেছিল সেদিন হতে তারা দলবদ্ধভাবে শিকারের দ্বারা জীবন-ধারণ করার উপায় উদ্ভাবন করে। আরও পরবর্তীযুগে শিকার ও পশুপালন ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃক্ষতলের আশ্রয়কে নিরাপদ মনে না করায় প্রয়োজনের তাগিদে ঘর বেঁধেছিল এবং যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে জন্ম নিল গ্রামীণ সভ্যতার ; যার উন্নততর পর্যায় হল নগর সভ্যতা। এ সময়ে তারা পাত্রের ব্যবহার ও নির্মাণ কৌশলের সাথে ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। আকরিক ধাতুকে আগুনে গলিয়ে প্রস্তরায়ুধের পরিবর্তে ধাতব অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কৌশল তাদের আয়ত্তাধীন হয়েছিল। প্রাচীন মানব সমাজ এই সময়ের আগেই খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার কৌশলও আবিষ্কার করে। খাদ্য উৎপাদন, ধাতুর ব্যবহার ও বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্মে পারদর্শী হয়ে তারা উন্নততর জীবনযাত্রা যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উদ্ভব প্রাচীন মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। কৃষিজদ্রব্য উৎপাদন ও ধাতব পদার্থ আবিষ্কার আধুনিক কালের পরিভাষায় শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু ও প্রত্নতথ্যগুলি বিশেষ অর্থবহ। মৃৎপাত্রের রং, গঠন, অলঙ্করণ, তামার ব্যবহার প্রভৃতির লক্ষণে চিন্তার অবকাশ রাখে না যে, রাঢ় অঞ্চল মানবসভ্যতার তাম্রাশ্মীয় পর্বে উন্নীত হয়েছিল। এবিষয়ে নীহাররঞ্জন রায়, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অতুল সুরের মন্তব্য প্রায় সমপর্যায়ের।[১২] পাণ্ডুরাজার ঢিবির পর্যালোচনা ও তাম্রা-শ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে ধ্বংসস্তূপের মধ্য হতে যে বাসগৃহগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এক সরলরেখায় অবস্থিত এরূপ কয়েকটি ঘরের মেঝেও দেখা গেছে। মেঝেগুলি এই অঞ্চলে প্রাপ্ত (বর্ধমানকে রাঙামাটির দেশ বলা হয়) লোহিত বর্ণের কাঁকর মাটি দিয়ে পেটান, দেওয়ালে ও মেঝেয় চুনের প্রলেপ। মেঝের উপর খুঁটির গর্তের চিহ্ন হতে অনুমান করা যায় যে, বাঁশ কাঠ পুঁতে বাঁশের বেড়া প্রস্তুত করে তার উপর মাটির প্রলেপ সহযোগে ও তালপাতা বা নোনাপাতার ছাউনিতে গৃহগুলি নির্মিত হত। গৃহ-গুলির মধ্যে একটা সরুগলির অস্তিত্ব আছে যা আজও পল্লীগ্রামে দেখা যায়, এবং সেগুলি এক গৃহ হইতে অপর গৃহে যাতায়াতের সহায়ক। গৃহনির্মাণে পোড়ামাটির টালি ও চুনের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

তাম্রাশ্মীয় অধিবসতি অঞ্চলে দুদিকে ধারওয়ালা ছুরি, বুরিন জাতীয় অস্ত্র, মসৃণ করার যন্ত্র, নলাকৃতি প্রস্তর খণ্ড হতে অনুমান করা যায় যে, এই পর্বের

প্রাথমিক পর্যায়ে নবাশ্মীয় আয়ুধসমূহ পূর্বসূরীরূপে বর্তমান ছিল। তাম্র নির্মিত বঁড়শির নিদর্শন হতে অনুমান করতে পারা যায় যে, অধিবাসীরা ছিল মৎস্য শিকারী এবং সম্প্রতিকালে উৎখননের সময় ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত কয়েক শ্রেণীর মাছের শিরদাঁড়ার উপস্থিতিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহু ছিদ্র বিশিষ্ট মৃৎপাত্রটি হতে অনুমিত হয় যে সেটি ধর্মীয় অথবা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত পাত্র। এই ধরনের মৃৎপাত্র আজও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়, যেগুলি স্থানীয় ভাষায় 'সহস্রধারা' নামে অভিহিত।[৭৩] ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কোশীপাত্রগুলি ব্যবহারের ধারা সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করছে, কেবলমাত্র গঠন প্রণালীর পরিবর্তনে কিছু পার্থক্য আছে। মৃৎপাত্রগুলির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনপ্রণালী, উজ্জ্বল রং-এর প্রলেপ ও পালিশ, চিত্রণের সংযত বিন্যাস ও মাধুর্য বাংলার তাম্রযুগের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে সুরুচির স্পষ্ট ধারণা বহন করতে সক্ষম। "প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুরাজার ঢিবির স্তরসমূহে প্রাপ্ত কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের ও উজ্জ্বল লাল রং-এর কৌলাল শ্রেণী এবং বিশেষতঃ কোশীপাত্রের নানা অমূল্য নিদর্শন বাংলার তথা প্রাচ্য ভারতের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতাকে নূতন আলোক দান করেছে সন্দেহ নাই।"[৭৪] এই আবিষ্কারকে বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম মূল্যবান আবিষ্কাররূপে গণ্য করা যায়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির ভূগর্ভস্থ অধিবসতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর অন্যান্য প্রত্নস্থল আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হয় ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ। ফলে বীরভূম জেলায় অবস্থিত মহিষদল, হারাইপুর এবং নানুর-এ উৎখননাদির ফলে তাম্রাশ্মীর অধিবসতিস্থলসমূহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদলে প্রাপ্ত নিদর্শন এবং অজয়-কুনুর-খড়্গেশ্বরী-দামোদর অববাহিকায় গলসী, আউশগ্রাম, ভাতার, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর প্রভৃতি থানা এলাকায় প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে তাম্রাশ্মীয় যুগ পর্যন্ত নিদর্শনাবলী একই সূত্রে গাঁথা।[৭৫] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অমিতা রায়, অধ্যাপক ডঃ সমীর মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে মঙ্গলকোটের উৎখনন কার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং মঙ্গলকোট সম্পর্কে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে যথেষ্ট আলোকপাতের সহায়ক হবে সন্দেহ নাই। পাণ্ডুরাজার ঢিবি সম্পর্কে বি. বি. লাল মন্তব্য করেছেন,—[৭৬]
"In eastern India, two important excavations throwing light on the protohistoric period have been carried out during recent years: at Pandu-rajar-dhibi in West Bengal, and at Kuchai in Orissa. In the lower levels of the former site has been encountered a culture associated with white-painted black-and-red and black-on-red wares which are reminiscent of their prototypes in Rajasthan and Central India. A Carbon-14 determination indicates that the

culture may well be earliar than 1000 B.C., which throws back the antiquity of civilization in the West Bengal by several centuries."

ষ্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত শীলমোহর, ব্রোঞ্জনির্মিত মাছ, নিম্নভাগ সমতল-বিশিষ্ট লাল রং-এর পোড়ামাটির নৌকা দেখে অনুমান করা হয় যে এগুলি বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সম্ভবতঃ এখানে এসেছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন যে শীলটি এদেশীয়, কিন্তু অনুরূপ শীলের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত লিপিটিকে ব্রাহ্মী বা সমগোত্রীয় মনে করার কারণ নাই। ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় এবং ২০০০ বৎসর পূর্বে অজয় নদের নামও গ্রীক পর্যটকগণের নিকট অজানা ছিল না। পাথরের মালা পুঁতি, কানের মাকড়ি ও জীবজন্তুর হাড়ে তৈরী দ্রব্যাদি হতে তাদের শিল্পকর্মের কথা স্মরণ করা যায়।

মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রটি পাণ্ডুরাজার ঢিবি অপেক্ষা আয়তনে বড। এখানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে হস্তনির্মিত ও চাকে তৈরী উভয় পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। এখানে প্রাপ্ত বাদামী রং-এর 'রোমান পটারী' হতে অনুমান করা যায় যে, হয়ত প্রাচীন যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল। এছাডা সংগৃহীত নিদর্শনাবলী থেকে অনুমান করা যায় যে প্রস্তরায়ুধ ব্যবহারকারী যে জনগোষ্ঠী বীরভানপুরে অধিবসতি স্থাপন করেছিল হয়ত তাদেরই কোন উত্তরপুরুষ উন্নততর জীবন যাপনের জন্য মঙ্গলকোট, ডিহর, তুলসীপুর, মহিষদল, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে অধিবসতিগুলি গড়ে তুলেছিল। ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান কার্য অনুষ্ঠিত হলে যদি কোন ধারাবাহিক সূত্র আবিষ্কৃত হয় তাহলে রাঢ়-বঙ্গের জনবসতি ও আদি সাংস্কৃতি, একই পুরাতত্ত্বের আলোকে যে প্রতিভাত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিকাশস্থল উত্তর ভারতের সিন্ধু-সরস্বতী-গঙ্গা অববাহিকায় যেমন দেখা যায়, অনুরূপ প্রত্নস্থল দক্ষিণ ভারতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ মন্তব্য করেছেন যে এই সংস্কৃতির সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য ভারত ও রাজস্থানের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার যোগসূত্র ছিল। উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-বর্ণের কৌলালের (NBP) যে সমারোহ বর্ধমানের প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে দেখা গেছে, তাতে গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে যোগসূত্রের সম্ভাবনা অধিক। আবার অনেক মন্তব্য করেছেন যে, এই যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল গাঙ্গেয় ভারতের মাধ্যমে নয়, ওড়িশার মাধ্যমে।[৭৭]

প্রস্তরায়ুধ ব্যবহারকারী মানবগোষ্ঠীর উন্নত চিন্তাধারার ফলে এক ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে মিশ্রধাতুর উৎপাদন, শিল্পকলা, বাস্তুনির্মাণ, পশুপালন,

কৃষির উদ্ভাবনা, ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব, মূর্তিপূজা প্রভৃতি তাদের আয়ত্তাধীনে এনে পরবর্তীকালে আরও উন্নততর সভ্য সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়, যা সত্যই বিস্ময়কর। মঙ্গলকোট ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিটিতে সামগ্রিকভাবে উৎখনন কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। বস্তুতঃ জোর দিয়েই বলা যায় যে, রাঢ়ের মাটির নীচে বাংলা তথা বাঙালীর আদি ইতিহাস চাপা পড়ে আছে। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় যুগের সংস্কৃতির প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হলেও বর্ধমান জেলায় এই সভ্যতার প্রসার অধিক। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে আদি সমাজ জীবনের নূতন রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে এবং এই রূপ বাঙালীর আদি-ইতিহাসেরই রূপ।[৭৮]

৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিম ভাগ ধরে দামোদর-অজয় নদের মধ্যবর্তী ভূভাগে যদি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা হয় তা'হলে প্রস্তর যুগ হতে তাম্রাশ্মীয় যুগের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মানব সভতা ও সংস্কৃতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা যাবে এবং এই লুপ্ত ইতিহাসের ধারা হতে বর্তমান জনজীবনের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-সংস্কৃতির তাৎপর্য ও সমন্বয় যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা সহজেই অনুমেয়। পারুলিয়ার নিকটে কুনুর তীরবর্তী রানীপোতার ডাঙ্গা ও অঙ্গদপুরের দক্ষিণ প্রান্তে দামোদর তীরবর্তী গ্রামরক্ষীতলা নামক স্থানদ্বয় উৎখনিত হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আরও প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হতে পারে।[৭৯] আউসা, মণ্ডলগ্রাম ও রাইগ্রামের ঢিবিতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি লুক্কায়িত আছে, অনুসন্ধানকার্যের (exploration) দ্বারা এটি প্রমাণিত।

পাদটীকা :

১। *The Archaeology of India*—D. P. Agarwal, p. 188-90.
২। অন্বেষা, ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ২৪-২৭।
৩। *Prehistory and Protohistory of Eastern India*—A. Dani, p. 18. *Proceeding of A. S. B. 1874*, p. 96. 'As it is important that all discoveries of ancient stone implements should be recorded, I add that last year, in the Raniganj coal field, I found lying on a laterite-striwn surface, as well formed quartzite axe of the ordinary type. The locality was for removed from any possible source of the material of which the axe was formed.'
৪। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
৫। *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*—P. C. Dasgupta, p. 46 ; *Prehistory and Protohistory of Eastern India*—p. 22. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃঃ ৫৬।
৬। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৮।
৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৭-৫৮।
৮। *Ancient India*, no. 9, p. 97-98.
৯। *Prehistory and Protohistory of Eastern India*, p. 37.
১০। *Indian Archaeology : A Review*, 1953-54, p. 6, & 1956-5 p. 15
১১। *Ancient India*, No. 14, p. 4-48.
১২। *An Encyclopadia of Indian Archaeology*—A. Ghosh, Vol. 2, p. 78-79.
১৩। *Ancient India*, No. 14, p. 33.
১৪। দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯।
১৫। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ৮২।
১৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ পৃ: ৫৬।
১৭। *Steel India*, Vol. 12, No. 1, 1989, Special Nnmber. শ্রীসুধীন দে ও শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—লৌহের ব্যবহার ও প্রাচীনতা বিষয়ে এই সংখ্যায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ৯২-৯৩।
১৮। অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান, ১৩২১ সাল, পৃঃ ৮৩-৮৪।
১৯। *An Encyclopadia of Indian Archaeology*, Vol. I, p. 330.

২০। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ৯৫।

২১। *Indian Archaeology, A Review*, 1961-62, p. 59, 1962-63, p. 43, 1963-64, p. 61, 1964-65, p. 46.

An Encyclopadia oj Indian Archaeology, Vol. 2, p. 67.

'Thereafter the site remained deserted for a long time. The next period III is distinguised by the presence of burnt brick structure of which a few causes of the foundation were encountered. For want of a concrete evidence no firm date can be assigned to this short lived period'.

Prehistory and Beginnings of Civilization in Bengal—Dr. A. K. Sur, P. 4-7; *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*, p. 11-34.

২২। *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*, p. 17.

২৩। *Ibid*, p. 20-21.

২৪। *The Seal of AETEA and the Minoan Script*—Michael Ridly,p. 9.

২৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৮ সাল।

২৬। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১১৪।

২৭। *Folkllre*, vol. 9, No. 1, p. 7.

২৮। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৯২২।

২৯। *Prehistory and Beginnings of Civilization in Bengal*, p. 7-9.

৩০। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১০৩-৬।

৩১। *Bulletin of the Anthropological Survey of India*, vol. XIX, nos. 3-4, 1970, p. 75. 'Human Skeletal Material Excavated at Pandu Rajar Dhibi—P. Gupta & A Pal.'

৩২। *Indian Archaeology: A Review*, 1972-73, p. 36; আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল পৃঃ ৫৮।

Archaeological Discovery at Baneswar Danga, Unpublished Report of P. C. Dasgupta.

৩৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল পৃঃ ৫৯-৬০।

৩৪। ঐ, পৃঃ ৫৮-৬০।

৩৫। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১২৬; আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃঃ ৬১।

৩৬। *The Eastern Anthropologist*, Vol.-31, no. 4. p. 552-53.

৩৭। *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*—p. 31.

৩৮। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃঃ ৯২১-২২।

৩৯। বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়—শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৮৫।
৪০। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।
৪১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৪-৫৬।
৪২। *Indian Archaeology* : *A Review* 1984-85, p. 97.
৪৩। *Ibid*, 1966-67, p. 72-73.
৪৪। *Unpublished Report* of S. C. Mukherjee, Sudhin Dey and Pranab Chattopadhyaya—*The Metal Remains from Pandu Rajar Dhibi* : *Archaeological Studies.*
৪৫। *Steel India*, 1989, p. 33.
৪৫ক। *The Asur*—K. K.Leuva, p. 156 & 163.
৪৬। Unpublished paper of Mr. Sudhin De, '*The Osteo Keratic Culture* and *Faunal Exploration in prehistoric West Bengal.*' (Read in the Seminar organised by Bihar Puravid Parisad, Patna, 1989.)
৪৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৮।
৪৮। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১২২।
৪৯। *The Eastern Anthropologist*, vol. 31, p. 553.
৫০। *Indian Archaeology* : *A Review*, 1973-74, p. 33.
৫১। *Ibid*, 1971-72, p. 50.
৫২। *Ibid*, 1972-73, p. 36.
৫৩। Unpublished Report of *The University of Burdwan (Museum & Art Gallery)*.
৫৪। *History of Bengal*, Vol-I, p. 485-7.
৫৫। *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*, p. 46-48.
৫৬। *Ibid*, 36-38.
৫৬ক। *Jain Journal*, Vol, VII, No. 3, p. 130-31.
৫৭। *Indian Archaeology*, *A Review*, 1968-69, p. 41.
৫৮। *Ibid*, 1983-84 p. 172.
৫৯। *Ibid*, 1984-85, p. 15.
৬০। *Ibid*, 1971-72, p. 49.
৬১। *Ibid*, 1972-73, p. 36.
৬২। *Ibid*, 1963-64, p. 59.
৬৩। *Ibid*, 1961-62, p. 59, 1962-63, p. 43, 1972-73, p. 36.

৬৪। *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi,* p. 35.
৬৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ।
৬৬। *Indian Archaeology : A Review*, 1962-63, p. 43.
৬৭। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।
৬৮। *An Encyclopadia of Indian Archaeology*, Vol. II, p. 277.
'The lowest level contains the essential equipment of the chalcolithic culture which included the black and red ware, plain and painted in which, bright red-ware plain and painted in black pigment and a sturdy red ware. The next phase is represented by antiquities, mainly terracottas, and covers in general the early historical times, from the Mauryan to Kushan ages and the Gupta age. The succeeding occupation has stone sculptures in the late historical style. The top level is repre sented by a ruined mosque partly built of massive architectural members of Brahmanical temple.'
৬৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ।
৭০। ঐ।
৭১। *Indian Archaeology : A Review,* 1982-83, p. 104.
৭২। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব,) পৃঃ ৯১৯।
৭৩। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১০১।
৭৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৮।
৭৫। *The Eastern Anthropoligist*, Vol 31, p. 551.
৭৬। *Indian Archaeology, Since Independence,*—B. B. Lal, p. 26.
৭৭। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), পৃঃ ৯২৫।
৭৮। ঐ, পৃঃ ৯১৯।
৭৯। দুর্গাপুরের ইতিহাস, পৃঃ ২২।

পরিশিষ্ট—১

IRON OBJECTS FROM PANDU RAJAR DHIBI : ARCHAEOMETALLURGICAL STUDIES*

SUDIN DE & PRANAB K. CHATTOPADHYAYA

The Directorate of Archaeology, Govt. of West Bengal and SAIL have initiated some archaeometallurgical projects to reveal the technology of iron and steel making in ancient India. The present studies have been conducted with iron objects and slag specimen found during excavation at pandurajar Dhibi, a key site of Iron Age of West Bengal. The study revealed that iron techonology was initiated at this site in the period II, one millenium BC, and that matured Iron Age had existed around eighth century BC. The hardening and quenching methods were observed in a sickle which is so far one of the earliest Indian specimen of c. 3rd century BC.

ARCHAEOLOGY OF THE IRON OBJECTS

The iron objects have mostly been found from the upper levels, though their occurrence in the lower levels was also noticed. Two iron objects, one iron smelting crucible and one iron sickle, have been found from the period III (iron age) level of Trench A (the sickle, however, has been found from the ash pit of period III). Table 1 gives the stratigraphy and the correspoding chronology. One iron implement, probably a part of a sword, was recovered from an ash pit belonging to period II (chalcolithic) of Trench A. Several iron implements, pertaining to different periods, were encountered in Trench B also. Amongst those, mention may be made of (i) one iron dagger from period III, (ii) two iron points (one with a tang), from period III (a'tang' is the projected portion of the implement to fix the wooden handle), (iii) one iron spearhead also from period III, and (iv) four iron implements each with a hole

* STEEL INDIA, Vol, 12, No. 1, April 1989.

for the shaft from period IV. From Trench C one spearhead belonging to period II and two iron points belonging to period IV (early historic) were recovered. It may not be out of place to mention here that iron smelting was known to the people of Pandurajar Dhibi in the period III (iron age) and afterwards, as observed earlier during the 1964 excavations at the site. In support of this, in the present excavation campaign, unearthing of an iron smelting crucible from period III level and the existence of a furnace probably for smelting iron found along with a fragmentary iron dish shaped object and iron slags from period IV level, may be mentioned. Iron slags have been unearthed from the strata belonging to the period III to period V in Trench A, period II (chalcolithic late level) to period V (Mediaeval) in Trench B and period II to period IV (early historic) in Trench C.

CHRONOLOGY : C^{14} DATES

Pandurajar Dhibi had yielded a few C^{14} dates. Till 1965, only two dates were known, one of period II (chalcolithic), 1012$\pm$120 BC, and another for period V (TF-61) 1260$\pm$110 BP. In the recent findings, authors could get a few more dates from other sources. G. Rajagopalan has obtained a date (BS-621) as 2580$\pm$110 BP for the period III, which on conversion to the Christian calendar would give 630 BC. Freundlich has obtained two dates : forperiod II (KN-3641) 2940$\pm$55 BP. and for the period III (KN-3640) 2870$\pm$50 BP. Converting these dates into the Christian calendar will give, respectively, 1045 and 970 BC taking the plus value.

From the available dates, the introduction of iron in Pandurajar Dhibi may be estimated as corresponding to the beginning of one millenium BC and it may be stated that matured iron age had existed around 800 BC.

ষষ্ঠ অধ্যায়

পথ-পরিচিতি

প্রাচীন যুগঃ

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি একদিকে যেমন জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ একে অপরের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিময় করতে সক্ষম হয়ে মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী হয়। নদীবহুল রাঢ়অঞ্চলে অতীতে পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল স্থলপথ ও জলপথ। হস্তী, অশ্ব, রথ, উট, গোযান ও মানববাহিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রব্যসমূহ স্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হত। অপরপক্ষে বজরা, পানসী, ছিপ, নৌকা, ডিঙ্গি, ভেলা, জেলেনৌকা প্রভৃতির সাহায্যে নদীবক্ষে পারাপার ও যাতায়াত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এদেশে উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার না ঘটায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিচিতি ও ভাবের আদান-প্রদানে বহু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ২০০ বছর পূর্বেও কালনার অধিবাসীগণের নিকট আসানসোল-বরাকর অঞ্চল ছিল বিদেশ। অনুরূপ ভাবে বলা যায় গোতানের অধিবাসীরা হয়ত সীতাহাটী-নৈহাটীর আচার ব্যবহার সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

প্রাচীনকালে পথঘাট নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু সমসাময়িক যুগে রচিত ঐতিহাসিক বিবরণী, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ও স্মৃতিশাস্ত্রে পথ-পরিচয়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ অনুপস্থিত। প্রাচীন লেখমালায় দু-একটি পথের ইঙ্গিত আছে মাত্র। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত পথঘাটগুলিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করলে যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র পাওয়া যাবে, তার যথেষ্ট মূল্য আছে। অনুরূপভাবে, গ্রীক বিবরণী, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ ও ইৎ-সিঙ প্রাচীন ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তাতে কিছুটা অনুমান বা কল্পনার আশ্রয় নিলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের পথ-পরিচিতির যে ধারণার সৃষ্টি হতে পারে তা অনৈতিহাসিক চর্চা নয়। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে রাঢ় অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। মুসলমান আমলের প্রথম পর্বে মিনহাজ উদ্দিনের 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে যৎসামান্য বিবরণ আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

পথ-পরিচিতি সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যে যেসব

প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব বললেন—

'বিশালান্ রাজমার্গাশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ।
প্রপাশ্চ বিপণাংশ্চৈব যথোদ্দেশং সমাদিশেৎ ॥' (মহাঃ, শান্তিপর্ব ৬৯।৫৩)

রাজধর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজার কর্তব্যের মধ্যে রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করান অন্যতম প্রধান কার্য এবং রাজা বিশাল রাজপথ নির্মাণপূর্বক স্থানে স্থানে পানীয়শালা ও বিপণীসমূহ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিবেন। রামচন্দ্রকে বনগমন হতে নিবৃত্ত করার মানসে ভরতের চিত্রকুট পর্বত উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে, তাঁর সঙ্গে সূত্রকর্মকার, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষখনক, অবরোধক, স্থপতি, বর্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্মকার, যন্ত্রনির্মাতা, কর্মান্তিক, ভৃত্য ও পথ পরীক্ষকেরা যাত্রা করেছিল (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, অধ্যায়-৮০)। দ্বারকাপুরী নির্মাণের সময় শ্রীকৃষ্ণ, যাদবগণকে উপদেশ দিলেন—'মীয়ন্তাং রাজমার্গাশ্চ প্রাসাদস্য চ যা গতিঃ।' (হরিবংশ ২।৫৮।৯), অর্থাৎ রাজপথসমূহের জন্য ভূমি মাপ করুন এবং রাজপ্রাসাদে যাবার যে পথ, তার জন্যও ভূমি মাপ করুন। বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত দ্বারকাপুরীর পথগুলি ছিল—

'অষ্টমার্গ মহারথ্যাং মহাষোড়শচত্বারম্।
এবং মার্গ পরিক্ষিপ্তাং সাক্ষা দুশনসা কৃতাম ॥' (হরিবংশ, ২।১৮।২৯)

অর্থাৎ, এদের মধ্যে চলাচলের নিমিত্ত আটটি মহাপথ (রাজপথ) ও ষোলটি বড় বড় চত্বর ছিল। এইভাবে বিভিন্ন মার্গসমূহ দ্বারা পরিচ্ছন্ন দ্বারকাপুরী সাক্ষাৎ শুক্রাশ্চার্য্যের নীতি অনুসারে নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিমিত্ত পথ নির্মাণ-কৌশল যে আয়ত্তাধীন ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। রামায়ণের বর্ণনায় ও সভাপর্বে বর্ণিত ভীম কর্তৃক বিপুল সৈন্যসহ রাজগৃহ, সুহ্ম (রাঢ়) প্রভৃতি দেশ অভিযান থেকে অনুমান করা যায়, ঐ সময়ে গমনাগমনের নিমিত্ত যথাযথ পথ নির্মিত হয়েছিল।

পানিনি উল্লিখিত 'দেব পথাদিভ্যশ্চ' (৫।৩।১০০) কথাটির অর্থে হংসপথ, বারিপথ, রথপথ, স্থলপথ, করিপথ, অজপথ, রাজপথ, সিংহপথ, সিংহগতি, উষ্ট্রগ্রীব, হস্ত, দন্ত, ইন্দ্র, পুষ্প, জলপথ ও রজ্জুপথকে নির্দেশ করে।[১] পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১।১।৪৯) কান্তার-পথিক, বারিপথিক, স্থলপথিক ও রথ্যা (শকট বহনযোগ্য পথ) প্রভৃতি পথের উল্লেখ আছে।[২]

প্রাচীন সিন্ধু-সরস্বতী-গাঙ্গেয় সভ্যতা উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হবার মূলে রাজপথগুলির অবদান কোন অংশেই ন্যূন নহে। তাই যাযাবর আর্যজাতি যেদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখল, সে সময়ে তারা পথ ও পথবিষয় প্রসঙ্গে ক্রমশই সচেতন হয়েছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে পাওয়া যায়ঃ 'অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুংবিদঃ ॥' (১।৪২।৮) অর্থাৎ, হে পূষা,

তুমি শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদের নিয়ে যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়, তুমি এপথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর।

নন্দ ও মৌর্যবংশের রাজত্বকালে পথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২২ প্রকরণ-দুর্গনিবেশ) আছে—দুর্গে চার দণ্ড-পরিমিত বিস্তার যুক্ত রথ্যাসমূহ (বিশিখা নামক পথ) থাকবে। রাজমার্গ, দ্রোণমুখে (উপনগর) যাওয়ার পথ, স্থানীয়ে (৮ শত গ্রাম মধ্যে উল্লেখযোগ্য) যাওয়ার পথ, রাষ্ট্র বা জনপদে যাওয়ার পথ, বিবীতে (সংরক্ষিত অরণ্য) যাওয়ার পথ এবং সংযানীয়ে (ব্যবসাকেন্দ্র) যাওয়ার পথ, ব্যূহপথ, শ্মশানে যাওয়ার পথ ও গ্রামে প্রবেশের পথগুলি আটদণ্ড পরিমিত বিস্তার যুক্ত হবে। সেতুপথ, ও বনপথের বিস্তার হবে চারদণ্ড পরিমিত। এছাড়া হস্তিপথ, ক্ষেত্রপথ, রথপথ, পশুপথ, ক্ষুদ্রপশুপথ ও মনুষ্যপথের উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে আছে।[৩] সম্রাট অশোকের দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে (খ্রীস্ট পূর্ব ২৫৭ অব্দ) খোদিত গিরনার লিপিতে আছে—'পংথেসু কূপা চ খানাপিতা ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমনুসানম্ (পালি) অথবা পথিষু কূপাঃ চ খনিতাঃ, বৃক্ষাঃ চ রোপিতাঃ পরিভোগায় পশু-মনুষ্যানাম্ (সংস্কৃত)'।[৪]

আর্য-সংস্কৃতি প্রসার লাভের পূর্বে রাঢ় জনপদে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উদ্ভবস্থলরূপে চিহ্নিত প্রত্নক্ষেত্র সমূহ হ'তে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে এক বিস্তৃত অঞ্চলের আদিম মানবগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিল। নদীতীরবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই যোগাযোগের চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও মাটির তৈরী নৌকা, চক্রসমন্বিত গাড়ী, শীলমোহর প্রভৃতি নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে জলপথ ও স্থলপথের ব্যবহার তাদের অজানা ছিল না। পশু শিকার থেকে পশুপালন ও কৃষি সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে গুরুভার বহনের উপযোগী পথ ও পরিবহনের মাধ্যমগুলির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আরও পরবর্তীযুগে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ১০ম হতে ৮ম শতকের মধ্যে লৌহ ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত লাভ করায় পরিবহন ব্যবস্থা যে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাঢ়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রয়াত ঐতিহাসিক ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন,—[৫] "রাঢ় লোহা ও তামার মত অত্যাবশ্যক ধাতুর উৎসস্থল। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক যুগে অনুর্বর, জঙ্গলময় উচ্চাবচ রাঢ়ভূমি চারদিক থেকেই স্থায়ী বসতিসম্পন্ন উর্বর ভূমিদ্বারা পরিবেষ্টিত। তৃতীয়তঃ, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তো বটেই, তার পরেও রাঢ় বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ বলে গণ্য হত। পশ্চিমে উত্তর ভারত থেকে এবং দক্ষিণে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের যোগাযোগ

হ'ত রাঢ়ের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার, সার্থবাহ চলাচল হয়েছে রাঢ়ের পথ বেয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে মার্গ সংস্কৃতির প্রভাবও এসেছে এই পথেই।" ডঃ সান্যালের সুচিন্তিত বক্তব্যের উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন।

বৈদিক যুগে বঙ্গ বা রাঢ় জনপদের কোন পরিচয় জানা যায় না। কিন্তু মনুসংহিতায় (২।২২) তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে আর্যগণ বঙ্গদেশে যে আগমন করতেন তার ইঙ্গিত আছে। খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বর্ধমান মহাবীর যে রাঢ় ভ্রমণে এসেছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় আয়ারঙ্গ বা আচারঙ্গ সূত্র নামক জৈন গ্রন্থে। উক্ত বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে রাঢ় জনপদে রাজপথের অপ্রতুলতা ছিল। কেবলমাত্র হাঁটাপথ বা গোপথ জাতীয় স্থানীয় পথ ছিল। তেলপত্ত জাতকে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদেব সমূহ জনপদের অন্তর্গত দেশক নগরে এসেছিলেন; কিন্তু তিনি রাজগৃহ হতে কোন্ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাঢ় বা সূহ্ম জনপদে পদার্পণ করেছিলেন, তার বিবরণ অনুপস্থিত। তবে ঐ সময়ে কুসুমপুর (পাটলিপুত্র) হ'তে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত একটা পথের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে।

বেস্‌সান্তর জাতকে দুটি পথের উল্লেখ আছে এবং উক্ত পথ দু'টির পরিচয় প্রসঙ্গে ডাঃ অশ্বিনীকুমার চৌধুরী মন্তব্য করেছেন[৬] যে, জেতুত্তর নগর (মঙ্গলকোট) হ'তে সুবর্ণগিরিতাল (কর্জ্জনা)—কন্টিমার (দামোদর নদ)-অরঞ্জগিরি (চাঁপা-ডাঙ্গার ঢিবি)—ব্রাহ্মণগ্রাম দুন্নিভিট্ট (আমতা)—চেতনগরী (শিলাবতী অথবা চন্দ্রকোণা)—বনদ্বার (ফুলকুশমার নিকট, জেলা বাঁকুড়া) পেরিয়ে কেতুমতী (কাঁসাই নদী) অতিক্রম করে শিবি রাজপুত্র সঞ্জয়কুমার বঙ্কগিরি (শুশুনিয়া) পর্বতে নির্বাসন সময়ে কালযাপন করেন। তিনি বঙ্কগিরি হতে জেতুত্তর যাওয়ার জন্য অপর একটি পূর্বমুখী রাস্তার বর্ণনা করেছেন। ঐ পথটি ধরে শুশুনিয়া হতে দামোদর পেরিয়ে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে মঙ্গলকোটে যাওয়া যায়।[৭] ডাঃ চৌধুরী যে পথের উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যতীত অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে আরও যে গবেষণার প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মৌর্যযুগে সম্ভবতঃ গঙ্গানদীর দক্ষিণ অববাহিকার পথ ধরে সম্রাট অশোকের সৈন্যদল তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পুনরায় পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের কোন রাস্তা ধরে কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য তোসলীতে পৌঁছেছিল। পরবর্তীকালে ঐ একই পথে ত্রিকলিঙ্গের অধীশ্বর খারবেল অঙ্গ ও মগধ জয় করে পাটলিপুত্র অধিকার করেন। মৌর্যযুগে পাটলিপুত্র-চম্পা-রাজমহল (তেলিয়াগড়ির গিরিপথ)-কর্ণসুবর্ণ পার হয়ে অজয় ও দামোদর নদ অতিক্রম করে (রাঢ়ের মধ্যাঞ্চল দিয়ে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যভাগ) সমুদ্রতীরে তাম্রলিপ্ত বন্দরে যাওয়া যেত[৮] এবং তাম্রলিপ্ত থেকে বালেশ্বরের মধ্য দিয়ে তোসলী

(ভুবনেশ্বরের নিকটে) হয়ে কলিঙ্গনগর (কলিঙ্গপত্তন) যাওয়ার পথ ছিল।[৯] বৌদ্ধযুগে সার্থবাহ বা বণিক সম্প্রদায় দুই বলিবর্দবাহিত শকটে দলবদ্ধ হয়ে স্থল নিয়ামকের নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য দ্রব্য নিয়ে যাতায়াত করত।[১০]

প্রাচীনকালে বিহার রাজ্যের আকরিক তামা প্রধানতঃ তিনটি পথ ধরে বহির্বাণিজ্যের জন্য তাম্রলিপ্ত ও গঙ্গে (সপ্তগ্রাম) বন্দরে নিয়ে আসা হত ; যথা :

১। পাটলিপুত্র, চম্পা, কর্ণসুবর্ণ, মঙ্গলকোষ্ঠ, অজয় ও দামোদর নদ পার হয়ে তাম্রলিপ্ত।

২। রাজগৃহ হতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে অজয়-দামোদর অববাহিকার মধ্য দিয়ে বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চল ছুঁয়ে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত বন্দর অথবা বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল থেকে পূর্ব মুখে সপ্তগ্রাম বন্দর।

৩। দক্ষিণ বিহার থেকেওড়িশা ও মেদিনীপুর জেলা হয়ে তাম্রলিপ্ত।

কুরুধর্ম জাতকে (জাতক নং ২৭৬) বর্ণিত আছে যে, আট জন কলিঙ্গ ব্রাহ্মণ দন্তপুর (চিকাকোল ও কলিঙ্গ নগরের সন্নিকটে অবস্থিত) হতে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের অঞ্জনবৃষভ নামক মঙ্গল হস্তীটিকে যাচ্ঞার নিমিত্ত গমন করেছিল।[১১] সম্ভবতঃ দন্তপুর হতে যে পথে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত সিংহলে প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, কলিঙ্গ ব্রাহ্মণেরা ঐ পথেই তাম্রলিপ্তে পৌঁছে সেখান থেকে ১নং পথ ধরে পাটলিপুত্র হতে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিল।[১২]

৫ম শতকে সিংহলে রচিত মহাবংশে[১৩] আছে যে, অশোকের রাজত্বকালে সিংহল প্রেরণের উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্র থেকে বোধিবৃক্ষটিকে জলপথে এক সপ্তাহে তাম্রলিপ্ত বন্দরে আনা হয়। অর্থাৎ, ঐ সময়ে পাটলিপুত্র হতে জলপথে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের যোগাযোগ ছিল। ৫ম শতকে ফা-হিয়েন-এর বিবরণে পাওয়া যায়,—[১৪]

"Following the course of the Ganges towards the east at the distance of 18 yeon yan (about 24 leagues) you arrive at the great Kingdom of Chen Cho on the southern bank of the stream......... Then proceeding easterly about 50 yeon yan (appx. 68 leagues), you came to the Kingdom of To mo li ti, there is the embouchure into the sea."

ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রীস্টাব্দ ভারত ভ্রমণের কাল) পাটলিপুত্র-চম্পা অতিক্রম করে রাঢ় জনপদের মধ্য দিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেছিলেন। ইৎ-সিঙ নামক অপর এক চৈনিক পরিব্রাজক তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে একটি দুর্গম পথে ১০ দিনে বুদ্ধগয়ায় পৌঁছেছিলেন এবং পথিমধ্যে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছিল।[১৫] ইৎ-সিঙ সম্ভবতঃ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান জেলা হয়ে সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মেজর

কারনাক বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের ব্যবহৃত পথটি আবিষ্কারের জন্ম সমীক্ষা করেছিলেন; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নাই। ঐ সালেই একদল ইংরেজ সৈন্ম কলিকাতা থেকে বর্ধমান-রামগড় হয়ে একটা প্রাচীন পথ ধরে মীরকাশিমের সেনাপতি কামগড খানের পশ্চাদ্ধাবন করে গয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।[১৬]

সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ অভিযানের প্রচ্ছন্নরূপ রঘুর দিগ্বিজয় বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে বলে অনুমান করা হয়। মহারাজা রঘু হস্তিযূথসহ বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে সুহ্ম, বঙ্গ ও গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করে গজসেতু দ্বারা কপিশা নদী অতিক্রম করে কলিঙ্গ দেশের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।[১৭] রঘুবংশে (৪।৩৬) বাঙালীর নৌবলের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে রাঢ় অঞ্চলে যথোপযুক্ত রাজপথের অস্তিত্ব না থাকলে গুপ্ত সম্রাটের এই বিপুল সৈন্যদলের পক্ষে সমরাভিযান কোনমতেই সম্ভবপর হত না।

গুপ্তযুগের শেষ পর্বে খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বৈন্যগুপ্তের আমলে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ ছিল। গোপচন্দ্রের সামন্তরাজ বিজয়সেনের মল্লসারুল তাম্রশাসনে 'বাহনায়ক' নামক এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঐ সময়ে পথঘাট ও যানবাহন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল। সম্ভবতঃ গোপচন্দ্রের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হতে দক্ষিণে উৎকল ও পূর্বে ফরিদপুর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল সুদৃঢ়। আরও পরবর্তীকালে শশাঙ্কের সময়ে এত বড় অঞ্চলে শাসনকার্যের ও সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত পথঘাটের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শশাঙ্কের অব্যবহিত পরেই চীন দেশীয় পর্যটক হিউয়েন-সাঙ (৬২৯ -৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ) বাংলায় এসেছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর পূর্ব ভারত সম্পর্কিত বিবরণে কয়েকটি পথের বিবরণ, দূরত্ব ও পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি পূর্বাঞ্চলে যে ৫টি পথের নির্দেশ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:[২১]

পুণ্ড্রবর্ধন হ'তে কামরূপের দূরত্ব	৯০০ লি	=	১৫০ মাইল;	
কামরূপ হ'তে সমতটের দূরত্ব	১৩০০ লি	=	২১৭	,,
সমতট হ'তে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব	৯০০ লি	=	১৫০	,,
তাম্রলিপ্ত হ'তে কর্ণসুবর্ণের দূরত্ব	৭০০ লি	=	১১৭	,,
কর্ণসুবর্ণ হ'তে ওড্র বা উৎকলের দূরত্ব	৭০০ লি	=	১১৭	,,

উপরি-উক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র হতে অঙ্গ, কজঙ্গল, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌছান যেত এবং সেখান থেকে সিংহল ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাহাজযোগে চলত ব্যবসা-বাণিজ্য, যার ফলে ঐ সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও সম্পন্ন হত। রাঢ় হতে কলিঙ্গ জনপদের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত পথ ধরে হিউয়েন

সাঙ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং জয়াভিলাষী চোল, চালুক্য ও গঙ্গবংশীয় রাজারা এই পথ ধরে রাঢ় অভিযানে এসেছিলেন।

পাল ও সেন রাজত্বকাল ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ। এই সময়ে শিল্পকলা, ধর্ম, সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পথঘাটের যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য তথ্যাদির সঙ্গে সে সময়ের রাস্তাঘাটের কোন পরিচয় কিন্তু জানা যায় না। ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে সমগ্র রাঢ় অঞ্চল পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ধমান জেলার ভরতপুরে পাল যুগের বৌদ্ধ স্তূপ ও সম্ভবতঃ ঐ স্থানে একটি বিহারও ছিল এবং সে কারণে অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের রাজধানীর সঙ্গে এই বিহারের যোগাযোগ থেকে থাকতে পারে। রামচরিতে বর্ণিত হয়েছে, দণ্ডভুক্তি, দেবগ্রাম, অপার-মন্দার, কুজবটি, তৈলকম্প, ঢেক্করী, সঙ্কটগ্রাম প্রভৃতি রাঢ়ের রাজন্যবৃন্দ সমবেত হয়ে রামপালের সাহায্যার্থে রমাবতীর দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। অতএব সুষ্ঠু যোগাযোগের বন্দোবস্ত না থাকলে এহেন অভিযান কোনমতেই সম্ভবপর হত না। ধরুন, রাজেন্দ্র চোল ও কর্ণদেবের রাঢ় অভিযান থেকে পরোক্ষভাবে ধরা যায় যে মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের যথোপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল।

পালযুগে চতুরঙ্গ বাহিনী (রামচরিত-২।৭) ব্যতীত মহিষারোহী (রাম-৩।৩০) সৈন্য বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অশ্ব ও হস্তী ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের রমণীগণ পাল্‌কি দ্বারা স্থানান্তরে যাতায়াত করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু সাধারণ লোকে মহিষবাহিত গাড়ীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে মহিষের ব্যবহার ছিল সে সময়ে অন্যতম প্রধান সম্বল।[২২]

বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে উল্লিখিত গোপথগুলি বর্তমান কেতুগ্রাম থানা এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং ঐ সময়ে বর্ণিত গোপথগুলি গ্রামের সীমারেখাকে যে চিহ্নিত করত তেমন অনুমান করা যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'শ্রীবর্ধমানভুক্তি'র অন্তর্গত 'বেতড্ড-চতুরক' বাণিজ্য ও শাসন কার্যের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং এক্ষেত্রে লক্ষণাবতীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাল্পনিক মনে না করাই শ্রেয়। পাল-সেন রাজত্বকালে নির্মিত পথ ধরেই অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর আগে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংস করে সম্ভবতঃ সাঁওতাল পরগণা জেলার মধ্য দিয়ে বীরভূম জেলার লক্ষোর (রাজনগর) অধিকার করে দক্ষিণ-পূর্বমুখে অগ্রসর হয়ে মঙ্গলকোটের নিকট অজয় পার হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পূর্বদিকে কোন এক পথ ধরে কালনার কাছে ভাগীরথী নদী অতিক্রম করে পরপারে শান্তিপুরে উপস্থিত হন। শান্তিপুরে বক্তারঘাট নামক স্থানটি এখনও প্রাচীন ইতিহাসের

স্মৃতিটিকে ধরে রেখেছে বলে অনুমান করা যায়। বখতিয়ার খলজি সামরিক কৌশলের জন্যই তেলিয়াগড়ির গিরিপথ অতিক্রম করেন নাই এবং কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ পৌঁছোতে হলে বিশাল বিশাল জলা অতিক্রমে অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় আরও সহজতর দক্ষিণের কোন পথ ধরে তিনি কালনায় উপস্থিত হয়েছিলেন, এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঐ সময়ে নবদ্বীপ ছিল ভাগীরথীর পূর্বতীরে।

প্রাচীন পথ সম্পর্কে একটি শিলালিপি প্রমাণও পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ শিব মন্দিরের অনতিদূরে অনন্তবাসুদেব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপিতে দ্বাদশ শতকে রাজা হরিবর্মনের মহামন্ত্রী ভট্টভবদেবের নামাঙ্কিত প্রশস্তিলিপিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং ভট্টভবদেব রাঢ়ে একটি জাঙ্গাল বা পথ নির্মাণ (যা উচ্চ বাঁধ সম্পর্কেও প্রযোজ্য) করেছিলেন। ঐ প্রশস্তিলিপিতে পাওয়া যায়,[২৩]—

'রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গল পথ গ্রামোপকণ্ঠস্থলী—
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণাপ্ত প্রীণনঃ।'

(অনু : রাঢ়দেশে জাঙ্গাল পথযুক্ত ও জলহীন গ্রামোপকণ্ঠসীমায় শ্রমার্ত পান্থদের মনপ্রাণে প্রীতিদায়ক জলাশয় ইনি (ভবদেব) প্রতিষ্ঠা করেছেন)।[২৪] সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু রাজত্বে একদা পথঘাটসহ জলাশয় খননের প্রথা ছিল। আজও প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের উপকণ্ঠে বিরাটাকার দিঘি বা পুষ্করিণীর অস্তিত্ব সেই প্রাচীন প্রথার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগ

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে লক্ষ্ণৌতি হতে লক্ষোর পর্যন্ত যে একটি পথের উল্লেখ আছে তা জানা যায় তবকাত-ই-নাসিরী নামক গ্রন্থ থেকে[২৫] এবং এই পথের সঙ্গে বখতিয়ারের ব্যবহৃত মঙ্গলকোট-কালনা পথের যোগসূত্রও যে স্থাপিত হয়েছিল তেমন একটা অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়। পরবর্তীকালে মঙ্গলকোট-দিগনগর হয়ে দামোদর নদের দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গিয়াস-উদ্দীনের সৈন্যদল বাঁকুড়া জেলার কাটাসিনে উৎকলরাজ ৩য় অনঙ্গভীমদেবের সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়েছিল।[২৬] গঙ্গোসৈন্য জাজপুর বা জাজনগর হতে অগ্রসর হয়ে তাম্রলিপ্ত ও অরম্যনগরী অধিকারের পর দামোদর নদ অতিক্রম করে উত্তর রাঢ় বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এই অভিযান ছিল দীর্ঘস্থায়ী, বর্ধমান জেলার রায়না থানায় ও বাঁকুড়া জেলায় 'উডের গড়' নামক স্থানদ্বয়ে বিজয়ী গঙ্গোসৈন্যের আবাসস্থল ছিল বলে জনশ্রুতি। সমগ্র রাঢ় অঞ্চল অধিকার করে ৩য় অনঙ্গ-ভীমদেব বর্ধমান থেকে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন।[২৭] এর

ফলে গৌড়ের সঙ্গে স্বল্প দূরত্বের পথে শাসনকার্য, বিজয়াভিযান ও তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত এই পথটি স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়ে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে (১৩২২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ বিণ তুঘলক বাংলা অধিকার করার পর) সপ্তগ্রামে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র (ইক্তা) স্থাপিত হওয়ায় হুগলী ও বর্ধমান জেলার গুরুত্ব বাড়ে। সেইসঙ্গে কালনা, নবদ্বীপ, বর্ধমান, পাণ্ডুয়া, সেলিমাবাদ, গড়মান্দারণ, জাহানাবাদ (অরম্যনগরী বা আরামবাগ) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুসলমান আধিপত্য বৃদ্ধি পায় এবং সপ্তগ্রাম হয়ে উঠে বাণিজ্যকেন্দ্রিক রাজধানী। সপ্তগ্রামের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১। সপ্তগ্রাম—কালনা—নবদ্বীপ (গঙ্গার পশ্চিমকূল বরাবর),

২। সপ্তগ্রাম—পাণ্ডুয়া—সেলিমাবাদ—বর্ধমান—মঙ্গলকোট—কাটোয়া,

৩। সপ্তগ্রাম—বর্ধমান—গড মান্দারণ—নেড়াদেউল—জাজনগর—কটক—পুরী,

৪। সপ্তগ্রাম—পাণ্ডুয়া—মহানাদ হয়ে গড় মান্দারণ পর্যন্ত একটি অল্প গুরুত্বপূর্ণ পথের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা যায়।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন এবং তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল অত্যন্ত বিশাল। গৌড হতে দক্ষিণ মুখে ব্রাহ্মণভূম পরগণার নেডা দেউল পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথটি হোসেন শাহের নির্মিত 'বাদশাহী সড়ক' নামে বহুল প্রচারিত। এই সডকের ধারে কেতুগ্রাম থানার কুলুটে, মঙ্গলকোট থানার নূতনহাটে এবং এটির সংযোগকারী অপর একটি রাস্তার ধারে পীর বাহমন শাহের মাজারের নিকট আউসগ্রাম থানার সুয়াতা গ্রামে তাঁর নামে মোট তিনটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ঐ সময়ে বর্ধমান শহর সম্ভবতঃ 'সরাই সহরে' পরিণত হয় যার আভাস ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ হতে সপ্তগ্রামের পথে অমুয়া মুলুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু হোসেন শাহ যে বাদশাহী সডক নির্মাণ করেছিলেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ হোসেন শাহ প্রাচীন রাজপথের সংস্কার সাধন করে স্বীয় নামে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বর্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের আদি নির্মাতা হিসাবে শেরশাহের নামকে অমর করে রেখেছে। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। শেরশাহ মাত্র পাঁচ বৎসর (১৫৩৯-৪৪) রাজত্ব করেন এবং তারমধ্যে সাডে তিন বৎসর কেটেছিল নিজস্ব প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে। এত অল্প সময়ে ১৫০০ মাইল দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করা মোটেই সম্ভবপর নহে। মনে হয় গঙ্গার দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে প্রসারিত প্রাচীন উত্তরাপথের বিভিন্ন অংশের যোগসাধন করে মসজিদ ও সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এই অংশের জন্য শেরশাহের

কোন কৃতিত্ব নাই। অবশ্য বিহার থেকে রাজমহল হয়ে সোনারগাঁও পর্যন্ত নির্মিত পথটি শেরশাহের প্রধান কীর্তি বলা যেতে পারে।

মোগল আমলে বর্ধমানের সঙ্গে বাংলা, ওড়িশা, ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত এই পথগুলি যে নির্মিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এসকল রাজপথ-গুলি কোন্ সময়ে বা কোন্ শাসক প্রস্তুত করেছিলেন, ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। কেবলমাত্র পথ ব্যবহারের সময় সংশ্লিষ্ট স্থান-নাম হতে পথের বিবরণটুকু জানা যায় মাত্র। ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে দাউদ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মোগল সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁকে সহায়তা করার জন্য রাজা টোডর-মল্ল বর্ধমান হতে মোগলমারি (বর্ধমান জেলায়)-গড় মান্দারণ-বালি দেওয়ানগঞ্জ ও ঘাটাল হয়ে চেতুয়ায় মুনিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর সম্মিলিত মোগল-বাহিনী কোটালপুর-বাসুদেবপুর-কালিয়া-নবাবগঞ্জ-শ্যামপুর-কেদার-পলাসপুর-নান-জোড়া (নাহানজোড) হয়ে দাঁতন রেল ষ্টেশনের ১৪ কিঃমিঃ পূর্বে তুর্কা-কসবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং এই যুদ্ধ মোগলমারির (মেদিনীপুর) যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই সময়ে দাউদ খাঁর শিবির ছিল তুর্কা-কসবা হতে ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে ও দাঁতন হতে ১৮ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে গড়হরিপুর নামক স্থানে।[২৮] রেলপথ. নূতন নূতন রাজপথ নির্মাণের ফলে ও বন্যাকবলিত হয়ে এই সকল প্রাচীন পথঘাট আজ বিস্মৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে। আকবরনামায় উল্লিখিত আছে যে, ওড়িশার পাঠান শাসক কতলু খাঁর সঙ্গে মোগলবাহিনীর অজয়-কুনুরের সঙ্গমস্থলে মঙ্গলকোটে যুদ্ধ হয়।[২৯] সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত রাজপথ ধরেই পাঠান বাহিনীকে মোগল সৈন্যদের বাধা দেওয়ার জন্য মঙ্গলকোটে উপস্থিত হতে হয়েছিল।

১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ভন-ডেন-ব্রুকের অঙ্কিত মানচিত্রে একটি সুদীর্ঘ রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। সে মানচিত্রে পাওয়া যায় ওড়িশা-সুবার কটক হতে ভদ্রক-মেদিনীপুর-বর্ধমান-গাজীপুর-অগ্রদ্বীপ (হাগদিয়া)-পলাশী-মুকসুদাবাদ-সুতী পর্যন্ত এক পথ। সুতীতে পথটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি শাখা পূর্ব মুখে উত্তরবঙ্গের দিকে এবং অপর একটি শাখা রাজমহল-মুঙ্গের হয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমান শহর হতে সম্ভবতঃ দিগনগরের পথে উত্তর-পশ্চিম মুখে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে বক্রেশ্বর হয়ে রাজনগর পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটির সঙ্গে কাশিমবাজার থেকে আগত অপর একটি রাজপথের সংযোগ সাধিত হয়েছিল। বর্ধমান শহর হতে সেলিমাবাদ-হুগলী-যশোহর-ভূষণা-সত্রাজিৎপুর অতিক্রম করে ধলেশ্বরী ও লখিয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ইদ্রাক পর্যন্ত প্রসারিত একটি পথের সন্ধান জানা যায়, যার অনতিদূরে বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৩০] ভন-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে ওয়্যালি মন্তব্য করেছেন,[৩১]—"Two roads are entered on his map— one, a Padishahi or royal road, extending

through Burdwan to Midnapore, and the other, a smaller road, which starting from Burdwan, passed through Salimabad and Dhaniakhali to Hooghly. The former was an important military route, being used by troops in the rebellion of 1696, in the march of Shuja-ud-din to Murshidabad and in the wars of Ali Vardi Khan."

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে জলপথ ও স্থলপথের বর্ণনা পাওয়া গেলেও স্থলপথ অপেক্ষা জলপথের বর্ণনা বিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত। ধনপতির গৌড় যাত্রা প্রসঙ্গে পথ-পরিচিতির যে চিত্র পাওয়া যায় তা হোসেন শাহের আমলে নির্মিত বাদশাহী সড়কের ইঙ্গিত বহন করছে। মুকুন্দরামের বিবরণে উজানী হতে গৌড় পর্যন্ত যাত্রাকালে ধনপতি সদাগর মজলিসপুর (ভরতপুর থানা, জেলা : মুর্শিদাবাদ), বারবকপুর, বালিঘাটা (রঘুনাথগঞ্জ থানা), ও শীতলপুরে (সম্ভবতঃ বর্তমান সুতী) বড় গঙ্গা পার হয়ে গৌড় নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যানভাগ পালযুগের ইতিহাস আশ্রিত হলেও ময়নাগড় হতে গৌড় পর্যন্ত যাত্রাপথটি নিঃসন্দেহে বাদশাহী সড়ক। পরবর্তীকালে মুঘল যুগে রাজমহলে রাজধানী স্থাপিত হলে ওড়িশার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্ত বাংলার রাজধানী হতে সুবা ওড়িশা পর্যন্ত সুলতানী আমলের রাস্তাঘাট মোগল আমলে ব্যবহৃত হত। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল', মানিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল', রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল', ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে পথ-পরিচিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ঘনরামের বর্ণনা বিস্তৃত হওয়ায় অন্যান্য কবিগণের তুলনায় এই বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। শ্রীধর্মমঙ্গলের রচনা-কাল হল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষ পর্ব ও বাংলার নবাবী আমলের প্রারম্ভিক যুগ।

শ্রীধর্মমঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের গৌড়যাত্রা ও গৌড় হতে লাউসেনকে অপহরণ করতে ময়না আগমনের জন্য ব্যবহৃত পথটির উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ময়না, যার ভৌগোলিক অবস্থিতি হল মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ২০ কিঃমিঃ পশ্চিমে কালিনী বা কাঁসাই নদীর তীরে। অতঃপর কেলেঘাই নদীর বিল বা জলাভূমি (পদ্মমার বিল) পেরিয়ে কাশিজোড়া—ধূলাডাঙ্গা—ব্রহ্মপুর (সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণভূম পরগণার সদর কার্যালয় নেডাদেউল)—কোতলপুর (বর্তমান কোটালপুর)—রাঙামাটি—গড় মান্দারণ—জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ)—উচালন (বর্ধমান জেলার রায়না থানায়)—মোগলমারি—আমিল্যা—বরাকপুরের খাল—উড়েরগড়—দামোদর নদ পার হয়ে—বর্ধমান (সরাই সহর)—কর্জনা—মঙ্গলকোট—অজয় নদ অতিক্রম করে—রাজকোট (পরিচয় অজ্ঞাত)—সিমুলিয়া—জামতি জালন্দা—পাঁচপাড়া (মোক্তারপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, মনোহরপুর, পলাশপুর ও হাজিপুর গ্রাম একত্রে পঞ্চগ্রাম)—গোলাঘাট—শীতলপুর (সম্ভবতঃ সুতী)—বড় গঙ্গা বা পদ্মাবতী—গঙ্গাবাটী হয়ে গৌড় বা রমৌতি (রমাবতী) নগরে পৌছানো

যায়। উপরোক্ত বর্ণনার সমর্থনে বলা যায় ঘনরামের প্রায় ৭০ বছর পরে জেমস্ রেনেল অঙ্কিত (১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ) মানচিত্রে প্রদর্শিত পথটি তমলুক থেকে কাঁসাই নদী অতিক্রম করে ময়নাগড—অমর্ষি—নারায়ণগড়—মেদিনীপুর—বাণপুর—নেড়া-দেউল—ক্ষীরপাই—জাহানাবাদ—মোগলমারি—বর্ধমান—কামনারা — মঙ্গলকোট—নয়াহাট—তারাপুর—সেখপুর—মির্জাপুর—জঙ্গীপুর—সুতী—নবাবগঞ্জ—রোহন-পুর—গৌড় (Ruins of Gour) বা রমাবতী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের ও বর্ধমানের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থসমূহে। সেসব গ্রন্থে বর্গী হাঙ্গামার সময়ে মারাঠী ও নবাব সৈন্যের গমনাগমনের নিমিত্ত ব্যবহৃত পথগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্তুগীজ, ইতালীয়, ওলন্দাজ বণিক ও পর্যটকগণ প্রধানতঃ জলপথে ভ্রমণ করায় স্থলপথ সম্পর্কে তাঁদের বিবরণে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না,[৩৩] বা যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের আট বছর পরে জেমস্ রেনেল সার্ভেয়ার নিযুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন এবং রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে যে সকল পথঘাটের উল্লেখ আছে, নিঃসন্দেহে ঐগুলি নবাবী আমলের বা তৎপূর্বে নির্মিত হয়েছিল। ইংরাজেরা ৮/১০ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রাস্তা প্রস্তুত করে নাই বা এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিস্তৃত অঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্মাণ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন দীর্ঘতম রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল না এবং সর্বপ্রথম ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 'Old Military Road' ব্যতীত অপর কোন রাজপথও নির্মিত হয় নাই।[৩৪] রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে উল্লিখিত পথঘাটগুলি নিঃসন্দেহে মোগলযুগের শেষ পর্ব এবং নবাবী আমলের প্রথমভাগে নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলার মধ্যে এমন বহু রাজপথ বা সাধারণ পথের পরিচয় জানা যায় যেগুলির মাধ্যমে বর্ধমান জেলার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগসহ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। এ সকল রাস্তাসমূহের পরিচিতি হল,[৩৫]—

১। হুগলী হতে পাণ্ডুয়া-মহব্বৎপুর (মেমারী)-বর্ধমান-আলমপুর-বনপাস-দিগনগর-মানকর-কুমারখালি-জামবন-উখরা-ছোড়রা-রাজাপুর-আহ্লাদী অতিক্রম করে বরাকর নদ পার হয়ে বড়মুড়া এবং তথা হতে মুসলমান আমলে নির্মিত পথটি সাসারাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

২। বর্ধমান হতে কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত পথটি বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে দাবা করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ পথটির অস্তিত্ব ছিল তেজ-চন্দ্রের বহু পূর্বেই এবং তিনি চারটি সরাইখানাসহ রাস্তাটির নূতন রূপ দিয়েছিলেন মাত্র। আলোচ্য পথের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এবং এই পথ ধরেই শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হতে নবদ্বীপের সন্নিকটে কুলিয়া গ্রামে এসেছিলেন। বৈষ্ণব

কবি জয়ানন্দের বাসস্থান এই পথের ধারেই যে ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় জয়ানন্দের রচিত "চৈতন্যমঙ্গলে"।

৩। হুগলী বা সপ্তগ্রামের সঙ্গে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুলতানী আমলেও ছিল। পরবর্তীকালে কলিকাতায় ইংরেজরা কুঠী ও দুর্গ স্থাপন করায় ঐ যোগাযোগ ব্যবস্থা কলিকাতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কলিকাতা থেকে ভাগীরথীর পূর্বকূল বরাবর পথে ব্যারাকপুর বা হুগলীর ঘাটে গঙ্গাপার হয়ে ১ নং পথকে অনুসরণ করত। সে পথগুলি হল—

ক) কলিকাতা—ব্যারাকপুর। হুগলী-শ্রীরামপুর-চন্দননগর-চুচুড়ার পথে হুগলী পর্যন্ত প্রসারিত একটি রাস্তা।

খ) কলিকাতা-সালকিয়া-অভিনগর-চণ্ডীতলা-নালিকুল-ধনিয়াখালি-বালিডাঙ্গা-সেলিমাবাদ-পারলা (বর্তমান পাল্লা রোড) হয়ে বর্ধমান।

গ) পূর্বোক্ত পথে ধনিয়াখালি থেকে কৃষ্ণবাটী-বৈঁচি-কুমারপুর-কালনা। তারপর কালনার নিকটে অম্বুয়া এবং সেখান থেকে দু'কিলোমিটার দূরত্বে গোলগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ বাজারের সঙ্গে এ পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল।

৪। ক) হুগলী থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীর বরাবর নয়াসরাই-ইঞ্চুরা-অম্বোয়া-কালনা-সমুদ্রগড-যবননগর (জাহান্নগর)-বেলতলি (বেলেরহাট)-ধুম্র্যা (দাঁইহাট) হয়ে কাটোয়া বা গঞ্জ-মুর্শিদপুর ও শাঁখাই যাওয়ার পথ।

খ) পূর্বোক্ত পথে বেলেরহাট হতে পাটুলী-অগ্রদ্বীপ; তারপর গঙ্গাপার হয়ে—অম্বিতপুর-পলাশী-কাশিমবাজার অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত একটি পথ।

গ) কাটোয়া (গঙ্গা পার হয়ে) হতে পলাশীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিল।

ঘ) সপ্তগ্রাম বা হুগলীর সঙ্গে জেলার পূর্বাংশের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাটি কালনার পথে সারগডিয়া-মরাইপিডি-মন্তেশ্বর এবং তথায় খড়ি নদী পার হয়ে কাটোয়া ও মঙ্গলকোট থানার মধ্য দিয়ে নিগন (নিগন সরাই) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মন্তেশ্বর হতে নিগন পর্যন্ত রাস্তাটি সম্পর্কে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে; কিন্তু অতঃপর এই পথটি লুপ্ত হয়ে যায়।

৫। সমুদ্রগড় হতে শ্রীবাটি (কাটোয়া থানা) পর্যন্ত রাস্তাটি ভক্তিখাঁ রোড নামে পরিচিত ছিল যা পরবর্তীকালে ইন্দ্রাণী সড়ক নামে খ্যাত হয়। কাটোয়া থেকে এই রাস্তাটি বণিকপল্লী শ্রীবাটী অতিক্রম করে সমুদ্রগডে পুরী যাওয়ার পথের সঙ্গে একদা মিশেছিল। বর্তমানে কিন্তু পথ ও নাম উভয়ই লুপ্ত। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে এই রাস্তার উল্লেখ আছে। কালনা-সমুদ্রগড-লস্করপুর-বাকসা থেকে উত্তর-পশ্চিম মুখে দাঁইহাট হয়ে কাটোয়া পর্যন্ত রাস্তাটি প্রসারিত ছিল।

৬। বর্ধমান শহরের সঙ্গে পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দিগনগর, মঙ্গলকোট, নিগন, কড়ুই ও বাকসা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাস্তা যা পূর্বোক্ত ভক্তিখাঁ রোডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই পথটির স্থানে স্থানে বিলুপ্তি ঘটে। নিগন-কৈচার-

ক্ষীরগ্রাম-কড়ুই-নন্দীগ্রাম-বাকসা পর্যন্ত প্রাচীন পথটির দীর্ঘতম অংশ পরিত্যক্ত হয়ে বর্তমানে নুতনভাবে কাটোয়া-মেমারী রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৭। রেনেলের মানচিত্রে বর্ধমান হতে কাটোয়া যাওয়ার দুটি পথের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে বর্ধমান-কামনারা-বালসিডাঙ্গা, ভাতার, পরসোনা (পলসোনা)-নিগন-শ্রীকোণ্ড (শ্রীখণ্ড) হয়ে কাটোয়ার রাস্তাটি বর্গী হাঙ্গামার সময় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। অপর একটি রাস্তা বর্ধমান হতে কামনারা ও মঙ্গলকোট হয়ে নিগনের নিকট পূর্বোক্ত রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

৮। ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' ময়নাগড থেকে বর্ধমান অতিক্রম করে গৌড পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটির পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। রেনেলের মানচিত্রে উক্ত রাস্তাটি উচালনে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে উত্তর মুখে দামোদর পার হয়ে বর্ধমান-মঙ্গলকোট এবং তৎপরে অজয় পার হয়ে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে পুনরায় কেতুগ্রাম থানায় দধিয়া বৈরাগ্যতলা পার হয়ে উত্তর মুখে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে সূতী অতিক্রম করে গঙ্গা পার হয়ে রাস্তাটি গৌড় পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই রাস্তাটি বাদশাহী সড়ক নামে আজও প্রসিদ্ধ।

৯। বর্ধমানের সঙ্গে বীরভূমের রাজধানী রাজনগরের যোগাযোগ ছিল, দিগনগর-আউসগ্রাম-গৌরাঙ্গপুর-সুরুল হয়ে ইলামবাজারের উত্তরাভিমুখী এক পথের সঙ্গে।

১০। বর্ধমান শহর হতে আলমপুর, ওরগাঁ, গোবিন্দপুর হয়ে অজয় নদ অতিক্রম করে সুপুরের সঙ্গে একটি পথের যোগসূত্র ছিল বলে জানা যায়।

১১। বর্ধমান শহর থেকে বাঁকুড়া জেলার ছাতনার যোগাযোগ ছিল দামোদরের উত্তরতীর হয়ে পশ্চিমাভিমুখী এক রাস্তা ধরে। বর্ধমান-বেলকাশ-দাউদপুর-গোহগ্রাম-লোয়াপুর (Lockor)- ফুলঝড়ি (Fullaponi) - সিলামপুর - নপাড়া (Nompara)-নদিহ-পুরসুর-শ্রীরামপুর এবং এর কয়েক কিঃমিঃ পশ্চিমে দামোদর অতিক্রম করে বাঁকুডা জেলার মাজদিয়া হয়ে ছাতনা পর্যন্ত রাস্তাটি প্রসারিত ছিল। অবশ্য বর্তমানে বাঁকুড়ার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে দুর্গাপুরে দামোদরের উপর সেতুনির্মাণের ফলে। দামোদরের বিধ্বংসী বন্যা, বাঁধনির্মাণ, রেলপথ ও বর্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের ফলে উপরোক্ত রাস্তার বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নাই।

১২। দামোদরের উত্তর তীরে অবস্থিত ফুলঝড়ি থেকে উত্তর-পূর্বাভিমুখী রাস্তাটি দিগনগরে মূল বাদশাহী সড়কের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

১৩। বর্ধমানের সঙ্গে বীরভূমের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, বর্ধমান-দিগনগর-ভাল্কি-ভাতকুণ্ডা (Batewara)-আদুরিয়া (Addarya)-কুমারবাজার (কুমারগঞ্জ) পর্যন্ত এবং তারপর সেনপাহাড়ীর ১৩ কিঃ মিঃ উত্তরে অজয় নদ অতিক্রম করে বীরভূম জেলার কোটা (Cotah) পর্যন্ত যাতায়াতের পথ ছিল।

১৪। পূর্বোক্ত ১১ নং রাস্তার সঙ্গে নদিহ-দুর্গাপুর-কুমারখালি-জামনা হয়ে উত্তরমুখী রাস্তাটি অজয় পার হয়ে ১৩নং রাস্তার সঙ্গে কোটাতে (Cotah) মিশেছিল।

১৫। ছাতনা হতে একটা রাস্তা মাঝদিয়ায় দামোদর নদ অতিক্রম করে উত্তর মুখে উখরায় চুরুলিয়া অভিমুখী রাস্তাটিকে ছেদ করে সোপুর এর নিকটে অজয় নদ অতিক্রম করে নাগরাকোন্দা (Locarconda) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

১৬। উখরা হতে চুরুলিয়া যাবার রাস্তাটি ছোড়ার (Churar)-হিজলগোড়া (Hesilgurra)-সত্তার হয়ে চুরুলিয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

১৭। মেদিনীপুর হতে বাঁকুড়ার ইন্দাসের মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা ধরে বর্ধমানে পৌছান যেত। আবার মেদিনীপুর-ইন্দাস-মামুদপুর-গোহগ্রাম-দামোদর অতিক্রম করে-সারুল (Salurya-Bublah-Cutsay) হয়ে দিগনগরের নিকট বাদশাহী সড়ক ধরে মুর্শিদাবাদে যাবার একটি পথ ছিল।

১৮। বর্ধমান হতে পুরী পর্যন্ত রাস্তাটি ছিল একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। গড় মান্দারণের পথে না গিয়ে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পথে পুরী পৌছান যায়। বর্ধমান-সেহারাবাজার-মোগলমারি-নন্দনপুর-বুলচাঁদ-ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর-জলেশ্বর-কটক অতিক্রম করে পুরী যাওয়ার পথ ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গৌড় বা মুর্শিদাবাদ থেকে পুরী যেতে হলে এই পথটিকে অনুসরণ করা হত।

১৯। বর্ধমান থেকে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের সঙ্গে যোগাযোগের নিদর্শন পাওয়া যায় ; বর্ধমান-সাদিপুর ও তৎপরে দামোদরের পশ্চিম তীর ধরে শ্রীকৃষ্ণপুর-তকিপাড়া হয়ে কয়েকটি নদীখাত অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত যাওয়া যেত।

২০। বর্ধমান শহর হতে সরস্বতী নদীর তীরে বেতড় বা প্রাচীন বেতড্ড-চতুরকে যাবার রাস্তাটি ছিল, বর্ধমান-পাল্লা-সেলিমাবাদ-আমতা হয়ে পূর্বমুখী মেদিনীপুর রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেতোড়ে যাওয়া যেত। ধনিয়াখালির সঙ্গে একটি রাস্তা উপরোক্ত রাস্তায় যুক্ত হয়েছিল।

২১। বর্ধমান হতে সপ্তগ্রামের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ত্রিবেণীর যোগাযোগ বহুকালের।

২২। শিখরভূমের রাজারা সেরগড় অঞ্চল থেকে রাজধানী কাশীপুরে স্থানান্তরিত করলে পাঁচেৎ রাজ্য হতে উত্তর-পূর্বমুখী রাস্তাটি দামোদর অতিক্রম করে রাধানগর, আহ্লাদী, রঘুনাথপুর, চুরুলিয়ার নিকট অজয় পার হয়ে বীরভূম জেলার লক্ষ্মণপুর হয়ে নাগরাকোন্দায় (Lacarcoonda) পৌছেছিল।

রেনেলের বিবরণে (সিট নং ১১) আছে, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে সসৈন্যে রবার্ট ক্লাইভ ভাগীরথীর বাম তীর বরাবর অগ্রদ্বীপ ও কাটোয়ার কাছে নদীপার হয়ে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম (বর্তমান জি.পি.ও. ও পূর্ব-রেলের অফিস) থেকে নির্গত হয়ে হুগলীতে নদী পার হয়ে নয়াসরাই-অম্বয়া-কালনা সমুদ্রগড়-জাহান্নগর—বেলতলী-পাটুলী-পিলে-গাজীপুর--

অগ্রদ্বীপে ভাগীরথী অতিক্রম করে ইংরেজ সৈন্য পলাশীতে উপস্থিত হয়েছিল। সৈন্যদলের অপর একটি অংশ ক্লাইভের অধীনে ১৭ই জুন পাটুলীর শিবির হতে কাটোয়ার পথে ঐদিন ঐস্থানে পৌঁছেছিল এবং সৈন্যদলটি ১৯শে জুন শাঁকাই দুর্গ দখল করার পর ২২শে জুন নদী পার হয়ে পলাশীর আম্রকাননে পৌঁছেছিল। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মেজর এডামস্ সসৈন্যে কলিকাতা থেকে হুগলী (পূর্বকূল ধরে) অম্বুয়া-অগ্রদ্বীপ-কাশিমবাজার-সূতী-রাজমহল-ভাগলপুর-মুঙ্গের হয়ে পাটনা পর্যন্ত মীরকাশিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। পাটনা যাওয়ার অপর একটি পথের পরিচয় পাওয়া যায়; কলিকাতা থেকে চুচুড়া, বর্ধমান, দিগনগর, আউশগ্রাম, কর্ণগড (Cornogar), সুরুল, ইলামবাজার, দুবরাজপুর, নগর (রাজনগর বা লক্ষ্ণোর), নবাবগঞ্জ হয়ে পাটনা যাওয়া যেত। রেনেলের মানচিত্রে Sangotgola নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের লেখা এক (২৯।১২।১৭৬০) পত্রে জানা যায়, দামোদরের দক্ষিণ তীরে বর্তমান গোলাগ্রামে তিনি বর্ধমানের মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সসৈন্যে হাজির হন।

এরপর একটি পথ ধরে বর্ধমান হয়ে এবং অপর একটি পথে হাজিপুর, দিগনগরের পথে কাটোয়ায় যাওয়া যেতে পারতো। আমার জ্যেষ্ঠতাত অতুলকৃষ্ণ চৌধুরীর নিকট শোনা গেছে যে, কাটোয়া-বর্ধমান রাস্তায় উটের গাড়ীই ছিল একমাত্র সম্বল। সম্ভবতঃ ঐ পথটি ছিল কলিকাতা, ধনিয়াখালি, বেলডাঙ্গা, সেয়ারা, বেলেড়া পর্যন্ত প্রসারিত এবং তারপর কাঁচা রাস্তায় সঙ্গতগোলা বা গোলাগ্রামে যাওয়া যেত।

বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের দেওয়ান বর্ধমানবাসী রামগোপাল রায় (জাড়া রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা) মেদিনীপুর অঞ্চলে জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতেন। কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোনা শহরে ঐ দেওয়ানের সহায়তায় রামচন্দ্রের মূর্তিসহ সুন্দর মন্দির ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬] বর্ধমান-চন্দ্রকোনা রাস্তায় অবস্থিত জাড়াতে পুরীতীর্থ যাত্রীরা ধর্মশালায় বিশ্রাম লাভের সুযোগ পেত। এই রাস্তাটি বর্ধমান-উচালন-জাড়া-চন্দ্রকোনা হয়ে জাজপুরে পুরীগামী সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। রানীগঞ্জ থেকে অন্য একটি সড়ক বাঁকুড়া জেলার মধ্যভাগ অতিক্রম করে পুরী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[৩৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমান হতে দক্ষিণে দামোদর নদ অতিক্রম করে উচালনের চটির উপর দিয়ে প্রায় ৬৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত ছিল চন্দ্রকোনা এবং এই রাস্তার উপরেই কেঠের খালের উত্তর তীরেই ছিল জাড়াগ্রাম।[৩৮]

আধুনিক যুগ :

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হতে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলে শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা কলিকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত

জি. হারকোলেটের মানচিত্রে দেখা যায় কলিকাতার সঙ্গে বর্ধমানের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল হুগলী শহরকে কেন্দ্র করে। হারকোলেটের মানচিত্রে পাওয়া যায়,—[৩৯]

১। হুগলী হতে ত্রিবেণী-নয়াসরাই-অম্বোয়া-সমুদ্রগড়-বেলতুল্লী (বর্তমান বেলেরহাট) হয়ে পাটুলী পর্যন্ত ভাগীরথীর প্রবাহপথ ধরে এবং তথায় নদী পার হয়ে অগ্নিতপুর ও পলাশীর পথে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাওয়া যেত।

২। কালনা হতে অপর একটি পথ ধরে সমুদ্রগড়-লস্করপুর (Luskerpore) মশাগড়িয়া (Mecipoogry) অতিক্রম করে খড়িনদী পার হয়ে বাক্‌সা (শ্রীবাটীর সংলগ্ন গ্রাম) হয়ে কাটোয়া পর্যন্ত যাওয়া যেত। এই পথটির একাংশ ভক্তি খাঁ রোড নামে পরিচিত ছিল।

৩। কাটোয়ার উত্তরে অজয় নদ পার হয়ে শাঁকাই-ইদিলপুর-কাগ্রাম (কেতুগ্রাম থানা)-চক্রতা (কাকতা) পার হয়ে বড়নগর ও মুর্শিদাবাদ যাওয়া যেত।

৪। হুগলী শহর হতে ধরমপুর (Dumah)-মালপাডা (মালতিপাড়া)-কৃষ্ণবাটি-(Kissabutty)-ছিনা (Chuna)-বৈঁচি-ওসমানপুর-বেতিয়া হয়ে কালনা পর্যন্ত প্রসারিত একটি নাতিদীর্ঘ স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান জানা যায়।

৫। কালনা-সারগড়িয়া-মরাইপিড়ি হয়ে মন্তেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত একটি পথের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

হেষ্টিংসের সময়ে কোম্পানির আগ্রাসন নীতিকে কার্যকরী করতে উন্নত-মানের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রীতির বশবর্তী হয়ে বা এদেশীয়দের সুযোগ-সুবিধার নিমিত্ত বর্ধমানের সঙ্গে বিহারের সাসারাম ও গয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে নাই। কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র উত্তর ভারতের উপর দ্রুত আধিপত্য বিস্তার করা। কিন্তু গঙ্গার তীর ধরে পাটনা বা বারাণসীর দূরত্ব অধিক হওয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত পথের চিন্তায় তারা এই অঞ্চল সমীক্ষা করে রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করে।[৪০] প্রধান রাস্তা দুটি যে জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত তৈরী করা হয় নাই, সেটি রাস্তা দুটির নামকরণ হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথম রাস্তাটি হুগলী-বর্ধমান-বাঁকুড়া জেলা হয়ে বিহার পৌঁছেছিল, যা 'ওল্ড মিলিটারী রোড' নামে পরিচিত ছিল এবং দ্বিতীয় রাস্তাটির নাম ছিল 'নিউ মিলিটারী রোড', যেটি বর্তমানে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে বিখ্যাত। ১৮২১-২২ খ্রীস্টাব্দে লেঃ খ্যামস্-এর তত্ত্বাবধানে সালকিয়া হতে নাগপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ওল্ড মিলিটারী রোড বা বারাণসী রোডের সঙ্গে জাহানাবাদ হতে ২০ কিঃমিঃ দীর্ঘ একটা রাস্তা মেদিনীপুর জেলার মোড়াগড়ে (Mooragurreah) এসে নাগপুর রোডের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় বর্ধমানের সঙ্গে নাগপুরের যোগাযোগ সহজ হয়েছিল। নাগপুর রোড় পরবর্তীকালে অহল্যাবাঈ রোড নাম পরিচিত হয়।[৪১]

সৈন্য চলাচল, ডাক ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বারাণসী হয়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত একটি পথের পরিকল্পনা করা হয়। বহুল ব্যবহৃত পাটনার পথের (বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চল হয়ে বিহারের পথ) দূরত্ব অধিক হওয়ায় বর্ধমান-ধানবাদ-সাসারাম হয়ে বারাণসীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে পরিকল্পিত পথের সূচনা করা হয়, সে প্রস্তাবিত পথের দূরত্ব যাতে অধিক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। তাছাড়া এই অঞ্চলে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার জন্য ক্যাপ্টেন জেমস্ ক্রফোর্ডকে কলিকাতা হতে বারাণসী পর্যন্ত প্রস্তাবিত রাস্তার নক্‌সা ও আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করতে অনুরোধ করা হয়। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুলাই, গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও কাউন্সিল কর্তৃক ২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু লণ্ডনের ডিরেক্টরবর্গের ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অগাস্ট তারিখের পত্রে জানা যায় যে, এই বিপুল খরচের প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে নাই এবং উক্ত পত্রে কলিকাতা হতে চুনারগড় পর্যন্ত ৪৩৬ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়।[৪২] অবশেষে ২০ বৎসরের মধ্যে রাস্তার নির্মাণকার্য শেষ হয় এবং এটি 'মিলিটারী রোড' নামে পরিচিত হয়। সালকিয়া হতে বাঁকুড়া জেলা পার হয়ে জৌনপুর অঞ্চল অতিক্রম করে এই পথে চুনারগড়ে যাওয়া যেত এবং বর্ধমান হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত বাদশাহী সড়কের উন্নতি ঘটিয়ে এর সঙ্গে যোগ করা হয়। কিন্তু দামোদর ও ধলকিশোর (দ্বারকেশ্বর) নদের প্লাবণে বর্ষাকালে রাস্তাটি যে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত তা বিভিন্ন-সূত্রের সংবাদে জানা যায়।[৪৩] বর্তমানে এ রাস্তার অধিকাংশ লুপ্ত হলেও অতীত স্মৃতির রোমন্থনের প্রয়োজন আছে।

পূর্বোক্ত রাস্তাটি নির্মিত ও ব্যবহৃত হ'তে শুরু হলেও নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা থেকে ব্যারাকপুর বা হুগলী হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। কেরী সাহেবের 'Good Old Days of The Hon'ble John Company' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্যারাকপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মূল পরিকল্পনায় হুগলী পর্যন্ত নির্মাণকার্য শেষ করে অবশিষ্ট দূরত্বটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে, হুগলী থেকে পাণ্ডুয়া, পাণ্ডুয়া হতে বৈঁচি, ও বৈঁচি হতে বর্ধমান পর্যন্ত নির্মাণকার্য সম্পন্ন করার কথা ছিল। এই হিসেবে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মগরা পর্যন্ত নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর মগরায় সেতু নির্মাণের (সরস্বতী নদী উপর) ব্যয়ভার বহন করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এই পথটি সৈন্য বাহিনীকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের প্রস্তাব অনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম (বর্তমান দুর্গ) থেকে দিল্লী পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পথ নির্মাণের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু জানা না

গেলেও ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পথটি বর্ধমান শহর ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে এগিয়ে গিয়েছিল বলে এক সংবাদে জানা যায়।[৪৪] সম্ভবতঃ এই সময়ে বর্ধমান ছাড়িয়ে রাস্তাটি প্রসারণের ক্ষেত্রে কোম্পানি অনিচ্ছুক ছিল। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে রাস্তাটির নির্মাণকার্য হাজারিবাগ পর্যন্ত সমাপ্ত হ'লে, এটি 'New Line of Roads' নামে পরিচিত হয় বটে, তবে বর্ধমান পর্যন্ত এটিকে মিলিটারী রোড নামেই অভিহিত করা হত এবং পূর্বোক্ত রাস্তাটি 'Old Military Road' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে বর্ধমান থেকে বারাণসী পর্যন্ত সম্প্রসারণের মধ্যে ২০৪ মাইল পাকা এবং অবশিষ্ট ১৩৭ মাইল পথ ছিল কাঁচা সড়ক। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই রাজপথটির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করায় ১৮৪৪-৪৫ খ্রীস্টাব্দে লেঃ বিডলকে রাস্তাটির বরাকর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে ৫০টি সেতু নির্মাণসহ আরও উন্নতি বিধানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং সেজন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ২ বছর ৬ মাস। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বারাণসী পর্যন্ত এটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। কলিকাতা হতে শেরঘাটি পর্যন্ত রাস্তাটিকে ২৬টি পর্যায়ে বিভক্ত করে এবং এইসঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর মিলিটারী শিবিরও স্থাপন করা হয়েছিল। এসব মিলিটারী শিবিরের (encamping ground) মধ্যে বর্ধমানেও যে একটি শিবির স্থাপিত হয়েছিল যার নামের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। রাস্তাটিতে প্রায় ১১ মাইল অন্তর একটি করে বিশ্রামাগারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত চার্লস-জোসেফের মানচিত্রে 'New line of Roads' এর পরিবর্তে এটি 'Grand Trunk Road' নামে উল্লিখিত হয়েছে এবং ঐ মানচিত্রে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড, ডাকবাংলো, বিশ্রামাগার, চৌকীবাংলো, ঘোড়া ও মহিষের বিশ্রামাগার, নিকটস্থ পোষ্ট অফিস ও থানাগুলির স্থানও নির্দেশিত হয়েছে। রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে ভাগীরথীর তীর বরাবর কলিকাতা থেকে বারাণসীর দূরত্ব ৬৮৬ মাইল, কিন্তু নূতন রাস্তায় বারাণসীর দূরত্ব হয়েছে ৫৭০ মাইল। রাস্তাটির নির্মাণ ব্যয় সে সময়ে প্রতি মাইলে ১০০০ পাউণ্ড হয়েছিল। কয়েদীদের রাস্তার কাজে নিযুক্ত ও সেতু নির্মাণের খরচ বাদ দেওয়ায় এত অল্প খরচে এই নির্মাণকার্য সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে মেজর ফ্রেড রবার্টস (Major Fred Roberts, V. C.—Dy. Asstt. Quarter Master General, Fort William)-এর লিখিত এক বিবরণীতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হতে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ঐ রাস্তার উপর নির্মিত চটি বা সরাইখানাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৫] এছাড়া পথ পার্শ্বে ডাকবাংলো, পানীয় জল, আহারের স্থান, বাজার, সৈন্যশিবির প্রভৃতির উল্লেখও মেজর রবার্টস-এর তালিকায় উল্লিখিত। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বরাকর নদীর খাত পর্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৪ মাঃ ৭ ফার্লং। বর্তমানকালে হাওড়ায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূরত্ব নির্দেশসূচক স্তম্ভ প্রোথিত হলেও

অতীতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এদিকে ছিল না সেকথা পরে আলোচিত হবে। এই বিবরণে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে পূর্ববর্তী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শুরু হয়ে আট মাইল দূরত্বে চিৎপুরের উপর দিয়ে দমদম অতিক্রম করে প্রথম কক্‌স বাংলোর (সম্ভবতঃ উত্তর দমদম) উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর খড়দহ ও ব্যারাকপুরের পাশ দিয়ে রাস্তাটি ফোর্ট হতে ১৭ মাইল দূরত্বে ইছাপুরের নিকট শেষ হয়েছিল এবং সেখানে ৬ ফার্লং প্রস্থ বিশিষ্ট ভাগীরথী নদী পার হওয়ার জন্য ফেরী যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত স্থানটি ছিল Ghyrethy Ghat (গৌরহাটি বা ঘেরেটির ঘাট)। গৌরহাটি হতে রাস্তাটি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর অতিক্রম করে চুচুড়ার ক্যাণ্টনমেণ্টের পাশ দিয়ে ২৬ মাইল দূরত্বে হুগলী জেলার সদর শহর হুগলী (বর্তমানে চুচুড়া) পর্যন্ত যাওয়া যেত। হুগলী থেকে হোসেনাবাদ হয়ে মগরা, তারপর মগরা পার হয়ে তারাসোনিয়ায় (বর্তমান তারাগুণ) অবস্থিত ছিল একটা ডাকবাংলো। এখান থেকে পাণ্ডুয়ার ডাকবাংলোটি অতিক্রম করে বৈঁচী হতে ৫ মাইল দূরত্বে স্থগনা (শ্যামনগর) ও ৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত মেমারীর ডাকবাংলো হয়ে রসুলপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে দুল্লাবাজারের (দলুই বাজার) চটিতে যাওয়া যেত।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ৭২ মাইল দূরে বর্ধমান শহরে ছিল একটি মিলিটারী শিবির (encamping ground—বর্ধমান ষ্টেশনের সন্নিকটে)। বর্ধমান থেকে উত্তর-পশ্চিম মুখে নবাবগঞ্জ (নবাবহাট), সাঁকো (৮½ মাইল) অতিক্রম করে এইপথে স্থরুল (বর্তমান সারুল) যাওয়া যেত এবং স্থরুল থেকে গলসী, গোলাগঞ্জ (বর্তমান গোলগ্রাম) রাকোনা (বর্তমান রামনগরের প্রাচীন নাম) অতিক্রম করে বুদবুদের চটিতে পৌছান যেত। বুদবুদ পার হয়ে পানাগড এবং বেনাড়ী (রামনাড়া) গ্রামের পর গোপালপাড়া (গোপালপুর) চটিতে যাত্রীগণের বিশ্রামস্থান ছিল। গোপালপুর হতে অণ্ডাল ডাকবাংলো ও বাজারের সে সময়ে দূরত্ব ছিল ১২ মাইল। অণ্ডাল হতে ৫ মাইল দূরে ভক্তনগরের ডাকবাংলো, মঙ্গলপুর এবং রানীগঞ্জ অতিক্রম করে এপথ ধরে বোখরার (চলবলপুরের উত্তরে) চটিতে পৌছান যেত। একটা রাস্তা রানীগঞ্জ শহরের উত্তরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হতে বের হয়ে রানীগঞ্জ এবং দামোদরের ঘাট-ফেরীতে পার হয়ে সেটি ৩০ মাইল দূরত্বে বাঁকুড়া শহরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। বোঘরা বা বভ্রা হতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল নিয়ামৎপুরের চটি এবং এই অংশে আসানসোল গ্রামে (তৎকালে গ্রাম) একটি ডাকবাংলোর অস্তিত্বের খবর জানা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম ও বর্ধমান শহর হতে নিয়ামৎপুরের দূরত্ব যথাক্রমে ১৪২ মাইল ও ৭০ মাইল। এরপর নিয়ামৎপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে বেগুনিয়া এবং সেখানে বেগুনিয়ার ফেরীঘাটে বরাকর নদ অতিক্রম করে ধানবাদ জেলার তালডাঙ্গা পার হয়ে নিরসা চটি পর্যন্ত যাওয়া যেত। বেগুনিয়ার ফেরীঘাট পর্যন্ত ছিল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের (পশ্চিমবাংলা তথা বর্ধমান

জেলার) শেষ সীমা। এরপর গয়া-বারাণসী-আম্বালা অতিক্রম করে এ রাস্তাটি পেশোয়ারে শেষ হয়েছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আছে শিবপুর থেকে গৌরহাটি পর্যন্ত রাস্তাটি ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের আমলে। কিন্তু ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম রেকর্ডের সঙ্গে এ রাস্তার কোন মিল নাই। অথচ মেজর রবার্টসের বিবরণে জানা যায় যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে চিৎপুর-ব্যারাকপুর হয়ে গৌরহাটি-হুগলী-বর্ধমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে শিবপুর থেকে গৌরহাটি পর্যন্ত যে রাস্তার উল্লেখ আছে, সেটি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিতি লাভ করে নাই। সম্ভবত: হাওডা থেকে দিল্লী পর্যন্ত রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুণ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে কাঠের সেতু (পন্টুন ব্রীজ) নির্মাণের ফলে কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ও সেইসঙ্গে ভাগীরথীর পূর্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিম-ভাগের গুরুত্ব অধিক হওয়ায় কলিকাতা থেকে গঙ্গার পূর্বভাগের রাস্তাটি পরিত্যক্ত হয়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, এ রাস্তাটির প্রধান অসুবিধা ছিল গৌরহাটিতে ফেরীযোগে গঙ্গা পারাপারের সমস্যা। অপরপক্ষে, হাওড়া শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ভারতের সরাসরি সড়কপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধাজনক হওয়ায় হাওডা থেকে যে সাধারণ রাস্তাটি গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর উত্তরমুখে প্রসারিত ছিল সেটিই পরে নূতনভাবে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, হাওড়া-চন্দননগর রাস্তাটি প্রাচীন হলেও নিঃসন্দেহে সেটি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে নাই।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হুগলীর জেলাশাসক জর্জ টয়নবির এক রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই বর্ধমান, কালনা, হুগলী, হরিপাল, বালি, চণ্ডীতলা, উলুবেড়িয়া, ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ পথঘাটগুলি মিলিটারীর দখলে ছিল। টয়নবি, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে রাস্তাগুলির দুরবস্থার উল্লেখ প্রসঙ্গে তৎকালীন জেলাশাসকের মন্তব্যকে তুলে ধরেছেন,—[৩৬]

"I am sorry to say that with the exception of the great lines of communication which are kept up by Government—and which by the way are frequently in a wretched state—no provision whatever exists making or repairing roads or bridges in the interior of the district." । এহেন দুরবস্থার চিত্র বাংলার সকল জেলাতেই ছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যায় ত্রিবেণী ও নয়াসরাই-এর ঝুলন্তসেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে হুগলীর সঙ্গে

যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া স্বল্প পরিসরের রাস্তাগুলি কেবলমাত্র জমিদারের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

কলিকাতা হতে নেসরা পর্যন্ত অংশটির মধ্যে ২টি ফেরী ঘাট, ৪টি সেতু ২টি সৈন্য শিবির, ১৭টি ডাকবাংলোর অস্তিত্ব ছিল এবং রাস্তার পাশে তৈরী হয়েছিল বহু চটি বা বিশ্রামালয় যেখানে যাত্রীরা আহার, পানীয় জল, ঘোড়ার গাড়ী, পাল্কী, আবাসগৃহ প্রভৃতির সুযোগ লাভ করতো; অবশ্য এর জন্য তাদের ধার্য সরকারী মাশুল অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে হত। এই রাস্তার উপর মগরায় সেতু নির্মাণের জন্য বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র ৩৬,০০০ টাকা দান করেন।[৪৭]

জনসাধারণের জন্য রাস্তাটি ব্যবহারের অনুমতি মিললে ডাক গাড়ী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে দূরতম অঞ্চলে গমনাগমনের নিমিত্ত যাতায়াত ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে, ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে 'The Inland Transit Company'-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জানা যায়, এই কোম্পানীর এরূপ প্রতিটি ষ্টেশনে ১১টি করে ঘোড়া রাখা হত। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে এট্‌কিনসন সাহেব এই উদ্দেশ্যে একটা ব্যবসা-সংস্থা গড়েছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এই সময়ে কলকাতায় 'North West Dak company'-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সংস্থাটি এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে সুন্দর সুন্দর ঘোড়া ও গাড়ীও আমদানী করেছিল। মোট ৬০০ জন সহিস, ৪০ জন দেশীয় কেরাণী, ৬০ জন কোচম্যান ও ২০ জন ইংরাজ ওভারসিয়র নিয়ে এই সংস্থা ১২০০ মাইল দীর্ঘ পথে ডাক ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে চিঠির চার্জ হয়েছিল ৫ আনার পরিবর্তে ৩ আনা এবং কলিকাতা হতে বারাণসী পর্যন্ত নূতন ডাক ব্যবস্থায় ১২০ ঘন্টার পরিবর্তে ৫২ ঘণ্টায় চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হত। অবশ্য এর বহু পূর্ব থেকেই ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে বর্ধমান হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পত্র প্রেরণের ব্যয় জানা যায়।[৪৮]

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের ফলে ইংরেজ শাসককুল পূর্বাঞ্চলের মধ্যভাগের এক অরণ্য সমাকুল পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে সম্ভবতঃ এই রাস্তা নির্মাণের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ তারা দ্রুত সিপাহী বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

বর্ধমান জেলার মধ্যে একটি রাজপথ ও একটি সেতু নির্মাণের কাহিনী হয়ত বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত রাজপথটির অস্তিত্ব নবাবী আমল বা মোগল যুগের পূর্বেই ছিল। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' নামক গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে যে, মহারাজা তেজচন্দ্র বর্ধমান হতে কালনা পর্যন্ত 'কালনা রোড' নামক রাস্তাটি নির্মাণ করেছিলেন।

কিন্তু ভন ডেন ব্রুক ও রেনেলের মানচিত্র দেখলে স্পষ্টতই এই দাবী নস্যাৎ হয়ে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন রাস্তাটিকে মহারাজা তেজচন্দ্র নূতন রূপ দিয়েছিলেন মাত্র। নবাবী আমলেই এই রাস্তার ধারে ইংরাজদের ৪টি কুঠি বা ফ্যাক্টরী ছিল, যথা—বর্ধমান, বৈকুণ্ঠপুর, কুচুট ও সাতগাছিয়া। কিন্তু 'রাজবংশানুচরিতে'র বিবরণে পাওয়া যায়,[৪৯] —"মহারাজা তেজচন্দ্র বর্ধমান হ'তে অম্বিকায় যাইবার যে সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন, ঐ পথের প্রতি চার ক্রোশ ব্যবধানে এক একটি আড্ডাবাটী প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে পুষ্করিণী খনন ও তদুপরি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। আটঘরিয়া, রাইপুর, সাতগাছিয়া ও কুচুটে ৪টি আড্ডাবাটী ছিল।" তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুরাতন ফ্যাক্টরীগুলির মধ্যে দু'টি নূতন রূপ লাভ করে এবং দু'টি নবনির্মিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তেজচন্দ্র এই রাস্তা যদি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের অনতিপূর্বে নির্মাণ করে থাকেন তাহলে তৎপূর্বে বিষণকুমারী ও পরবর্তীকালে প্রতাপচাঁদ (শেষ যাত্রা) কালনার রাস্তায় কিরূপে যাতায়াত করতেন! ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর কলিকাতা কাউন্সিলের প্রসিডিংস থেকে জানা যায় যে, ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে সসৈন্যে কালনা হতে বর্ধমান অভিযানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৫০]

সুতরাং বেশ বোঝা যায়, তেজচন্দ্রের আমলে কালনা রোড সংস্কার সাধিত হয়ে রাস্তার ধারে সরাইখানা বা বিশ্রামাগার নির্মিত হয়েছিল এবং ঐগুলির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বিশ্রামাগারের বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়।[৫১]

গ্রাম : কুচুট : থানা মেমারী, নির্ম্মাণকাল ১৭৫৩ শকাব্দ=১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ।

'ত্রীন্দ্রীন্দু শাকে সকলজন সুখাং পদ্ধতি বৃক্ষপার্শ্বং
স্বার্দ্ধক্রোশাঙ্ক পাষাণ মুনিগুণমিতাং সংক্রমৈর্যোজনান্তঃ।
ব্যাপারামেশ বৃন্দাষ্ট গজ হয় নিজাগার কূপাপনাঢ্যাং
ভূপ শ্রীতেজচন্দ্রোঽকৃত নিজ ভবনাদম্বিকান্তাং মনোজ্ঞাং ॥'

গ্রাম : সাতগাছিয়া : থানা মেমারী, নির্মাণকাল ১৭৫৩ শকাব্দ=১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ।

'শকে শুমরাশ্ব চন্দ্রগণিতে বৃক্ষালিযুক্তাস্থতিং
ক্রোশার্ধাঙ্ক শিলা মুণিত্রয়মিতাং চক্রোঽভূতৈঃ সংক্রমৈঃ।
দেবারাম সরোগজাশ্ব নিজগোবৃন্দেশ বেশ্মাপনাং
ভূপ শ্রীযুত তেজচন্দ্র নৃপতি স্বীয়লয়াস্তাম্বিকাং ॥'

গ্রাম : আটঘরিয়া : থানা-কালনা, নির্মাণকাল ১৭৫৩ শকাব্দ—১৮৩১ সাল।

'শকে হব্বেহগ্নীষু পৃথ্বীধরবিধুগণিতে বৃক্ষমালাদ্বিপার্শ্বাং
ক্রোশার্দ্ধাশ্মাঙ্কিতাশ্বানলমিত সুস্থতিং সংক্রমৈ সংপ্রচক্রে।
ভূপ শ্রীতেজচন্দ্রো ব্যপবনমিলিতাং যোযনস্তে নির্মত্যাং
বাপীকূপেশ বৃন্দাশ্বগজহয় গৃহাং বর্দ্ধমানোম্বিকান্তঃ ॥'

গ্রাম ঃ রাইপুর ঃ থানা-কালনা, নির্মাণকাল ১৭৫৩ শকাব্দ=১৮৩১

'শৃঙ্খোম্বশ্বেন্দু শকে বিবিধ তরুগণাচ্ছন্ন বর্দ্ধয়ণং যৎ
স্বার্দ্ধক্রোশাঙ্কসিদ্ধত্রিমিতমকৃত সৎসংক্রমৈর্যোজনান্তঃ।
বাপীবৃন্দাষ্টকেশস্বগজহয় গৃহারাম কূপাপনাঢ্যং
ভূপ শ্রীতেজচন্দ্, সকল জন সুখার্দ্ধমানাধিকান্তঃ॥'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, কুচুট ব্যতীত অবশিষ্ট বিশ্রামাগারগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত।

বর্ধমান জেলায় নদীর উপর নির্মিত দুটি সেতু প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। সর্বপ্রাচীন সেতুটি কেতুগ্রাম থানার নৈহাটি-সীতাহাটি গ্রাম সংলগ্ন শিবা নদী বা কাঁদড খালের উপর নির্মিত হয়েছিল। প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ পাঁচ খিলান বিশিষ্ট সুদৃঢ় ইষ্টক নির্মিত সেতুটির গঠনবৈশিষ্ট্য আজ বিস্ময় উৎপাদন করে। পরিত্যক্ত সেতুর দু'পাশের রাস্তা অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, বর্তমানে এই সেতুটি ভেঙ্গে ফেলে সেখানকার ভাঙ্গা ইটগুলি রাস্তায় একসময়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু সেতুর গাঁথুনী এত শক্ত ছিল যে, সাধারণ শ্রমিকেরা ঐ সেতু ভেঙ্গে ইট সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেতু ভাঙ্গার কাজটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই কাঁদড় খালটি বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনোক্ত সিঙ্গুটিয়া নদী। স্থানীয় লোকে দাবী করে যে, সেতুটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল এবং তাঁরা সেতুর গায়ে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি থেকে এ-প্রমাণ পেয়েছেন বলেও দাবী করেন। কিন্তু বর্তমানে শিলালিপিটির সন্ধান না পাওয়ায় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; তবে সেতু গঠনের বৈশিষ্ট্য, নির্মাণকুশলতা ও ইটের ব্যবহার প্রণালী দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি অন্ততঃপক্ষে মোগল যুগের শেষ পর্বে নির্মিত হয়েছিল। যে সময়ে শাঁকাই-এর দুর্গ নির্মিত হয়েছিল, সেতুটি তারও পূর্বের বলে সনাক্ত করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নিকটবর্তী এনায়েৎপুরে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তৈরী একটি সুন্দর মসজিদ এখনও অবিকৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে তার প্রাচীনত্বকে ঘোষণা করছে। সেতুটি স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট 'মাসীর সেতু' নামেই সমধিক পরিচিত।

বর্ধমান জেলায় অবস্থিত দ্বিতীয় প্রাচীন সেতুটি বর্ধমান শহরের বুকে আজও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়ির পশ্চিমভাগে নতুনগঞ্জের মধ্য দিয়ে নবাবেড পর্যন্ত যে রাস্তাটি প্রসারিত হয়েছে, ঐ রাস্তার উপর বাঁকা বা বঙ্কেশ্বরী নদীর উপর এ সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ঐ স্থানটি রাধাগঞ্জের ঘাট নামে পরিচিত ছিল। সেতুটির উপর প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি (বর্তমানে অপসৃত) হ'তে জানা যায় যে, বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র ১৭৪২ শকাব্দে (১৮২০-২১ খ্রীস্টাব্দে) জনসাধারণের পারাপারের নিমিত্ত রাধাগঞ্জের ঘাটে বাঁকা নদীর উপর এটি নির্মাণ করেছিলেন। এটিতে নিবদ্ধ সে লিপিটির পাঠ :[৫২]

"শ্রীরাধাবল্লভাবির্ভবন সুখভরৈর্ভাস্বরে বর্দ্ধমানে
শ্রীরাধাগঞ্জঘট্টে ভুজযুগমুনিভূসম্মিতেঽস্মিন্ শকাব্দে।
নদ্যাং বঙ্কাভিধায়াং পথিকজন সুখং সংক্রমং গোত্রতূল্যং
ধীর শ্রীতেজচন্দ্রো বরমকৃত মহারাজাধিরাজঃ ॥"

সেতুর উপর উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বর্ধমান শহরে নবনির্মিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (মিলিটারী রোড) বাঁকা নদীকে অতিক্রম করেছিল, যার উপর একটি সেতু নির্মিত হয়। দ্বিতীয় সেতুটি ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দ বা তৎপূর্বেই নির্মাণ করা হয়। কিন্তু উভয় সেতুর নির্মাণশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। একই সময়ে সেতু দু'টি নির্মিত হলে অন্ততঃপক্ষে কিছুটা সাদৃশ্য থাকা উচিৎ ছিল। এক্ষেত্রে উভয় সেতুর নির্মাণশৈলীর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথমটি (রাধাগঞ্জ) দ্বিতীয় সেতুটি (বীরহাট) অপেক্ষা প্রাচীন। উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে কেবলমাত্র সেতুটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। সেতুটির নির্মাণ-পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় আলোচ্য সেতুর সঙ্গে পূর্বোক্ত 'মাসির সেতুর' গঠনরীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ বাংলার সুবাদার আজীম-উস্-শান বর্ধমান শহরে তিন বৎসর যাবৎ বসবাস-কালীন 'বেড়' অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এই সেতুটি নির্মাণ করতে পারেন বলেই অনুমান। বেড়ের নবাববাড়িতে তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর খাজা আনোয়ার সমাহিত আছেন। সেতুটির গঠন-পদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ মোগল আমলে নির্মিত সেতুটি তেজচন্দ্রের সময়ে সংস্কার সাধিত হওয়ায় তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠালিপি নিবদ্ধ করা হয়—যেমনটির উদাহরণ পাওয়া যায় বর্ধমান-কালনা রাস্তা প্রসঙ্গে।

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, যশোহর নিবাসী কালীপ্রসাদ পোদ্দার নিজ ব্যয়ে যশোহর হতে নবদ্বীপ হয়ে অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করেন এবং পথিকজনের সুবিধার্থে উক্ত রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। একাজে তাঁর সর্বমোট ব্যয় হয়েছিল ৪৪, ০০০ টাকা।[৫৩] বর্ধমান জেলার মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকটি সীমিত এলাকা ব্যতীত রেলপথের সুযোগ-সুবিধা হতে একটা বিরাট অঞ্চলের জনসাধারণ বঞ্চিত। সে কারণে জেলার অভ্যন্তরভাগে যোগাযোগ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে রাজপথের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মিত হওয়ার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে এই ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। এ সময়ে প্রাচীন রাস্তাগুলি সংস্কারসাধনের যে প্রয়োজন ছিল, সে লক্ষ্য পূরণে বিদেশী শাসককুলের ছিল নিতান্ত অনীহা। কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে গোযানের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গোযানের বিকল্পও অনুপস্থিত। এখনও এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে বর্তমানকালেও গোযানের পরিবর্তে অন্য কোন

যানবাহনে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রে বা রেলষ্টেশনে আনয়ন করা সম্ভবপর নহে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন সরকারী বিবরণ জানা যায় না। ১৮৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দের এক সরকারী প্রতিবেদনে বর্ধমান জেলার আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য জেলার সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগের নিমিত্ত কয়েকটি পথ-পরিচিতির উল্লেখ আছে। তবে এগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন রাস্তার নব্যরূপ। সে পথগুলির তালিকা যা দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ :[৫৪]

১। সিউড়ী হতে দুবরাজপুরের মধ্য দিয়ে অজয় নদ অতিক্রম করে রানীগঞ্জ হয়ে বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত।

২। বাঁকুড়া হতে সোনামুখী-বুদবুদের মধ্য দিয়ে সিউড়ী পর্যন্ত।

৩। বর্ধমান হতে সিউড়ী পর্যন্ত।

৪। খণ্ডঘোষ হতে সোনামুখী পর্যন্ত।

৫। বুদবুদ (মহকুমা সদর ছিল) হতে মানকর রেল স্টেশন পর্যন্ত।

৬। দিগ্‌নগর হতে গুসকরা ষ্টেশন পর্যন্ত রেলপথের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা।

৭। বর্ধমান হতে কাটোয়া পর্যন্ত প্রসারিত পথটির ৮ মাইল মাত্র পাকা ছিল।

৮। শাঁকাই-এ অজয় নদ পার হয়ে কাটোয়া হতে সিউড়ী পর্যন্ত।

৯। গুগুনডিহি (বর্তমান বলগনা ষ্টেশন) হতে গুসকরা রেলষ্টেশন পর্যন্ত।

১০। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীর বরাবর কাটোয়া হতে দাঁইহাট পর্যন্ত ৪ মাইল দীর্ঘপথ।

১১। কেতুগ্রাম থানার মোরগ্রাম হতে মঙ্গলকোট-বর্ধমান (সদর ঘাটে খেয়া পার হয়ে; বর্তমানে সেতু) উচালন পর্যন্ত রাস্তাটি প্রাচীন বাদশাহী সড়ক।

১২। সাতগাছিয়া হতে মেমারী রেলষ্টেশন পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তা।

১৩। জামালপুর হতে মেমারী রেলষ্টেশন পর্যন্ত সংযোগকারী পথ।

১৪। কাঠগোলার ঘাটে দামোদর নদ পার হয়ে বর্ধমান হতে খণ্ডঘোষ হয়ে সোনামুখী পর্যন্ত রাস্তা।

১৫। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে ওল্ড মিলিটারী রোডকে বর্ধমান জেলায় দেখান হলেও বর্তমানে এটি হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত।

১৬। কাটোয়া হতে দাঁইহাটের মধ্য দিয়ে রেল লাইনের উত্তর পার্শ্ব বরাবর প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ছাতনাতে (পূর্বস্থলী থানা) ন্যাশানাল হাইওয়েতে মিশেছে এবং কালনা পর্যন্ত রাস্তাটি এযুগে লুপ্ত হয়ে গেছে।

১৭। বর্ধমান-উচালন-একলাকি-ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর পর্যন্ত রাস্তাটি উচালন থেকে একলাকি হয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত অংশটি একদা 'মেদিনীপুর রোড' নামে পরিচিত ছিল।

১৮। সিডডী-পুরন্দরপুর-আহমদপুর হয়ে কাটোয়া পর্যন্ত।

১৯। পুরন্দরপুর হতে ইলামবাজারের দক্ষিণে অজয় নদ অতিক্রম করে বর্ধমান শহর পর্যন্ত একটি পথ।

২০। বীরভূম জেলার পূর্বভাগে ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণ তীর হতে ইলামবাজার পার হয়ে কাঁকসার মধ্য দিয়ে সোনামুখী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পথ।

২১। সিউড়ী হতে দুবরাজপুরের মধ্য দিয়ে অজয় নদ অতিক্রম করে ২৩ মাইল দীর্ঘ পথের অনেকাংশই নূতন রূপ নিয়েছে।

উপরোক্ত রাস্তাগুলি ব্যতীত জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের অধীনে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কয়েকটি পথ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, রেলষ্টেশন ও কোলিয়ারী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বহু রাস্তা নির্মিত হয়েছিল, যেগুলি বর্তমানকালে বর্ধিত আকারে বিভিন্ন দিক প্রসারিত হওয়ায় বর্তমান রাস্তাগুলির সেই সাবেকী অবস্থা আর চেনা যায় না। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও অন্যান্য রাস্তাগুলির পার্শ্বে ইন্‌পেকসেন ডাকবাংলো যেসব নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে বুদবুদ, রাজবাঁধ, চাঁদমারী, কর্জনা, গুস্তনদীঘি, শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মেমারী, গুসকরা, পানাগড, উচালন, সাতগাছিয়া, কালনা, আসানসোল, বনবহাল, কুসুমগ্রাম, বরাকর, বর্ধমান (সার্কিট হাউস) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডাকবাংলোগুলির অবস্থা একসময়ে অত্যন্ত সঙ্গীন ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এগুলি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে আসায় যথেষ্ট শ্রীবদ্ধি না ঘটলেও ব্যবহারিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের পর হতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ও জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাস্তাঘাট প্রসারণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি এলাকা ব্যতীত বর্তমানে প্রায় প্রতি অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর ও আসানসোলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সড়ক পরিবহনের দ্রুত প্রসারণ ঘটায় বর্ধমান শহরে সদরঘাটে দামোদরের উপর কৃষক সেতু, চরকিতে অজয়ের উপর সেতু (কাশীরামদাস সেতু) ও নবদ্বীপে ভাগীরথীর উপর গৌরাঙ্গ সেতু নির্মাণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ বিহার ও অসম রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় দ্রুততা এসেছে। কলিকাতা হতে প্রসারিত হাইওয়েটি কালনা-কাটোয়ার পথে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে মিলিত হয়ে উত্তরবঙ্গ ও অসমের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এনেছে। কলিকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে শিল্পনগরী দুর্গাপুরে পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে ২ নং হুগলী সেতু ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে।

পথ মানুষকে করেছে ঘরছাড়া, পথ মানুষকে নিত্যনূতন আবাসস্থল আর কর্মস্থলের সন্ধান দিয়েছে, তেমনি এই সব পথ ধরে একদা দুর্বারগতিতে ভিন্ন জনপদের সৈন্যদল এসে বর্ধমান তথা রাঢ় জনপদের উপর যুগ যুগ ধরে নিপীড়ন চালিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পথিপার্শ্বেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন গ্রাম, গঞ্জ, নগর আর সরাইখানাগুলি। প্রাচীন গ্রাম ও নগরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার কালক্রমিক

সূত্রগুলি অনুসন্ধান করলে এখনও বহু বিস্মৃত ও লুপ্ত পথের সন্ধান যে জানা যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের ন্যায় পথঘাটগুলি একটি বিস্মৃত অধ্যায়ে নির্বাসিত হয়ে আছে। সেজন্য প্রাচীন কালের পথ-পরিচিতি আজ কেবলমাত্র অনুমানসাপেক্ষ ও ঐতিহাসিকগণের বিতর্কিত বস্তু। মধ্যযুগের পথ-পরিচিতির একমাত্র ভরসা মঙ্গলকাব্য, সামরিক অভিযান ও রেনেলের মানচিত্র। ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয় বিধায় বহু রাজপথ ও স্থানীয় পথ লুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যেও ক্ষীণ সূত্র ধরে ঐসব রাস্তাঘাটের পরিচয় ও বিস্তৃতি যদি বর্তমান জনপদ বা স্থান-নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্যালোচনা করা না হয়, তা'হলে অচিরাৎ ক্ষীণসূত্রগুলিও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইতিহাস, সাহিত্য, ও পুরাতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা সন্ধানরত তাঁরা শত চেষ্টাতেও পরে শ্রীধর্মমঙ্গলে বর্ণিত উপাদান বা রেনেল সাহেবের কৃত মানচিত্র থেকে প্রাচীন পথের পরিচয় আর খুঁজে পাবেন না।

রেলপথ :

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রানীগঞ্জে কয়লার খনি আবিষ্কারের পর গুরুভার বহনের নিমিত্ত উন্নত মানের পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে গভর্ণর-জেনারেল হেষ্টিংস-এর পৃষ্ঠপোষকতায় খনি আবিষ্কার ও কয়লা উত্তোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলেও রানীগঞ্জ থেকে কলিকাতায় কয়লা আনয়নের জন্য দামোদর ও অজয়ের জলপথ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দামোদর ও অজয় নদে দেশী নৌকা ও ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় জাহাজ ও জ্বালানীর প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ করা হত। ছোট ও মাঝারি ধরনের দেশী নৌকায় অজয়ের পথে কয়লা বহন করে প্রথমে কাটোয়ার Dhoba Company-র গুদামে মজুত ক'রে, তারপর ভাগীরথীর পথে ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় কয়লা নিয়ে আসা হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভাগীরথী নদী, দামোদর ও অজয় নদের খাতে চড়া পড়ে নদীখাতের গভীরতা নষ্ট হওয়ার এই জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা অলাভজনক তথা বিপদজ্জনক হয়ে পড়ে।

ইংরেজরা স্বীয় স্বার্থের প্রতি নজর রেখেই ভারতবর্ষে রেলপথ প্রসারে যত্নবান হয়েছিল। পূর্ব ভারতে রেলপথ প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনিগুলি থেকে কয়লা, লোহা, এলুমিনিয়াম, তামা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে ইংলণ্ডে রপ্তানি করে, তথাকার কলকারখানায় সস্তায় কাঁচামালের যোগান দেওয়া। সেকারণে, বর্ধমান জেলায় রেলপথ প্রসারণের জন্য বিদেশী শাসকদের বিশেষ নজর ছিল। কেবলমাত্র যাত্রী পরিবহনের জন্য রেলপথের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব থাকলেও কোন তাগিদ ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় একদিকে যেমন সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে, অন্যদিকে ভারীদ্রব্য পরিবহন, অরণ্য হতে কাঠ সংগ্রহ ও কলিকাতা বন্দরের জন্য পশ্চিমাঞ্চল হতে

কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ আনয়নের ক্ষেত্রে রেলপথ স্থাপনের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এছাড়া তারা যে দ্রুত সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল তারও পিছনে ছিল রেলপথ স্থাপনের ফলশ্রুতি।

স্বভাবতই রেলপথ প্রতিষ্ঠার জন্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পরিবহন ব্যবস্থায় এল দ্রুততা ও নিশ্চয়তা। আনুষ্ঠানিকভাবে রেলগাড়ী চলাচলের দশ বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল লাইন পাতা ও মাপজোপের কাজ। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে স্যার রোল্যাণ্ড ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি এবং তিনিই এই কোম্পানির এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। ষ্টিফেনসনের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত জরিপকার্য অনুষ্ঠিত হয় এবং রেলওয়ে কোম্পানি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করায় ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রস্তাব সম্পর্কে ষ্টিফেনসন মন্তব্য করেছেন,—" 'Active operations have now at the close of 1850 scarcely commenced. The interval (from 1844) has been occupied with discussion, doubts, objections and their solution and removal. At the commencement of 1851, the practicability, the usefulness, and indeed the indispensable necessity of constructing at least the great trunk lines of the country will probably be undisputed.' অবশ্য এই বিলম্বের অপর একটি কারণ ছিল, ভূমি অধিগ্রহণের কোন আইন না থাকায় ফলে উদ্ভূত সমস্যা। অবশেষে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ল্যাণ্ড অ্যাক্ট'-এর বলে রেল কোম্পানি রেল লাইনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষে ষ্টিফেনসন, জর্জ টার্নবুল ও তাঁদের সহকারীদ্বয় পেরসার ও ইভান্স-এর উদ্যোগে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়েছিল ১৮৫০-৫১ সালে। ইংলণ্ড থেকে পরিদর্শক ও ইট নির্মাণে কুশলীকর্মীদের নিয়ে আসা হয়েছিল এবং প্রশিক্ষণের নিমিত্ত হাওড়ায় ১৮৫১ সালে একটি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছিল। ১৮৫০ সালে দামোদরের প্রবল বন্যায় ইট পোড়ানোর জন্য রানীগঞ্জ হতে বোঝাই হওয়া ২০০০ টন কয়লাসহ ১১০ খানি নৌকা জলমগ্ন হলে রেলপথ নির্মাণের কাজে বেশ বাধা পড়ে।

পর বৎসর রানীগঞ্জ হতে বরাকর পর্যন্ত এবং সিউড়ী, দানাপুর, বক্সার হয়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত ভূভাগের জরিপ কাজ শুরু করা হয়েছিল নূতন লাইন স্থাপনের উদ্দেশ্যে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে রেলওয়ে কোম্পানি ১০০০ মাইল পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ষ্টিফেনসন ইংলণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য হওয়ার প্রস্তাবিত রেললাইন স্থাপনের কাজে বেশ ভাঁটা পড়ে।

সে যাই হোক, ভারতবর্ষের মাটিতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী চালু হয় ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে এবং সেখান থেকে থানে পর্যন্ত ৩৪ কি.মি. পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল মোট ৫৭ মিনিট। ঐ বছরের শেষ ভাগে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ৬৪ কিঃ মিঃ রেলপথ তৈরী করা হলেও রেলগাড়ী চালানোর প্রারম্ভে দুটি বিশেষ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পূর্বাঞ্চল প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিল। প্রথমতঃ ইংলণ্ড থেকে 'গুডউইন জাহাজে' বোঝাই করা কোচ নিয়ে কলিকাতা বন্দরে আসার সময় বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সেটি ডুবে যায় এবং সেইসঙ্গে ইঞ্জিন বোঝাই জাহাজটি ভুলক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরে চলে যায়। ১৮৫৪ সালের জুন মাসে ইঞ্জিনগুলিকে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এছাড়া, দ্বিতীয় আর একটি বিঘ্নের কারণ হল, ফরাসী-চন্দননগর ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল না হওয়ায় রেল লাইন পাতার বিষয়ে ফরাসী সরকারের সঙ্গে মীমাংসা করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় সত্বর রেল চলাচলের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ড থেকে এইভাবে তৈরী কোচ আনয়নের অসুবিধা এবং অযথা বিলম্ব দূরীকরণের জন্য জন হগসনের তত্ত্বাবধানে এদেশে কোচ ও মালগাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। এ কাজে অগ্রণী হয় স্টুয়ার্ট ও সেটন কোম্পানী এবং ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে উক্ত কোম্পানীদ্বয় ৪ খানি প্রথম শ্রেণী, ৮টি দ্বিতীয় শ্রেণী, ও ১৭টি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া এই সময়ে ভ্যান ও মালগাড়ী নির্মাণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট ৬৪ টি।

পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৫৪ সালের ২৮শে জুন হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলগাড়ী চালান হলেও, প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চলেছিল ঐ বছরের ১৫ই অগাষ্ট তারিখে। সে সময় হাওড়া হতে হুগলী পর্যন্ত প্রথম ট্রেনটির মোট ৩৭ কিঃ মিঃ দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এই গন্তব্যস্থল বর্ধিত হয়ে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত প্রসারিত করা হল। অবশেষে ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্ধমানের কালো হীরের ভাণ্ডার লুণ্ঠনের নিমিত্ত বিদেশী বণিক ও শাসককুল এই রেলপথের মাধ্যমেই তাদের বহু প্রতীক্ষিত ১৯০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী কলকাতা থেকে রানীগঞ্জে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। এক চিত্রকরের তুলিতে প্রথম বর্ধমান রেলষ্টেশন উদ্বোধন উপলক্ষে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, শহর থেকে দূরে বনজঙ্গল অতিক্রম করে সরু পথ ধরে ঐ সময়ে রেলষ্টেশনে যাওয়ার।পথ ছিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী, হাতী, ঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ-সহ বর্ধমানের মহারাজাও সম্ভবতঃ যে রেলষ্টেশনে উপস্থিতি ছিলেন, চিত্রটি দেখে অন্ততঃ তাই অনুমিত হয়। সে সময়ে কলিকাতা-দিল্লীর পথে বর্ধমান ছিল উল্লেখযোগ্য এক স্থান এবং ১৮৬০ সালের পূর্বে কলিকাতার লোকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখানে আসত। এ প্রসঙ্গে ১৮৪৬ সালেই রেভাঃ লঙ মন্তব্য

করেছিলেন,[৫৬]—'The rail road connecting Calcutta with Delhi is to pass near Burdwan, which will make the place better known.'।

রেলপথ চালু হবার তিন বছর পরে 'নূতন পঞ্জিকা'য় প্রকাশিত (শকাব্দ ১৭৮০ / বঙ্গাব্দ ১২৬৫ / ইংরাজী ১৮৫৮) বিজ্ঞপ্তিতে হাওড়া হতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত পথের দূরত্ব, ভাড়া ও সময় সারণীর নিম্নরূপ বিবরণ জানা যায় :

'কলিকাতা হ'তে রানীগঞ্জ

পথের দূরত্ব (মাইল)	ষ্টেশন	ভাড়া ১ম শ্রেণী টাকা আনা	ভাড়া ২য় শ্রেণী টাকা আনা	ভাড়া ৩য় শ্রেণী টাকা আনা	প্রথমগাড়ি গমন	বৈকালে গমন
০	হাওড়া	০	০	০	৯-২০	৫-৪০
১২	শ্রীরামপুর	১—২	০—৯	০—৩	১০-০০	৬-২১
২৪	হুগলী	২—৪	১—২	০—৬	১০-৪২	৭-০৩
৩৮	পাণ্ডুয়া	৩—১০	১—১৩	০—১০	১১-২৭	৭-৪৮
৫১	ম্যামারি	৪—১২	২—৬	০—১৩	১২-০৯	—
৫৯	সাকটিগড	৫—৯	২—১২	০—১৪	১২-৩৪	—
৬৬	বর্দ্ধমান	৬—০	৩—০	১—০	১-৩০	—
৯০	মানকুর	৮—৬	৪—৩	১—৬½	২-৩৫	—
৯৭	পাণিগড	৯—০	৪—৮	১—৮	২-৫৬	—
১২১	রাণিগঞ্জ	১১—৪	৫—১০½	১—১৪	৪-০০	—

বিঃ দ্রঃ প্রতি রবিবারে বাষ্পীয় শকট চলিবে না।'

অতঃপর ভূ-অভ্যন্তর ভাগের সম্পদ লুণ্ঠনের পালা এগিয়ে চলল। ঐ বছর (১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) ৩০শে মার্চ ২৬টি মালগাড়ীতে ১৮৭ টন কয়লা সর্বপ্রথম হাওড়ায় এসে পৌঁছায়। পরবর্তী ১৮৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর রাজমহল (ভায়া লুপ লাইন), ১৮৫৭ সালে এলাহাবাদ ও ১৮৬৬ সালে দিল্লী পর্যন্ত এই রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটায় ভারতের পরিবহন ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।[৫৭] দিল্লী হতে রাজপথ ধরে লাহোর যাবার ব্যবস্থা হওয়ার ফলে পূর্বভারতের সঙ্গে সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগসূত্রর সকল প্রকার বাধা অপসৃত হয়ে যেতে সক্ষম হল। পূর্বে ষ্টীমার যোগে ছারপোকা, পিপীলিকা আর ইঁদুরের সহযাত্রী হয়ে গঙ্গাবক্ষে এলাহাবাদ যেতে যেখানে সময় লাগত ২৫দিন, এখন সে সময় অবিশ্বাস্যরকমে কমে গেল।[৫৮]

স্থানাভাবের জন্য পরবর্তী কালে হুগলী ইয়ার্ড ব্যাণ্ডেলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন A. H. Boileau-এর তত্ত্বাবধানে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হতে সার্ভে কার্য শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মে মাস নাগাদ ব্যাণ্ডেল-কালনা-নবদ্বীপ-কাটোয়া হয়ে বারহাওড়া পর্যন্ত প্রসারিত

রেলপথে বিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। এই রেলপথের কাজ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়; কিন্তু বেশ দ্রুততার সঙ্গে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বর্ধমান জেলায় কয়েকটি ন্যারো গেজের রেলপথও নির্মিত হয়, যার ফলে বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যোগসূত্র অতি সহজ হয়ে যায়। সেসব রেলপথগুলি হ'ল,[৫৯]—

১। বর্ধমান-কর্জনা-ভাতাড-বলগোনা-নিগন-কৈচর-শ্রীখণ্ড হয়ে কাটোয়া পর্যন্ত ৫৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ রেলপথ। এই রেলপথটি ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর সরকারের অনুমোদন লাভ করলেও এর সেক্রেটারী ও ট্রেজারার ম্যাকলিয়ড কোম্পানি ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে 'কোম্পানি আইন'মতে ঠিক সময়ে রেজিস্ট্রি-ভুক্ত না হওয়ায় দীর্ঘ বিলম্বের কারণ। অবশেষে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রেলপথটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি লাভ করে। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের, ১লা এপ্রিল, এই রেলপথ সরকার অধিগ্রহণ করেন।

২। কাটোয়া-পাঁচুন্দি-জ্ঞানদাস কাঁদড়া-কির্নাহার-লাভপুর হয়ে আহমদপুর পর্যন্ত ৫২ কিঃমিঃ দীর্ঘ রেলপথ। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর ম্যাকলিয়ড কোম্পানি এই রেলপথের সেক্রেটারী ও ট্রেজারার নিযুক্ত হওয়ায় ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মে কাটোয়া হতে পাঁচুন্দি পর্যন্ত এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হতে আহমদপুর পর্যন্ত রেল চলাচল করে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই, সরকার এই রেলপথ অধিগ্রহণ করেন।

৩। রায়নাগড-শেহারাবাজার--বোঁয়াইচণ্ডী-ঈদাস--পাত্রসায়র--সোনামুখী-বাঁকুড়া-পর্যন্ত ৯৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ রেলপথ (আরম্ভ—১৯১৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর)।

বর্ধমান জেলায় প্রসারিত রেলপথের দূরত্ব সম্পর্কিত তালিকা হল:[৬০]

হাওড়া-বর্ধমান-দুর্গাপুর-আসানসোল-বরাকর; মোট দূরত্ব—২১৪ কিঃমিঃ।
হাওড়া-বর্ধমান-আসানসোল চিত্তরঞ্জন; মোট দূরত্ব—২৩৮ কিঃমিঃ।
হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কালনা-নবদ্বীপ-কাটোয়া; মোট দূরত্ব—১৪৪ কিঃমি।
হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহাওডা; মোট দূরত্ব—২৮৫ কিঃমিঃ।
হাওড়া-বধমান মেন লাইন; দূরত্ব—১০৭ কিঃমিঃ।
হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন; দূরত্ব—৯৫ কিঃমিঃ।
হাওড়া-বর্ধমান-অণ্ডাল-সিউড়ী; মোট দূরত্ব—১৯৮ কিঃমিঃ।
হওড়া-বর্ধমান-বোলপুর; মোট দূরত্ব—১৫৩ কিঃমিঃ।
আসানসোল-আর্দ্রা-খড়্গপুর মোট; দূরত্ব—২০৯ কিঃমিঃ।
আসানসোল-আর্দ্রা-পুরুলিয়া; মোট দূরত্ব—৮১ কিঃমিঃ।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্ধমানের ন্যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ জেলার রেলপরিবহন ব্যবস্থা বর্তমানে একেবারে এমনি এক নিম্নমানে পৌঁচেছে যা সমগ্র

প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যঙ্গ করছে বলে মনে হয়। তিনটি ন্যারো গেজের রেলপথের একই নড়বড়ে অবস্থা। বিংশ শতকের শেষ পাদে আজও এই পথে ঘন্টায় ১৬।১৭ কিঃমিঃ বেগে রেলগাড়ী ছোটে। রেল কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র ট্রাঙ্ক লাইনগুলির উন্নতি বিধানের চেষ্টায় আত্মসুখ অনুভব করছেন। হাওড়া-বারহাওড়া লাইনেরও সেই একই হাল এবং সিঙ্গল লাইনের উপর নির্ভরশীলতার ফলস্বরূপ হাজার হাজার যাত্রী দুর্ভোগের শিকার হন। বর্তমানে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যদি পরিবহন ব্যবস্থায় দ্রুততা না আসে তাহলে কৃষক তার কৃষিজাত পণ্য নিয়ে দ্রুত শহরাঞ্চলের বাজারে মাল বিক্রি করতে সক্ষম হবে না। কৃষক স্বয়ং যদি তার মাল বিক্রির ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে-'লাভের গুড় পিপড়েয় খাবে', অর্থাৎ তাকে মধ্যবর্তী এক শ্রেণীর মজুতদারের খপ্পরে পড়ে সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য হতে হবে।

অতীতের তুলনায় বর্তমানে একদিকে যেমন বর্ধমান জেলায় রাস্তাঘাটের সংখ্যা ও বাসের সংখ্যা বেড়েছে, অনুরূপভাবে রাস্তাঘাটের মানও যথেষ্ট নিম্নগামী হয়ে পড়েছে, যার ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। জেলার কৃষক ও কৃষি-অর্থনীতি রাজপথ পরিবহন ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় এদিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে; অন্যথায় পরিবহন ব্যবস্থাও কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে একটা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

পাদটীকা :

১। *The Astadhyayi of Panini*, Vol-II,—Ed. S. C, Vasu, p. 975.
২। প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৯।
৩। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড,—রাধাগোবিন্দ বসাক, পৃঃ ৭৫।
৪। *Asoka's Edicts*—Amulya Chandra Sen, p. 66-67.
৫। অনুষ্টুপ—চতুর্বিংশ বর্ষ, পৃঃ ২-৩।
৬। *Sibi King Vessantara his Country & Cultural Heritage*—Dr. A. K. Chaudhuri, p. 42-45.
৭। *Ibid*, p. 43.
৮। *Buddhist Record of the Western World*—Beal, Vol-II, p. 71-72.
৯। প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়, পৃঃ ৪৪।
১০। ঐ পৃঃ ৩৯।
১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৪-৫৬।
১২। *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*—S. Levi, p. 171.
১৩। *Ibid*, p. 164.
১৪। *The Mahavamsa*—Wilhelm Geiger, p. 128.
১৫। *Pilgrimage of FAHIAN*, Bangavasi Edition, p. 360.
১৬। ইৎসিঙের দেখা ভারত—প্রেমময় দাশগুপ্ত, পৃঃ ৩১-৩২।
১৭। *Bengal Past and Present*, 1924—p. 21 & 1925—p. 18.
১৮। রঘুবংশ (নবপত্র প্রকাশন), চতুর্থ সর্গ।
১৯। *Epigraphia Indica*, Vol-XIX, p. 293.
২১। *Buddhist Record of the Western World*, Vol. II, p. 194-204 ; *On Yuan Chwang's Travels in India*—T. Watters, Vol. II, p. 182-193.
২২। *Everyday life in the Pala Empire*—Dr. S. Hussain, p. 190.
২৩। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III—N. G. Majumdar, p. 35.
২৪। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন, পৃঃ ১৫।
২৫। *Tabkat-i-Nasiri*—J. Revarty, p. 586-7.
২৬। *Ibid*—p. 585n.
২৭। গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, পৃঃ ৪০।
২৮। *Military History of India*—Sir Jadunath Sarkar, p. 70-72.
২৯। *Akbar Nama* (Vol. III),—H. Beveridge, p. 697.
৩০। বাঙ্গলার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫১৫।
৩১। *Bengal District Gazetters, Hooghly*—L. S. S. O'Mally, p. 194.
৩২। *Rennell's Atlas, Sheet no. VII & IX.*

৩৩। *Bengal Past and Present*, 1924, p. 26.
৩৪। *Ibid*, 1924, p. 28.
৩৫। *Rennell's Atlas, Sheet*, No. VII.
৩৬। জাড়া রায়বংশের পরিচয়—মৃগাঙ্কনাথ রায়, পৃঃ ২৫।
৩৭। মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড,—যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ২৯।
৩৮। জাড়া রায়বংশের পরিচয়—পৃঃ ২১।
৩৯। *Harklots Map, Sheet no. XVI.*
৪০। *Bengal Past & Present*, 1925, p. 18.
৪১। *A Sketch of the Admn. of the Hooghly Dist.*—G. Toynbee, p. 112.
৪২। *Bengal Past and Present*, 1925, p, 29.
৪৩। *Bengal District Gazetters, Hooghly*, p. 195.
৪৪। *Bengal Past and Present*, 1925, p. 26.
৪৫। *Routes on the Grand Trunk Road, from Fort William to Peshwar* —Major Fred Roberts, V. C., p. 1-2.
৪৬। *A Sketch of the Admn. of the Hooghly Dist.*, p. 105.
৪৭। *Hooghly Past & Present*—Shambhoo Chunder Dey, p. 181.
৪৮। *Selection from Calcutta Gazette*, Vol. I, p. 10-11.
৪৯। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৬।
৫০। *Selection from Unpublished Record of Government*—The Revd. James Long, No. 534.
৫১। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—পৃঃ ১১৬-১৭।
৫২। ঐ পৃঃ ১১৭।
৫৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড,—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ, পৃঃ ৩০৭ ও ৪৩১।
৫৪। *Statistical Accounts of Bengal*—W. W. Hunter, Vol. IV, p. 105-6 & p. 372-73.
৫৫। *Bengal Past & Present*—1910, p. 16.
৫৬। *Hand Book of Bengal Mission*,—Rev. J. Long, p. 79.
৫৭। *Bengal Past & Present*, 1910, p. 59-70.
৫৮। *Statistical Account of Bengal*, Vol. IV, p. 106-7; *Bengal Dist. Gazetters, Burdwan*—p. 142-43; *Imperial Gazetter of India, Provincial Series, Bengal*, Vol. I, W. W. Hunter, 265.
৫৯। কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক ডঃ কালিচরণ দাস কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।
৬০। *Indian Bradshaw*.

সপ্তম অধ্যায়

জলপথ-পরিচিতি

বর্ধমান জেলার জনজীবনের উপর নদ-নদীর প্রভাব তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে জেলার কৃষি, শিল্প, জনজীবন, গ্রামপত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রাম্য অর্থনীতির উপর প্রভাববিস্তারকারী প্রত্যেকটি নদ-নদী তাদের গুরুত্বসহ প্রাচীন ও বর্তমান খাতের প্রবাহপথ পর্যালোচনার প্রয়োজনে আলোচ্য অধ্যায়ের সূত্রপাত। এর পূর্বার্ধে (৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) বিভিন্ন নদীখাতের পরিচিতি এবং অপরার্ধে বাণিজ্যযাত্রার উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত জলপথের বর্ণনাসহ নদীতীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম-গঞ্জসমূহের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভৌগোলিক পরিচিতি দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য।

নদনদী পরিচিতি :

দামোদর ঃ

বিহার সীমা অতিক্রম করে বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে বরাকর সঙ্গম-স্থলের পর পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার প্রাকৃতিক সীমা রচনা করে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে দামোদর নদ (দামোদর নদ সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যের জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৫-৮১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হিরাপুর, রানীগঞ্জ, অণ্ডাল, দুর্গাপুর, শিলামপুর, কসবা-চম্পাইনগরীকে বামে রেখে পৌছেচে বর্ধমান শহরে। তারপর শহরের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান, জামালপুর ও মেমারী থানায় প্রবেশ করেছে। বর্ধমান-পুরুলিয়া ও বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমায় প্রবাহিত দামোদরের এই খাতের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে প্রায় ১৫ কিঃমিঃ ও ৭২ কিঃমিঃ। বর্ধমান শহরের ২৪ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে বড়শুলের নিকট চাঁচাই গ্রামের কাছে দামোদর হঠাৎ প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে ভাগীরথীর উদ্দেশ্যে। এরপর জামালপুর থানায় সাজিপুর, দাদপুর, সেলিমাবাদ, জামালপুর, গুড়ে-কালনা দক্ষিণ-মোহনপুর ও কোডাগ্রাম অতিক্রম করে হুগলী জেলার সীমানায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর হুগলী জেলার পুরশুড়া, রাজবলহাট ও পশপুর অতিক্রম করে হাওড়া জেলার ডিহিভুরশুট, উদয়নারায়ণপুর, আমতা, বাগনান, গড়চুমুক ও শ্যামপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শিবগঞ্জের উত্তরে ও ফলতার বিপরীত দিকে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। জামালপুর থানার সেলিমাবাদের দক্ষিণে দামোদরের পূর্বতীর হতে সৃষ্ট কৌশিকী নামক একটি নদীখাত একদা দশঘরা, দীপা-বারহাটা

জাঙ্গীপাড়া, নাঞ্চকুলি, মাণিকপুর হয়ে উলুবেড়িয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছিল। এ খাতটি দ্রুত মজে যাচ্ছে।

রেনেলের মানচিত্র ও মুকুন্দ মিশ্রের 'বাসুলীমঙ্গলে' এই ধারার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌশিকী বা কানা দামোদরের খাতই ছিল এই অঞ্চলের মুখ্য খাত। 'বাসুলীমঙ্গল' ব্যতীত ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত নৌচার্টের নক্শাতেও দেখা যায়, এটি এক প্রশস্ত নদী, যার উপর দিয়ে জাহাজও একসময় চলাচল করতে সক্ষম হত। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় কৌশিকীর এই ধারা একটি লুপ্তপ্রায় গৌণ নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। জামালপুর থানার দক্ষিণাংশে শিয়ালীগ্রামের নিকট বেগুয়াতে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যার পর দামোদরের বর্তমান ধারা পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে, যার পশ্চিম প্রান্তের একটি ধারা 'কাঁকি' নামে দক্ষিণাভিমুখে জামালপুর ও রায়না থানার মধ্য দিয়ে হুগলী জেলার পশ্চিম ভাগ বরাবর দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর এটি মুণ্ডেশ্বরী খালের (কাঁদড়) সঙ্গে মিলিত হয়ে মুণ্ডেশ্বরী নামে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সীমানায় রানীচকের বিপরীত তীরে রূপনারায়ণ নদে মিলিত হয়েছে। মুণ্ডেশ্বরীর খাত বর্তমানে মুখ্য ধারা এবং এর জলপ্রবাহ রূপনারায়ণকে বৃহৎ নদে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে।

জাও দ্য বারোজের মানচিত্রে প্রদত্ত নদীটির নাম নির্দেশ না থাকলেও উইলসন ও ব্লকম্যান এটিকে কানা দামোদরের ধারারূপে চিহ্নিত করেছেন।[১] ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত গ্যাষ্টলডির মানচিত্রে দেখা যায় যে, বেহুলা-গাঙ্গুরের খাত ছিল দামোদরের মুখ্য খাত, যা Satigaon-এর (সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম) উত্তর পার্শ্ব বরাবর ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত ভন.ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে পাওয়া যায়, বর্ধমান শহর পেরিয়ে দামোদরের দ্বি-মুখী ধারার একটি প্রবাহ উত্তর-পূর্বে অম্বনায় ভাগীরথীতে মিশেছিল এবং অপর ধারাটি সোজা দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সংযুক্ত ধারাটি ভাগীরথীতে পড়েছিল। ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রের সঙ্গে গ্যাষ্টলডি বা বারোজের মানচিত্রের পার্থক্য আছে। কিন্তু ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গলের বিবরণের সঙ্গে গ্যাষ্টলডির মানচিত্রের সমর্থন পাওয়া যায়। ভন. ডেন. ব্রুকের দ্বিতীয় ধারাটি কানা দামোদরের ধারা। সেলিমাবাদ হতে পিছলদহ পর্যন্ত দামোদরের এই সুপ্রশস্ত খাতের নাব্যতার পরিচয় ১৭০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়। রেনেলের মানচিত্রে আমতার খাত বা বর্তমান দামোদরের খাত হল মুখ্য ধারা! ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বিধ্বংসী বন্যায় বর্ধমান শহর সম্পূর্ণরূপে জলের তলায় চলে যায়।[২] অনেকের মতে ১৭৭০-এর বন্যার পর বর্তমান খাতের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বাসুলীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় অনুমান করতে মোটেই বাধা নেই যে, কানা-দামোদর ছিল দামোদরের মুখ্য খাত। রেনেলের মানচিত্রে

আরও দেখা যায় যে, সেলিমাবাদ হতে দক্ষিণ-পূর্বমুখে বন্দিপুর হয়ে গোপাল-নগরের নিকট উত্তর-পূর্বমুখে সরস্বতী নদীর বর্তমান খাতের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে ত্রিবেণীর উত্তরে নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে মিশেছিল। বর্তমানে স্থানে স্থানে খাতটি শুষ্ক হয়ে কানা, কুন্তি ও মগরাখাল নামক তিনটি অংশে পরিণত হয়েছে।

দামোদরের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বমুখী ধারাগুলি বর্তমানে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও অতীতের তথ্য-প্রমাণাদি হতে বলা যেতে পারে যে, ঐ শাখাগুলির সঙ্গে একদা দামোদরের যোগাযোগ ছিল। অনেকের মতে ভাগীরথী-দামোদর-অজয়ের যোগসূত্র প্রাচীনকালেও ছিল। অতীতে গঙ্গা রাজমহল-মুঙ্গেরের পার্বত্য অঞ্চলে বাধা-প্রাপ্ত হয় এবং তাতেই জহ্নুমুনির কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। তখন সম্ভবতঃ অজয়ও দামোদরের খাত ধরেই তাম্রলিপ্তের নিকট সাগরে মিশেছিল। অবশ্য এ মত সর্ববাদী সম্মত নয়। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র এক নিবন্ধে আছে,—"পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় ভাগীরথী বাঙলা দেশে প্রবেশ করে রাজমহল, সাঁওতালভূমি, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূমের শৈলভূমি রেখা ধরে যে অগভীর ঝিল-বিল, নিম্ন জলাভূমি পেরিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত, সেই ভূমিরেখাই ভাগীরথীর সম্ভাব্য প্রাচীন পথ। এই পথেই বর্তমান ভাগীরথীর কাছাকাছি বন্দর ও তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী।"[৩] এ কথা প্রমাণিত হলে দামোদরের খাতে ভাগীরথীর জলপ্রবাহের পরিচয় জানা যাবে এবং 'মৎস্য পুরাণ'-এ বর্ণিত গঙ্গার প্রবাহপথ এই ইঙ্গিতই বহন করছে।

ভাগীরথী ঃ

গঙ্গা, জাহ্নবী বা ভাগীরথী ভারতবর্ষের অন্যতম পবিত্র নদী। এর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে বেদ, পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যে এবং অফুরন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু জল মাথায় ছিটিয়ে নিলে মানুষের মন চরম তৃপ্তিতে ভরে উঠে। আবার বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই নদী। গঙ্গা বা ভাগীরথী প্রসঙ্গে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ[৪]

"Egypt has been called "the gift of the Nile." No area, however, in the world, not even Egypt, has been so conspicuously dominated in its economic and social life by a river as the valley of the Ganges. The direction of this mighty river has governed the course of ancient migration and conquest, as well as the modern distribution of population and prosperity."

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির মধ্যে ভাগীরথীর স্থান সর্বপ্রথম হলেও বর্ধমান জেলার জনজীবন ও অর্থনীতিতে দামোদরের পরেই ভাগীরথীর স্থান। ভাগীরথীর তীরে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট, শাঁকাই-এর নীলকুঠি ও দুর্গ, শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান, ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, শ্রীচৈতন্যদেবের

নদীয়া নগরী, সমুদ্রগড়ে সাতসৈকা জমিদারের বাসস্থান ও গৌরীদাস-শ্রীগৌরাঙ্গের পাদস্পর্শে ধন্য অম্বুয়ামুলুক পেরিয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মুক্তধারায় সুশোভিত তীর্থস্থান ত্রিবেণী অবস্থিত।

রাজমহল অতিক্রম করে দক্ষিণ মুখে ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করে কেতুগ্রাম থানায় নূতনগ্রামে বর্ধমান জেলায় প্রবেশপূর্বক কাটোয়ার উত্তরে অজয় নদের সঙ্গে মিশেছে। কাটোয়া হতে কালনা পর্যন্ত অঞ্চলটি এই নদীর দ্বারা বেষ্টিত। ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহ পথের খাত প্রাচীন নয়; অথবা একই খাতে নদীটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত হয় নাই। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে সুভাষরঞ্জন বসু কৃত জরিপে ভাগীরথীর খাত পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীর প্রবাহপথ দু'হাজার বৎসর পূর্বে ছিল কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অরিয়নের বিবরণে অজয়ের পরিচয় থাকলেও গঙ্গার কোন উল্লেখ নাই। উক্ত বিবরণ অনুযায়ী অনুমান করা যেতে পারে যে, অরিয়নের সময়ে ভাগীরথী হয়ত আরও পূর্বে প্রবাহিত হত।

১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে বর্তমান খাতের তুলনা করলে বোঝা যায় নদী সরে যাওয়ার ফলে সমতল বেদী ও সোপান শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। "কিছুদিন পূর্বের এক জরিপে কাটোয়া শহরে বাঁকের কাছে এরকম পাঁচটি সোপানের সন্ধান পাওয়া গেছে। নদীটি যে পাঁচটি ধাপে তার পুরনো খাত ছেড়ে পাশে সরে এসেছে, এটি তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভাগীরথীর এই দিক পরিবর্তনের ফলে অবতল বাঁকে অবস্থিত অনেক প্রাচীন জনপদ ক্রমে ক্রমে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। একই সঙ্গে নদীর উত্তল বাঁকে নূতন কৃষিযোগ্য ভূমির সৃষ্টি হয়েছে।"[৫] ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্রে অধুনা বিচ্ছিন্ন কেতুগ্রাম থানার সাতটি মৌজা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ছিল, কিন্তু সেগুলির বর্তমান অবস্থিতি হল নদীর পূর্বতীরে। নদীয়া জেলায় কালিগঞ্জ, চাপড়া, চিতয়া, কোটালপাড়া, ভালসুনি, গোটপাড়া অঞ্চলে অবস্থিত বিলগুলি লম্বা ধরনের। সম্ভবতঃ এই বিলগুলিই ছিল ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহপথ। আবার নদীর দক্ষিণতীরে বর্ধমান জেলার কামাখ্যা খাল, ভনওয়ার খাল, সাইনী খাল, পাঠান নালা, মরি গঙ্গার খাল, বেদটার বিল, চুপীর চর, সুগনার বিল প্রভৃতির সঙ্গে নিঃসন্দেহে ভাগীরথীর যোগাযোগ ছিল। সমীক্ষার দ্বারা জানা গিয়েছে যে, কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত এই খাত পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট। নরম পলি অবক্ষেপণ ও সঞ্চয়ের ফলে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি গঠিত এবং এই গঠন কার্য এখনও শেষ হয় নাই; ফলে নদী, নরম ভূভাগের উপর প্রবল বন্যার সময় নিত্য নূতন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

কাটোয়া হতে নবদ্বীপ পর্যন্ত ৪২ কিঃমিঃ দীর্ঘ খাতে চর-চাকন্দি, অগ্রদ্বীপ, আয়মাপাড়া, পাটুলী, দামপাল চর, চরকাশিডাঙ্গা, হাটনগর, চাঁদপুর, কাষ্ঠশালীও রামচন্দ্রপুরের নিকট বিশাল বিশাল বাঁক দেখা যায় এবং নবদ্বীপ থেকে কালনা

পর্যন্ত অঞ্চলে জালুইডাঙ্গা, গোড়খালি, মানিকনগর, নূতন পানপাডা, নিভুজিবাজার ও গঙ্গাধরপুরেও বিরাট বাঁক লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত বাঁক সংলগ্ন ভূ-ভাগ কোথাও বিশাল চড়া আবার কোথাও গোক্ষুরাকৃতি হ্রদে পরিণত হয়েছে। এরূপ গোক্ষুরাকৃতি হ্রদগুলির মধ্যে চরকালিডাঙ্গা অঞ্চলটি এক উৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে গণ্য হতে পারে। পূর্বে কাটোয়া ও দাঁইহাটের বিপরীত দিকে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল প্রবাহ ছিল, কিন্তু ফারাক্কার ব্যারেজ নির্মাণের ফলে সম্প্রতিকালে জলপ্রবাহ কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের কোল ঘেঁসে প্রবাহিত হচ্ছে।

অত্যধিক হারে পলি অবক্ষেপণের ফলে ভাগীরথী নদী বারবার মূল প্রবাহ পথ হতে সরে যাচ্ছে। বারহাট-তেরঘাটের জন্য প্রসিদ্ধ ইন্দ্রাণী পরগণায় ভাগীরথীর খাত লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যে খাতে ভাগীরথীর প্রবাহ ছিল বর্তমানে ঐ গতিপথ উত্তরে সরে গেছে এবং কোথাও প্রায় ৩ কি:মি: পর্যন্ত নদীর গতিপথের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ঘাটগুলি আজও পুরাকীর্তির নিদর্শনরূপে শোভাবর্ধন করছে। আবার পাটুলী ও পূর্বস্থলীর নিকট লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নদীর দক্ষিণভাগে বিপজ্জনকভাবে ভূমিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, যা দেখে মনে হয় ভাগীরথী যেন তার পূর্ব গতিপথকে খুঁজে বেডাচ্ছে এবং যে কোন সময়ে কোন বড আকারের বন্যার ফলে বেটের বিল বা চাঁদ বিল দিয়ে তার পথ খুঁজে নেবে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বন্যার পর নবদ্বীপ হতে অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে রেলপথকে দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ তীর বরাবর কাটোয়া থেকে কালনা পর্যন্ত প্রাচীন রাজপথটি কয়েকটি প্রবল বন্যার কবলে পড়ে ইতিপূর্বে বিনষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এর অস্তিত্ব কিছু কিছু জায়গায় এখনও দেখা যায়। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের বন্যার সময় এই অঞ্চল এক বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল এবং ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের বন্যার সময় পূর্বস্থলীর নিকট লক্ষ্য করা গেছে যে, বন্যার জল পূর্বস্থলীর দক্ষিণ ভাগের প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে পডার দিকে প্রবণতা ছিল। হয়ত কোন প্রবল বন্যার সময় এই পথে পুনরায় তার খাত সৃষ্টি করে বেহুলার ১নং খাতকে সজীব করে তুলবে।

১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যায় বিকিহাটের নিকট নদীর বাঁক হঠাৎ উত্তরমুখী হয়ে পুনরায় দক্ষিণে কাশীপুরের নিকটবর্তী হয়েছে এবং তথা হ'তে কিছুদূর উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় দক্ষিণমুখী প্রবাহটি নবদ্বীপকে (Nuddia) বামে ও নিমদহকে (Nimda) ডাইনে রেখে অম্বুয়ার (Ambona) দিকে এগিয়ে গেছে। ঐ সময়ে অম্বুয়ার বিপরীত তীরে ভাগীরথী-জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল ছিল। পরবর্তীকালে ঐ সঙ্গমস্থল আরও উত্তরে নবদ্বীপ শহরের (বর্তমান সঙ্গমস্থল) দিকে সরে যাওয়ায় পরিত্যক্ত নদীখাতটি ১৬ কি:মি: দীর্ঘ গোপিয়া বিল নামে মানচিত্রে শোভাবর্ধন করছে। অম্বোনা বা অম্বুয়ার নিকটে দামোদরের একটি ধারা মিলিত হওয়ায় ঐ সময়ে অন্তর্দেশীয় জলপথ যোগাযোগের

জন্য অম্বিকা-কালনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুকুন্দরামের বিবরণে এই জলপথের সমর্থন পাওয়া যায়—"বামে রাখি নবদ্বীপ ডাইনে পাড়পুর" অর্থাৎ ভন.ভেন. ব্রুকের প্রদর্শিত ভাগীরথীর গতিপথের সঙ্গে মুকুন্দরামের বর্ণনার সমর্থন মিলছে।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জেমস্ রেনেল-এর মানচিত্রে দেখা যায় ভাগীরথীর উত্তর তীরে অগ্রদ্বীপ অবস্থিত। অগ্রদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে দশভুয়ারী বাঁধ হতে ভাগীরথীর একটি ধারা দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে ব্রহ্মাণীর সঙ্গে কাটোয়া থানার হাপানি গ্রামে মিশেছে এবং মিলিত ধারা দক্ষিণ পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে হালদিপাড়ায় খড়ি নদীতে পড়েছে। অতঃপর এই প্রবাহটি কামদেবপুরে বাঁকা বা বক্কেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এক ভাগ মীর্জাপুর গ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথীতে মিশেছে এবং দ্বিতীয় ধারাটি বেহুলার ১নং খাত নামে কালনার দিকে প্রবাহিত হয়ে নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে মিশেছে। রেভাঃ লঙের বিবরণে খাতটিকে প্রাচীন গঙ্গার খাত বলা হয়েছে।[৬] দ্বিতীয় ধারাটি একশত বছর পূর্বেও যে অতি প্রবল ছিল তা স্থানীয় লোকের উক্তিতে জানা যায় এবং এই খাতেই ভল্লুকা মিশেছিল। ১৮৫৪-৫৫, ১৯১০ ও ১৯৫০-৫১ খ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্রেও রেনেলের ধারার সমর্থন মিললেও বর্তমানে ভাগীরথী সংলগ্ন খাতটির অধিকাংশ স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্বস্থলী থানার চরকাশিডাঙ্গা গ্রামে একটি বিশাল চড়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ গ্রামের দক্ষিণে কামাখ্যা খালের সঙ্গে বেতের বিল, পদ্মা বিল, সুগনার বিলের যোগসূত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ খাতে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখে একটি ধারার সঙ্গে খড়ি-বাঁকার ধারার যোগাযোগ ছিল। বেতের বিল হতে নিমদহ গ্রামের দূরত্ব ২ কিলোমিটার। সে কারণে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই খাতই ভন. ভেন. ব্রুকের উল্লিখিত গঙ্গার গতিপথ। রেনেলের মানচিত্র হতে আরও জানা যায় যে, নবদ্বীপের উত্তরে রামচন্দ্রপুরে ভাগীরথী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নবদ্বীপকে দ্বীপাকারে বেষ্টিত করে সমুদ্রগড়ের দক্ষিণে জালুইডাঙ্গায় দুটি ধারা মিশেছিল। পশ্চিম ভাগের ধারাটি কালিনগরও সমুদ্রগড় অঞ্চলে মরা গঙ্গা নামে এখনও পরিচিত। বর্তমানে শুষ্ক হলেও ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হারকোলেট-এর মানচিত্র, ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দে রেভিনিউ সার্ভে ও ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া জেলার সার্ভে মানচিত্রে এসব তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

কাটোয়া শহরের শ্মশানঘাট থেকে ঘোষহাটের পাশ দিয়ে রেল লাইন অতিক্রম করে টিকরখাঁজি, দেপাড়া, আমডাঙ্গা অতিক্রম করে চাণ্ডলি গ্রামের উত্তরে প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর আশ্রমের নিকট ব্রহ্মাণীর সঙ্গে মিশেছে। এই লুপ্ত খাতটির বর্তমানে সংস্কার করা শুরু হয়েছে। উইলকক্স মন্তব্য করেছিলেন যে. দামোদর কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে মিশেছিল। তবে কি এই ধারা উইলকক্স উল্লিখিত প্রাচীন দামোদরের লুপ্তপ্রায় খাত? ব্যাপক অনুসন্ধান ব্যতীত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয়।

ভাগীরথী নদীর খাত পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অন্ততঃপক্ষে ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে কাটোয়ার পূর্ব ভাগে প্রবাহিত গতিপথে ব্রহ্মাণী, খড়ি ও বাঁকার জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিবেণীর পথে প্রবাহিত হত। আরও পরে নদীর ধারা যে নবদ্বীপের পশ্চিমে খাত সৃষ্টি করেছিল, তা'র প্রমাণ মেলে বর্তমানে পরিত্যক্ত ও শুষ্ক নদীখাতের নিদর্শনে ও সমসাময়িক কালে রচিত সাহিত্যে। এছাড়া এখাতের একাংশে ছিল বেহুলা-বল্লুকা যাদের পরিচিতি আজও প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের ঢাল পূর্বমুখী এবং এর সঙ্গে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রবাহিত নদীগুলির পলির চাপ সৃষ্টির ফলে ভাগীরথীও ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে গেছে। আর এটাই হ'ল পলিগঠিত ভূভাগে প্রবাহিত নদী পথের বিচিত্র ইতিহাস। O. H. K. Spateও এই মতের সমর্থক।

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক বিবরণের বিষয় বহির্ভূত হলেও নদীর নিম্নধারা সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা আলোচ্যক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আদিগঙ্গার খাত যে ভাগীরথীর প্রধান প্রবাহ ছিল, ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের বিবরণীতে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। মৎস্য পুরাণে (অঃ ১২১) আছে,—গঙ্গানদী কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, কাশী, অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্ত নামক আর্য জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। গ্রীক ভৌগোলিক ও পর্যটকগণের বিবরণে জানা যায় যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন যে সমুদ্রের খাড়িতে ঐ বন্দরের অবস্থিতি। সম্ভবতঃ ঐ যুগে গঙ্গার প্রধান খাত অগ্রদ্বীপ হতে বেহুলার খাতে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী হয়ে কানা নদীর খাতে তাম্রলিপ্তের পথে সাগরে মিলত। পরবর্তীকালে কলিকাতা হয়ে আদিগঙ্গার প্রবাহ প্রবল হয়েছিল এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের পরে আদিগঙ্গা ও সরস্বতীর ধারা শুষ্ক হওয়ায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বেতড়ের মধ্যবর্তী চড়া কাটিয়ে সরস্বতীর খাতে গঙ্গার জলধারা বহান হয়। কিন্তু আদিগঙ্গার খাত যে দশম-একাদশ শতকের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে।

সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় ভাগীরথী প্রবাহের প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব যুগ হতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বেহুলার খাতে সপ্তগ্রাম হয়ে তাম্রলিপ্তে ছিল সাগরসঙ্গম। অন্ততপক্ষে দশম-একাদশ শতকের পূর্বেই আদি গঙ্গার খাতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত আদিগঙ্গার ধারা প্রবল ছিল। ভাগীরথীর আদিখাত অর্থাৎ সরস্বতীর খাতে পলি সঞ্চয়জনিত কারণে নদীগর্ভ উঁচু হতে হতে লুপ্ত ধারায় পর্যবসিত হয়েছে। যমুনা নদীর খাতও ভাগীরথীর পলি প্রবেশের ফলে সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে মূল প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অপরদিকে দীর্ঘকাল পলিবাহিত জল বহনের ফলে আদিগঙ্গাও লুপ্ত খাতে পরিণত হয়েছিল। সে কারণে যমুনার উৎসস্থলে চড়া পড়ে ভাগীরথী হতে

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অনুরূপভাবে কলিকাতার দক্ষিণ হতে হাওড়া জেলার বেতড় পর্যন্ত অংশে পলি অবক্ষেপণের ফলে চড়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলকেই মুকুন্দরাম বালিঘাটা নামে উল্লেখ করেছেন।

অজয়ঃ

বর্ধমান জেলার জনজীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নদনদীগুলির মধ্যে অজয় নদের স্থান তৃতীয়। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন প্রাচীন বিবরণীতে এই নদের উল্লেখ পাওয়া যায়। দামোদরের ন্যায় প্রাচীন না হ'লেও ভাগীরথীর প্রবাহের পূর্বে যে এই নদের অস্তিত্ব ছিল, তেমন ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৭] অরিয়নের (Arrian) বিবরণে আছে—অম্যষ্টিস্ (Amystis), কটদূপ নগরের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত; অর্থাৎ আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে এবং আজও কাটোয়া শহর অজয়ের তীরে অবস্থিত ছিল বা আছে।[৮] হাণ্টারের মতে এই নদী অ-জয় অর্থাৎ অজেয় এবং উইলফোর্ড বলেছেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত অজবতী বা অজয়, এক ও অভিন্ন।[৯] গালভতন্ত্রে এই নদী অজয় নামে পরিচিত।[১০] বিমলাচরণ লাহার মতে সংস্কৃত সাহিত্যে অজাবতী বা অজমতী, বর্তমান অজয় নদ হ'তে অভিন্ন।[১১] মিথিলাশরণ পাণ্ডে, গালভতন্ত্রের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, অজয় নদ—অজয়া, অজয়ে বা অজপা নামে একদা পরিচিত ছিল।

বিহার রাজ্যের মুঙ্গের জেলাস্থ জামুই মহকুমার অন্তর্গত ১০০০ ফুট উচ্চ সারণের পার্বত্য অঞ্চল থেকে এই নদটি উৎপন্ন হয়ে, প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বমুখে সাঁওতাল পরগণা জেলায় প্রবাহিত হওয়ার পরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত হয় এবং তৎপরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে চিত্তরঞ্জন থানার সীমজুড়ি গ্রামে এই জেলায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার সঙ্গে বর্ধমানের প্রাকৃতিক সীমারেখা রচনা করে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে কেতুগ্রাম ও কাটোয়া থানার মধ্য দিয়ে কাটোয়ায় ভাগীরথীতে মিশেছে। এর প্রধান উপনদী কুনুর, মঙ্গলকোট গ্রামকে ডান পাশে রেখে উজানী-কোগ্রামে অজয়-কুনুর সঙ্গম স্থলের সৃষ্টি করেছে। সঙ্গমস্থলটি মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত ভ্রমরাদহ নামে প্রসিদ্ধ। অজয়ের প্রবাহ পথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৮ কিঃমিঃ এবং জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত নদীখাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ কিঃমিঃ। অজয় নদের অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৬০৫০ বর্গ কিঃমিঃ।

বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত অজয় নদের খাতটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫২ কিঃমিঃ এবং সাঁওতাল পরগণা জেলা অতিক্রম করার পরে মোটামুটি পূর্বমুখে প্রবাহিত অজয়-কুনুর সঙ্গমস্থল হ'তে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। নূতনহাট থেকে উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে কাটোয়া ও শাঁকাই-এর মধ্যবর্তীস্থলে ভাগীরথীতে মিশেছে। খাত সৃষ্টি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, দিক পরিবর্তন না করেই নদীটি প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিম হতে পূর্বে। সীমাজুড়ি পেরিয়ে জিৎপুর

ও পারুলবাড়িয়ায় দুটি বাঁকের সৃষ্টি করে পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে শ্যামসুন্দরপুরে নদীর গতিপথ হয়েছে দক্ষিণ-পূর্বমুখে এবং নূতনহাটের নিকট উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর মালিয়াড়ীর নিকট এক বাঁকের সৃষ্টি করে পূর্বমুখে কাটোয়ার পথে খাত সৃষ্টি করেছে। কাটোয়ার সন্নিকটে সুনিয়া ও বাইগণকোলার বাঁক দুটি বর্তমানে বেশ বিপজ্জনক এবং যে কোন বড় প্লাবনে এ গ্রাম দুটি জলপ্লাবিত হয়ে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে অজয়ের মোহনায় যে দুটি চড়ার সৃষ্টি হচ্ছে, তা কাটোয়া শহরের পক্ষে বিপজ্জনক।

অজয় নদ কেবলমাত্র বর্ষার জলে পুষ্ট হলেও বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এটির নিম্ন অংশ ছিল সুনাব্য। রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনি হ'তে অজয়ের পথে ছোট ছোট স্টীমারে কাটোয়ায় যে কয়লা নিয়ে আসা হত, তাই আবার সেখান থেকে বড় বড় ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় চালান যেত। একশত বৎসর পূর্বেও অজয়ের দুই তীর ছিল গভীর জঙ্গলে পূর্ণ। বর্তমানে কলকারখানা স্থাপন, কৃষিক্ষেত্র ও জনবসতির প্রয়োজনে নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ষার সময় নদীগর্ভে অববাহিকার মৃত্তিকা অবক্ষেপণ হওয়ায় নদীখাতে জলধারণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। দামোদরের ন্যায় বর্ধমান জেলার অংশে অজয়ের প্রবাহ পথ কঙ্করময় ও তার ঢালও অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে নদীগর্ভ দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অজয় নদের বন্যার ফলে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বহু গ্রাম প্রায়ই প্লাবিত ও জলমগ্ন হ'ত। এই বন্যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল, অগভীর নদীখাতে ঢালবহুল পার্বত্য অঞ্চলের জল অতর্কিতে দ্রুত সমভূমি খাতকে ভরাট ও প্লাবিত করে, যা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে অন্যান্য নদীতে এরূপ দেখা যায় না। সে কারণে নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের লোকেরা সতর্ক বা প্রস্তুতির পূর্বে বন্যায় আক্রান্ত হয়।

নদীখাতের গভীরতা হ্রাস পাবার ফলে ১৯০৫ থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ততঃ ১৪ বার এই অঞ্চলে প্রবল বন্যা দেখা দিয়েছিল। বর্ষার সময়ে কখনও কখনও জলপ্রবাহ তিন লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে যায়। কোন কোন নদীবিজ্ঞানী অজয় নদের উপর আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু অজয় নদের নিম্ন অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের হার এত অধিক যে, সে ধরনের বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা হয় নাই। জলাধার ও বাঁধের পশ্চাৎদেশের খাত শীঘ্র মজে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং বর্ষাকাল ভিন্ন জলাধারের জন্য জল সংগ্রহ তখন অপর এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। বন্যা প্রতিরোধকল্পে বর্ধমান জেলায় অজয়ের দক্ষিণতীর বরাবর এক সময়ে মোট ৩৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এগুলি জমিদারী ও সরকারী বাঁধ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন সরকারী তথ্যে পাওয়া যায় যে, গোরাবাজার থেকে কাজলাডিহি পর্যন্ত ১১ কিঃমিঃ বিষ্ণুপুর হতে অর্জুনবাড়ী পর্যন্ত ৬.৫ কিঃমিঃ এবং সাতকাহনিয়া থেকে সাগর-পোতা পর্যন্ত ১৭.৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া হয়। যদিও 'The Bengal

Embankment Act, 1873'-এ আজমৎশাহী পরগণায় ৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ ৪র্থ বাঁধের অনুমোদন ছিল ; কিন্তু কার্যতঃ ঐ বাঁধ নির্মাণ করা হয় নাই।

উৎস স্থান হতে শুরু করে মোহনা পর্যন্ত অজয় নদের গতিপথ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রথম ১৯০ কিঃমিঃ খাত অর্কিয়ান ও গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরে গঠিত ভূভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ও ঢালের মান উচ্চ থাকায় দক্ষিণাভিমুখী গতিপথে জল দ্রুত নেমে যায়। ফলে এই অংশে পলি সঞ্চয়ের হারও কম। নদীর গতিপথ পরীক্ষা করলে উৎসুক্য জাগে যে, দক্ষিণ মুখেই অজয়নদের প্রবাহ দামোদরের খাতে আসা উচিত ছিল। সে কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, উপনদীগুলিসহ দামোদর-বরাকর সঙ্ঘের সৃষ্টি পূর্বেই হয়েছিল এবং দামোদর বাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের উচ্চতা স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া মাইথন, হালদা প্রভৃতি পাহাড়গুলি ঐ সময়ে আরও উন্নত থাকার কারণে অজয়ের প্রবাহপথ দামোদরের ঢালের শেষ প্রান্ত ও পাহাড়গুলির উত্তর সীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল এবং নদীর দক্ষিণাভিমুখী গতিপথের পরিবর্তে সেটি পূর্বগামী হয়ে পড়ে। গণ্ডোয়ানা শিলাস্তর পেরিয়ে আউসগ্রাম থানার মধ্যাংশ পর্যন্ত অববাহিকা ল্যাটেরাইট উপাদানে গঠিত এবং গভীর শাল জঙ্গলে এই ভূ-ভাগ আচ্ছাদিত ছিল। আউসগ্রাম থানার পূর্বাংশ থেকে মোহনা পর্যন্ত অঞ্চল নূতন পলি গঠিত ভূ-ভাগ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে খড়ি বা খড়্গেশ্বরীর প্রবাহপথে মূল দামোদরের জলধারা প্রবাহিত হওয়ার কারণে মঙ্গলকোট-কাটোয়া থানার ভূ-ভাগ পলি অবক্ষেপণের ফলে ক্রমশঃ উঁচু হতে আরম্ভ করে এবং দামোদর নদ গঠিত ভূ-ভাগ অজয়ের গতিপথকে পূর্বমুখী হতে বাধার সৃষ্টি করে। তা না হলে, ব্রহ্মাণীর খাতে অজয় নদের গতিপথ হওয়া উচিত ছিল।

অজয় নদ সমগ্র গতিপথের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ পলি গঠিত ভূ-ভাগে এবং অবশিষ্ট অংশ প্রাচীন শিলা ও প্রাচীন পলি গঠিত ভূ-ভাগে প্রবাহিত হওয়ায় নদীর গতিপথ বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। তবে নদীর স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে এক কূল ভাঙা ও অপর কূল গড়ার কাজ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। ভন. ভেন. ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যায় জামুরিয়া ও ফরিদপুর থানার উত্তর সীমা থেকে আরও উত্তরে অজয়ের প্রবাহপথ ছিল। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় অজয়-কুনুর সঙ্গমস্থলের পর নদীখাত কিছুটা নানুর থানায় প্রবাহিত হলেও বর্তমানে বর্ধমান জেলার দিকে সরে এসেছে। নানুর থানায় এমন কয়েকটি কাঁদড় বা খালের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি অজয়ের প্রাচীন খাত বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্রে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার কয়েকটি কাঁদড়/খালের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি অজয় থেকে নির্গত হয়ে পুনরায় অজয়ে মিশেছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নদী চত্বরটি

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত অজয় বলেই সনাক্ত করেছিলেন। রেনেলের মানচিত্র হতে আরও জানা যায়, বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হলেও কুনুরের ধারা ঐ সময়ে সেনপাহাড়ী হতে নির্গত হয়ে অজয়েই মিশেছিল। স্থানীয় লোকের মতে 'বন্দরা' বা 'বন্দর' হতে 'বাঁদড়া' শব্দটির উৎপত্তি এবং এই গ্রামটি অতীতে অজয়ের তীরেই অবস্থিত ছিল।

বরাকর: দামোদরের প্রধান উপনদী। বর্ধমান জেলার সীমান্তে মাত্র ২০ কিঃমিঃ প্রবাহপথ হলেও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বরাকর নদের অবদান যথেষ্ট। দামোদরের জলপ্রবাহ এই নদীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, কারণ এটি একটি প্রাচীন নদী। কল্পসূত্রে আছে ভগবান মহাবীর ত্রয়োদশ বৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে জম্ভিকা গ্রাম (পালি-জংভিয়) নামক নগরের বাহিরে ঋজুপালিকা বা উজুবালিয়া নদীর তীরে একটি শাল বৃক্ষের নীচে কেবল নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করেন। মিথিলাশরণ পাণ্ডের মতে ঋজু-পালিকা নদী বর্তমান এই বরাকরেরই নামান্তর।[১২] নন্দলাল দে-র মতে গিরিডি হতে ১৩ কিঃমিঃ দূরে বরাকর নদের তীরে একটি মন্দির আছে এবং এই মন্দিরে ভগবান মহাবীরের মূর্তির পাদদেশে খোদিত লিপিতে ঋজুপালিকা নদীর উল্লেখ আছে।[১৩] কিন্তু অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে, ঋজুপালিকা নদী বর্ধমান জেলার জৌগ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু এ মতের সমর্থনে তাঁর স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপিত করতে পারেন নি, বরং এ সম্পর্কে তিনি এক কাল্পনিক মানচিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র। অন্যদিকে আর একটি মতে অজয় নদই উজুবালিয়া নদীর নামান্তর।[১৪]

বিহার রাজ্যের অন্তর্গত হাজারিবাগ শহরের উত্তরে (২৪°৭´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৫°১৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) প্রায় ২১০০ ফুট উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বরাকর নদের উৎপত্তি। এটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলভুক্ত হাজারিবাগ ও মানভূম জেলায় প্রবেশ করেছে এবং সালানপুর ও কুলটি থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ডিসেরগড়ের ৩ কিঃমিঃ পশ্চিমে শিয়ালডাঙ্গায় (২৩°৪২´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°৪৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উৎসস্থল হতে বরাকর-দামোদর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নদীখাতের দৈর্ঘ্য ২২৫ কিলোমিটার এবং দামোদর অববাহিকার মধ্যে ৬১৫০ বর্গ কিঃমিঃ অঞ্চল বরাকরের অববাহিকারূপে চিহ্নিত। উৎসস্থল থেকে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহপথে ১২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বরহিব্রিজ (তিলাইয়া বাঁধের ৩০ কিঃমিঃ পশ্চিমে) পর্যন্ত নদীর ঢাল গড়ে প্রতি মাইলে ৭ ফুট এবং তিলাইয়া বাঁধের কাছে এই উচ্চতা ৪-৬ ইঞ্চিতে পৌঁছেছে। খুদিয়া ও লারহিয়ান্দি হ'ল এর প্রধান উপনদী। বরাকর একটি প্রাচীন নদী হওয়ায় যুগ যুগ ধরে নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীখাত পলি সঞ্চয়জনিত কারণে ভরাট হয়েছে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল থাকে না বললেই চলে

এবং কোন কোন অঞ্চলে জলের গভীরতা ২ ফুট হতে ২½ ফুটের অধিক থাকে না। কিন্তু বর্ষাকালে ছোট ছোট উপনদী বা ঝরণার জলে পুষ্ট হয়ে সময়ে সময়ে এই নদী ভয়াবহ হয়ে উঠে। প্রবল বর্ষণে দামোদরের জলস্ফীতির সময়ে বরাকরের জলধারা যোগ দেওয়ায় অতীতে বর্ধমান জেলা বিধ্বংসী বন্যাকবলিত হ'ত। 'দামোদর নদ উপত্যকা পরিকল্পনা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে তিলাইয়া ও মাইথনে বাঁধ নির্মাণের দ্বারা উদ্ভূত বরাকর নদের জলশক্তি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে উল্লেখজনক পরিবর্তন এনেছে। দামোদর ও বরাকরের জলধারাকে দুর্গাপুরে ব্যারাজ নির্মাণ করে বিভিন্ন খালের সাহায্যে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়েছে।

খড়ি : খড়ি বা খড়্গেশ্বরী নদী বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। এই নদীটি কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় নাই। সমতলভূমিতে সৃষ্টি হয়ে সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদী ভাগীরথীতে মিশেছে। উৎসস্থল থেকে ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি:মি: এবং বর্ধমান জেলার মধ্যাঞ্চলে কৃষি ও জনজীবনের উপর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মাডো (মানকরের নিকট) গ্রাম হতে নির্গত হয়ে গলসী, বর্ধমান, ভাতাড়, মন্তেশ্বর, কাটোয়া ও পূর্বস্থলী থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালনা থানার নাদাই বা নন্দাই গ্রামে ভাগীরথীতে মিশেছে। তৎপূর্বে কাটোয়া থানার ওহান্দপুর গ্রামে কাঙ্গুলিয়া ও নওয়াপাড়া গ্রামের পশ্চিমে ব্রহ্মাণী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত ধারা নাদনঘাটের পূর্বে জালুইডাঙ্গাতে বাঁকা বা বঙ্কেশ্বরীর সঙ্গে মিশেছে। কয়েকটি খাল বা কাঁদড় মিলিত হওয়ায় এটির নিম্নাংশে বারমাস জল থাকায় সেখানে দেশী নৌকা চলাচল করে এবং 'রিভার-পাম্পে'র সাহায্য কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ করা হয়। বর্তমানে উৎসস্থলরূপে চিহ্নিত স্থান থেকে গলসী, বর্ধমান ও ভাতাড থানা পর্যন্ত মোটামুটি পশ্চিম হতে পূর্বমুখে প্রবাহিত এবং তৎপরে উত্তর-পূর্বমুখে মন্তেশ্বর থানায় প্রবেশ করে ঐ থানায় উত্তরমুখী খাতের সৃষ্টি করেছে। কাটোয়া থানার কামাল গ্রামে নদীর ধারা পুনরায় উত্তর-পূর্বমুখী হয়ে শিলাগ্রামের নিকট নদীর বাঁক দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বাভিমুখী এবং সোনাডাঙ্গা গ্রামের নিকট হতে ভাগীরথী সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটির দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী ধারা দেখা যায়।

খড়ি নদীর উৎসস্থল ও সঙ্গমস্থল প্রায় এক সরল রেখায় অবস্থিত। ল্যাটেরাইট ও কঙ্করময় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রথম অংশে নদীর বিস্তার ও খাতের গভীরতা উভয়ই কম। ভাতাড় ও মন্তেশ্বর থানায় নদীর গভীরতা পূর্বাপেক্ষা অধিক হলেও নদীখাতের প্রস্থ এঅঞ্চলেও অধিক নয়। তবে কাটোয়া

ও পূর্বস্থলী থানায় খাতের গভীরতা ও বিস্তার উভয়ই অধিক এবং কয়েকটি ছোট ছোট কাঁদড় খালের জলধারা দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় নিম্নাংশে বারমাস অল্প জল থাকে; ফলে সঙ্গমস্থলের কাছে এটি নৌচলাচলযোগ্য। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে রেভারেণ্ড লঙের বিবরণীতে জানা যায় যে, এর নিম্নাংশ স্নাব্য ছিল।[১৫] ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে হারকোলেটের মানচিত্রে দেখা যায় নিম্নাংশের খাত সুপ্রশস্থ ছিল। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে যে, বর্ষাকালে গোপালপুর পর্যন্ত নদীটি স্নাব্য ছিল এবং অন্যান্য সময়ে নাদনঘাট পর্যন্ত বড় বড় নৌকা প্রবেশ করত। কিন্তু নাদনঘাটের পশ্চিমে বর্ষার পরে কাঁচা বাঁধ নির্মাণের জন্য ঐ অংশে নৌ-চলাচল সম্ভবপর হত না বা বর্তমানেও হয় না। অতিরিক্ত বর্ষণ ভিন্ন এই নদীতে বন্যার উপদ্রব নাই।

অনেকের ধারণা যে মাড়ো-মানকরের সন্নিকটস্থ রেলপথের পার্শ্বে খনিত খাত হতে খড়ি বা খড়্গেশ্বরী নদীর উৎপত্তি। কিন্তু এ ধারণা বর্তমান উৎপত্তিস্থল দেখে অনুমিত হলেও দু'শো বছর পূর্বের মানচিত্র দেখলে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার উপশম হতে পারে। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, বর্তমান উৎপত্তিস্থলের অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ কিঃমিঃ পশ্চিমে খড়ি নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল। ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে রেনেলের সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথটি ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় অতীতে কোন এক সময়ে দামোদর নদের বন্যা যাতে অজয় অববাহিকায় ছড়াতে না পারে তজ্জন্য খড়ির ধারাকে দামোদরের মূলধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং জলধারার অভাবে সংযোগস্থল ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে কারণে খড়ি নদীকে একটি আধুনিক কালের নদীরূপে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এর সমর্থনে পাওয়া যায়—[১৬] 'Its bed is a wide and deep valley which bears all the appearance of having once been the channel of a great river, and there is little doubt that the stream was formerly one of the many offshoots of the Damodar. The old bed to its junction with the present stream can still be traced.'

খড়ি নদীর তীরে সাঁওতালডাঙ্গা ও বাণেশ্বরডাঙ্গায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার কিছু নিদর্শনাবলীও আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে অনুমান করা যায় যে, দামোদরের কোন প্রাচীন খাতকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন করে অন্য নদী বা খালের সঙ্গে সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টার ফলেই নদীখাত এই অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছিল। বিগত শতকের দ্বিতীয় দশকে এরূপ একটি খাল খননের সংবাদ জানা যায়। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান শহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং জেলার অভ্যন্তরভাগের স্থানসমূহের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ সাধনের জন্য বর্ধমানের মহারাজা

তেজচন্দ্র একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। সে পরিকল্পনাটি হল,[১৭]— "আপনার (মহারাজার) নূতনবাজার রাধাগঞ্জকে বাঁচাইবার কারণ খড়ি নদী কাটিয়া গৌর নদীতে আনাইয়া পশ্চাৎ ঐ গৌর নদী কাটিয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্ত্তী বঙ্কেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন, যেহেতুক বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেক অনেক জিনিষের আমদানী হইবেক।" ইতিপূর্বে দামোদর নদ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে যে, সুদূর অতীতে দামোদরের ধারা কাটোয়ার পথে প্রবাহিত হ'ত এবং খড়ি নদীর খাতে দামোদরের জলধারায় প্লাবিত পলিগঠিত ভূ-ভাগ তারই চিহ্ন। পরবর্তীকালে ভাগীরথী বাহিত পলির চাপে নূতন ভূভাগ গঠিত হওয়ায় খড়ি নদীর নিম্নাংশ তার গতিপথ পাল্টে পূর্ব-দক্ষিণমুখী হয়ে পড়ে। খড়ি অববাহিকার মৃত্তিকাভাগ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পলিগঠিত এই ভূ-ভাগে ভূমির উর্বরতা শক্তি অধিক হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। কোন স্থানীয় নদীর পলি অবক্ষেপণের ক্ষমতা এত অধিক হতে পারে না যে সেটি একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। সে কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'বার পূর্বেই বর্ধমান জেলার একাংশ খড়ি নদীর খাত বেয়ে দামোদরের পলল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়েছিল। খরার চাষের জন্য খড়ি নদীর নিম্নাংশে কয়েকটি স্থানে নদীতীরে লোহা বা বাঁশের পাইপ বসিয়ে দেখা গেছে যে ভূগর্ভস্থ জল স্বাভাবিকভাবে প্রস্রবণের আকারে বেরিয়ে আসে যা কোন নূতন সৃষ্ট খাত হলে দেখা যেত না।

খড়ি নদীর খাত পরিবর্তনের অপর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। কাটোয়া থানার পোষ্টগ্রামের পূর্বনাম ছিল পোতাগ্রাম। অতীতের পোতাগ্রাম-শ্রীবাটীর দক্ষিণে ত্রিমোহনী ও খড়ি নদীর লুপ্ত খাত তার পূর্ব স্মৃতি বহন করে চলেছে এবং শ্রীবাটীর বণিককুল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নদী তীরবর্তী এইস্থানে একদা বসতি স্থাপন করেছিল। খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত মানকর, কুড়মুন, মন্তেশ্বর, দেনুড়, পুটশুরি, সমুদ্রগড় প্রভৃতি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে নদীটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কুনুর : অজয়ের প্রধান উপনদী কুনুর। উখড়ার ৪ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে ঝানজিরা গ্রাম হতে উৎপন্ন হয়ে অণ্ডাল, ফরিদপুর, আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নূতনহাটের পশ্চিমে অজয় নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অণ্ডাল, রানীগঞ্জ ও জামুরিয়া থানার কিয়দংশ নিয়ে কুনুর নদীর অববাহিকা অঞ্চল গঠিত এবং ভূ-প্রকৃতির ঢাল পূর্বমুখী থাকায় এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ বৃষ্টির জল কুনুরের খাতে প্রবাহিত হয়। উৎসস্থল হতে অজয় সঙ্গমস্থল পর্যন্ত ৮০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নদীখাত প্রায় সর্বত্রই অগভীর থাকায় বর্ষায় জলধারণের ক্ষমতা থাকে না; ফলে মাঝারি বৃষ্টিপাতেও নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে থাকে। কুনুরের প্রবাহ পথে কাঁকসা, দুর্গাপুর ও আউসগ্রামের শাল জঙ্গল এক সময়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই অববাহিকা

অঞ্চলে ব্যাপকহারে বনভূমি ধ্বংস করায় বর্তমানে ভূমিক্ষয়ের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেইসঙ্গে নদীও তার খাতের গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে। নদীখাত গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে তাই নাব্য নয়। এই নদীর তীরে নাচন, মলনদীঘি, বন-নবগ্রাম, গুসকরা প্রভৃতি স্থানের অবস্থিতি হলেও প্রত্নকীর্তি ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানরূপে মঙ্গলকোট ও মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত উজানী ও ভ্রমরাদহের অবস্থিতির জন্য অজয়-কুনুর সঙ্গমস্থলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কুনুরের প্রবাহপথের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হলেও রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, সেনপাহাড়ীর উত্তর অংশে অজয় নদ হতে একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী ধারার গতিপথ বর্তমান খাতেই প্রবাহিত হয়েছে; অর্থাৎ অতীতে এই নদী অজয় হতে নির্গত হয়ে অজয়েই মিশেছিল। মনে হয় অতীতে উৎসস্থলের নিকট বাঁধ নির্মাণের ফলে খাতের প্রাথমিক কিছু অংশ শুষ্ক। কিন্তু ঐ অঞ্চলের নদী খাতগুলি অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, জামুরিয়া থানার ডাহুক থেকে তুমুনি নামে একটি পূর্বমুখী ধারা গোগলা, মহেশপুর ও কালিনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাঁকসা থানার উত্তরাংশে রাউতডিহির কাছে অজয়ে মিশেছে। কুনুরের উৎপত্তিস্থল ঝানজিরা গ্রামের পশ্চিমে এবং ঐ উৎসস্থলের দু' কিঃমিঃ উত্তরে একটি খাল উত্তরমুখী হয়ে পূর্বোক্ত অজয়ের সঙ্গে সংযোগসাধনকারী এক খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রেনেলের মানচিত্র প্রস্তুতের সময় এই খালগুলির যোগাযোগ ছিল এবং বর্তমানে ঐ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেগুলি পৃথক পৃথক খাতে পরিণত হয়েছে।

বাঁকা ঃ বাঁকা বা বঙ্কেশ্বরী নদী গলসী থানার রামগোপালপুর গ্রামের উত্তর থেকে নির্গত হয়ে পূর্বমুখে দামোদর নদের উত্তর অঞ্চল বরাবর বর্ধমান শহরে প্রবেশ করেছে। এর আগে জুজুটির নিকট একটি কাঁদড় এই নদীতে মিশেছে। বর্ধমান শহর অতিক্রম করে মেমারি থানার পালশিট পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এই নদীটি উত্তর-পূর্বমুখে মেমারী থানা অতিক্রম করে নাম্না গ্রামের পশ্চিমে মায়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবার ঐ মিলিত জলধারা মেমারী, মন্তেশ্বর, কালনা ও পূর্বস্থলী থানার সীমারেখা ধরে সমুদ্রগড়ের উত্তরে (জালুইডাঙ্গা) খড়ি নদীতে সঙ্গমস্থলের সৃষ্টি করেছে। খড়ি-বাঁকার যৌথ প্রবাহের এই দক্ষিণ-পূর্বমুখী খাতটি পাঁচলকি ও মীর্জাপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে নাদাই গ্রামে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। অপর ধারাটি মেদগাছির পূর্বভাগ থেকে নির্গত হয়ে বেহুলা নাম ধারণ করে (১ নং খাত) কালনা থানা অতিক্রমের পর হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। চাঁদা নামক উপনদীটি বর্ধমান শহরের উত্তর হতে নির্গত হয়ে কন্টিয়া, বৈকুণ্ঠপুর ও ভৈটা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেমারী থানার করন্দা গ্রামের উত্তরে বাঁকার উপনদীরূপে মিলিত হয়েছে।

অতীতে বাঁকা নদীর পৃথক কোন সত্তা ছিল না। দামোদরের মূল প্রবাহ উত্তর-পূর্বমুখী খাত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলে আলোচ্য খাতটি জলধারার অভাবে বর্তমানে একটি অপ্রশস্ত খালে পরিণত হয়েছে। ক্ষেমানন্দ এই ধারাকেই বাঁকা-

দামোদর নামেউল্লেখ করেছেন এবং ঐ বিবরণ হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে সপ্তদশ শতকে বাঁকার ধারাও দামোদরের একটি মুখ্য খাত ছিল।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে বাঁকা-দামোদর নদ হতে নির্গত হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্রে দেখা যায়, বেলকাশ মৌজার দক্ষিণে যেখানে দামোদরের উত্তর তীরে পরপর দুটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তথায় বাঁকার প্রবাহপথ ঐ বাঁধ বরাবর পূর্বমুখে এগিয়েছে। সম্ভবতঃ এইস্থানেই দামোদরের মূলধারা থেকে বাঁকাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। রেনেলের মানচিত্রে আরও দেখা যায় যে, সদর থানার আলমপুর গ্রামের (মৌজা নং ৯) পূর্ব দিক থেকে একটি নদীর ধারা বৈকুণ্ঠপুরের কাছে বাঁকা নদীতে মিশেছিল। কিন্তু রেনেলের প্রদর্শিত বাঁকা (Banka) নদীর ধারা ও বর্তমান ধারা একই খাতে প্রবাহিত নয়। রেনেলের সময় বাঁকা নদী ছিল বৈকুণ্ঠপুরের উত্তরে ; কিন্তু বর্তমান খাত বৈকুণ্ঠপুরের দক্ষিণে প্রবাহিত, অর্থাৎ বর্তমান চাঁদা নদীর খাতই ছিল ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে বাঁকার (দামোদরের) প্রবাহপথ। ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে দেখা যায় গৌর নামক একটি ছোট নদী গলসী থানার দক্ষিণাংশ হতে পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে বেলকাশ গ্রামের নিকটে বাঁকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দাঁড়ায় যে, রেনেলের সময়ে বাঁকা ছিল দামোদরের শাখা যার উৎপত্তিস্থল ছিল বর্ধমান শহরের নিকট। বর্তমান বাঁকার উৎপত্তিস্থল হল, বর্ধমান শহর হতে প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ পশ্চিমে এবং দামোদর হতে বাঁকা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর গৌর নদীকে ঐ বিচ্ছিন্ন খাতের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই বাঁকা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং ঐ সময়ের কিছুকালের মধ্যেই গৌর নদীর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে বাঁকার উৎসস্থলরূপে রামগোপালপুর গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবিকপক্ষে তা ছিল গৌর নদীর উৎসস্থল।

বর্তমানে খড়ির ধারা বাঁকা অপেক্ষা প্রবল হলেও একশো বছর পূর্বেও বাঁকার খাত অধিক জলধারা বহন করত। বাঁকার খাতে প্রবল জলধারার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, প্রবাহপথের উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত অঞ্চলের ভূমি ভাগে প্লাবনজনিত পলিগঠিত মৃত্তিকা এবং ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধিজনিত কারণে এই অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন। মেমারী, মন্তেশ্বর প্রভৃতি থানার সমভূমির গঠনপ্রকৃতি ও ভূমির উর্বরতা শক্তির যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এককালে কোন বৃহৎ নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে এই অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্র হতে অনুমান করা যায় যে, দামোদরের পূর্বমুখী ধারাটির কিয়দংশ বাঁকা ও শেষাংশ বল্লুকা নামে বর্তমানে পরিচিত। কিন্তু নিম্নাংশে বাঁকার খাত আরও উত্তরে সরে গিয়েছে। বাঁকা

নদীর তীরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি হ'ল গাঙ্গপুর, শক্তিগড়, পালশিট, কবন্দা, পারহাটি, নান্না, পুরগুন, শিকারপুর ও সমুদ্রগড় প্রভৃতি।

ব্রহ্মাণী ঃ মঙ্গলকোট থানার কালিপাহাড়ী-মঞ্জুলা গ্রাম হতে নির্গত হয়ে মঙ্গলকোট ও কাটোয়া থানার মধ্যভাগে প্রবাহিত হয়েছে। মাথরুণ গ্রামের নিকট হতে খণ্ডেশ্বরী নামক একটি খাল শ্রীখণ্ড গ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে আলমপুর ও গাঁফুলিয়া গ্রামের উত্তর অঞ্চল বরাবর পঞ্চাননতলার পশ্চিমে ব্রহ্মাণীতে মিশেছে। স্থানীয়ভাবে এই খালটি 'ফড়ে' নামে পরিচিত। অতঃপর ঐ মিলিত ধারা পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে সুগাচী গ্রামের নিকট দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম অংশের ধারাটি 'কারুলিয়া' নামে ওকরসা গ্রামের পূর্বভাগ অতিক্রম করে শিলা গ্রামের ৩ কিঃমিঃ পূর্বে খড়িতে মিশেছে। অপর ধারাটি অর্থাৎ ব্রহ্মাণীর মূলধারাটি কাটোয়া ও পূর্বস্থলী থানার সীমারেখা রচনা করে কাটোয়া, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর থানার সংযোগস্থলে ঘুমুর গ্রামের দক্ষিণে খড়িতে মিলিত হয়েছে।

দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র হলেও ব্রহ্মাণীর নিম্নপ্রবাহের গতিপথ অতীব বিচিত্র। এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উৎসস্থল ও নিম্নপ্রবাহের কয়েকটি স্থানে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করে যে তথ্য জানা গিয়েছে তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্র (১৮৫৪-৫৫), রেনেলের মানচিত্র ও সার্ভে মানচিত্রে (১৯৩০-৩১) পাওয়া যায় ব্রহ্মাণী নদীর উৎসস্থল মঙ্গলকোট থানার মোরাদপুর গ্রামের উত্তরে। বর্তমানে মোরাদপুর হতে উত্তরমুখী প্রবাহটি স্থানে স্থানে লুপ্ত অথবা শুষ্ক খাতে পরিণত হওয়ায় উৎসস্থলের পরিবর্তন দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্রহ্মাণীর প্রথম পর্যায়ের উৎসস্থল হতে কুনুর নদী ৬।৭ কিঃমিঃ পশ্চিমে প্রবাহিত। এক্ষেত্রে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, অজয়ের স্বাভাবিক গতিপথ হয়ত এক সময়ে পূর্বমুখী খাতে প্রবাহিত হত।

অন্যদিকে নিম্নপর্যায়ে দেখা যায় যে অগ্রদ্বীপ রেল-ষ্টেশনের পূর্বে ভাগীরথীর একটি ধারা গডাগাছা গ্রাম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে তারপর কৃষিক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে এবং প্রায় ১ কিঃমিঃ পরে সুগাচী গ্রামের দক্ষিণ হতে অপর একটি খাত হাপানি গ্রামে ব্রহ্মাণীতে যুক্ত হয়েছে। প্রথম খাতটি সাইনি ও দ্বিতীয় খাতটি কানা নদী নামে পরিচিত। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত মানচিত্রে অগ্রদ্বীপের সন্নিকটস্থ ভাগীরথীর সঙ্গে ব্রহ্মাণীর খাতের সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অতীতে কোন এক সময়ে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হবার পূর্বে, দক্ষিণমুখে ব্রহ্মাণী, খড়ি, বাঁকা ও বেহুলার পথে ত্রিবেণী অভিমুখে অথবা সপ্তগ্রাম হয়ে সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত হত। আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও প্রাচীন মানচিত্র দৃষ্টে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ভাগীরথীর প্রবাহপথ এতদঞ্চলে একদা খাত সৃষ্টি করেছিল এবং O.H.K. Spate-এর সূত্র অনুযায়ী "...while the

Hooghly has probably been pushed to the east by the detritus of the plateau stream."।[১৮] এই অঞ্চলে জলঙ্গী ও নারতিল নামক বিল দু'টিও হয়ত অতীতে প্রবাহিত নদীখাতের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। সম্ভবতঃ ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দ বা তার কিছু পূর্বে ভাগীরথী প্রবাহ এই অঞ্চলে নিমদহ গ্রামের দিকে যে গতি-পথ পরিবর্তন করে, তার প্রমাণ মেলে, ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে। কাটোয়া শহরের শ্মশানঘাট হতে একটি খাল ঘোষহাটের পাশ দিয়ে রেললাইন অতিক্রম করে টিকরখাঁজি, দেপাড়া, আমডাঙ্গার উপর দিয়ে চাণ্ডুলী গ্রামের উত্তরে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ আশ্রমের নিকট ব্রহ্মাণীতে মিশেছে। স্থানীয়ভাবে এই খালটি মৌনা খাল নামে পরিচিত। এই ধারাটি প্রায় লুপ্ত, কিন্তু এর নিম্নাংশে নদীর খাত ধরে কিছুটা সংস্কার করা হচ্ছে।

ব্রহ্মাণী নদীর নিম্নাংশে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। নিম্নপ্রবাহের সন্নিকটে বিল বা ঝিলে সঞ্চিত জল থেকে রবিশস্য ও খারিফ চাষ হয় এবং এই অঞ্চলে 'রিভার পাম্পের' সাহায্যেও জলসেচ হয়ে থাকে। নদীখাত প্রশস্ত না হলেও নদীর দৈর্ঘ্যের অনুপাতে এটির গভীরতা বজায় আছে। গ্রীষ্মকালে নদীখাত শুষ্ক হলেও স্থানে স্থানে জল সঞ্চিত থাকে। ব্রহ্মাণীর খাত মধ্যস্থ কয়েকটি স্থানে প্রস্রবণও আছে, যার জন্য প্রখর গ্রীষ্মেও জল সঞ্চিত থাকে। নদীটি বিখ্যাত না হলেও এই নদীর তীরে সংঘটিত যে ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে তা হ'ল, ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে নিগনসরাই-এ (নিগনের চটি) সুবা বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর সঙ্গে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের যুদ্ধ।[২০]

বল্লুকা : 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বল্লুকা বা ভল্লুকা নামক নদীর উল্লেখ আছে। ধর্মপুরাণ মতে এটি ধর্মঠাকুরের উপাসকদের কাছে এক পবিত্র নদী। মানিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গলে' (পৃঃ ৫৪) আছে—প্রথমে বল্লুকার তীরে উল্লুক বাহনে ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' (পৃঃ ৩৪-৩৫) পাওয়া যায়—"সন্ন্যাসী বল্লুকাবাসী বসি যে দুয়ারে"। ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত আছে ধর্মঠাকুরের প্রথম পূজার প্রচলন হয় বল্লুকার তীরে—

"শীলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে।"

সার্ভে মানচিত্রে প্রদর্শিত বল্লুকা নদীর গতিপথ হ'ল, মেমারী থানার কুকুণপুরের বিপরীত তীরে গাঙ্গুর হতে নির্গত হয়ে কামালপুর, শ্রীধরপুর, হরকলা, বাণেশ্বর, বাইতিপাড়া, শ্রীরামপুর, কুস্তমপুর, মাদপুকুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাঙ্গাপাড়া গ্রামের দক্ষিণে খড়ি-বাঁকার মিলিত ধারার সঙ্গে মিলন। এই অঞ্চলে খাসপুর, ঝাপানতলা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত অপর একটি ধারা (বর্তমানে শুষ্ক) বাঘনাপাড়া গ্রামের দক্ষিণ দিক ঘিরে ঐ গ্রামের পূর্বভাগে খড়ি-বাঁকার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বাঘনাপাড়া নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামক এক অতি বৃদ্ধ শিক্ষকের নিকটে বলাই দেবশর্মা, যে বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন

তাতে জানা যায়, বাল্যকালে রায় মহাশয় ছিলেন বল্লুকা নামক বিশাল নদীর প্রত্যক্ষদর্শী।[২০] এখন সার্ভে মানচিত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে, অন্ততঃপক্ষে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বল্লুকার খাতটি ছিল প্রবল এবং ঐ সময়ে ভাগীরথীর জলধারার একাংশ ব্রহ্মাণী, খড়ি, বাঁকা ও বল্লুকার জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্ষাকালে প্রবল আকার ধারণ করত।

বল্লুকা নদীর গতিপথ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে দামোদরের উত্তর-পূর্বমুখী ধারাটি বর্তমান বাঁকা, গাঙ্গুর ও বল্লুকা নদীর খাত ধরে ভাগীরথীতে মিশত এবং ঐ সময়ে দামোদরের এই খাতটি ছিল প্রবল। কিন্তু সম্ভবতঃ বাঁকা নদীর খাত, অর্থাৎ দামোদরের মূলধারা হতে বাঁকা নামক একটি খাত আরও উত্তরে প্রবাহিত হওয়ায় গাঙ্গুর ও বল্লুকা পরে গৌণ খাতে পরিণত হয়। বর্তমানে এই নদীটিতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল থাকে না। ভন. ডেন. ব্রুক ও ভ্যালেনটিজন্ দামোদরের যে গতিপথ লক্ষ্য করেছিলেন তার শেষাংশই হ'ল আলোচ্য বল্লুকার খাত। নদীর অবস্থা বর্তমানে শোচনীয় হলেও এতদঞ্চলে দামোদর বাহিত পলি দ্বারা গঠিত ভূভাগের মধ্যে প্রবাহপথের দু'ধারের ভূমি খুব উর্বর হওয়ায় প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। যদি খাত কাটিয়ে জলসেচের ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে এ অঞ্চলে যে কৃষিকার্য ও শস্যোৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে, তাতে সন্দেহ নাই।

গাঙ্গুর ঃ বর্তমানে লুপ্ত ও শুষ্ক খাতের উত্তরাধিকারী হয়ে বর্ধমান জেলার মধ্যে প্রবাহিত হলেও অন্ততঃপক্ষে দু হাজার বছর পূর্বে গাঙ্গুরের প্রবাহপথ ছিল দামোদরেরই মুখ্য খাত। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সতী বেহুলা মৃত পতিসহ গাঙ্গুর ও বেহুলার বুকে ভেলাযাত্রার প্রসঙ্গ এই নদী দুটিকে প্রসিদ্ধ করেছে। উইলিয়ম উইলকক্সের মতে, ভাগীরথী সৃষ্টির পূর্বে দামোদরের প্রাচীন ধারা বর্ধমান শহর অতিক্রম করে বর্ধমান, মেমারী ও কালনা থানার মধ্য দিয়ে ত্রিবেণী অতিক্রম করে ২৪ পরগণা ও যশোহরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হত।[২১] পরবর্তীকালে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখী ধারা প্রাচীন দামোদরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিল। সে সময়ে পূর্ব ভাগের ধারাটি যমুনা ও পশ্চিম ভাগের ধারাটি দামোদর নামে পরিচিত ছিল।

বর্তমানকালের মানচিত্রে দেখা যায় যে গাঙ্গুর নদী রসুলপুরের উত্তরে উলরা গ্রাম থেকে নির্গত হয়ে আমোদপুর, পারহাটি, দেবপুর, নন্দিয়ারা, ময়নাগড়, মতিসর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অগ্রদহ গ্রামের উত্তরে লুপ্ত হয়েছে। পুনরায় অগ্রদহ গ্রামের ২ কিঃমিঃ পূর্বে একটি ক্ষুদ্র খাল উত্তর-পূর্বমুখে রুস্তমপুরে ভালুকা নদীতে মিশেছে। দু'টি নদীখাত দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে অগ্রদহ গ্রামের সন্নিকটে কোন কারণে নদীখাতের প্রায় দু'কিঃমিঃ স্থান লুপ্ত খাতে পরিণত হয়েছিল।

বেহুলা : বর্ধমান জেলায় বেহুলা নামক নদীটির দুটি খাত সার্ভে মানচিত্রে দেখা যায়। বাঁকা বা গাঙ্গুরের ন্যায় বেহুলা নদীর খাত ছিল দামোদরের প্রবাহপথ। গাঙ্গুরের মত জলধারার অভাবে এই নদীখাতও ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীর অস্তিত্ব ক্ষীণ।

খড়ি ও বাঁকার মিলিত ধারা জালুইডাঙ্গা গ্রামের নিকট হতে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথের সৃষ্টি করে কালনার পথে প্রবাহিত হয়েছে। এই সময়ে বল্লুকা নদীর দুটি স্রোতপথ রাঙ্গাপাড়া ও বাঘনাপাড়ায় পূর্বোক্ত সম্মিলিত জলধারার সঙ্গে মিলনের ফলে বেহুলা নদীর সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে বেহুলা নামক অপর একটি খাতের অস্তিত্ব বর্ধমান জেলায় পাওয়া যায়; সে কারণে আলোচ্য খাতটি বেহুলার ১নং খাত বা গাজন নামে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লিখিত।[২২] খড়ি, বাঁকা ও বল্লুকার সম্মিলিত ধারা বেহুলা নামে রাঙ্গাপাড়া গ্রামের পশ্চিম ভাগ দিয়ে দক্ষিণ মুখে কালনার ৩ কিঃমিঃ পশ্চিমে উমরপুর অতিক্রম করে রাতপুর, হিজুলী ও গোলবাটীর উপর দিয়ে পুনরায় উত্তর-পূর্ব মুখে বাকুলিয়া, ইলামপুর, কামারডাঙ্গা, পয়গাছি গ্রামের পাশ দিয়ে বাঁকিপুরের বিলে প্রবেশ করেছে। বাঁকিপুরের বিল ভাগীরথীর পরিত্যক্ত জলা অর্থাৎ, বেহুলার সঙ্গে ভাগীরথীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বর্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। একশ বছর পূর্বে হিজুলী হতে নির্গত একটি শাখা কালনার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছিল, যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কুশডাঙ্গা ও কল্যাণপুরের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বিলটির মধ্যে। বুদ্ধিচন্দ্রপুর থেকে একটা পূর্বমুখী খাল জামিরতলা গ্রামের পুবে একসময়ে বেহুলার সঙ্গে মিশেছিল, যা বর্তমানে প্রায় লুপ্ত। গোপালবাটী গ্রামের উত্তর হতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী আর একটি খাল বেহুলার ১ নং খাত হতে নির্গত হয়ে বোয়ালিয়া গ্রাম অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের কাছে বেহুলার ২ নং খাতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হুগলী জেলার হোমজানপুর হতে ঢাকচর গ্রাম পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ দীর্ঘ শুষ্ক খাতটি যে বেহুলার পরিত্যক্ত খাত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্ধমান জেলার কালনা থানা ও হুগলী জেলার বলাগড় থানার অধিকাংশ নদী, দহ বা বিলের উৎপত্তি হয়েছে ভাগীরথী অথবা দামোদরের পরিত্যক্ত খাত থেকে। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণীতে আছে কামারডাঙ্গা-পয়গাছির খাতটি হ'ল ভাগীরথীর খাত।

বেহুলা নদীর দ্বিতীয় খাত বা ২ নং খাতটি বর্তমান মানচিত্রে রসুলপুরের উত্তরে উলরা গ্রাম হতে নির্গত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া গেলেও, এটি অতীতে গোপালপুর ও কালিনগরের (শক্তিগড়ের ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে) মধ্যভাগে দামোদর নদের শাখারূপে প্রবাহিত ছিল। দামোদরের উত্তর তীরে বাঁধ নির্মাণ ও ইডেন খাল খননের জন্য এটি মূল দামোদর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুরাতন সার্ভে মানচিত্রে পাওয়া যায় বর্ধমান শহর থেকে একটি ক্ষীণ স্রোতপথ পূর্বমুখে প্রবাহিত ছিল। বর্ধমানবাসী অধ্যাপক ডঃ সামাদের এই বিষয়ে অভিমত হল যে, বর্ধমান

শহরের উত্তরে ক্ষীণ স্রোতপথটি বেহুলার জলা নামে পরিচিত। গোপালপুরের নিকট থেকে নির্গত খাতটি নবগ্রাম, সাহাপুর, ও বেলুটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রসুলপুর ষ্টেশনের নিকট শেষ হয়েছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেল লাইন নির্মাণের ফলে যে দুটি কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি হয়েছিল, তা'র দ্বারাই নদীর গতিপথ কালক্রমে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপ, রেল লাইনের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র স্রোতপথেরও অস্তিত্ব ছিল।

বর্ধমান শহরের সন্নিকটস্থ লুপ্ত খাতটি বাদ দিলেও বেহুলার ২ নং খাতটি একদা গোপালপুরের নিকট থেকে উৎপন্ন হয়ে নবগ্রাম, সাহাপুর, রসুলপুর, গোপী-নাথপুর, বাগিলা ও তৎপরে উত্তরমুখে ইছাপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে প্রবাহটি পূর্বাভিমুখে গোপালদাসপুর, হাসানহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, হরিহরপুর অতিক্রম করে অপর একটি ক্ষুদ্র খালের সঙ্গে কৃষ্ণপুর গ্রামের দক্ষিণে মিলিত হয়েছে। তারপর পূর্বমুখী বেহুলা নদীর সঙ্গে বেহুলা ১ নং খাত হতে নির্গত আর একটি শাখা বৈকুণ্ঠপুরে এসে মিলিত হয়েছে। এবার সম্মিলিত ধারা দক্ষিণপূর্বাভিমুখে নপাড়া, গড়পাড়া, জাগুলিয়া, অন্দপাডা, শিমলা গ্রাম অতিক্রম করে বর্তমান মগরাখালের সঙ্গে মিশে ত্রিবেণীর ৪ কিঃমিঃ উত্তরে নয়াসরাই-এর কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। পূর্বোক্ত খালটি মেমারীর পশ্চিমে সুলতানপুরের জলা হতে নির্গত হয়ে উত্তর-পূর্বমুখে আমুদপুর, আমুলমহুরী, পীরাগ্রাম, বড়বাহারকুলি অতিক্রম করে বেহুলার ২ নং খাতে মিশেছে। সম্ভবতঃ অতীতে এই খাতটিও বেহুলার অংশ ছিল।

বেহুলার ২ নং খাতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অতীতে বর্ধমান অথবা সন্নিকটবর্তী স্থানে দামোদর হতে নির্গত হয়ে এটি বর্ধমান, মেমারী, ও কালনা থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। আলোচ্য খাতের দক্ষিণে দেখা যায়, গ্যাষ্টেল্ডি বর্ণিত প্রাচীন দামোদরের প্রবাহপথ, যার অস্তিত্ব রয়েছে মাটির নীচে বালি খাতের চিহ্নগুলির মধ্যে। দামোদরের প্রাচীন খাতটি মূল নদী হতে এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর সেটি পরে বেহুলা নামে পরিচিত হয় বলেই অনুমান।

বেহুলার ১ নং খাতের পর্যালোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলার মানচিত্রে প্রদর্শিত নদীগুলির প্রবাহপথ লক্ষ্য করতে হবে। ব্রহ্মাণী, খড়ি, বাঁকা, বল্লুকা, গাঙ্গুর ও বেহুলা (২নং খাত) নদীগুলি মোটামুটিভাবে পশ্চিম হতে পূর্বমুখে প্রবাহিত। রেনেলের মানচিত্র প্রস্তুতের সময় থেকে বর্তমান শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত সার্ভে মানচিত্রে দেখা যায় যে, অগ্রদ্বীপের সন্নিকটে দশদুয়ারী বাঁধের নিকট হতে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখী সাইনী ও কানা নদীর খাত দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মাণীর সঙ্গে মিশেছিল। তারপর আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে খড়ি-বাঁকার সম্মিলিত ধারাও বল্লুকার সঙ্গে মিশেছে এবং পুনরায় দক্ষিণমুখেই তা প্রবাহিত হয়ে বেহুলার ২নং খাতের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখে নয়া-সরাই-এর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্বস্থলী থানার নিমদহ, ছাতনী প্রভৃতি স্থানে টালি ও ইট তৈরীর জন্য সংগৃহীত ভূগর্ভস্থ পলির সাথে ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলের

পলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কামাখ্যা খাল ও কানা নদীর খাতে ভাগীরথীর জলধারা যে বাহিত হ'ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণীতে আছে,[২৩]—'The river [The Bhagirathi] formerly flowed behind Kalna where old Kalna now is, it passed by Pyagachi, the remains of deep and large jils are still to be met with there.'

ভাগীরথীর গতিপথ আরও পূর্বে সরে গেলে পরিত্যক্ত ভাগীরথীর খাতটি কোন এক সময়ে বেহুলা (১নং খাত) নদীরূপে পরিচিত হয়েছিল। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্যার সময় ভাগীরথী খাতের বর্তমান অংশটি বিরাট আকার ধারণ করার ফলে পূর্বোক্ত খাত দুটি মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন ও পরে শুষ্ক হয়ে যায়। এতদ্ঞ্চলে ভাগীরথীর খাতের বিবরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "Here the small streams, some formerly spill channels of the Damodar, have lost their headwaters by sitting or shifts of that river, while the Hooghly has probably been pushed to the east by the detritus of the plateau streams. This is thus a region of silted and stagnant bhils: 'the villagers laconically remark that their land is infested by blind, dying and chocked rivers."[২৪]

বর্ধমান জেলার নদনদী প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হলেও ভাগীরথীর নিম্নপ্রবাহের কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সরস্বতী নদীর আলোচনা প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেছেন,[২৫] "দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ—ইহাই জাও ডি ব্যারোসের নক্‌শার ইঙ্গিত। আমার অনুমান, এই প্রবাহপথই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সরস্বতীর পথ ইহার নিম্নাংশ মাত্র।" তাঁর অপর একটি মন্তব্যে দেখা যায়,—"কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিম বাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদরের প্রবাহের সঙ্গে, বাঁকা দামোদরের সংগমের নিকটেই।" ডঃ রায়ের এ মন্তব্যটি যে সঠিক নয় সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। কারণ হিসাবে দেখান যায় যে, প্রথমতঃ ভাগীরথীর এতদঞ্চলে গতিপথ সৃষ্টির পূর্বেই দামোদর নদের উৎপত্তি হয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ কোন নদী এতটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উজানে অর্থাৎ ঢালের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নয়, তৃতীয়তঃ ব্যারোস, ভন. ডেন. ব্রুক বা গ্যাষ্ট'ল্ডর মানচিত্রে এমন কোন ইঙ্গিত নেই, যা দিয়ে অনুমান করা যায় যে, সরস্বতীর ধারা পশ্চিমমুখী ছিল এবং সর্বশেষ বলা যায় যে, বর্ধমান জেলার নদীগুলি কিন্তু পশ্চিম হতে পূর্বে প্রবাহিত। তাছাড়া, মৎস্যপুরাণ ও গ্রীক পর্যটকগণের বিবরণে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল একদা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, সরস্বতীর স্রোতপথে সর্বপ্রথম গঙ্গা বা ভাগীরথীর জলধারা প্রবাহিত হত এবং আরও

পরবর্তীকালে আদিগঙ্গারূপে চিহ্নিত খাতটি প্রবল হলে সরস্বতীর খাতে স্বভাবতই জলপ্রবাহ কমে যায় এবং সেই সঙ্গে ভাগীরথীর ধারা প্রবল হয়। তাহ'লে সমগ্র বিষয়টি একত্র করলে দেখা যায় যে, ভাগীরথী প্রথম পর্বে অগ্রদ্বীপের সন্নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে দক্ষিণমুখে বর্তমান বেহুলার (১নং) খাত ধরে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর মধ্য দিয়ে সরস্বতীর খাত অবলম্বনে তাম্রলিপ্তকে ডান পাশে রেখে সাগরে মিলিত হত। এই প্রাচীন খাতটি সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

মায়া ঃ বারকোনা গ্রাম হতে নির্গত হয়ে মায়া নাম্নী পূর্বমুখী খালটি কল্যাণপুর অতিক্রম করে নওয়াপাড়া গ্রামের নিকট বাঁকার সঙ্গে মিশেছে।

মুণ্ডেশ্বরী ঃ 'দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক মধ্যযুগে রচিত পৌরাণিক গ্রন্থে মুণ্ডেশ্বরী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণ বর্ণিত 'মুণ্ডেশ্বরী' ও দামোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরী নদী দুটির নাম এক হলেও পৃথক সত্তা নিয়ে এরা প্রবাহিত হয়েছে, অর্থাৎ এ দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত নদী। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ'-এ বর্ণিত মুণ্ডেশ্বরী খাল রায়না থানার শ্রীরামপুর গ্রামের উত্তরে একটি পুষ্করিণী হতে নির্গত হয়ে কাইতি, চকভূরা, পৈঁটা ও বেতাবগ্রাম অতিক্রম করে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর হুগলী জেলার যাদবপুর, নারায়ণপুর ও অরন্দি গ্রাম অতিক্রম করে হায়াৎপুরের নিকট দামোদরের পশ্চিম অংশের কাঁকি নামক খাতের সঙ্গে মিলিত হয়ে এটি মুণ্ডেশ্বরী নামক বিশাল জলধারায় পরিণত হয়েছে। হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের (১৯১২ খ্রীস্টাব্দ) মানচিত্রে দেখা যায় মুণ্ডেশ্বরী খালের পূর্বমুখী ধারাটি রাজবলহাটের বিপরীত দিকে ৩ কিঃমিঃ উত্তরে দামোদরের মূল খাতে একদা মিলিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ মুখের ধারাটির দ্বারকেশ্বর নদের সঙ্গে সঙ্গম হয়েছিল। ঐ সময়ে দামোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরীর অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানকালে প্রকাশিত সার্ভে মানচিত্রে মুণ্ডেশ্বরী খালটির নাম বিভ্রাটের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করার ফলে এটি কানানদী নামে উল্লিখিত। ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে দমোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরীর কোন উল্লেখ নাই।

'মুণ্ডেশ্বরী' নদীর নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, বর্ধমান জেলার কাইতি গ্রামের জমিদার কন্যার নাম ছিল মুণ্ডেশ্বরী। কাহিনীটি এরূপ—একদিন কাইতি গ্রামের জমিদার মহাশয় যখন একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর কন্যা মুণ্ডেশ্বরী বেড়াতে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ বায়না ধরলে জমিদার বিরক্ত হয়ে বলেন,—'যাবি তো দিঘিতে যা'। অভিমানভরে মেয়েটি দিঘির দিকে চলে যায় বটে, কিন্তু পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘটনাচক্রে সেইদিন মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় এবং প্রবল বর্ষণে ঐ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে দিঘি হতে একটি খাত বা কাঁদড়ের সৃষ্টি হয়। এই খালটিই জমিদার তনয়ার নামে রায়না, আরামবাগ ও খানাকুল থানায় মুণ্ডেশ্বরী নদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্ভবতঃ কাহিনীর পিছনে যে ঘটনাটি জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হয় সেটি হ'ল, হয়ত

ঐ জমিদার তনয়া অল্প বয়সে মারা যান এবং ঐ অঞ্চলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য কাইতি গ্রামের ৮ কি:মি: উত্তরে কোন এক বৃহৎ পুষ্করিণী হতে হয়ত কোন খাল কাটা হয়ে থাকতে পারে। কালক্রমে জমিদার তনয়ার এই স্মৃতির সঙ্গে সম্ভবতঃ এই খাল খননের কাহিনী জড়িয়ে যায়।

দামোদরের শাখারূপে প্রবাহিত মুণ্ডেশ্বরী নদীর খাতের গতিপথ অত্যন্ত আধুনিককালের। রেনেল, ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্র, বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯১০ খ্রীস্টাব্দ), হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯১২ খ্রীস্টাব্দ) ও ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্রে এই মুণ্ডেশ্বরী নদীর কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী প্লাবনের সময় বন্যার জল দামোদরের মূল খাত ধারণ করতে অসমর্থ হওয়ায় মূল নদীর পশ্চিম ভাগে আলোচ্য খাতটির সৃষ্টি হয়। সেলিমাবাদ ও জামালপুরের নিকট দামোদরের বিস্তৃতি বিশাল, এমনকি ভাগীরথীর বিস্তার অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু সেই অনুপাতে খাতের গভীরতা অল্প। আরও দক্ষিণে কালনা গ্রামের নিকট নদীর প্রসার কমে এসেছে এবং একটা বাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। বাঁকের নিচে হরগোবিন্দপুরের নিকট সৃষ্ট এক চড়ার দু'পাশে দামোদর প্রবাহিত এবং আরও নিচে দুটি স্রোত একত্রিত হয়ে পুনরায় দামোদর দু'ভাগ হয়ে পশ্চিমের খাতটি মুসির খাল ও পূর্বের খাতটি দামোদর নামে প্রবাহিত হত। এই দুই খাতের মধ্যবর্তী অংশে বিশাল চড়ার উপর সাহহোসেনপুর ও পাইকপাড়া নামক দুটি গ্রামের পত্তন হয়েছিল। এই অঞ্চলের বেণ্ডয়াতে বাঁধ দিয়ে দামোদরের জলকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করার ফলে, দামোদরের মূল খাতের গভীরতা নষ্ট হতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, এই বাঁধগুলিকে স্থানীয়ভাবে 'হানা' নামেও অভিহিত করা হয়। মনুষ্যসৃষ্ট নদীখাতে বাঁধ নির্মাণের ফলে খাত ক্রমশঃ উঁচু হতে থাকে এবং সম্ভবতঃ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বন্যার সময় প্রবল জলরাশি মূল খাত দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারায় পশ্চিম ভাগে নদী তার গতিপথ সৃষ্টি করেছিল। এই স্রোতপথের প্রথমাংশ কাঁকি এবং পূর্বোক্ত মুণ্ডেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আলোচ্য খাতটি মুণ্ডেশ্বরী নামে দামোদরের অধিকাংশ জল বহন করে নিয়ে বর্তমানে রূপনারায়ণ নদের জলধারাকে পুষ্ট হতে সহায়তা করেছে। বর্ধমান জেলা পেরিয়ে বেণীবদ্ধ জালের ন্যায় নদীটি হুগলী জেলার আরামবাগ ও খানাকুল থানা পেরিয়ে হাওড়া জেলার আমতা থানার সীমারেখা ধরে দক্ষিণমুখে হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর জেলার পানশিউলির নিকটে রানীচকের বিপরীত তীরে রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে মিশেছে।

দামোদর নদ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার সময় পলি সঞ্চয়জনিত কারণে মূলখাতে সারা বছর ধরে জলপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হতে হতে বিশাল বিশাল চড়ার সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে নব সৃষ্ট খাতটি দিয়ে ১৯২১ হতে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রবল বন্যার জল প্রবাহিত হওয়ায় এটি প্রচণ্ড আকার

ধারণ করেছে এবং মুণ্ডেশ্বরীর খাতই বর্তমানে মুখ্য খাত। কিন্তু ডি. ভি. সি-র বাঁধ নির্মাণের ফলে মূল খাতের জলধারাও কমে গিয়েছে এবং জলধারার অভাবে রূপনারায়ণ নদ ও তার নিম্নাংশ নাব্যতা হারাতে চলেছে। মুণ্ডেশ্বরী নদী মূলতঃ দামোদরের অববাহিকা বা দামোদরের পলি গঠিত ভূ-ভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং খাতটি সৃষ্টি হ'বার ৩৫-৪০ বছরের মধ্যে জল-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই নদীর দ্বারা কোন ব-দ্বীপ গঠনের সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র বর্ষাকালে প্লাবনের সময় ভীষণ আকার ধারণ করার ফলে অববাহিকা অঞ্চলে প্রাণহানি ও শস্যহানি হয়ে থাকে। নদীখাতে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর জন্য বর্তমানে দামোদরের মূলখাতের অবস্থাও সঙ্গীন। দামোদরের খাতকে অকেজো করে দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর খাতে জলপ্রবাহের যে চেষ্টা চলছে তাতে হয়ত ভবিষ্যতে মূল দামোদর একটি লুপ্ত খাতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এই কাজের কুফলস্বরূপ স্মরণ করা উচিত যে, বন্যার সময় যখন দামোদরের সমূহ জলরাশি মুণ্ডেশ্বরীর খাতে প্রবাহিত হবে, সে সময়ে হুগলী ও হাওড়া জেলায় যে বিপর্যয় ডেকে আনবে, তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

কানা নদী : কানা নদী নামক কয়েকটি খাতের সন্ধান বর্ধমান জেলায় পাওয়া গেলেও দামোদরের শাখা কানা নদীর প্রসিদ্ধি অধিক। দামোদরের মূল প্রবাহপথ থেকে বামভাগে সেলিমাবাদের নিকট একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে জোগ্রাম, কালিডাঙ্গা, ধনিয়াখালি, বন্দীপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে, পুনরায় সরস্বতী নদীর পরিত্যক্ত খাত ধরে মগরা অতিক্রম করে বেহুলার সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিবেণীর উত্তরে নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে মিশেছিল। হুগলী জেলায় সরস্বতীর সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র খালের দ্বারা কানা নদীর যোগ ছিল। রেনেলের মানচিত্রে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় অর্ধবৃত্তাকারে যে নদীটির উল্লেখ আছে, সেটিই দামোদরের অন্যতম প্রাচীন খাত কানা নদী। ঘিয়া, কানা নদী, কানা দামোদর, রানাবাঁধ খাল, নিনখিলা (শেষোক্ত দুটি মিশে মাদারিয়া খাল), কেদোখাল প্রভৃতি হ'ল দামোদরের / সরস্বতীর পরিত্যক্ত খাত অথবা কাটা খাল। জামালপুর থানায় কানা নদীর একটি অংশ ইলসুরা নামে পরিচিত। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে বাঁধ নির্মাণের ফলে মূল দামোদর হতে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ৩৫০ ফুট বিস্তৃত ব্রীচ নির্মাণ করে বর্ষাকালে দামোদরের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উইলকক্সের মতে 'কানা' শব্দটি প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ক্যানাল (Canal) শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু তাঁর এ ধারণা ঠিক নয়। এ দেশে যা অবরোধ প্রাপ্ত হয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে, তাই সাধারণতঃ কানা নামে অভিহিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ কলিকাতা শহরে কানা গলি আছে; ঐগুলি আক্ষরিক অর্থে কাটা গলি নয়। যে পথ হঠাৎ অবরোধ প্রাপ্ত হয়ে শেষ হয়েছে. তা কানা গলি নামে লোকমুখে পরিচিত হয়।

পর্যাপ্ত জলধারার অভাবে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর কোন এক সময়ে কানা নদীর মধ্যাংশ নালিকুল গ্রামের নিকট বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বিযুক্ত অংশ কুন্তি নামে পরিচিত হয়েছিল এবং একই কারণে শেষাংশ আজ মগরা খাল বা কুন্তি নদী নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

দ্বারকেশ্বর : দ্বারকেশ্বর বা ধলকিশোর নদী বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে প্রবেশপূর্বক ঐ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ১৫ কি:মি: সীমানা ছুঁয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে এবং আরও পরে শিলাই-এর জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ নাম ধারণপূর্বক গাদিয়াড়া ও গেঁওখালির মধ্যভাগে ভাগীরথীতে মিশেছে। খণ্ডঘোষ ও রায়না থানার কয়েকটি গ্রাম দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত।

হরিণখালি খাল : জামালপুর থানায় দামোদর নদ প্রবাহিত হওয়ার সময় বহু খালের সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী ও দামোদরের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র ধারাকে হরিণখালি খাল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, যা প্রকৃত প্রস্তাবে দামোদর নদেরই একটি ক্ষুদ্র স্রোতপথ। তাছাড়া এ অঞ্চলে পুরোনো দামোদর, রানের খাল ও কানা নামধারী বহু খালের সৃষ্টি হয়েছে।

শিবা : বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ে' শিবা নদী বা শিয়ালানালার উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমান মানচিত্রে কাঁদড় ও নদীখাল নামে পরিচিত। কাঁদড় নামে কেতুগ্রাম থানায় বহু খাল ও নালার অস্তিত্ব আছে, যেগুলির সঙ্গে অতীতে অজয় বা বাবলা নদীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। কিন্তু মূল নদীতে জলপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শাখা-প্রশাখাগুলি শুষ্ক খাতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে কাঁদড় নামে পরিচিতি হলেও ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এটিকে বাবলা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই তথ্য ভুল। বাবলা বা দ্বারকা নামে প্রবাহিত নদীটির খাত বর্ধমান জেলায় ৪-৫ কি:মি: মাত্র এবং এই তথ্য সার্ভে মানচিত্র দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং গেজেটিয়ারে বর্ণিত নদীটি যে বাবলা নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সিঙ্গুটিয়া : প্রায় সমগ্র কেতুগ্রাম থানা জুড়ে কাঁদড় নামে পরিচিত ছটি বড় খাল আছে এবং এই খালগুলি একত্রে মিলিত হয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে শাঁকাই গ্রামের পশ্চিমে ভাগীরথীতে মিশেছে। আলোচ্য কাঁদড়গুলির বর্ণনা হল :

কাঁদড় নং ১ : বীরভূম জেলার খণ্ডগ্রাম (বাহিরীর উত্তরে) হতে নির্গত হয়ে জুরাইপুর, সাহজালালপুর অতিক্রম করে মুরুন্দি গ্রামের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

কাঁদড় নং ২ : বীরভূম জেলার কুরমা গ্রামের দক্ষিণ ভাগ হতে নির্গত হয়ে চণ্ডীপুর, ডোংগরা ও কুমুরিয়া গ্রাম অতিক্রম করে মুরুন্দি গ্রামের উত্তর-পূর্বে উপরোক্ত ১নং কাঁদড়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুলগ্রাম, উচকরণ, সেবানডিহি, দধিয়া, খাটুন্দি,

ভ্রমরকোল, গুরুপাড়া, ভুলকুড়ি অতিক্রম করে বেলুন গ্রামের (অম্বলগ্রামের দক্ষিণে) দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

কাঁদড নং ৩ : বীরভূম জেলার উকরাণডিহি গ্রাম হতে নির্গত হয়ে মহব্বৎপুর, আলিপুর, সুলতানপুর, রাজুর, মাসুন্দি, পাণ্ডুগ্রাম, দক্ষিণডিহি, কেতুগ্রাম অতিক্রম করে বেলুন গ্রামে ১ নং ও ২ নং খাতের মিলিত ধারার সঙ্গে মিশেছে।

কাঁদড় নং ৪ : কেতুগ্রাম থানার নরেঙ্গা গ্রাম হতে নির্গত হয়ে ফুলুন, কুলাই অতিক্রম করে খেনাইবান্দাগ্রামের উত্তরে ২নং খাতের সঙ্গে মিশেছে। খালটির গতি প্রকৃতি দেখে অনুমান করা যায় যে অতীতে এটি ছিল অজয়ের শাখা, যা জল-ধারার অভাবে বর্তমানে শুষ্ক বা কোথাও লুপ্ত খাতে পরিণত হয়েছে।

কাঁদড় নং ৫ : কেতুগ্রাম থানার হোসেনপুর গ্রাম হতে নির্গত হয়ে কান-ডাঙ্গা, সোনারুন্দি, বনওয়াড়িবাদ ও বন্দর অতিক্রম করে খারুলিয়ার উত্তরে ৩নং খাতের সঙ্গে মিশেছে।

কাঁদড় নং ৬ : মুর্শিদাবাদ জেলার শিলিপাড়া গ্রাম হতে নির্গত হয়ে জলসোথী, বালুটিয়া, গোয়ালপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাটিকুরির ২ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে ৩নং খাতের সঙ্গে মিশেছে।

আলোচ্য কাঁদড়ের ৫ নং খাতের তীরে বন্দর নামক গ্রামটি সম্ভবতঃ অতীতের কোন বড় নদী প্রবাহকে ইঙ্গিত করে এবং এই খাতের তীরে মোগল আমলের ফরমানবলে বনওয়াড়িবাদের রাজারা রাজ্যপাট স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে[২৭] সিঙ্গটিয়া নদীর উল্লেখ আছে এবং এই নদীর তীরে খাণ্ডয়িল্লা (খারুলিয়া), অম্বয়িল্লা (অম্বলগ্রাম), মোলাড়ন্দি (মুরন্দি) গ্রামগুলি অবস্থিত। তাম্রশাসনোক্ত গ্রামগুলির পাশ দিয়ে সিঙ্গটিয়া নামক নদীটি একদা দ্বাদশ শতকে প্রবাহিত হত অর্থাৎ, সে হিসাবে সিঙ্গুটিয়া নামক প্রাচীন নদীটি অতীতে ৩নং, ৫নং ও ৬নং খাত ধরে প্রবাহিত হয়েছিল। তাম্রশাসনোক্ত দানকৃত গ্রামের নাম ছিল বল্লালহিট, যা বর্তমানে ৬নং খাতের দক্ষিণে বালুটিয়া নামে পরিচিত।

উপরোক্ত ৬টি কাঁদড় খালের সম্মিলিত মিলন স্থল হল গঙ্গাটিকুরি গ্রামের উত্তর-পূর্বে। তারপর কিছুটা পূর্বমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ দক্ষিণমুখে খাত সৃষ্টি করে সুজাপুর, নৈহাটী, উদ্ধারণপুর ও এনায়েৎপুর অতিক্রম করে শাঁকাইগ্রামের ১ কিঃমিঃ পশ্চিমে অজয়ে মিশেছে। সীতাহাটি গ্রামের ১·৫ কিঃমিঃ উত্তরে অতি শীর্ণ স্রোতপথের উপর প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ সুদৃঢ় পাঁচ খিলানবিশিষ্ট সেতুটি মোগল আমলের বলে অনুমান করা হয়। স্থানীয় লোকে দাবী করেন যে, এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের। সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থাপনের পর কাটোয়ায় নবাবের শস্যের গোলা ও গড় এবং শাঁকাই-এ দুর্গ নির্মাণের পর সড়কপথে মুর্শিদাবাদ হতে কাটোয়া হয়ে বর্ধমান যাবার পথে সেতুটি নির্মাণের

ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এই সঙ্গে অনুমিত হয় যে, এই সময়ে প্রাচীন সিঙ্গুটিয়া নদীটিও প্রবল ছিল। অন্যথায় এত বৃহৎ ও সুদৃঢ় সেতু নির্মাণের কোন যৌক্তিকতা বা প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

বাবলা ঃ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নদীরূপে এটি প্রবাহিত হলেও, বাবলা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল হ'ল বর্ধমান জেলায়। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানা হ'তে কেতুগ্রাম থানার নূতনগ্রামে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে মৌগ্রাম ও নৃসিংহপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নারায়ণপুরের বিপরীত দিকে এটি ভাগীরথীতে মিশেছে।

নুনিয়া ঃ সালানপুর থানার আছড়া গ্রামের দক্ষিণে এক উচ্চ ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে নুনিয়াজোড়া নামে পূর্বমুখে প্রবাহিত ধারাটি মঙ্গলামাঝি গ্রামের উপর দিয়ে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছে। নুনিয়াজোড় নামে অপর একটি ক্ষুদ্র ধারা পরব্বতপুর হতে নির্গত হয়ে পূর্বমুখী অমশাল গ্রামের দক্ষিণে এসে দুটি ধারা একত্র মিলিত হয়ে নুনিয়া খাল নামে মদনমোহনপুর ও পুরুলিয়া অতিক্রম করে আসানসোলের ২ কি: মি: উত্তর-পূর্বে কেশবগঞ্জের পথে প্রবাহিত হয়েছে।

রূপনারায়ণপুরের দক্ষিণে রাঙামেটে গ্রামের নিকট থেকে আর একটি ক্ষুদ্র ধারা দক্ষিণমুখে আলকুশ, ধুন্দাবাদ, মহিষমারা, কালিকাপুর গ্রাম অতিক্রম করে পূর্বমুখে আসানসোল শহরের উত্তর ভাগে প্রবাহিত হয়ে কেশবগঞ্জের কাছে মূল নুনিয়াখালের সঙ্গে মিশেছে। তারপর কালিপাহাড়ীর ২ কিঃমিঃ পশ্চিমে রতিকাটি, শালডাঙ্গা ও আমকুল গ্রাম অতিক্রম করে রানীগঞ্জের ৪ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদরে এসে মিলিত হয়েছে। এই প্রবাহপথে দোমহণী হতে দক্ষিণমুখে আগত পুনতাল খালটি জামুরিয়া থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে প্রবাহিত দামোদর খালের সঙ্গে চককেশবগঞ্জে মিলিত হয়ে কালিপাহাড়ীর ৩ কিঃমিঃ পশ্চিমে নুনিয়ার মূলধারার সঙ্গে মিশেছে। তারপর নুনিয়া খাল নামে দক্ষিণ-পূর্বমুখে কুমারডিহি, শালডাঙ্গা, হাড়ডাঙ্গা ও আমকুল অতিক্রম করে রানীগঞ্জ থানার নারায়ণকুড়িতে দামোদরে যুক্ত হয়েছে। নিম্নাংশে বেড়াল গ্রামের নিকট থেকে চলবলপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জোডনালা নামে একটি খাল নুনিয়াতে মিশেছে। নুনিয়া খাতের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ কিঃমিঃ। গ্রীষ্মকালে নদীখাত শুষ্ক থাকে। কেবলমাত্র বর্ষার সময় এই খাল বা ক্ষুদ্র নদীগুলি দামোদরের জলধারা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চালনা ঃ রামচন্দ্রপুর হতে নির্গত হয়ে চালনা খালটি দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে কল্যাণেশ্বরীতে বরাকর নদের সঙ্গে মিশেছে। চালনাদহ এবং দেবী কল্যাণেশ্বরীকে নিয়ে বহু প্রবাদ বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

তমলা ঃ উখড়ার নিকট হতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী খালটি তমলা, দক্ষিণখণ্ড ও ওয়ারিয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুর্গাপুরের দক্ষিণে নডিহা ও

বীরভানপুরে দামোদরে মিশেছে। ২৫ কি:মি: দৈর্ঘ্য নদীখাতটি বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে শুষ্ক থাকে। তমলা-দামোদরের সঙ্গমস্থলে বীরভানপুর গ্রামে আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বৎসর অথবা ততোধিক কালের এক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তিলপাড়ার নিকট থেকে অপর একটি ক্ষুদ্র খাল মহির গ্রামে তমলায় মিশেছিল। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গমস্থলের অংশটি শুষ্ক হওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সিঙ্গারাণ: জামুরিয়া থানার বিজয়নগর গ্রাম (ইকরা রেলষ্টেশনের নিকট) হতে নির্গত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে ইকরা, সার্থকপুর, সিঙ্গারাণ, তপসী, মঙ্গলপুর, হরিশপুর, দিগনালা, অণ্ডাল, শ্রীরামপুর অতিক্রম করে ওয়ারিয়ার পশ্চিমে পিজরাপোল গ্রামে দামোদরে মিশেছে। প্রায় ৩৫ কি:মি: দীর্ঘ এই নদীখাতটি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে। জামশোল গ্রামের পূর্বভাগ হতে একটি ক্ষুদ্র নালা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে কুলডাঙ্গা গ্রামের পশ্চিমে সিঙ্গারাণ নদীতে মিশেছে। সিতুলি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত হতে অপর একটি খাল মধুসূদনপুর, ভাতুর, অতিক্রম করে দিগনালা গ্রামের পশ্চিমে সিঙ্গারাণ নদীতে এসে মিলিত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে[২৮] মহাবংশে উল্লিখিত রাঢ-রাজ সিংহবাহুর রাজধানী ছিল সিঙ্গারাণ নদীর রুক্ষ অববাহিকায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে এবং সিংহ অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীটি সিঙ্গারাণ নামে পরিচিতি লাভ করে।

তুমুনি: চিচুরিয়া গ্রামের নিকটে উৎপন্ন হয়ে ক্ষুদ্রকায়া তুমুনি খাল পূর্বমুখে গোগলা, কেঁদুলা, ডিহিবেতা, নবগ্রাম অতিক্রম করে শ্যামারূপাগড়ে অজয় নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই নদীটির গতিপ্রকৃতি দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে হয়ত অজয় নদ তুমুনির খাতে প্রবাহিত হ'ত। চিচুরবিল নামক দহটি তার প্রাচীন প্রবাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পঞ্চগঙ্গা: ভাল্কির নিকট থেকে উৎপন্ন হয়ে একটি অতি ক্ষুদ্র নালা কুনুরে মিশেছে। গঙ্গা হতে বহুদূরে অবস্থিত হয়েও উষর প্রান্তরের মধ্যে প্রবাহিত নালাটি কেন স্থানীয় লোকের নিকট পঞ্চগঙ্গা নামে পরিচিত হয়েছিল, সেটা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

কুকুয়া: পানাগড়ের দক্ষিণে শিলামপুর গ্রামের নিকট একটি ক্ষুদ্র খাল বুদবুদ, রণ্ডিয়া থেকে নির্গত হয়ে মুরারীপুর, রঘুনাথপুর, কেন্দুয়াটিকরী, নারায়ণপুর, উমরপুর পেরিয়ে নবখণ্ড গ্রামে দামোদরে মিশেছে। খালটি সর্বসাকুল্যে মাত্র ২০ কি:মি: দীর্ঘ হলেও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের লেখনীতে এর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মনসামঙ্গলে মৃতপতিক্রোড়ে বেহুলা তুবরাজপুর হতে যাত্রা করে নবখণ্ডে দামোদরে পৌঁছেছিল এবং ঐ স্থান দুটির মধ্যে প্রথমটি কুকুয়া খালের পূর্বতীরে এবং দ্বিতীয়টি কুকুয়া-দামোদরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

দেবখাল : খণ্ডঘোষ থানার কুমিরকোলা গ্রামে দামোদর থেকে নির্গত হয়ে দেবখালের ধারা খাজুরহাটি, খরকোল, বিল্লসর, বস্তির, গোপালনগর, দক্ষিণকূল, বোড, দরিয়াপুর অতিক্রম করে সাদিপুরের দক্ষিণে এসে দামোদরে মিশেছে। অন্যদিকে তার একটি জলধারা জুফুলিয়া গ্রামের পশ্চিম হতে নির্গত হয়ে গোপালপুর, গোলগ্রাম, সুরপুর, শেখপুর অতিক্রম করে তেয়ান্দুল গ্রামের নিকট দেবখালে মিশেছে। ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গলে এই খালটি বরাকপুরের খাল নামে উল্লিখিত।

কাঁটাখাল : কাঁটাখাল বা কাটাখালটি রায়না থানার পলাসন গ্রাম হতে নির্গত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখে ভাগবৎপুর, বেসিয়া, পাষণ্ডা, সুবলদহ অতিক্রম করে বড়বৈনান গ্রামের দক্ষিণে কাঁকি বা মুণ্ডেশ্বরীতে এসে মিলিত হয়েছে। রায়না থানার বুরারি গ্রামের উত্তরাংশ হতে নির্গত হয়ে অপর একটি খাল মুকুলপুর, সহজপুর, রায়না অতিক্রম করে কামারগড়িয়ার দক্ষিণে কাঁটাখালে মিশেছে। দক্ষিণকূল গ্রামের নিকট থেকে দেবখালের একটি দক্ষিণমুখী ধারা রসিকপুর, শুনার, রামদেববাটী অতিক্রম করে আদমপুর গ্রামের দক্ষিণে কাঁটাখালে এসে সংযোগ হয়েছে। দেবখাল থেকে এই ধারার উৎপত্তিস্থলের যোগাযোগ বর্তমানে লুপ্ত।

রত্নালু : রায়না থানার যশপুর গ্রামের দক্ষিণ থেকে উৎপত্তি হয়ে গোতান, ও দামিন্যা অতিক্রম করে ফতেপুর গ্রামে উত্তরমুখী হয়ে কোটশিমুল অতিক্রম করে দামোদরে মিশেছে। অতি তুচ্ছ হলেও রত্নালু নদীর দুই তীরে দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নদীর প্রসিদ্ধি বর্ধিত করেছে। নদীর বামতীরে দামিন্যা গ্রামে মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের জন্মস্থান এবং নদীর পূর্বতীরে গোতান গ্রামে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেছেন।

রানাবাঁধ : রানের খাল বা রানাবাঁধা নামক খাতটি প্রাচীন দামোদরের পরিত্যক্ত খাত। দামোদরের প্রাচীন খাত কানা দামোদরের প্রবাহপথ পরিত্যক্ত হয়ে বর্তমান খাতে প্রবাহিত হওয়ার সময় সম্ভবতঃ এই খাল বা খাতটির সৃষ্টি হয়েছিল। কানা দামোদরও বর্তমান খাতের মধ্যভাগ দিয়ে একইমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই খালের বর্তমান পরিচিত হল কানা দামোদরের এক শাখারূপে। সম্ভবতঃ সেলিমাবাদের দক্ষিণ থেকে নির্গত হয়ে চকদিঘি অতিক্রম করে হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দামোদরের বর্তমান ধারা হতে আগত নিনখিলা নদীর সঙ্গে কানপুরে এসে মিশেছে এবং মিলিত ধারা মাদারিয়া খাল নামে আমতার পশ্চিমে দামোদর নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে সেলিমাবাদ হতে তারকেশ্বর পর্যন্ত নদীখাত স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ইলসরা : দামোদর অথবা কানা দামোদরের খাত পরিবর্তনের ফলে

পরিত্যক্ত খাতটির অস্তিত্ব জামালপুর থানার ইলসরা গ্রাম থেকে পাওয়া যায়। এই খাতটি ইলসরা, ময়না, বেনাপুর, বীরশিমূল গ্রাম পেরিয়ে হুগলী জেলার বারুল, জুলকুল রামেশ্বরপুর, সিকন্দরপুর অতিক্রমপূর্বক হোদলা গ্রামে ঘিয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ঘিয়া ঃ অতীতে কানা নদীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও বর্তমানে ঘিয়া নদীর খাতের চিহ্ন হুগলী জেলার গুড়াপের পশ্চিমে কোটালপুরে পাওয়া যায়। কোটালপুর হতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে গেঁতেগড ও মাণিকপুর অতিক্রম করে হোদলা গ্রামে ইলসরা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও দক্ষিণে ভবানীপুরে জোলাই বা জোলা নদীর সঙ্গে মিশেছে। এরপর ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখের প্রবাহপথে তালারচক গ্রামে জুলকি বা জুলকুল নদীর সঙ্গে ঘিয়ার সংযোগ ঘটেছে এবং আরও পূর্বমুখে ৬-৭ কিঃমিঃ পরে কানা নদীর সঙ্গে যেখানে যোগাযোগ ঘটেছিল সেখানে কানা নদীর এই অংশের নাম কুন্তি। কানা নদীর খাত যে সময়ে প্রবল ছিল, সে সময় ঘিয়া ও কানার মিলিত ধারা নয়াসরাই-এর দিকে প্রবাহিত হত। বর্তমানে ঘিয়া ও কুন্তির সংযোগস্থলের খাত লুপ্ত।

কানা দামোদর ঃ দামোদর প্রসঙ্গে কানা দামোদরের খাতের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কানা দামোদরের আরও কয়েকটি লুপ্ত খাত আছে যেগুলি আজ বিস্মৃত। সেলিমাবাদ হতে দক্ষিণমুখে একদা এই নদীটি বর্ধমান জেলার হিরণ্যগ্রাম, বাহাদুরপুর, কাঠগড়া, খাঁপুর অতিক্রম করে হুগলী জেলার গোবিন্দপুর, দশঘরা, বলাগড (তারকেশ্বরের নিকটে), দ্বীপা, দ্বারহাট্টা, আঁটপুর, জাঙ্গীপাডা ডিঙ্গলহাট, বাগাণ্ডা পেরিয়ে হাওডা জেলার নাইকুলিহাট, মাজু, বাসুদেবপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু রঘুদেবপুরের পশ্চিমে নদীখাতকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হুগলী জেলার বালিয়া গ্রামের নিকট থেকে কানা নদীর একটি দক্ষিণমুখী ধারা হরিপাল পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল এবং ৪-৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণে পুনরায় ঐ খাতের চিহ্ন গোপালনগর গ্রামে দেখা যায় এবং সেখান থেকে নীলারপুর, ভীমপুর, ফুরফুরা অতিক্রম করে ডিঙ্গলহাটে কানা দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দামোদরের দুটি ভিন্নমুখী ধারা পুনরায় একত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিই কৌশিকী বা স্থানীয়ভাবে ‘ডাকাতী নদী’ নামে পরিচিত। হাওড়া জেলার ইসলামপুর হতে পানপুর হয়ে আমতার উত্তরে বড়ময়রা গ্রাম পর্যন্ত একটি লম্বা বিল আছে যা লুপ্ত খাতের চিহ্নস্বরূপ। এই খাতের একটি অংশ বাণবাটী খাল নামে দক্ষিণ মুখে হরিশপুর, ভগবতীপুর, কামিনা, অভিরামপুর পেরিয়ে মহিষরেখা গ্রামে দামোদরে মিশেছে। ইসলামপুর হতে কেন্দুয়া খাল নামে একটি দক্ষিণমুখী স্রোতপথ মাজুক্ষেত্র, বাণীবন, ফুলেশ্বর পেরিয়ে উলুবেড়িয়ায় ভাগীরথীতে মিশেছে। এই খাতটি কানা দামোদরের মুখ্য খাত। আঁটপুরের নিকট লোহাগাছি গ্রাম হতে অপর একটি দক্ষিণমুখী জলধারা জাঙ্গীপাড়া ফুলকাস, গোবিন্দপুর,

কানপুর পেরিয়ে, হঠাৎ বসন্তপুরের উত্তরে এসে তার স্রোতপথ হারিয়ে ফেলেছে। নাইকুলি হতে বেগুয়ার বিল হয়ে দাদখানি দহের মধ্য দিয়ে কানা দামোদরের সঙ্গে রূপনারায়ণের যোগসূত্র ছিল এবং সম্ভবতঃ আমতা থানার দক্ষিণাংশে ছিল এই সংযোগস্থলটির অবস্থিতি। বাসুলিমঙ্গলে নাঞ্চিকুলি পেরিয়ে জলদুর্গের পথে (সম্ভবতঃ বড বিল পথে) যমখানা (বর্তমান ঝামটে) ও মানকুর হয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরে যাতায়াতের জলপথ ছিল। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রেও এ ইঙ্গিত মেলে।

গৌর : গৌর বা গোরা নদী চন্দনপুর গ্রামের উত্তরাংশ থেকে নির্গত হয়ে উত্তর-পূর্ব মুখে বীরপুর, মুঙ্গরী, মালকিতা, কলিগ্রাম অতিক্রম করে তুবগ্রামের পূর্বে খড়িতে মিশেছে।

গৌরাঙ্গ : বড়বেলুন গ্রামের দক্ষিণ থেকে নির্গত হয়ে এই কাঁদড় খালটি কামালের খালের সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্দ্রপুরের পূর্বে খড়ি নদীতে মিশেছে।

কুঞ্জি : কুঞ্জি নদীর খাত দেখে অনুমান করতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে, অতীতে খড়ি বা খড়েগশ্বরীর প্রবাহ এই খাতেই প্রবহমান ছিল। বুধপুর গ্রামের নিকট খড়ি হতে নির্গত হয়ে উত্তরমুখী একটি খাল মালডাঙ্গায় এসে পুনরায় খড়ির সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং ঐ সংযোগকারী খালটি কুঞ্জি নামে পরিচিত।

কামালের খাল : ক্ষীরগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ধামাচিয়া দিঘি হতে একটি খাল পুঁইনী, স্বরগ্রাম, বৈঁচি অতিক্রম করে চন্দ্রপুর গ্রামে খড়ির সঙ্গে মিশেছে। সেলেণ্ডা (ভাতার থানা) গ্রামের নিকট হতে উত্তর-পূর্ব মুখে কাঁদড নামে পরিচিত একটি খাল স্বরগ্রামের উত্তরে কামালের খালের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। মাধপুরের নিকট হতে কাঁদড় নামে অপর একটি খাল ফুলগ্রাম ও পাকুরমারি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কামালের খালের সঙ্গে মিশে সম্মিলিত ধারা খড়ির জলপ্রবাহ বৃদ্ধির সহায়তা করেছে।

ডুবি : পিপলুন গ্রাম হতে একটি ক্ষুদ্র ধারা উত্তর-পূর্বমুখে জামনা, কানপুর, কামালপুর অতিক্রম করে দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে এক অংশ সোনাডাঙ্গা, অপর অংশ মোরিলডাঙ্গায় খড়ির সঙ্গে মিশেছে। এই সংযোগস্থলের পূর্বভাগে উনির বিল এবং উনির বিলের সঙ্গে একটি শীর্ণকায় স্রোতপথ দ্বারা চণ্ডীপুর বিলের সঙ্গে যুক্ত। এই স্রোতপথের তীরে দামোদর পার বা দামোদরপাড়া গ্রামখানি প্রাচীন দামোদরের স্মৃতি চিহ্নকে ধরে রেখেছে বলে অনুমান করলে মোটেই অসঙ্গত হবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উত্তরে ভাগীরথীর খাত থেকে খড়ি, বাঁকা ও বল্লুকার খাত পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য বিল ও খালের, যাদের অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়া যায়। সেকারণে অনুমান করা যায় যে, দামোদর ও ভাগীরথীর বিভিন্ন সময়ে খাত পরিবর্তনে ফলে এগুলির উৎপত্তি হয়েছিল।

গর্জন ঃ গর্জন বা গুর্জন নামে একটি খাল খাঁপুর গ্রামে খড়ি-বাঁকার সম্মিলিত ধারা হ'তে নির্গত হয়ে নূতনগ্রাম, ধাত্রীগ্রাম, নিরলগাছি অতিক্রম করে বল্লুকার খাতের সঙ্গে মিশেছে। তবে গর্জন খালের দক্ষিণ অংশের খাতটি স্থানীয় লোকের কাছে বেহুলা নামে পরিচিত।

মঙ্গলকাব্যে জলযাত্রা :

নদীমাতৃক বাংলা দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল স্থলপথ ও জলপথ। কিন্তু এই সব পথের ঐতিহাসিক পরিচিতির অভাবে এগুলি আজ লুপ্তপ্রায়। তবে এ বিষয়ে মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত পথঘাটগুলি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ বিবরণের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য যথেষ্ট।

অতীতে জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীমাতৃক এই দেশে শাসককুল তাদের স্বীয় স্বার্থে এবং বণিককুল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জলপথের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। সৈন্য চলাচল ও বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ব্যবহার করতে হলে সুপ্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন, যা সময়সাপেক্ষ ও প্রভূত অর্থলগ্নিকারক প্রকল্প। স্থলপথে ভারী দ্রব্যাদি দূরতম প্রদেশে বহন করাও কষ্টকর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কর্ম্মসন্ধি (পৃঃ ২।১৩৮) অধ্যায়ে আছে, "যদিও কৌটিল্য এই মত মানেন না, তাহা হ'লেও অন্যান্য আচার্য্যগণের মতে বারিপথই স্থলপথ অপেক্ষা প্রশস্ততর। কারণ বারিপথ, অল্প ধনব্যয় ও অল্প পরিশ্রমে নির্মিত হতে পারে এবং এই পথে প্রভূত পণ্যদ্রব্যের নয়ন ও আনয়ন সম্ভবপর হয়"।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সপ্তগ্রামের স্থান ছিল অগ্রগণ্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ করেছেন—

> 'সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
> ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥'

উপরোক্ত ঘটনা কিন্তু সমসাময়িককালের ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যায় না, বা মুকুন্দরামের আমলে সপ্তগ্রামের বণিককুলের ধনসম্পদ ও প্রতিপত্তির উল্লেখ ইতিহাস-সম্মত নয়। কারণ তৎপূর্বেই সপ্তগ্রাম অঞ্চলে মুসলমান শাসকগণের আধিপত্যে হিন্দুরা ধন ও মানের ভয়ে দূর অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য বণিক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে না। ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের "মনসাবিজয়" কাব্যে সুবর্ণবণিক কুলের বিবরণ অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীগণের বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে, যথা—

'নিবসে যবন জত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি
দুই তক্ত করে তছলিম॥'

প্রকৃতপক্ষে বিপ্রদাসের কাব্যে সপ্তগ্রামে বাণিজ্যেরই কোন উল্লেখ নাই।

মুকুন্দরামের বিবরণে জানা যায় যে, রাঢ়ের মূল বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম অঞ্চল থেকে বণিকেরা ক্রমশ: দূর দূরান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক বণিক বাণিজ্যই ছেড়ে দেয়। ধনপতিকে সিংহলে প্রেরণ উপলক্ষ্যে রাজার উদ্দেশ্যে ভাণ্ডারির উক্তি—

'অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক এক তোলা
জত সাধু ছিল রিনী সবে তারা হইল ধনী
সম্পদে মাতিয়া হৈলভোলা।
বিংশতি বৎসর হইল জয়পতি দত্ত মইল
ডিঙ্গা ভর্‍্যা আনিত চন্দন
আর জত সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর
না পাই চন্দন-অন্বেষণ।
দিনী সাধু হইল বধ্ না আইল বৈদিনী সাধু
দেখিতে দুর্লভ হইল গুয়া।'

সপ্তগ্রাম বন্দরের ক্রমাবনতি, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মোগল ও বিদেশী সওদাগরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, সমুদ্র বা জলপথে জলদস্যুর উৎপাত প্রভৃতি কারণে বণিকগণ নিজেদের এই স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করে নি। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে বর্ধমান, চম্পাইনগর কর্জনা, গণেশপুর, দশঘরা, সপ্তগ্রাম, সাঁকো, কাইতি, জাড়গ্রাম, তেঘরা, ত্রিবেণী, লাউগাঁ, পাঁচড়া, বিষ্ণুপুর, খণ্ডঘোষ, গোতান প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকেরা উজানী নগরে সমবেত হয়েছিল। অর্থাৎ, উপরোক্ত কারণে তারা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে না পেরে রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিল প্রধানতঃ নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিকে। মুকুন্দ কাব্যে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়কে সওদাগর সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয় নি। তাছাড়া পুরাণসমূহে তাদের কৌলীন্য ছিল না। মুকুন্দ শুধু 'বাণ্যা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। গুজরাটের বর্ণনা ছাড়া কোথাও সুবর্ণবণিক নাই। বর্ধমান শহরের পশ্চিমভাগে লাকুড়িয়া নামক এক পল্লী আছে। জনশ্রুতি যে, লক্ষ ঘর অর্থাৎ তৎকালে লক্ষ টাকার অধিকারী নাহলে লাকুড়িয়া পল্লীতে কেহ বসবাসের অনুমতি পেত না।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে "উজানী' অর্থাৎ উজানী-কোগ্রাম-মঙ্গলকোট-নূতনহাট এবং 'চম্পাইনগরী' অর্থাৎ পানাগড়ের নিকট কসবা-চম্পাই নগরীতে অভিজাত

বণিককুলের বসবাসের উল্লেখ আছে। মনসামঙ্গলে আছে বেহুলার বাপের বাড়ি ছিল উজানী, আর চম্পাইনগরীতে চাঁদবেনের বাড়িতে বেহুলার বিবাহ হয়েছিল। চম্পাইনগরীর নিকটে অবস্থিত একটি ছোট টিলা, সার্ভে মানচিত্রে সাঁতালী পাহাড় নামে পরিচিত।

মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ, পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের যুগ। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ মঙ্গল-কাব্যগুলিতে মূল আখ্যায়িকা ভাগ ছাড়াও গ্রাম-বাংলার সমাজ জীবনের বহু চিত্র ব্যক্ত অথবা অব্যক্তরূপে লুকিয়ে আছে। বিপ্রদাস পিপলাই, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ঘনরাম চক্রবর্তী, মুকুন্দ মিশ্র, মাণিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিগণ যদি বিস্তারিত ও সুষ্ঠু বিবরণ রেখে না যেতেন, তা'লে রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবন, সমসাময়িক কালের ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভৌগোলিক আলোচনার ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত যে হত না একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। আবার ভারতচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী কবির রচনায় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানের সূত্রগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। মধ্যযুগের কবিদের ভৌগোলিক বর্ণনাগুলি মোটামুটি নির্ভরশীল, কারণ তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীয় অবস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলের স্থান-নামের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। আবার নিকটবর্তী স্থানসমূহের সুষ্ঠু বর্ণনা পাওয়া গেলেও দূরতম অঞ্চলের বিবরণগুলি মোটেই সহজবোধ্য বা পরিষ্কার নয়। দ্বিজ মাধব ও বিজয় গুপ্তের রচনার আখ্যানভাগের বিষয়বস্তু রাঢ় অঞ্চলের হলেও, রাঢ় জনপদ সম্পর্কে তাঁদের কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কিন্তু এই জনপদের জলপথ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামের বিবরণ তুলনামূলকভাবে অধিকতর নির্ভরশীল।

বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাঢ়ের যে তিনটি প্রধান জলপথের সন্ধান জানা যায়, যার প্রথমটি হল অজয়-ভাগীরথীর জলপথ।

অজয়-জাহ্নবীর কূলে :

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের দুই খ্যাতনামা কবি জলপথ পরিচয় ও নদীতীর-বর্তী যে সকল স্থান-নাম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উভয় কবি সুদীর্ঘ জলপথ যাত্রা প্রসঙ্গে যে সকল প্রাচীন স্থান-নামের বর্ণনা দিয়েছেন, তন্মধ্যে, কয়েকটি স্থান হয়েছে লুপ্ত এবং কিছু স্থান নামান্তর গ্রহণ করেছে। আবার এরূপ কিছু জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি অন্য স্থানের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত চাঁদসদাগর, ধনপতি ও শ্রীমন্ত বণিককুলের প্রতিভূ এবং উভয় কবির বর্ণনায় উজানী হতে মগরা বা সাগর সঙ্গম পর্যন্ত তৎকালীন উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির উল্লেখ আছে। কিন্তু উজানী থেকে অম্বুয়া পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ অঞ্চল সম্পর্কে বিপ্রদাসের ধারণা স্বচ্ছ

ছিল না। সে কারণে বিপ্রদাসের বর্ণনায় মাত্র ছ'টি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, বিপ্রদাস ও মুকুন্দরাম অম্বুয়া থেকে মাধবপুর পর্যন্ত প্রায় সকল বিখ্যাত স্থানের উল্লেখ করেছেন এবং উভয়েই কালিঘাটের দক্ষিণে গঙ্গাপ্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন, যা বর্তমানে আদিগঙ্গার লুপ্ত খাত নামে পরিচিত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও এর সমর্থন মিলছে।

সওদাগরদের বাণিজ্যবহর রাজা বিক্রমকেশরীর রাজধানী উজানী নগর থেকে যাত্রা শুরু করে অজয় ও ভাগীরথীর খাত ধরে কাটোয়া, নবদ্বীপ, অম্বিকা, কালনা, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কলিকাতা, বেতড় অতিক্রম করে অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গার খাত ধরে ছত্রভোগ-মাধবপুর হয়ে দুর্জয় মগরা বা সাগর সঙ্গমে পৌছুত। এই পর্যন্তই ছিল অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যপথ। অতঃপর বাণিজ্যবহরটি উত্তর সারকাস ও করমণ্ডল উপকূল ধরে বঙ্গোপসাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। প্রাচীনকাল হতে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসহ পৃথিবীর নানাস্থানের সঙ্গে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্রের বহু প্রমাণ পাওয়া গেলেও মঙ্গল-কাব্যের কবিরা কেবলমাত্র দক্ষিণ পাটনের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তাঁদের সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান দক্ষিণ পাটন বা সিংহল দ্বীপকে অতিক্রম করতে পারে নাই। আবার নামপরিচয় প্রসঙ্গে তাঁরা অনেকক্ষেত্রে সেগুলিকে ভৌগোলিক ক্রম অনুসারে বর্ণনা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। স্থান-নামের বিকৃত উচ্চারণ ও লিপি-প্রমাদ সেকালেও ছিল—আজও আছে। কবিরা পরম্পরা প্রচলিত লিখিত বা অলিখিত কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন এবং তা বর্তমানে সব ক্ষেত্রেই লুপ্ত। সুতরাং এর মধ্যে ঐতিহাসিক জ্ঞান বা সত্যতা খুঁজতে গেলে মঙ্গল কাব্যে মিলবে না।

বাণিজ্য যাত্রা শুরু হয়েছিল উজানী নগরের অনতিদূরে 'ভ্রমরাদহ' হতে। হ্রদাকৃতি ভ্রমরাদহ ছিল আধুনিক পরিভাষায় পোতাশ্রয়। অজয়-কুনুর সঙ্গমস্থলে উজানীর মহাশ্মশানের দক্ষিণে ছিল এর অবস্থিতি। অজয় নদের পলি সঞ্চয়ের ফলে চড়ায় পরিণত হয়ে কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই এখন দেখা যাবে না। সওদাগরদের বাণিজ্যযাত্রা বিরতির সময় দহ বা হ্রদাকৃতি এ জলাধারের জলে নৌকা ডুবিয়ে রাখার রীতি ছিল, তার প্রমাণ মেলে চণ্ডীমঙ্গলে :

'পূর্ব্ব হতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়ে সাধু গেল তার কূলে ॥'

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' বহুল প্রচারিত গ্রন্থ; কিন্তু বিভিন্ন পুঁথি অবলম্বনে ছাপা সংস্করণগুলিতে স্থানে স্থানে পাঠভেদ রয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণগুলির মধ্যে বঙ্গবাসী, বসুমতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য অকাদেমীর সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিতে পাঠভেদের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি ত্রুটি লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে,—

১। দক্ষিণে ললিতপুর সম্মুখে ইন্দ্রাণি—কলিকাতা বিশ্বঃ সং।

২। ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণি—বসুমতী সং।

৩। ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণি—সাহিত্য অকাঃ সং।

এস্থলে যৎসামান্য ভৌগোলিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। ললিতপুর নামধেয় গ্রামখানি বর্তমানে কেতুগ্রাম থানার অধীনস্থ নলিয়াপুর (জে, এল নং ১১৪) নামে পরিচিত এবং ইন্দ্রাণী নগরীর অবস্থিতি ছিল কাটোয়া-দাঁইহাটের মধ্যবর্তী বিবিহাটে, যার সর্বসম্মত প্রমাণ মিলেছে ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অবস্থিতির কারণে। উজানী হ'তে অজয় নদের খাত ধরে কাটোয়ার পথে নদীর উত্তর ভাগে অর্থাৎ বামে ললিতপুর বা নলিয়াপুরের অবস্থিতি এবং ইন্দ্রাণীনগরসহ সমগ্র ইন্দ্রাণী পরগণা, নদীর দক্ষিণে বা ডাইনে। বহু অনুসন্ধান করেও নদীর দক্ষিণ বা ডাইনে ঐ নামে কোন প্রাচীন গ্রামের সন্ধান জানা যায় নাই। তাছাড়া কোন অবস্থাতেই 'বামেতে ইন্দ্রাণি' হতে পারে না। অথচ সুকুমার সেনসহ সমস্ত সম্পাদিত সংস্করণেও এই উল্লেখ পাওয়া যায়। উধনপুর (উদ্ধারণপুর) ও নৈহাটী যে শাঁকাই ঘাট হতে স্বল্প দূরে অবস্থিত, তা মুকুন্দরামের বর্ণনা ও স্থানদ্বয়ের ভৌগোলিক অবস্থানও ঐ প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে পাঠ হওয়া উচিত ছিল—"বামেতে ললিতপুর ডাহিনে ইন্দ্রাণি।" কিন্তু ডাইনে ললিতপুরের উল্লেখ সর্বক্ষেত্রেই থাকায়, যা লিপিকরের প্রমাদ বলে মনে করা অনুচিত। সে কারণে মন্তব্য করা যায় যে, বিভ্রান্তি মুকুন্দরামের—লিপিকার প্রমাদ নয়।

বিপ্রদাসের বিবরণে নদীয়ার উল্লেখ ব্যতীত অপর কোন সংবাদ জানা যায় না। অবশ্য তাঁর সময়ে দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীচৈতন্যদেবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি অন্যান্য স্থানের ন্যায় নদীয়ার উল্লেখ করেছেন। কাজির বিচারালয়, টোল ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বাসস্থান ভিন্ন নদীয়ার প্রসিদ্ধির প্রমাণ পঞ্চদশ শতকে কিছুই মেলে না। কিন্তু মুকুন্দরাম নদীয়ার অবস্থিতির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে পাওয়া যায়—"বাম ভাগে নবদ্বীপ ডাহিনে পাড়পুর" বা "বাম ভিতে নদীয়া বাহিনে (ডাহিনে ?) পাড়পুর।" শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে নবদ্বীপ বা নদীয়া নগরীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রথাগত-ভাবে মুকুন্দরামও চৈতন্যচরণে প্রণাম জানিয়েছেন। জেমস্ রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, নবদ্বীপের উত্তরে রামচন্দ্রপুরে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে শহরের পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় সমুদ্রগড়ের উত্তরে দুটি স্রোতের মিলন ঘটেছিল। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে হারকোলেটের নকসায় একই নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আলোচ্য ধারাটি বিল ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

বিপ্রদাসের বর্ণনায় আছে—"খড়দহে শ্রীপাট করিয়া দণ্ডবত।" প্রসঙ্গতঃ

উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর নিত্যানন্দ, জাহ্নবী ও বসুধা দেবীকে বিবাহ করে খড়দহে শ্রীপাট স্থাপনপূর্বক বসবাস করেন। তা'হলে ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত "খড়দহে শ্রীপাট" বিপ্রদাসের এই উক্তি সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়।

'মনসাবিজয়' ও 'চণ্ডীমঙ্গলে' কলিকাতার উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন যে, কলিকাতার নামের অংশটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। এর বিরুদ্ধ প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্গত কলিকাতা পরগণা ও ডিহি কলিকাতার পত্তন ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই হয়েছিল।[২৯] তাছাড়া রেজাবিবির নামাঙ্কিত সমাধিফলক ও গুরু নানকের অত্র স্থানে আগমনের কাহিনীর সঙ্গে নবম শিখগুরু তেগবাহাদুর কর্তৃক বড়বাজারে বড় শিখসঙ্গতের প্রতিষ্ঠা হতে কলিকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।[৩০] 'কালিকা মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি কৃষ্ণরাম দাসের পিতামহ মদনমোহন নিমতা নামক পল্লীতে সুবর্ণবণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা কলিকাতার বহুবাজার পল্লীতে যে বসবাস করতেন একথার উল্লেখও কবি করে গেছেন। কৃষ্ণরাম কর্তৃক ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত কালিকামঙ্গল কাব্যে আছে—

"সপ্তগ্রাম সরকার কালকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি
সাবর্ণ চৌধুরী জায় সর্বলোক গুণগায়
পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী ॥"[৩১]

সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের 'ভাষা ভাগবত' গ্রন্থের ১ম স্কন্ধের রচনাকাল ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ এবং ঐ গ্রন্থে তাঁর বংশপরিচয় হল—"কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দের" পুত্র রামচন্দ্রের মধ্যমপুত্র সনাতন ঘোষাল। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠার পূর্বে গোবিন্দপুর গ্রামে শেঠ-বসাকরা বসবাস করত। তাছাড়া এই অঞ্চলের কোন গুরুত্ব না থাকলে জোব চার্ণকও সুতানটীতে বসবাসের জন্য পালিয়ে আসতেন না।

কলিকাতা অতিক্রম করার পর উভয় কবির বর্ণনায় কালিঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান ভাগীরথী খাতের পূর্বভাগে দু'টি প্রাচীন খাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দক্ষিণে মূল ধারা হতে নির্গত হয়ে কালীঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত এবং দ্বিতীয় ধারাটি খিদিরপুর হতে প্রবাহিত দক্ষিণমুখে ছত্রভোগের উদ্দেশ্যে খাত সৃষ্টি করেছিল। এই খাতটি জনশ্রুতিতে আদিগঙ্গা নামে পরিচিত। গঙ্গার অপর একটি ধারা ত্রিবেণী হতে নির্গত হয়ে হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 'Saugrall'-এর নিকটে বর্তমান ভাগীরথীর খাত ধরে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এই খাতটি সরস্বতী নদী নামে পরিচিত। আরও পূর্বে কানা দামোদরের খাতে সরস্বতীর

প্রবাহপথ ছিল। গঙ্গা বা ভাগীরথীর খাত ও সরস্বতীর খাত ছিল পৃথক অথবা কোন ক্ষীণ স্রোতপথের দ্বারা নদী দুটি যুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতকে অর্থাৎ প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে ওলন্দাজগণ ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণ হতে সাঁকরাইল পর্যন্ত শুষ্ক খাতটি সংস্কার করে ভাগীরথীর প্রবাহপথকে প্রশস্ততর করায়[৩২] উক্ত কার্যের আংশিক ফলস্বরূপ আদিগঙ্গার ধারাকে দ্রুত লুপ্ত খাতে পরিণত করতে ত্বরান্বিত করে। আবার অনেকের মতে, নবাব আলিবর্দীর আমলে চড়াটি কাটানো হয়েছিল। বেতড়ের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে আদিগঙ্গার খিদিরপুরের খাতটি প্রবল ছিল। মুকুন্দরাম বালিঘাট বা বালিঘাটার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ ভাগীরথী-সরস্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে খনিত চড়ার কোন একটি অংশ বালিঘাটা নামে পরিচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, নিম্ন ভাগীরথীর খাত নামে পরিচিত অংশটি হল প্রাচীন সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত ভাগীরথীর জলধারা।

বিপ্রদাসের প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে লক্ষ্মণসেনের ২য় রাজ্যাঙ্কে (১১৮০ খ্রীস্টাব্দ) রচিত গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে—'যথাঃ শ্রীবর্ধমানভুক্তনন্তঃ পাতি—পশ্চিম খাটিকায়াং বেতড্ড—চতুরকে পূর্বে জাহ্নবী [স্র] বন্তী অর্ধসীমা'। শাসন-ভুক্ত গ্রামের—"উত্তরে ধর্মনগর সীমা"।[৩৩] ধর্মনগর হল বারুইপুর থানার অধীনস্থ বর্তমান ধামনগর। ধামনগরের দক্ষিণে বিদ্যারশাসন গ্রাম এবং এর পূর্বে জাহ্নবী প্রবাহিত। গোবিন্দপুর তাম্রশাসন হতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, দশম-একাদশ শতকে গঙ্গার জলধারা আদিগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হত এবং এই অঞ্চলটি বর্ধমানভুক্তির অধীনস্থ হওয়ায় সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে সরস্বতীর (বর্তমান ভাগীরথীর) ধারা ক্ষীণ ছিল। এ প্রসঙ্গে কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেছেন[৩৪] যে, আদিগঙ্গার পশ্চিম তীর অঞ্চল ছিল বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত এবং পূর্বতীর ও লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসনে উল্লেখিত খাড়ি অঞ্চল ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীনস্থ। ঐ সময়ে সরস্বতীর জলধারা হ্রাস পাওয়ার জন্য চব্বিশ-পরগণা জেলার পশ্চিমাঞ্চল, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা বর্ধমানভুক্তির অধীনস্থ ছিল এবং একই কারণে এতদঞ্চলকে দক্ষিণ-রাঢ় জনপদের অন্তর্গত ভূখণ্ড হিসাবে ধরা যেতে পারে। ২৪-পরগণা জেলার মাইনগরের দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের প্রাচীন বসতি তার পরোক্ষ প্রমাণ।

মাইনগর পার হয়ে নাচনগাছা, বারাসত (দক্ষিণ), ছত্রভোগ, হাথিয়াগড়, সঙ্কেতমাধব অতিক্রম করে পশ্চিমমুখে নদীর প্রবাহপথ কাকদ্বীপ অঞ্চলে দুর্জয় মগরা বেয়ে সাগরসঙ্গমে প্রবেশ করেছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মগর বা মগরা কোন স্থান-নাম নয়। আভিধানিক অর্থে গভীর জলাশয়কে মগর বা মগরা বলা হয়। নদী যে স্থানে সাগর বা অন্য কোন বড় নদীতে মিশেছে, সেই সকল গভীর স্থানকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা মগরা নামে অভিহিত করেছেন।

মুকুন্দরাম ও বিপ্রদাস উভয়েই মগরা অতিক্রম করে পুরী হয়ে দক্ষিণ পাটন যাত্রার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, ঐ সময়ে সম্ভবতঃ গভীর সমুদ্রের পথ পরিত্যাগ করে অগভীর সমুদ্রপথে বা তীরভূমির নিকট দিয়ে পালতোলা নৌকায় সিংহল দ্বীপে যাওয়ার রীতি ছিল। বিপ্রদাসের বর্ণনায় ওড়িশা অঞ্চলের অধিবাসীগণের এক উপজাতি গোষ্ঠীর অদ্ভুত আচরণের বিষয় জানা যায় :—

"কিরাতের দেশ দিয়া চাঁদো রাজা জায়
জীয়ন্ত মানুষ ধরি তারা সভে খায়।
অশ্ব মুখ গজ মুখ বাহিল পাটন
এক ঠেঙ্গিয়ার দেশে করিল গমন।"

বিপ্রদাসের বহু পূর্বে 'পেরিপ্লাস মরিস ইরিত্রিয়া' গ্রন্থের নাবিকের বর্ণনায় জানা যে, দর্শার্ণ জনপদে (কলিঙ্গ হতে মধ্যভারত পর্যন্ত) নরমাংসভোজী এক গোষ্ঠীর মুখমণ্ডল ছিল অশ্বমুণ্ডের ন্যায়।[৩৫]

মনসাবিজয় ও চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে অজয় ও গঙ্গা-ভাগীরথীর ধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গের বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি বাদ দিলে গ্রাম-বাংলার একদা খ্যাত স্থানসমূহ বর্তমান মানচিত্রে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় অধুনালুপ্ত বা বিস্মৃত। সে কারণে মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের অবস্থিতির পর্যালোচনা করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। উজানীর অন্তর্গত ভ্রমরাদহ হতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত কবিদ্বয়ের উল্লিখিত স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

* ভ্রমরাদহ (চ): মঙ্গলকোট, বর্ধমান—অজয়-কুনুর সঙ্গমস্থলে উজানীর শ্মশানভূমির দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

উজানী (ম. চ): মঙ্গলকোট, বর্ধমান—অজয় নদের দক্ষিণ ও কুনুরের পশ্চিমে বর্তমান কোগ্রাম (৫৮) লোকমুখে উজানী-কোগ্রাম নামে পরিচিত।

চাকদা (চ): এই নামে দু'টি গ্রাম আছে। মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ চাকদহ অপেক্ষা বীরভূম জেলার নানুর থানার চাকদহ গ্রামটির সঙ্গে যাত্রাপথের সামঞ্জস্য অধিক।

কুমারখালা (চ): বোলপুর, বীরভূম—বর্তমানে কুমিরা গ্রামটি সম্ভবতঃ অতীতের কুমারখালা বা কুমিরখালা।

হাড়িয়া (চ): পরিচয় অজ্ঞাত।

থানাঘাট (চ): মঙ্গলকোটের উত্তরে নূতনহাট এবং তার উত্তরে পুরাতন হাটে বাদশাহী সড়কটি অজয় নদ অতিক্রম করে গৌড় পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অতীতে সম্ভবতঃ এই স্থানে নদীর ঘাটে চৌকী ছিল, সে কারণে থানাঘাট নামে উল্লিখিত।

* বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত কাব্যের নাম ও তারপর স্থান পরিচিতির জন্য থানা ও জেলার উল্লেখ আছে।

মৌনা (চ) : পরিচয় অজ্ঞাত।

গড়পাড়া (চ) : বর্তমান নূতনহাটের উত্তরে অবস্থিত।

হুসনপুর (চ) : নানুর, বীরভূম—অজয়নদের পশ্চিম তীরে ও বর্ধমান জেলার কাঁকড়া গ্রামের বিপরীত তীরে অবস্থিত।

দৌলতপুর (চ) : পরিচয় অজ্ঞাত। মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশে দেউলিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দেউলিয়াকে গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

কাঁকনা (চ) : মঙ্গলকোট, বর্ধমান—অজয় নদের পূর্বতীরে বর্তমান কাঁকড়া (৮৪)।

খাকসা (চ) : মঙ্গলকোট, বর্ধমান—বর্তমান কেওরসা (৬০)।

গাঙ্গবাড়া (চ) : নানুর, বীরভূম—অজয় নদের পশ্চিমতীরে গঙ্গাদাড়া গ্রাম।

কুলীনপাডা (চ)—পরিচয় অজ্ঞাত।

কুণ্ডরপুর (চ) : মঙ্গলকোট, বর্ধমান—অজয় নদের পূর্বভাগে বর্তমান কোঁয়ারপুর (০৬)।

বাকুলে (চ) : মঙ্গলকোট, বর্ধমান—অজয়নদের পূর্বকূলে বর্তমান বাকুলিয়া গ্রাম (৮৩)।

বেলেড়া (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—অজয়ের উত্তর তীরে বিল্বনাথ শিবের নামানুসারে বর্তমান বিল্বেশ্বর গ্রাম (৭৫)।

চরকি (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—অজয়ের উত্তর তীরে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ, বন্যা কবলিত হওয়ায় আরও উত্তরে নুতন গ্রাম পত্তন হয়েছে (৭৬)।

অঙ্গারপুর (চ) : কাটোয়া, বর্ধমান—চরকির বিপরীত দিকে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে এবং কাটোয়া হতে ১০ কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত।

রসই (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—বিল্বেশ্বরের ২ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

সোনালিয়া (চ) : কাটোয়া, বর্ধমান—কাটোয়া শহরের পশ্চিমে ও অজয় নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বর্তমান স্থানয়া গ্রাম (১)।

নবগ্রাম (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত (৯৩)।

বাগুনকোলা (চ) : কাটোয়া, বর্ধমান—কাটোয়া শহরের সন্নিহিত পশ্চিমে বাইগণকোলা (১২১) গ্রামটি বৈষ্ণবদের নিকট পবিত্র স্থান।

সাকাই (ম. চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—কাটোয়ার বিপরীত দিকে অজয় নদের উত্তরতীরে শাঁকাই গ্রামে মুর্শিদকুলি খাঁ একটি গড় নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণেল কুটে এই দুর্গটি ধ্বংস করেন।

শিবা নদী (ম) : শাঁকাই—এর পশ্চিমে কাঁদড় খাল বা শিয়াল নালা অজয় নদে মিলিত হয়েছে।

উধনপুর (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে কাটোয়া হতে ৫ কি:মি: উত্তরে এই গ্রামে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট।

নৈহাটী (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—উদ্ধারণপুরের এক কি:মি: উত্তরে প্রাচীন নবহট্ট। অনেক গবেষক ভুলক্রমে উত্তর চব্বিশ-পরগণা জেলার নৈহাটী ও আলোচ্য স্থানকে এক ও অভিন্ন মনে করেছেন।

ইন্দ্রাণী (ম. চ) : সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত একটি পরগণা, যা বর্তমান কাটোয়া থানার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যবর্তী স্থানে ইন্দ্রাণী শহরের অবস্থিতির কথা জানা যায়।

কাটোয়া (ম) : ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত কাটোয়া বা কণ্টকনগর বা চম্পকনগরে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও বাণিজ্য-কেন্দ্রিক স্থান।

মণ্ডলঘাট (চ) : কাটোয়া শহরের দক্ষিণে পানুহাট ও একাইহাটের মধ্যবর্তী স্থলে ভাগীরথীর তীরে মণ্ডলঘাট অবস্থিত ছিল।

নলিতপুর (চ) : কেতুগ্রাম, বর্ধমান—ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে উদ্ধারণপুরের নিকটস্থ বর্তমান নলিয়াপুর (১১৪) অবস্থিত।

ভাণ্ডসিংহের ঘাট (চ) : কাটোয়া, বর্ধমান—দাঁইহাট শহরের পূর্বপ্রান্তে ভৃগু বা ভাণ্ডসিংহ, অপভ্রংশে বর্তমানে ভাউ সিং নামে পরিচিত। ১৯২৩ সম্বৎ বা ১৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে খোদিত একটি জৈন প্রতিমালিপিতে (নৌপজী বা নবপদ) ভৃগুসিংহ নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে। এককালে এই স্থানটি গঞ্জ বা ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

মেটেরি (চ) : কালীগঞ্জ, নদীয়া—দাঁইহাটের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভাগীরথীর উত্তরতীরে মাটিয়ারী রামসীতা মন্দির ও কাঁসা-পিতলের বাসন নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ।

বেলনপুর (চ) : পূর্বস্থলী, বর্ধমান—সম্ভবতঃ বর্তমান বেলেরহাট গ্রামের পূর্ব নাম।

চণ্ডীগাছা (চ) : পূর্বস্থলী থানার মেড়তলার পশ্চিমে বর্তমান চণ্ডীপুর হতে পারে।

পূর্বস্থলী (চ) : ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে পূবধূলি বা পূর্বধূল্যা নামক প্রাচীন গ্রামটি নবদ্বীপের ৮ কি:মি: উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সন্নিহিত চুপি গ্রামে অক্ষয় কুমার দত্ত ও কবি সত্যেন দত্তের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল।

নদীয়া বা নবদ্বীপ (ম. চ) : নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপ শহরটি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এই স্থান নদীর পূর্বতীরেই ছিল। অন্নদামঙ্গলেও এর প্রমাণ মেলে—

'রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ।'

নবদ্বীপ শহর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, ভারতচন্দ্রের রচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গা নদী অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত হত।

হরিনাদি (চ): শান্তিপুর, নদীয়া—শান্তিপুরের ৬ কি:মি: দূরে অবস্থিত হরিনদী গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের কাহিনী জানা যায় 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে। একটি প্রচীন স্রোতপথে ভাগীরথী পার হয়ে কালনার (অম্বুয়া) সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

অম্বুয়া (ম. চ): অম্বিকা-কালনা মধ্যযুগে অম্বুয়ামুলুক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীচৈতন্য-গৌরীদাসের সাক্ষাৎকার, বরবাকশাহ ও হোসেন শাহের মসজিদ, মোগল আমলের গড় ও বর্ধমান রাজের নির্মিত অসংখ্য মন্দির ও সমাজবাড়ি কালনার পুরাকীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

শান্তিপুর (ম. চ): কালনার বিপরীত তীরে অবস্থিত শান্তিপুর (জেলা নদীয়া)। শ্রীঅদ্বৈত্যাচার্যের আবাসস্থল ও বৈষ্ণবগণের নিকট পবিত্র স্থান।

উলা (চ): রানাঘাট, নদীয়া—রানাঘাটের ১০ কি:মি: উত্তরে বীরনগরের প্রাচীন নাম। দেবী উলাইচণ্ডী ও মুস্তাফী বংশীয়দের কয়েকটি সুন্দর 'টেরাকোটা' শোভিত মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ।

খিসমা (চ): কিসিমা বা খিসমা নামে কোন গ্রামের পরিচয় জানা যায় না। তবে কিসিমা, কিসমতের অপভ্রংশ হতে পারে।

গুপ্তিপাড়া (ম. চ): বলাগড, হুগলী—ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে এবং ব্যাণ্ডেল হতে ৩৫ কি: মি: উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান।

মহেশপুর (চ): কালনা, বর্ধমান—বেহুলা নদীর প্রাচীন খাতের নিকট অবস্থিত মহেশ্বরপুর গ্রাম। রেভা: লঙের বিবরণীতে জানা যায় কালনার পশ্চিমে গঙ্গার একটি প্রাচীন প্রবাহপথ ছিল।

ফুলিয়া (ম. চ): শান্তিপুর, নদীয়া—ভাগীরথীর পূর্বভাগে রানাঘাট হতে ১৪ কি:মি: দূরে এবং কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান ও হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান।

হাতিকান্দা (ম): বলাগড, হুগলী—জীরাটের ২ কি:মি: দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্ভুক্ত হাতিকাঁদা পরগণা (আইন ২।১৫৪) এই অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

কুলিয়া (চ): কল্যাণী, নদীয়া—কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হতে ৫ কি:মি: উত্তর-পূর্বে শ্রীপাট কুলিয়া অবস্থিত। আলোচ্য কুলিয়াকে অপরাধ ভঞ্জনের পাটরূপে আখ্যা দেওয়া হলেও জয়ানন্দের রচনায় অপরাধ ভঞ্জনের পাট নামে ভূষিত স্থানটি যে নবদ্বীপের নিকট বর্তমান সাতকুলিয়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হালিশহর (চ) : বীজপুর, ২৪ পরগণা—ত্রিবেণীর বিপরীত তীরে প্রাচীন কুমারহট্ট গ্রামখানি হালিশহর নামে পরিচিত। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে, হাবেলী-শহর পরগণার সদর কার্যালয়রূপে স্থানটি হালিশহর নামে পরিচিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু, ঈশ্বরপুরী ও সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমির জন্য এই স্থানটি বিখ্যাত।

ত্রিবেণী (ম. চ) : মগরা, হুগলী—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হতে ৮ কি:মি: উত্তরে এই স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে মুক্তবেণী তীর্থস্থানরূপে প্রসিদ্ধ।

সপ্তগ্রাম (ম: চ) : মগরা, হুগলী—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হতে ৩ কি:মি: উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী নদীর লুপ্ত খাতের তীরে বর্তমান আদিসপ্তগ্রাম।

হুগলী (ম) : ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

ভাটপাড়া (ম) : জগদ্দল, ২৪ পরগণা—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর টোল, বাসস্থান ও মন্দিরের জন্য ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধি বহুকালের।

গরিফা (চ) : নৈহাটী, ২৪ পরগণা—নৈহাটী শহরের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন গৌরী পুরে, গৌরীয় শ্রীপাট স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান গৌরীয়পাট নামে অভিহিত হত এবং কালক্রমে অপভ্রংশে গরিফা নামে পরিচিতি লাভ করে।

বোরো (ম) : ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে চুচুড়া ও চন্দননগর শহরাঞ্চলভুক্ত হওয়ায় পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই।

পাইকপাড়া (ম) : চন্দননগর, হুগলী—চার্লস জোসেফের মানচিত্রে (প্লেট নং ৫)ভাগীরথীর পশ্চিমে তেলিনীপাড়া ও গোন্দলপাড়ার মধ্যবর্তীস্থানে পাইক পাড়ার অবস্থিতি ছিল।

কাঁকিনাড়া (ম) : জগদ্দল, ২৪ পরগণা—কলিকাতা হতে ৩৫ কি:মি: উত্তরে ভাগীরথীর পূর্বকূলে ভাটপাড়ার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন স্থান।

মূলাজোড় (ম) : জগদ্দল, ২৪ পরগণা—শ্যামনগর ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত মূলাজোড় গ্রাম নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক রচনা করেন।

গারুলিয়া (ম) : নওপাড়া, ২৪ পরগণা—শ্যামনগর ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীন স্থান।

গোন্দলপাড়া (চ) : চন্দননগর শহরের দক্ষিণাংশে গোন্দলপাড়া নামক পল্লীর আজও অস্তিত্ব আছে।

জগদ্দল (চ) : ভাটপাড়া শহরের অন্তর্ভুক্ত।

দেগঙ্গা (ম) : ভাগীরথী তীর হতে প্রায় ৩০ কি:মি: পূর্বে উত্তর ২৪-পরগণা জেলার দেগঙ্গার সঙ্গে জলপথ যাত্রার সামঞ্জস্য থাকে না। 'দিগ্বিজয় প্রকাশে'

বর্ণিত আছে যে, কুলপাল দীর্ঘগঙ্গার (সেওড়াফুলি দেগঙ্গায়) ও তৎপুত্র অহীপাল মাহেশের রাজা হয়েছিলেন। চার্লস জোসেফ-এর মানচিত্রে (প্লেট নং-৫) বৈদ্যবাটির সন্নিহিত পশ্চিমে DHEE GANGO-র অবস্থিতি দেখা যায়।

ন পাড়া (চ): ২৪-পরগণা—ভাগীরথীর পূর্বতীরে নওপাড়া থানার সদর কার্যালয়।

ইছাপুর (ম. চ): গাইঘাটা, ২৪ পরগণা—ভাগীরথীর পূর্বতীরে ও চাঁপদানীর বিপরীত দিকে ইছাপুর (৩৬), ষোড়শ শতকে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ভদ্রেশ্বর (ম): হুগলী-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত, ভদ্রেশ্বর শিবের নামানুসারে এটি একটি প্রাচীন স্থান।

চাঁপদানি (ম): চন্দননগর শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়েও চাঁপদানি পল্লীটি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

নিমাইতীর্থ (ম. চ): শ্রীরামপুর, হুগলী—বর্তমান নাম বৈদ্যবাটি। চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনায় জানা যায়, এই স্থানে নিম গাছে জবা ফুল (ওড় ফুল) ফুটেছিল।

বাঁকিবাজার (ম): বৈদ্যবাটির বিপরীত তীরে পলতা শহরের অন্তর্ভুক্ত বাঁকিবাজারে জার্মান নাবিকদের একটি ঘাঁটি ছিল।

চানক (ম): ব্যারাকপুরের প্রাচীন নাম। ব্যারাকপুর শহরের মধ্যে চানক পল্লীর অস্তিত্ব এখনও আছে।

বুড়নিয়া (ম): সরকার সপ্তগ্রামের অধীনস্থ 'বুড়ন পরগণা' হলে এটি সাতক্ষীরার নিকটে অবস্থিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি আলোচ্য জলপথ যাত্রার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ। আবার 'বুড়নিয়া দেশ' শব্দের অর্থ হল, পলি সঞ্চয়ের ফলে যে ভূখণ্ড ধীরে ধীরে গড়ে উঠে।[৩৭] অতএব এ অর্থে ২৪-পরগণা, হুগলী অঞ্চলের নিম্নাংশকে বুড়নিয়া দেশ বলা যেতে পারে।

আকনা (ম): শ্রীরামপুর শহরাঞ্চলভুক্ত একটি প্রাচীন স্থান।

মাহেশ (ম. চ): শ্রীরামপুর শহরাঞ্চলভুক্ত এই প্রাচীন পল্লী দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপল্লাই-এর শ্রীপাট ও জগন্নাথদেবের রথযাত্রার জন্য বিখ্যাত।

খড়দহ (ম. চ): কলিকাতার ২০ কিঃমিঃ উত্তরে এই প্রাচীন পল্লীতে নিত্যানন্দের শ্রীপাট ও তৎপুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের বিশেষ খ্যাতি আছে।

রিসিড়া (ম): হুগলী—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রাচীন ঋষিবাটি গ্রাম।

কোন্নগর (ম. চ): উত্তরপাড়া, হুগলী—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ঋষি অরবিন্দের পৈত্রিক বাসস্থান, অধুনালুপ্ত দিনেমার কোম্পানীর ডক, দ্বাদশ-শিবমন্দির ও আনন্দময়ী কালী বিগ্রহের জন্য এই স্থানের বিশেষ খ্যাতি আছে। ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে কোঙরনগরের উল্লেখ আছে।

সুখচর (ম): খড়দহ, ২৪ পরগণা—আগড়পাড়ার নিকটবর্তী একটি প্রাচীন পল্লী।

কুচিনান (চ): পরিচয় অজ্ঞাত; তবে বেলেঘাটার নিকট কুচিনান পল্লীর অস্তিত্ব জানা যায়, যা আলোচ্য ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

আড়িয়াদহ (ম): দক্ষিণেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত এই প্রাচীন পল্লীতে দেবী আদ্যাশক্তির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

ঘুসুড়ি (ম): বালী, হাওড়া—বালীর দাক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন পল্লী। ঘুসুড়ির ভোটবাগানে হেস্টিংসের আমলে তিব্বতীয় ও দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চিত্রপুর (ম. চ): বাগবাজার খালের উত্তরাংশ চিত্রপুর বা চিৎপুর পল্লীতে চিত্তেশ্বর প্রসাদের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের জন্য খ্যাত ছিল।

সালিখা (চ): হাওড়া শহর পত্তনের পূর্বে সালকিয়া বা সালিখা ছিল একটি বিখ্যাত গঞ্জ, নদী-বন্দর ও যোগাযোগ কেন্দ্র।

কলিকাতা (ম. চ): আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত কলকাতা মহলের কার্যালয় ডিহি-কলকাতাই বর্তমান প্রাসাদ নগরী, তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ হতে এই শহর সুবা বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল।

বেতড় (ম. চ): শিবপুর, হাওড়া—ভাগীরথীর উত্তর তীরে ও শিবপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন, সিজার ফ্রেডারিকের বিবরণ ও দেবী বেতাইচণ্ডী বেতড়কে বিখ্যাত করে রেখেছে।

বালীঘাটা (চ): বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম ও বেতড়ের মধ্যবর্তী অংশে একটা চড়ার অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খিদিরপুরের দক্ষিণে চড়া সংলগ্ন ভাগীরথীর তীরে কোন স্থান বালিঘাট নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে এই চড়া কাটানোর ফলে স্থানটি লুপ্ত হয়েছে।

কালিঘাট (ম. চ): কলিকাতা শহরাঞ্চলভুক্ত আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত কালিঘাট পল্লী কালী বিগ্রহ ও নকুলেশ্বর ভৈরবের জন্য বিখ্যাত।

ধনগু (ম. চ): ডাঃ দেবাশিস বসু মনে করেন, রেসকোর্সের পশ্চিমাঞ্চল ধনগু নামে পরিচিত ছিল। বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামের প্রকাশিত গ্রন্থে 'ধনগু'-এর উল্লেখ আছে। যাত্রাপথের ভৌগোলিক ক্রম অনুসারে রেসকোর্সের নিকটস্থ স্থান ধরলে সঙ্গতি রক্ষা হয়।

হিমাই (চ): সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণে আছে—"হিমাঞি বামেতে রহে হিজুলির পথ"; কিন্তু বসুমতী সংস্করণে পাওয়া যায়—"ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজুলির পথ।" হিমাই-এর পরিচিতি অজ্ঞাত।

ধনস্থান (ম): বারুইপুর, ২৪ পরগণা—সম্ভবতঃ বর্তমান ধনবেড়িয়া (৫০)।

কোদালিয়া (ম): বারুইপুর, ২৪ পরগণা—মালঞ্চ গ্রামের ২ কিঃমিঃ উত্তরে এবং আদিগঙ্গার খাতের পূর্বতীরে অবস্থিত।

বারুইপুর (ম): আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত বারুইপুর-আটিসরা বৈষ্ণবদের নিকট পবিত্র স্থান।

বৈষ্ণবঘাটা (চ): গড়িয়ার নিকটে টালি নালার উত্তরস্থ পল্লী।

মাইনগর (চ): বারুইপুর, ২৪ পরগণা—কলিকাতা হতে ২০ কিঃমিঃ দূরে মল্লিকপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে মাইনগরের অবস্থিতি। এই গ্রাম মালাধর বসু হতে সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত দক্ষিণ রাঢ়ী বসুজ কায়স্থগণের আদি বাসস্থান।

নাচনগাছা (চ): জয়নগর, ২৪ পরগণা—বর্তমান সূর্যপুরের প্রাচীন নাম।

বারাসত (চ): জয়নগর, ২৪ পরগণা—এই গ্রামখানি দক্ষিণ বারাসত নামে পরিচিত। দক্ষিণ বারাসত ও সংলগ্ন সরিষাদহ গ্রামে আদিগঙ্গার লুপ্তখাতে বহু প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছত্রভোগ (ম. চ): মথুরাপুর, ২৪ পরগণা—কলিকাতা হতে ৫৫ কিঃমিঃ দূরে মথুরাপুর রোড রেলষ্টেশনের নিকট চক্রতীর্থ বা ছত্রভোগ অবস্থিত। পুরী গমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব চক্রতীর্থে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করেন।

হেতেগড (ম. চ): মথুরাপুর, ২৪ পরগণা—লক্ষ্মীকান্তপুরের নিকট জটার দেউল এবং জটার দেউলের নিকটে হেতেগড বা হাথিয়াগড়ে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে অনুমান করা হয়। হাথিয়াগড় ও গোড়াই গাজী সম্পর্কে বহু লোক-কাহিনী প্রচলিত আছে।

সঙ্কেতমাধব (ম. চ): মথুরাপুর, ২৪ পরগণা—লক্ষ্মীকান্তপুরের নিকট মাধবপুর গ্রামে সঙ্কেতমাধব নামে কষ্টিপাথরে নির্মিত এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আছে এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও সঙ্কেতমাধবের উল্লেখ আছে।

সঙ্গম (ম. চ): সাগরদ্বীপের উত্তরাংশে আদিগঙ্গা যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছিল। মঙ্গলকাব্যের বিবরণ হতে জানা যায় যে, মাধবপুর হতে পশ্চিমমুখী একটি ধারা কাকদ্বীপের নিকট মগরার সৃষ্টি করেছিল বা কাকদ্বীপের নিকটবর্তী মোহনাঞ্চল মগরা নামে পরিচিত ছিল।

হিজুলী (চ): খেজুরী, মেদিনীপুর—রসুলপুর নদের মোহনায় অবস্থিত একটি সামুদ্রিক বন্দর। রেনেলের মানচিত্রে Injellee নদীর তীরে Injellee-র অবস্থিতি।

মেদিনীমল্ল (চ): ২৪-পরগণা জেলার একটি প্রাচীন মহল।

বিরখানা (চ): সম্ভবতঃ নামখানা অঞ্চল।

* ম—মনসাবিজয়—বিপ্রদাস পিপলাই।
চ—চণ্ডীমঙ্গল—মুকুন্দ চক্রবর্তী।

ধুসদত্তের বাণিজ্যযাত্রা :

বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামকে অনুসরণ করে মধ্যযুগের অপর একজন কবি মুকুন্দ মিশ্র জলযাত্রার বর্ণনা করেছেন তাঁর "বাসুলীমঙ্গল" কাব্যে। বর্ধমানে বণিক বসতির পরিচয় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে—

"বর্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধুসদত্ত।
সর্ব্বজনে গায় যার কুলের মহত্ত্ব।"

মুকুন্দ মিশ্রের আখ্যানভাগের নায়কের নাম ধুসদত্ত এবং তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমানে। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বর্ধমান শহরটি ছিল লাকুড়ডিহি-কাঞ্চননগরকে কেন্দ্র করে। দামোদর ও বাঁকা নদীর বন্যার ফলে জনবসতি ক্রমশঃ সরে এসেছে এবং মোগল আমলে নূতনগঞ্জ, রাধাগঞ্জ ও পুরাতনচক এলাকা ছিল অত্যন্ত জাঁক-জমক পূর্ণ। আরও পরে ক্রমশঃ পূর্বে শহর পত্তন ও বিস্তার লাভ করায় পুরাতন অঞ্চল ক্রমশঃ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। প্রাচীন অঞ্চলই ছিল আদি বর্ধমান শহর, যেখানে বর্ধমানের রাজারা তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র বর্ণিত জলপথযাত্রা প্রসঙ্গে জানা যায় যে, ঐ সময়ে আলোচ্য জলপথটি ছিল বর্তমান দামোদর, কানাদামোদর, দ্বারকেশ্বর নদের নিম্নাংশের প্রবাহপথ ধরে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত। দামোদরের প্রবল জলরাশি ভেদ করে বাণিজ্যতরণীসমূহ যাতায়াত করত। তবে যাত্রাপথের নিম্ন পর্যায় সম্পর্কে কিছু কৌতূহল থেকে যায়। দামোদরের জলপ্রবাহ নাগ্রিকুলির পর অকস্মাৎ ডানদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে রূপনারায়ণ বা দ্বারকেশ্বরের তীরে মানকৌর হয়ে তাম্রলিপ্ত পেরিয়ে সাগর সঙ্গমে মিলিত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, অথবা কবি ইচ্ছাকৃতভাবে তাম্রলিপ্তের ন্যায় বিখ্যাত স্থানকে তাঁর বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এভাবে উল্লেখ করেছেন। ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে পাওয়া যায়, কাঁসাই নদী Tamboli-র উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে এবং বর্ধমান হতে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ সৃষ্টি করে Tamboli-র পশ্চিমে (সম্ভবতঃ নারায়ণগড়) কাঁসাই-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে পাত্রঘাটা বা পাথরঘাটা নদী নামে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছিল। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, কাঁসাই নদীর উত্তরমুখী খাতটি মানকৌর-এর ৮ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদে মিলিত হয়েছে এবং দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে ২-৩টি গৌণ খাত মারফৎ যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ আরও ২০০/২৫০ বছর পূর্বে গৌণখাতগুলিও প্রবল ছিল।

'বাসুলীমঙ্গলে' বর্ণিত ধুসদত্ত ও গুণদত্ত ছিলেন বণিক সমাজের প্রতিভূ ব্যক্তি এবং তাঁদের বসবাসের স্থান ছিল বর্তমান কাঞ্চননগরে, যা বর্ধমান নামে পরিচিত ছিল। কাঞ্চননগরের সন্নিকটে (সম্ভবতঃ কাঠগোলার ঘাটে) দামোদরের তীরে অবস্থিত ছিল বর্ধমানের নদী-বন্দরটি। বর্ধমান অতিক্রম করে বড়সউল গ্রাম, যা শক্তিগড় রেল ষ্টেশনে হতে ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণে বর্তমানে বড়শুল নামে পরিচিত।

বড়শুলের পর দামোদরের দক্ষিণ তীরে জামালপুর থানার অধীনস্থ জামদহ বা জামদা গ্রাম। এরপর দেবখাল ও দামোদর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে বেউরগ্রাম, যার বর্তমান পরিচিতি হল জামালপুর থানার অধীনস্থ বেড়ুগ্রাম। বেড়ুগ্রামের ৩ কিঃমিঃ দূরে জামালপুর থানার সেলিমাবাদে কানা দামোদর নির্গত হয়ে বা ঐ পথে প্রাচীন দামোদর হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। সেলিমাবাদের ২ কিঃমিঃ পূর্বে কানানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত জামালপুর থানার হিরণ্যগ্রাম অতিক্রম করার পর সওদাগরদের বাণিজ্য তরণী ক্রমশঃ দক্ষিণে চলতে থাকে এবং আলোচ্য থানার অধীনস্থ গোপীকান্তপুর মৌজায় নররক্তপিপাসু রঙ্কিণীদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র রঙ্কিণী মহুলায় (রঙ্কিণী মহল) উপস্থিত হয়। শক্তি দেবী যথায় ক্ষেত্রদেবী, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শিবের অধিষ্ঠান বাঞ্চনীয় এবং বণিকদের আরাধ্য দেবতা শিবকে পূজা করে বাণিজ্যবহরটি জাড়গ্রামের (চকদিঘির দক্ষিণে) দিকে এগিয়ে যায়। জাড়গ্রামের প্রসিদ্ধি বহুকাল ধরে চলে আসছে কালুরায় নামে বিখ্যাত ধর্মঠাকুরের জন্য। হুগলী জেলার দেখীড় গ্রাম হতে নিয়ে এসে কালুরায়কে জাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। স্থানীয় একটি গ্রাম্য ছড়ায় কালুরায়কে নিয়ে জাড়গ্রাম ও দেখীড়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়েছে—

'জাড়গ্রামের কালুরায় দিখীড়েতে বাড়ী।
জামাজোড়া হাঁসাঘোড়া উত্তম পাগড়ী॥"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, জামালপুর থানার উত্তরাংশেই কানানদী ও কানাদামোদর পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় কানা দামোদরের খাতটি প্রবল আকার ধারণ করে এবং ঐ খাত দামোদর নামে পরিচিত ছিল।

নদীপ্রবাহ বর্ধমান জেলার শেষ সীমা মাধবপুর গ্রাম পার হয়ে হুগলী জেলার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বাসুলীমঙ্গল বর্ণিত দশঘরা গ্রামকে বামে রেখে দক্ষিণে প্রবাহপথের সৃষ্টি করেছিল। দশঘরা একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে খাঞ্জা খাঁ নামক এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বর্ধমান জেলার কোটশিমূল ও হুগলী জেলার দশঘরা অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে নিজের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। শোনা যায়, মোগলযুগে দশঘরায় দেশীয় পদ্ধতিতে কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধি ছিল। এখান হতে নদীপথে বৈদ্যপুর যাওয়া যায়। বৈদ্যপুরের অবস্থিতি হল, তারকেশ্বরের সন্নিহিত পূর্বে এবং কানাদামোদরের পশ্চিমে। তেঘরায় বণিককুলের উল্লেখ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে।

তেঘরা পার হয়ে হরিপাল থানার অধীনস্থ চণ্ডীপুরকে বামে রেখে আলোচ্য থানার দ্বীপা ও দ্বারহাটার মধ্যভাগে প্রবাহিত হয়ে নদীপথে জাঙ্গীপাড়া থানার সদর কার্যালয় জাঙ্গীপাড়া গ্রামে যাওয়া যেত। জাঙ্গীপাড়ার অবস্থিতি হল নদীর দক্ষিণ তীরে। জাঙ্গীপাড়ার কয়েক কিঃমিঃ পূর্বে কানানদীর একটি শাখা কৌশিকী বা ডাকাতে নদী নামে ডিঙ্গলহাটি গ্রামের উত্তরে কানা দামোদরের সঙ্গে

মিশেছে। কবি বর্ণিত নদীর বাম তীরে ডিঙ্গলহাটি এবং তার দক্ষিণে টাছয়া (চেচুয়া) গ্রাম অবস্থিত এবং আরও দক্ষিণে হুগলী জেলার 'বাঘাণ্ডা' গ্রামকে পূর্ব-ভাগে রেখে হাওড়া জেলায় কানা দামোদর প্রবাহিত ছিল। বাঘাণ্ডা অতিক্রম করে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীনস্থ নাঞ্চিকুলিকে (বর্তমান নাইকুলিহাট) পশ্চিমে রেখে দক্ষিণমুখী প্রবাহকে নিয়ে কবি বিভ্রান্ত হয়েছেন। কবির ভাষায়—

"ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ"

কিন্তু দেবনদ ঐ অঞ্চল অতিক্রম করার পর দেখা গেল—

"আকাশ পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর।
শুনিয়া জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির॥
কর্ণধার বলে ভাই শুন ধূসদত্ত।
ইহার অধিক আছে জলদুর্গ পথ"॥

নদীখাতটি নাইকুলি হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের নিকট দক্ষিণ-পূর্বমুখে সিজবেড়িয়া বা উলুবেড়িয়ার কাছে ভাগীরথীতে মিশেছিল। কবি প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে যাত্রাপথে যোগ করাতে এরূপ বিভ্রান্তি ঘটেছে। অথচ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বহু পূর্বেই তাম্রলিপ্ত তার নৌবাণিজ্যের প্রসিদ্ধি হতে বঞ্চিত ছিল।

অতীতে হাওড়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ বৃহৎ জলার অস্তিত্ব ছিল এবং ঐ জলাগুলিকে অবলম্বন করে বর্তমান দামোদর, মাদারিয়া খাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীপথের সৃষ্টি হয়েছিল। দামোদরের প্রবাহের ফলে পলি সঞ্চয়জনিত কারণে হাওড়া জেলার ভূমিভাগ ক্রমশঃ উঁচু হলেও কয়েকটি জলা তাদের পূর্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। মনে হয় এরূপ একটি জলাকে জলদুর্গ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। হাওড়া জেলাবাসী তারাপদ সাঁতরার মতে অতীতে নাইকুলি হতে বেগুয়ার বিল হয়ে দাদখানি দহের মধ্য দিয়ে কানা দামোদরের একটি ধারার সঙ্গে রূপনারায়ণ নদের যোগাযোগ ছিল। মুকুন্দ মিশ্র সম্ভবতঃ দাদখানি দহকেই 'জলদুর্গ' নামে উল্লেখ করেছেন। জলদুর্গ অতিক্রম করে রূপনারায়ণ নদের পূর্ব-তীরে আমতা থানার যমখানা (বর্তমান ঝামটে) ও বাগনান থানার মানকৌর (মানকুর) অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তে পৌঁছে নাবিক-লস্করগণ বিশ্রাম গ্রহণ করতো।

তাম্রলিপ্ত পার হয়ে রূপনারায়ণ ও ভাগীরথী সঙ্গমস্থলের পর ভাগীরথীর গভীর খাত মগর বা মগরা নামে মঙ্গলকাব্যের কবিদের নিকট পরিচিত। মগরের অনতিদূরে গঙ্গাসাগর বা সাগরদ্বীপ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হতে স্বীয় মহিমা ও খ্যাতি বহন করে চলেছে। সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে মাধবপুরের সঙ্কেতমাধব ও ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিবের কোন সম্পর্ক না পাওয়া গেলেও আদিগঙ্গার তীরে

সঙ্কেতমাধব নামক বিষ্ণু-বিগ্রহ ও চক্রতীর্থের অম্বুলিঙ্গ শিবের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি থাকায় বহুদূর হতে ঐ দেবতাদ্বয়ের স্মরণে প্রণতি জানিয়ে সমুদ্রপথে সিংহল বা দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করাই ছিল ঐ যুগের ধর্মবিশ্বাস তথা সহজাত সংস্কার।৩৮

বেহুলার ভেলা যাত্রা ঃ

সপ্তদশ শতকে বর্ধমানের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে অপর একটি জলপথের বর্ণনা আছে। মনসামঙ্গলে বর্ণিত জলপথটির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঐ সময়ে দামোদরের শাখানদীরূপে বাঁকা বা বক্কেশ্বরী পূর্বমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর মেমারী থানায় বাঁকা হতে অপর একটি শাখা গাঙ্গুর নামে মেমারী ও কালনা থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। দামোদরের অপর একটি শাখা বেহুলা নামে পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় গাঙ্গুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিবেণীর উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছিল। আলোচ্য খাতগুলি অর্থাৎ গাঙ্গুর ও বেহুলার খাত স্থানে স্থানে লুপ্ত ও শুষ্ক হলেও ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রবল বর্ষণের সময় দামোদরের অধিকাংশ জলধারা এই পথেই নিষ্কাসিত হয়েছিল।

কবি ক্ষেমানন্দের জলযাত্রা বর্ণনা নিছক কবিকল্পিত নয় এবং আলোচ্য অধ্যায়ে দামোদর, বাঁকা, বেহুলা, গাঙ্গুর ও বল্লুকা নদীখাতের বিবরণ হতে ক্ষেমেন্দ্র বা ক্ষেমানন্দের বর্ণনার সমর্থন মিলবে। নদীতীরবর্তী স্থান-নামগুলির ভৌগোলিক পরিচয় আজও প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কবির বেহুলা যে স্রোতপথ ধরে কলার মান্দাসে ভেসে গিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে সুনাব্য নদীপথ। মৃত পতিক্রোড়ে বেহুলার ভেলাযাত্রা প্রসঙ্গে নদীপথের একটি বাস্তবচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। কালের আবর্তে নদীখাত লুপ্ত, শুষ্ক অথবা দূরে সরে যেতে পারে, কিন্তু কবির লেখনীতে প্রাচীন খাতের নির্দেশ অবশ্যই ধরা আছে। প্রাচীন খাতকে খুঁজে পেতে হলে নিষ্ঠাসহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হলে, সকল দোষ সেই কবিকেই বহন করতে হয়। কিন্তু যদি প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের পথ বেছে নিয়ে এ কার্যে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে নিছক কল্পনার ভিত্তিতে তাঁরা নদীপথ বর্ণনার প্রসঙ্গ অবতারণা করেন নাই। সত্য নিহিত আছে, কিন্তু অনুসন্ধানকার্য হল শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাওয়া যায় গলসি থানার ভুবরাজপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৯) হতে যাত্রা করে কুকুয়াখালের স্রোতপথে দামোদর-কুকুয়ার সঙ্গমস্থলে নবখণ্ড গ্রামকে বামে রেখে দামোদরের জলপথে ওঝাটি (বর্তমান জুজুটি) পেরিয়ে বর্ধমান শহরে আসা যেত। তারপর দামোদরের প্রধান শাখা (প্রাচীন প্রবাহ পথ) বাঁকার খাত ধরে গোবিন্দপুর ও গাঙ্গপুর অতিক্রম করে নদী পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়েছে। মেমারী থানার ডেঁয়েমগরা গ্রামের নিকট বাঁকা নদীর শাখারূপে গাঙ্গুর নদী নির্গত হয়েছে। গোবিন্দপুর হতে গাঙ্গপুর (বর্ধমান থানায়) পার হয়ে

মেমারী থানার আমাদপুর বা আমদপুর গ্রামে নদীর প্রবাহপথ উত্তরমুখী হয়ে পুনরায় পূর্ব ও দক্ষিণ মুখে দেপুর বা দেবপুরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

কবির বর্ণনায় অবশিষ্ট স্থানগুলি বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে গাঙ্গুরের জলধারা বেহুলার খাতে প্রবাহিত হত। বেহুলা নদীর উত্তর তীরে কালনা থানার অন্তর্গত হাসানহাটি গ্রাম এবং এর সন্নিকটে নারিকেল-ডাঙ্গা। নারিকেলডাঙ্গার দক্ষিণ-পূর্বে কালনা থানার বৈদ্যপুর গ্রাম। বৈদ্যপুর অতিক্রম করে মগরা থানার অধীনস্থ পীড়তলি ও গহরপুর অতিক্রম করে বেহুলা ও কুন্তির ধারা একত্রে মিশে নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে সঙ্গমস্থলের সৃষ্টি করেছে। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ত্রিবেণীর সন্নিকটবর্তী হওয়ায় সঙ্গমস্থলটিকেও ত্রিবেণীসঙ্গম বা মুক্তবেণী বলা হয়ে থাকে।

মনসামঙ্গলে উল্লিখিত গোদাঘাট, কুকুরঘাট, জগতিঘাট প্রভৃতির পরিচয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কবি বর্ণিত বোয়ালিয়াদহ কালনা থানার অন্তর্গত বোয়ালিয়া গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থিতি জানা গেলেও আলোচ্য জলপথ বর্ণনায় সামঞ্জস্য অনুপস্থিত। বেহুলা নদীর অপর একটি দক্ষিণমুখী খাতের (১নং খাত) পশ্চিম-তীরে বোয়ালিয়া গ্রাম। বোয়ালিয়া গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে লুপ্তখাতের অস্তিত্ব আজিও দেখা যায়। অতীতে হাসানহাটি-উদয়পুরের সঙ্গে এই লুপ্তখাত ধরে বোয়ালিয়ার যোগাযোগ ছিল। ক্ষেমানন্দ যদি নারিকেলডাঙ্গা-বৈদ্যপুরের পর বোয়ালিয়ার উল্লেখ করতেন তাহলে বিতর্কের অবকাশ ছিল না।

অপর্যাপ্ত জলপ্রবাহ, পলি অবক্ষেপণ, বিধ্বংসী বন্যা, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, রেলপথ নির্মাণ ও খাল খননের ফলে দামোদরের মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান গাঙ্গুর-বেহুলা-বল্লুকার ক্ষীণ পরিচিতি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্ণিত প্রবল জলরাশিকে যেন উপহাস করছে।

পাদটীকা ঃ

১। *J.R.A.S.B.*—1892, p. 112.

২। *Statistical Accounts of Bengal*, Vol.-IV, W. W. Hunter, p. 93. এই বন্যা প্রসঙ্গে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উইলকক্সের অনুরূপ। তাঁর মতে, '১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে যখন দামোদর নদ কাটোয়ার সঙ্গমস্থল ত্যাগ করিয়া পশ্চিমগামী [দক্ষিণ গামী] হইল, তখন হইতে বাংলাদেশের একটি পুরাতন সভ্যতা ও শ্রীসম্পদের কেন্দ্রস্থলের অধঃপতন সুনিশ্চিত সূত্রপাত হইল।' 'বাঙলা ও বাঙালী'—পৃঃ ৩৮-৩৯।

৩। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯৩, পৃঃ ৫।

৪ *Changing Faces of Bengal*—Radha Kamal Mukherji, p. 18.

৫ নদী—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৫।

৬ *Calcutta Review*, 1846, p. 419.

৭ *The Bhagirathi Hooghly Basin*—Ed. K. P. Bagchi, p. 11 & 18.

৮ *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*—J. W. McCrindle, p. 191 & 195. 'AMYSTIS—The city Katadupa, which this river passes, Wilford would identify with Katwa or Cutwa, in Lower Bengal, which is situated on the western branch of the delta of the Ganges at confluence of the Adji. As the Sanskrit form of the name of Katva should be Katadvipa (dvipa, an island) M. de. St-Martin thinks this conjecture has much probability in its favour. The Amystis may therefore be the Adji or Ajavati as it is called in Sanskrit'.

৯। *Some Historical & Ethnical Aspect of the Burdwan District*—W. B. Oldham, p. 2.

১০। *The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India*—N. L. Dey, p. 3.

১১। *Historical Geography of Ancient India*—B. C. Law, p. 242.

১২। *The Historical Geography and Topography of Bihar*—M. S. Pandey. p. 81.

১৩। *Ibid.*—N. L. Dey, p. 168.

১৪। ভ্রমণ, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ১৭৫।

১৫। *Calcutta Review*, 1846, p. 420.

১৬। *Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan*—J. C. K. Peterson, p. 10.

১৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮।

১৮। *India and Pakistan*—Spate & Learmonth. p. 587.

১৯। *History of Bengal,* Vol-II, Ed. Sir Jadunath Sarkar, p. 455.

২০। বর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪, পৃঃ ১৫।

২১। *Lectures on the Ancient System oj Irrigation in Bengal*—Sir William Willcocks, p. 8.

২২। *Bengal District Gazetteers, Hooghly*—O'Mally & Chakraborty, p. 15-17.

২৩। *Calcutta Review*, 1846, p. 419.

২৪। *India and Pakistan*, p. 587.

২৫। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৯৮-৯৯।

২৬। *Bengal District Gazetters, Burdwan*—p. 10.

২৭। *Inscriptions oj Bengal,* Vol-III—N. G. Majumder, p. 79.

২৮। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, পৃঃ ৯।

২৯। *Old Fort William in Bengal (India Record Series)* Vol-1, —C. R. Wilson, p. 40 ; Ain-i-Akbari, Vol-II, p. 154.

৩০। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪০-৪২।

৩১। কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭।

৩২। *J. A. S. B,* 1952, p. 108.

৩৩। *Inscriptions of Bengal,* Vol,-III—N. G. Majumder, p. 96.

৩৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১, পৃঃ ১৯-২৩।

৩৫। *The Classical Accounts of India*—Dr. R.C. Majumdar, p. 307.

৩৬। বালি গ্রামের ইতিহাস—নলিনচন্দ্র মিশ্র, পৃঃ ৩১।

৩৭। বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭।

৩৮। আনন্দ সাহিত্য পত্রিকা (উত্তরপাড়া), শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৫ সাল, লেখকের 'ধূসদত্তের বাণিজ্য যাত্রা' নামক প্রবন্ধ, পৃঃ ৫৩-৫৭।

৩৯। '*Heritage of Burdwan*' স্মারক গ্রন্থ (১৯৮৯), লেখকের 'বর্ধমানের নদনদী' নামক প্রবন্ধ, পৃঃ ১-৩।

অষ্টম অধ্যায়

একটি বিস্মৃত জনপদ : গঙ্গারিডি

ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীন পর্বে বৃহৎ বঙ্গকে আটটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—গৌড়, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী, রাঢ় (উত্তর ও দক্ষিণ), সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ ও বঙ্গাল। তন্মধ্যে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু ও পুরাকীর্তির নিদর্শনাবলী হতে রাঢ়, গৌড, পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীও প্রাচীনতম জনপদরূপে চিহ্নিত। ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণও এ মন্তব্যের অনুকূলে। ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীন পর্বের পুরাকীর্তির বহু নিদর্শনাবলী ২৪-পরগণা জেলাতেও আবিষ্কৃত হয়েছে, যার প্রাচীনতা দু'হাজার বছরের কাছাকাছি।

কথ্যভাষা ও ভূ-তত্ত্বের দিক হতে বিচার করলে বৃহৎ বঙ্গের যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা রাঢ়ের প্রাচীনতা সর্বাধিক। উত্তরে রাজমহলের দক্ষিণ হতে কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ভাগীরথী নদীর দ্বারা সীমায়িত এবং এই অংশের মধ্যে রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমাংশে মাত্র), বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা। ভাগীরথীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ঐ সকল জেলা-গুলি রাঢ়ের অন্তর্গত। অনেকে হুগলী জেলার পূর্বাংশ, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলাকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী হলেও প্রাচীন সাহিত্য ও কুলজী-গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমগ্র ভূভাগকে রাঢ় বলা হয়। তবে 'রাঢ়' শব্দের প্রকৃত অর্থে বা আভিধানিক অর্থে এই ভূভাগের সঙ্গে সিংভূম ও মানভূম জেলাকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে ত বটেই। ঐতিহাসিক যুগে রাজনৈতিক স্বার্থে রাঢ়ের সীমানা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়েছে। অবশ্য এ সীমানা প্রসারণের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কারণটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

রাঢ়ভূমির প্রাচীনত্ব এবং এই অঞ্চলের জনবসতির প্রাচীন ইতিহাসের যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শনটি হ'ল ছ'হাজার বছর পূর্বের। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলায় আজ হতে অন্ততঃপক্ষে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রাম-পত্তন ও অধিবসতির প্রমাণ মিলেছে এবং এগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, বীরভানপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহিষদল, তাম্রলিপ্ত ও তুলসীপুরের ন্যায় সমৃদ্ধশালী প্রত্নক্ষেত্র ও অধিবসতির স্থানগুলি আবিষ্কৃত হলেও এ বিষয়ে আধুনিকালে রচিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে সম্যকরূপে মূল্যায়ন করা হয় নাই। আবার বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাসের ধারাকে অন্তরালে রেখেই বাংলার প্রাচীন

পর্বের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে বা হচ্ছে। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন, শশাঙ্কের তাম্রশাসনগুলি ও জয়নাগের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত না হলে হয়ত রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হত না।

প্রাচীন রাঢ়ের ইতিহাসই বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার আদি-পর্বের ইতিহাস। বর্ধমানের ইতিহাস রচনার প্রারম্ভিক পর্বে যেমন রাঢ়ের ইতিহাসের স্থান সর্বাগ্রে, অনুরূপভাবে বলা যায় যে রাঢ়ের ইতিহাসের পরিধিতে এক মুখ্য স্থান জুড়ে আছে বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্যই এ জেলাটি রাঢ়-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত হয়েছে। অনেকে মন্তব্য করেন যে, রাঢ়ের কোন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি নাই। এরূপ মন্তব্যের একটিমাত্র উত্তর হল যে, তাঁদের নিকট সংস্কৃতির সংজ্ঞা অজ্ঞাত। রাঢ় ও বরেন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাসের আদিপর্ব রচনা সম্ভবপর নয়। ভারত সংস্কৃতির যোগসূত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের আদান-প্রদান হয়েছিল রাঢ়ের মধ্য দিয়ে।

'রাঢ়' ও 'সুহ্ম', এই সমার্থবাচক শব্দের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে মনে করিয়ে দেয়। 'রাঢ়' ও 'সুহ্ম'-এর পরিচয় বৌদ্ধ-জৈন সাহিত্যের রচনাকাল থেকে সুরু করে পুরাণের পথ ধরে শিলালেখ বা তাম্রশাসনের যুগেও উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র রাঢ়ের পূর্বভাগের সীমানা গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় কোন কোন সময়ে গঙ্গাকে রাঢ়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব যুগের একটি বিবরণ ও তার উত্তরকালের ব্যাখ্যাসমূহকে কেন্দ্র করে একটি বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। খ্রীস্টপূর্ব যুগে 'রাঢ়' এই স্থান-নামটির প্রাচীন উল্লেখ আছে 'কল্পসূত্রে'। 'গঙ্গারিডি' জনপদের অবস্থিতি যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে রাঢ়কেই নির্দেশ করছে বলে মনে করা যায়। গ্রীক ও রোমান লেখকগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করে গঙ্গারিডির অবস্থানকে ঘিরে দীর্ঘকাল পূর্বে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল সে বিতর্কের আজও অবসান হয় নাই এবং পুনর্মূল্যায়নের জন্য 'গঙ্গারিডি' জনপদের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বহু প্রাচীনকাল হতে পুরাণ-সংহিতার রচনাকাল পর্যন্ত জনপদ নামে অভিহিত হ'ত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ষোড়শ মহাজনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ব্যতীত মিশর, রোমান ও গ্রীকদেশীয় লেখকগণের বর্ণনা হ'তে এদেশের নগর, জনপদ, নদনদী, পর্বত ও জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচনভঙ্গিতে গ্রীক ও রোমান উচ্চারণের ছাপ থাকায় প্রচলিত ও পরিচিত উচ্চারণ পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয়েছে এবং এই পার্থক্যজনিত কারণে বহু বিতর্কের অবকাশ আছে।

খ্রীস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে সিন্ধু নদের যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের পূর্ব সাম্রাজ্যের

প্রতিনিধি সেলুকাস নিকাটোর মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন।[১] খ্রীস্টপূর্ব ৩০৩ অব্দে উভয়ের সন্ধির শর্তানুসারে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস খ্রীস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে গ্রীকরাজের প্রতিনিধিরূপে এদেশে আগমন করেন।[২] পাটলিপুত্রে অবস্থানরত সময়ে মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু কালের কুটিল আবর্তে তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র অপরাপর লেখকগণের রচনার উদ্ধৃতি-অংশে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' (Indika) গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের অবস্থানসহ সামান্য কিছু তথ্য বর্ণিত আছে। কিন্তু মেগাস্থিনিসের পূর্বে এ রাজ্যের অস্তিত্বের কোন সন্ধান জানা যায় না এবং খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে টলেমীর 'Treatise on Geography'-তে এ রাজ্যের সর্বশেষ পরিচয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের অস্তিত্বকাল ছিল প্রায় ৪০০।৫০০ বছর। এহেন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক-ভূগোল সম্পর্কিত বিষয়ে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদ ও অষ্টাধ্যায়ী বর্ণিত জনপদসমূহ নির্ণীত হয়েছে, চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের রাজ্যসীমাও জানা গেছে; কিন্তু সমসাময়িককালে রচিত গ্রীক-বিবরণ বিষয়ে বিগত শতক হ'তে বর্তমান শতকের অন্তিমকাল পর্যন্ত বিতর্কের ধূম্রজালে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন গঙ্গারিডি জনপদের অবস্থান সম্পর্কে আজও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

গঙ্গারিডি জনপদ সম্পর্কে বিতর্ক অবতারণার কারণ কি? গ্রীক ও রোমান লেখকেরা ভারতীয় উচ্চারণভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে ভারতীয় পদ্ধতিতে উচ্চারণ বা বানান লেখ বিষয়ে পারদর্শী না হওয়ায় তাদের প্রদত্ত বিবরণে ভারতীয় স্থান-নামগুলির উচ্চারণভঙ্গী অভিনব বা অদ্ভুত বোধ হয়। গ্রীকরোমান ভাষা ত দূরের কথা, এমন কি কোন তামিল বা মালায়ালাম ভাষাভাষী ব্যক্তি যদি হঠাৎ বাংলাভাষা চর্চা করতে শুরু করেন, সেক্ষেত্রেও অনুরূপ বিকৃত উচ্চারণভঙ্গী লক্ষ্য করা যাবে। ষোড়শ শতক হ'তে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজী উচ্চারণের অনুরূপ বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় এবং ইংরেজগণ তাদের উচ্চারণ ভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থান-নামের বানানও সেইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যথা—নদীয়া-Nuddia, কালনা-Kulna/Culna, সুতি-Sooty, তেলিয়াগড়ি-Terriagurry pass, বর্ধমান-Burdomaan, দেহলি-Delhi ইত্যাদি। নবাগতদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক এবং এতে দোষের কিছুই নাই।

কিন্তু গ্রীকরীতিতে উচ্চারিত স্থান-নামগুলি কিছু ঐতিহাসিক ও ভারত-তত্ত্ববিদের ব্যাখ্যায় আরও অভিনবত্ব লাভ করেছে এবং জটিল বিষয়টিকে আরও জটিলতর করা হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বিবরণকে আড়ালে রেখে টলেমীর বিবরণকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে মূল সত্য থেকে অনেক দূরে বিষয়টিকে টেনে নিয়ে গেছেন। আবার কেউ কেউ ভার্জিলের (খ্রীস্টপূর্ব

৭০-১৯) ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করেছেন ;[৩] কিন্তু তাঁরাই আরও পরবর্তীকালে রচিত টলেমীর বর্ণনাকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেকে এরূপ মন্তব্য করে ফেলেছেন যে, এ রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেবলমাত্র ২৪-পরগণা জেলায়। অর্থাৎ, বিষয়টা এমনই দাঁড়িয়েছে যে অঙ্ক সমাধান করার পূর্বেই ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া।

মেগাস্থিনিস বর্ণিত গঙ্গারিডি-রাজ্যের যদি কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকে, তা'হলে তাঁর পরবর্তীকালের লেখকগণ কর্তৃক উল্লিখিত বিবরণসমূহের কালক্রমিক পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্যথায় সুবিধা মত দু-একটি উদ্ধৃতি করে টলেমীকে প্রাধান্য দিয়ে ঐ চর্চার যে ফসল সৃষ্টি হবে তাকে অনৈতিহাসিক চর্চা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাস (History of Bengal, Vol-I) নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে গঙ্গারিডি প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। অনেকে মেগাস্থিনিসসহ অন্যান্য গ্রীক ও রোমান লেখকগণের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার ম্যাক্রিণ্ডালকে বাদ দিয়ে গঙ্গারিডির পর্যালোচনা করায় ঐ অধ্যায়ের যথেষ্ট অঙ্গহানি ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে ডিয়োডোরাসের উদ্ধৃতিতে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হল—'Now this river, which is 30 stadia broad, flows from north to south and empties its waters into the ocean forming the eastern boundary of the Gangaridai, a nation which possesses the largest number of elephants and the largest in size.'

[অনুঃ এখন এই স্থানে নদী ৩০ ষ্টেডিয়া প্রস্থ, যার (নদীর) গতিপথ উত্তর হতে দক্ষিণে এবং সাগরে মিলিত হওয়ার আগে গঙ্গারিডি জনপদের পূর্বসীমা রচনা করেছে, যারা বৃহদায়তন বিশাল হস্তীবাহিনীর অধিকারী ছিল।]

সুতরাং মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হতে ঐ জাতি বা জনপদের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যায় যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হতে দক্ষিণ বাহিনী সেইস্থানের পূর্বসীমা বরাবর গঙ্গানদী প্রবাহিত। তা'হলে যে অঞ্চলকে রাঢ় দেশ বলা যায়, এখানে বাংলার সেই অঞ্চলকে নির্দেশ করছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, মেগাস্থিনিসের Gangaridai, 'গঙ্গারাঢ়ী' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে ম্যাকেঞ্জী সংগ্রহে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বে লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর ছিলেন অনন্তবর্মা বা কোলাহল।[৫] অতএব গঙ্গারাঢ়ী শব্দের প্রচলন বহু পরবর্তীকালেও ছিল।

ডিয়োডোরাসের বিবরণ হতে আরও জানা যায় যে, প্রাসী ও গঙ্গারিডি জনপদের অধীশ্বর Xandrames-এর সৈন্য বাহিনীতে ২,০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০০ রথ ও ৪,০০০ সুশিক্ষিত রণহস্তী ছিল। এই বিবরণে আরও

জানা যায় যে, ফিগিয়াসের নিকট উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে তিনি (আলেকজাণ্ডার) পুরুকে এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় পুরু আরও সংবাদ দেন যে, ঐ রাজা অপদার্থ, প্রজাপুঞ্জের বিরাগভাজন এবং সম্ভবতঃ তিনি একজন নাপিত-পুত্র। বর্তমান রাজার পিতা পূর্বতন বৃদ্ধ রাজাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন এবং তাঁর রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলেন। ঐ সময়ে ৭০ দিন ব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রীক সৈন্যদলের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ৮ বছর ব্যাপী দেশত্যাগী গ্রীক সৈন্যদল এহেন অবস্থায় আলেকজাণ্ডারের প্রচুর প্রলোভন সত্ত্বেও 'প্রাসই' ও 'গঙ্গারিডই' জনপদের দিকে অগ্রসর হতে রাজী হয় নাই।[৬] তৎকালে পূর্ব ও উত্তর ভারতে নন্দবংশের সর্বশেষ নৃপতি ধননন্দের রাজত্বকাল এবং তাঁর পিতা মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক মগধরাজ কালাশোক কাকবর্ণ নিহত হন। 'হর্ষচরিত'-এ ঘটনাটির সমর্থন (ষষ্ঠ উল্লাস) মেলে।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে কুইণ্টাস কার্টিয়াস রুফুস নামক একজন রোমান লেখক আলেকজাণ্ডারের বিজয়াভিযানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। কার্টিয়াসের বিবরণে জানা যায়—'Beyond the river lay extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next came the Ganges, the largest river in all India, the farther bank of which was inhabited by two nations, the Gangaridae and the Prasli, whose King Agrammes kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 2,00,000 infantry, besides 2,000 four horsed chariots and what was the most formidable force of all, a troop of elephants which he said ran up to the number of 3,000.'

অর্থাৎ সিন্ধু নদ অতিক্রম করে মরুপথে ১১ দিনে যাত্রাপথ অতিক্রম করে গঙ্গানদীর তীরে পৌঁছান যায় এবং গঙ্গানদীর দূরতম তীরে প্রাসই ও গঙ্গারিডই জনপদ / জাতির বাসস্থান, যার নৃপতি অগ্রমেশ দেশরক্ষার জন্য ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক সেনা, ২,০০০ চার ঘোড়াবাহিত রথ ও ৩,০০০ রণহস্তী নিযুক্ত করেছিলেন। সিন্ধু নদের তীর হতে ১১ দিনের পথ অতিক্রম করে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হওয়ার অর্থ উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর প্রবাহপথের কোন এক স্থানকে নির্দেশ করে এবং তথা হতে—'the farther bank of which was inhabited by two nations', উক্তির অর্থ ধরলে গঙ্গানদীর দূরতম প্রান্তবর্তী স্থানকে বোঝায়। এই উক্তির দ্বারা গঙ্গাতীর হতে কোন দূরবর্তী অঞ্চলকে বোঝায় না। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদার, ডিয়োডোরাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,[৮]—'This would imply that the Gangaridai were the inhabitant of Radha. But according to other writers, such as Curtius, Plutarch and Salinus, the two nations, the Gangaridai and the Prasii dwelt on the further

bank of the Ganges, i.e., the eastern bank.' কিন্তু কার্টিয়াস বলতে চেয়েছেন যে, সিন্ধু তীরবর্তী অঞ্চল হতে ১১ দিনের পথ অতিক্রম করে গঙ্গানদীর তীরে পৌছানোর অর্থ হতে বোঝা যায় উত্তরপ্রদেশের কোন স্থানকে তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন এবং তথা হতে দূরতমপ্রদেশ প্রাসই ও গঙ্গারিডই। সে যুগে উত্তর-প্রদেশের দূরতম স্থান পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্ত। 'Farther bank'-এর অর্থ 'Eastern Bank' হলে প্রাসই ও গঙ্গারিডই উভয় জনপদই গঙ্গানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং প্রাসই ও গঙ্গারিডই যদি গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত হয় তাহলে রাঢ়দেশ ও তাম্রলিপ্ত বন্দরের পশ্চিমভাগে গঙ্গার প্রবাহপথ হওয়া উচিত ছিল।[৯]

কার্টিয়াসের বর্ণিত further bank অর্থে ডঃ মজুমদার যেভাবে 'eastern bank' হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, অনুরূপভাবে কাননগোপাল বাগচী মেগাস্থিনিস ও ডিয়োডোরাসের বর্ণিত 'now this river empties its water into the ocean forming the eastern boundory of Gangaridai'-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন[১০]—'From these passages, it will be evident that Megasthenes in 300 B. Calso knew the eastern most course as the principal course of the Ganges.'

এখন প্রশ্ন রাখা যায় যে, মেগাস্থিনিস কি 'eastern most course'-এর বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন? 'Eastern boundary'-র অর্থ বা ব্যাখ্যা কিরূপে 'Eastern most course' হতে পারে তার ব্যাখ্যা কিন্তু ডঃ বাগচী করেন নাই এবং মেগাস্থিনিসের সময়ে 'eastean most course' বা পদ্মার খাত সৃষ্টির বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণও উপস্থাপন করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে রচিত প্লুতরার্কের বিবরণে আছে,[১০]—"This river, they (Alexander's Army) heard, had a breadth of thirty two stadia, and a depth of 100 fathoms, while its farther banks were covered all over with armed men, horses, and elephants. For the Kings of the Gandaridai and the Prasai were reported to be waiting for him (Alexander) with an army of 80 000 horse 2,00,000 foot, 8,000 war-chariots and 6,000 fighting elephants."

অর্থাৎ, গঙ্গানদী ৩২ ষ্টেডিয়া প্রস্থ ও ১০০ ফ্যাদম গভীর। এই নদীর দূরতম প্রদেশের তীরবর্তী অঞ্চলের নৃপতি প্রাসই ও গঙ্গারিডই জনপদের অধীশ্বর এবং তিনি ৮০,০০০ অশ্বারোহী ২,০০,০০০ পদাতিক সৈন্য, ৮,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০০০ রণহস্তীসহ বিশাল বাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধের অপেক্ষায় আছেন। এই সুবিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তাব শুনে গ্রীক শিবিরে ক্রন্দনরোল উঠেছিল। প্লুতরার্ক আরও বলেছেন যে, এই বিশাল সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই; কারণ Androcottus-এর (চন্দ্রগুপ্ত) সৈন্য

বাহিনীতে ৬ লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত ছিল। প্লুতার্কের বিবরণ মোটামুটি ডিয়োডোরাসকে অনুসরণ করলেও কিছু পার্থক্য সূচিত হয়।

খ্রীস্টপূর্ব ১ম শতকে রোমান ঐতিহাসিক জাষ্টিন-এর বিবরণে Gandaridae-র উল্লেখ আছ, যার অবস্থিতি ছিল পাঞ্জাব অঞ্চলে।[১১] খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের বিবরণে জানা যায়[১২]—

"After these, the course turns toward the east again, and sailing with the ocean to the right and the short remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges, and it rises and falls in the same way as the Nile. On its bank is a market-town which has the same name as the river Ganges."

Schoff-এর মতে গঙ্গা অর্থে দেশ, নদী ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহরকে নির্দেশ করে। গঙ্গা নদীর নামানুসারে গঙ্গে নামক বাণিজ্যকেন্দ্রে পান, স্থানীয় শস্য (সম্ভবতঃ চাল বা ধান), মুক্তা, সূক্ষ্ম মসলিন ব্যতীত এ দেশে স্বর্ণ খনি ও কলটিস (Caltis) নামক স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। নাবিকের আগমনের সময় ছিল কুষাণ যুগে অর্থাৎ এতদঞ্চলে কুষাণ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং স্বর্ণখনির অবস্থিতির উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, দেশটি রাঢ় ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাংশকে নির্দেশ করে; কোন পলি গঠিত ভূভাগকে নয়। আবুল ফজল বলেছেন যে, সরকার মাদারণে হীরকের খনি আছে, অর্থাৎ স্থানটি বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিম অংশসহ বিহার রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে অবস্থিত ছিল।

এল্ডার প্লিনির বিবরণে পাওয়া যায়[১৩]— '......in the final part of its (the Ganges) course, which is through the country of the Gangarides. The royal city of the Calingae is called Parthalis. Over their King 60,000 foot-soldiers. 1,000 horsemen, 700 elephants keep watch and ward in pricinct of war...... . There is a very large island in the Ganges which is inhabited by a single tribe called Modogalingae.'। প্লিনি আরও বলেছেন যে, বন্য হস্তীকে পোষ মানিয়ে কৃষি ও পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে এদের স্থান ছিল প্রধান। বৃহদাকার, দীর্ঘজীবী ও কর্মক্ষমতার গুণে যুদ্ধেও হস্তীর মুখ্য স্থান ছিল। তাঁর বিবরণে আরও জানা যায় যে, প্রিনাস ও সাইনাস নামক দুটি নাব্যনদী গঙ্গায় মিশেছে। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কলিঙ্গীরা বসবাস করত এবং উচ্চতম অংশে [দূরতম মনে করাই শ্রেয়:] মনদেই ও মল্লই জাতির বাসস্থানের

নিকট মল্লুস পর্বত (Mount Mallus) অবস্থিত এবং উপরোক্ত জনপদগুলি গঙ্গানদীর সীমারেখার দ্বারা বেষ্টিত।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে বাঙালীর রণ-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর রোমে পৌঁছেছিল। মহাকবি ভার্জিলের 'জর্জিকাস' কাব্যে লিখিত হয়েছে [১৪]—

'In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto
Gangaridum faciam, Victorisque arma Quirini.' Georgics III, 27.

Dryden কৃত ইংরাজী অনুবাদে পাওয়া যায়—

'High o'er the gate in elephant and gold
The crowd shall Caesor's Indian war behold.'

অথবা Ransdak ও Lee-র ইংরাজী অনুবাদে আছে—

'On the door will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaridae, and the arms of our victorious Quirinius'.

গঙ্গারিডিদের শৌর্য-বীর্যের খ্যাতি শুনে ভার্জিল এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সুদূর ভারতবর্ষের একটা জনপদের গৌরবকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। তাঁর রচনা হতে আরও জানা যায় যে, তিনি স্বীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে প্রত্যাবর্তনের পর মর্মর প্রস্তরের একটা সৌধ নির্মাণ করে, সেই সৌধে রোম সম্রাট কুইরিনাসের প্রতিমূর্তি স্থাপনপূর্বক ঐ সৌধের দ্বারফলকে স্বর্ণ ও গজদন্তের দ্বারা গঙ্গারিডিগণের যুদ্ধের দৃশ্য এবং রোম সম্রাটের রাজকীয় লাঞ্ছন অঙ্কিত করবেন।[১৫]

ভার্জিলের সময়ে মিশর, গ্রীস ও রোমের লোকেদের পক্ষে ভারতবর্ষের বিবরণ সংগ্রহ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। পেরিপ্লাস ও নিয়ারচাসের (আলেকজাণ্ডারের নৌ-অধ্যক্ষ) বিবরণ ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত শীলমোহর হতে অনুমান করা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। জর্জিকাসের প্রথম সর্গে বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষ হতে রোমে হস্তীদন্ত আমদানী করা হত।

এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন যে, আসলে এসব ধারণা ভ্রান্ত এবং ভার্জিলের জীবিতাবস্থায় গঙ্গারিডির গৌরব অস্তমিত।[১৬] তাহলে ডঃ সরকারের মন্তব্য অনুযায়ী প্লিনি, প্লুতার্ক, কার্টিয়াস, ডিয়োডোরাস প্রভৃতির বিবরণীও পরিত্যক্ত হওয়া উচিত ; কারণ কেহই ভার্জিলের পূর্ববর্তী নন। উপরন্তু প্লিনি ও কার্টিয়াস তাঁর পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং টলেমী ত সকলের শেষে। যদি ভার্জিলের ধারণা ভ্রান্ত হয় তাহলে সেই একই যুক্তিতে টলেমীর ধারণাও ভ্রান্ত। অথচ ডঃ সরকার ডিয়োডোরাসকে বাদ দিয়ে গ্রীক ও রোমান লেখকগণের উদ্ধৃতির উপর পর্যালোচনা করেছেন এবং আরও তিন শতাব্দী পরে রচিত টলেমীর কুহেলিকাপূর্ণ গঙ্গার পাঁচ মোহনা ও তৎসহ গঙ্গারিডি রাজ্যের বিস্তৃত পর্যালোচনাও বাদ পড়ে নাই।

খ্রীস্টীয় ২য় শতকে টলেমীর 'Treatise on Geography' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, গঙ্গানদীর মোহনা অঞ্চলে গঙ্গারিডিগণ বসবাস করত। টলেমী 'গঙ্গা,' 'গঙ্গে বন্দর' ও 'গঙ্গারিডই'-এর উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। মেগাস্থিনিস ব্যতীত মরিনাস ও তুরিয়ান নামক ভৌগোলিকদ্বয় ও টিটিয়ানাস (Titianus) নামক গ্রীক ব্যবসায়ীর নিকট হতে তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।[১৭] সম্ভবতঃ অরিয়ন এবং অন্যান্য পর্যটক ও নাবিকগণ প্রদত্ত ভৌগোলিক উপাদানকেও তিনি কাজে লাগিয়েছেন। টলেমীর বিবরণ হ'তে জানা যায়:[১৮] 'All the country above the mouths of the Ganges is occupied by the Gangarídai with this city :—.

Gange, the Royal residence	146° 19°	15′°

টলেমী আরও উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গানদীর পাঁচটি মোহনা, যথা—

'Mouths of the Ganges

The Kambyson mouth, the most western	144° 30′	18° 15′
Poloura, a town	145° 00′	18° 30′
The Second mouth, called Mega	145° 45′	18° 30
Third called Kamberikhon	146° 30′	18° 40′
Tilogrammon a town	147° 20′	18° 00′
The fourth mouth, Pseudostomon	147° 40′	18° 30′
The fifth mouth, Antibole	148° 30′	18° 15′
Tamalites	144° 30′	24° 30′
Polimbothra, the Royal residence	143° 00′	27° 00′
Aganagora	146° 30′	22° 30′

টলেমী বর্ণিত গঙ্গার পাঁচ মোহনার অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উইলফোর্ড, সেন্ট মার্টিন হতে শুরু করে বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে দু-একজন নদী-বিজ্ঞানীও তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। গঙ্গার প্রথম মোহনা সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট মত পার্থক্য আছে যে এতদ্‌সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট উপসংহার টানা যায় নাই। সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা থেকে শুরু করে পদ্মার মোহনা পর্যন্ত অসংখ্য বড় বড় নদীর মোহনার অস্তিত্ব ছিল, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি মোহনার অস্তিত্ব আজও বর্তমান এবং এই নদীখাত ও মোহনাগুলির কোন পর্যালোচনা না করেই এক তরফা ভাবে স্ব স্ব অভিরুচি অনুযায়ী গঙ্গার পাঁচ মোহনার অবস্থিতির নির্দেশ করেছেন। আবার অনেকে নলিনীকান্ত ভট্টাশালীর পথ অনুসরণ করে যেকোন প্রকারে পদ্মার মোহনাকে, পঞ্চম বা শেষ মোহনারূপে নির্দেশ করতে

তৎপর। অথচ ২০০০ হাজার বছর পূর্বে পদ্মানদীর খাত সৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে ; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের লেখনী একেবারেই নীরব। আবার অনেকে অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য করেছেন যে, ভৌগোলিক টলেমী ও পেরিপ্লাসের নাবিক উভয় গ্রন্থকার সমুদ্রপথে গঙ্গে বন্দর প্রত্যক্ষ করে সেই বন্দরের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ; কিন্তু মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরে অবস্থানকালীন সময়ে গাঙ্গেয়দের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গা বন্দর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে বর্ণনা দিতে পারেন নাই।[১৯] উপরোক্ত মন্তব্য যে সম্পূর্ণ ইতিহাসচর্চার বহির্ভূত বিষয় সে সম্পর্কে বিস্তর বাদানুবাদ করা চলে। কিন্তু লেখক যদি সামান্যতম সাবধানতা অবলম্বন করতেন বা যত্ন নিতেন, তাহলে সঠিক তথ্য সংগ্রহের সময়েই জানতে পারতেন যে, টলেমী কোন সময়েই ভারত ভ্রমণে আসেন নাই বা তাঁর এদেশে আসার কোন প্রয়োজনীয়তাও ছিল না এবং তাঁর ভৌগোলিক হিসাবে পরিচিতি অপেক্ষা জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি আলেকজেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারে বসেই সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষসহ এশিয়ার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন।

(২)

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে গ্রীক ও রোমান লেখকগণ কয়েকটি জনপদ ও স্থান-নামের ক্ষেত্রে যেভাবে বর্ণনা করে গেছেন যেসম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মেগাস্থিনিস বর্ণিত গঙ্গারিডি জনপদের স্থান-নির্ণয় প্রসঙ্গে এদেশের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হ'ল, অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ মেগাস্থিনিসের বিবরণকে বাদ দিয়ে গঙ্গারিডি জনপদের পর্যালোচনা ও মন্তব্যসহ উপসংহার টেনেছেন। এ যেন ব্যাসদেবকে বাদ দিয়ে মহাভারতের পর্যালোচনা। মেগাস্থিনিসের বিবরণে জানা যায় যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হতে দক্ষিণ বাহিনী, সেই প্রবাহপথ হ'ল গঙ্গারিডি জনপদের পূর্বসীমা। তাহ'লে এই সীমার মধ্যে উত্তরে সূতী হতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত (ভাগীরথী নদীর প্রবাহপথ ও আদিগঙ্গার খাত ধরে সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত) অংশের পশ্চিম দিকের ভূভাগকে বোঝাচ্ছে এবং এই ভূভাগটি গঙ্গারিডি জনপদের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এই অঞ্চলই গঙ্গারিডি জনপদের কেন্দ্রস্থল। ডিয়োদোরাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন[২০]—

'A Second relevant statement by Diodorus, based on an Alexandrian or post-Alexandrian source, records that the Ganges "empties its waters into the ocean forming the eastern boundary of the Gangaridai'. This territory must have been on the Bay of Bengal, into which the river falls through different channels. It was also at least partly situated to the east of one of the main

channels of the river. This ensures the inclusion of a part of lower West Bengal in the territory concerned.'

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে[২১]—"গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশক্রমে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় হয়েছে। সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। গঙ্গাতীরস্থ শব্দের পরিবর্তে অনেকে তীরস্থ বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'তীরভুক্তি'। এস্থলেও গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হয়ে কেবল 'তীর' শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেই জন্য 'রাঢ়' শব্দে দাঁড়িয়েছে।" এ প্রসঙ্গে নন্দলাল দে[২২] মন্তব্য করেছেন—

"It should be stated that according to Prof. Wilson, Ananta Varma, the first of the line of Ganga-vamsa Kings of Orissa was also called "Kolahala, sovereign of Ganga—Radhi (Mackenzie Collections Introduction CXXXViii) ...... It should be stated that Radha is a corruption of Rashtra, and an abbreviation of Ganga-Rashtra or Ganga-Rada (the kingdoom of Ganga the "district of the Ganges" of the Periplus and Gangaride of Megasthenes. Ganga-Rada was contracted into Ganga mentioned in the Kausitaka Upanishad and in the Karhad plate Inscription of Krishna III and also into Rada which is further corrupted into Lada and Lala."

নন্দলাল দে Indian Historical Quarterly (vol-III & IV, 1927-28) এবং Indian Antiquary (1921, vol-L.) পত্রিকায় এবিষয়ে দুটি সুবৃহৎ প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীন গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ রূপ হল 'রাঢ়'। তাঁর মতে পালি ভাষায় রট্‌ঠ ও সংস্কৃতে রাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ রূপ হল রাঢ় এবং গঙ্গারাঢ় শব্দের গ্রীক উচ্চারণ 'গঙ্গারিডই'। গঙ্গানদীকে গঙ্গা বা Ganges বলতে কোন বাধা নাই ; কিন্তু রিদই বা রিডইকে রাঢ়ের সমার্থক শব্দরূপে গণ্য করলেই ঐতিহাসিকগণের যত আপত্তি। কিন্তু মেগাস্থিনিসের জনপদ বর্ণনার সঙ্গে গঙ্গা ও রাঢ়ের সামঞ্জস্য পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত আচারঙ্গ সূত্রে রাঢ় শব্দের পরিচয় পাওয়া যায় জনপদ অর্থে এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক কল্পসূত্র প্রণেতা ভদ্রবাহুও একই অর্থের বর্ণনা করেছেন।[২৩]

গঙ্গা কেবল নদীরূপে বর্ণিত হয় নাই। ৮৮০ শকাব্দে তৃতীয় কৃষ্ণের করহাড় শাসনে অন্যান্য জনপদ বর্ণনা প্রসঙ্গে গঙ্গা জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়,[২৪] যথা—

'দ্বারস্থাংগ কলিঙ্গ গঙ্গা মগধৈরভ্যর্চ্চিতাঙ্গশ্চিরং'

আলোচ্য শাসনে অঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা ও মগধের উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, গঙ্গা জনপদ অর্থে উল্লিখিত এবং এস্থলে নদী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। নন্দলাল দের মন্তব্যকে[২৫] পূর্ণ সমর্থন না করলেও বিনয়চন্দ্র সেন উক্ত মতামতকে একেবারেই উপেক্ষা করতে পারেন নাই। তাঁর মতে বর্ধমান, হুগলী ও বাঁকুড়ার সম্পূর্ণ অংশ

এবং মেদিনীপুর, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঙ্গারিডি জনপদের অধিকাংশ অঞ্চল গঠিত ছিল এবং ভাগীরথীর পূর্বভাগেও এই জনপদের বিস্তৃতি ছিল।[২৬] কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য এই যে, রাঢ় জনপদ ছিল গঙ্গারিডি জনপদের বৃহত্তর অংশ।

মেগাস্থিনিস ও ডিয়োডোরাসের বিবরণে বর্ণিত আছে—'গঙ্গারিডি নেশন'। 'নেশন'-এর আভিধানিক অর্থ করে অনেকে 'গঙ্গারিডি জাতি' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইউরোপে 'নেশন' অর্থে রাষ্ট্রের সমার্থক শব্দরূপে গণ্য হয়। কেবলমাত্র প্লিনির বিবরণে 'ট্রাইব' বলে উল্লিখিত আছে। ইংরাজী শব্দে 'নেশন' ও 'ট্রাইব' সমার্থক শব্দ নয়। রাজ্যের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতি বা গোষ্ঠী অর্থ ধরলে যথেষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়, এমনকি গঙ্গারিডি শব্দের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু মূল বিবরণে আছে—'two nations'; নেশন অর্থে প্রাসইকে রাষ্ট্র বা রাজ্যরূপে ব্যাখ্যা করা হবে আর 'গঙ্গারিডি' জাতি অর্থে ব্যবহৃত হবে—এরূপ অপব্যাখ্যা মানা যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আলেকজাণ্ডার বিপাসা নদীতীরের শিবিরে, আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত প্রাসই ও গঙ্গারিডই নামক দুটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হয়েছিলেন।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্র, ম্যাক্রিণ্ডাল, রমাপ্রসাদ চন্দ,[২৮] নন্দলাল দে প্রভৃতি লেখকগণ 'গঙ্গারিডি রাজ্য'রূপে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু অধ্যাপক সরকার[২৯] গঙ্গারিডি রাজ্যের পরিবর্তে গঙ্গারিডি জাতি হিসাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন এবং তাঁর মতে গ্রীকরা বঙ্গ নামের সঙ্গে গঙ্গা নামটি গুলিয়ে ফেলে একটি গঙ্গেজাতির অস্তিত্ব প্রচার করে। তাঁর এ মন্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয় এই কারণে যে, গ্রীক ও রোমান লেখকগণ ভারতবর্ষের মধ্যে Indus, Palibothra ও Ganges নামের সঙ্গে যেরূপ-ভাবে পরিচিত ছিল, সমগ্র দেশের অপর কোন স্থান-নাম সম্পর্কে এত অধিক পরিচয় তাঁদের ঘটে নাই। অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সরকারের মন্তব্যের সঙ্গেও একমত নন। তাঁর কথায়, "However, Prof. Sircar was wrong in thinking that Vanga was confused with Ganga and the latter was changed to Gangara-under the influence of Gandhara as the frequent confusion between Gandhāra and Gangaridai would suggest. We have already shown that the expression Gangaridai is a perfectly intelligible one, meaning 'the people of a territory' which has 'the Ganges at its heart."[৩০]

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বঙ্গরাষ্ট্র বা বঙ্গজাতির কোন পরিচিতি ছিল না। ইতিহাস সেই কথাই বলে। ডঃ সরকার সমগ্র বঙ্গদেশকে, গঙ্গারিডি রাজ্যের (তাঁর মতে জাতি) অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় এরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে

তিনি বারংবার nation-কে tribe-রূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। গ্রীক ও রোমান লেখকগণ বঙ্গ নামের সঙ্গে গঙ্গ বা গঙ্গাকে গুলিয়ে ফেলার কোন প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

মেগাস্থিনিসের পরবর্তী লেখকগণ উক্ত বিবরণকে পাথেয় করে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল লিপিবদ্ধ করেছেন এবং 'সাত নকলে আসল বস্তু খাস্তা হয়েছে'। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রচিত প্লিনির বিবরণে পাওয়া যায় যে, গঙ্গারিডির শেষ প্রান্তবর্তী অঞ্চলে গঙ্গানদী প্রবাহিত এবং উক্ত বিবরণে কলিঙ্গের রাজধানী পার্থেলিস, গঙ্গারিডিদের সৈন্যবল, গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে মোড়গলিঙ্গ ও ম্যাকো-কলিঙ্গ জাতির বসতি ইত্যাদির খবর পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্রিণ্ডালের পাঠনির্দেশ হল,[৩১]—
'The common reading, however—"Gangaridum Calingarum Regia", & c. makes the Gangarides a branch of the Kalingae.'

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৩২] মতে কলিঙ্গ রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত ও তিন অংশের সমষ্টি একত্রে ত্রিকলিঙ্গরূপে পরিচিত ছিল। দ্রাবিড় ভাষায়, 'মূডু' শব্দের অর্থ তিন; সে কারণে তিনটি কলিঙ্গকে মেগাস্থিনিস ও প্লিনি একত্রে 'মোড-গলিঙ্গম্' বা 'মোদো-গলিঙ্গম্' নামে উল্লেখ করেছেন। 'মূডু' ও 'কলিঙ্গ' একত্রে উচ্চারিত হয়ে মুকলিঙ্গম্ শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ সময়ে কলিঙ্গ জনপদ উত্তরে মেদিনীপুর-হাওড়া ছাড়িয়ে বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর লেখা History of Orissa (vol-1) গ্রন্থে প্রদত্ত মানচিত্রে কলিঙ্গ জনপদের বিস্তৃতি দেখা যায় দামোদর-ভাগীরথীর প্রবাহপথ পর্যন্ত। গঙ্গারিডই রাজ্যের সঙ্গে কলিঙ্গ যুক্ত ছিল এবং গঙ্গা নদী গঙ্গারিডি রাজ্যের পূর্ব সীমা ছিল। এই বিবরণ হতে অনুমান করা যায় যে, প্লিনির সময়ে কলিঙ্গ ও গঙ্গারিডি, মগধের অধীনস্থ ছিল না। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে গঙ্গারিডি রাজ্য কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতকে কলিঙ্গরাজ খারবেল,[৩৩] অঙ্গ ও মগধ সহ সমস্ত উত্তরাপথ জয় করেছিলেন এবং সেই সময়ে সমগ্র রাঢ় জনপদ কলিঙ্গের অধীনস্থ ছিল। রাঢ় বিজয় ব্যতীত অঙ্গ বা মগধ জয় করা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না এবং খারবেল যে ভাগীরথীর পূর্বভাগ জয় করেছিলেন তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পার্শ্ববর্তী রাজ্য হল রাঢ়, যা বিদেশী লেখকগণ গঙ্গা নদীর নামের সঙ্গে রাঢ় জনপদ, নামকে একত্রে উচ্চারণ করেছিলেন—'গঙ্গারিডম্-কলিঙ্গম্'।

মৌর্যযুগে উত্তরবঙ্গ ও রাঢ় মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু পদ্মার দক্ষিণ-ভাগ এবং ভাগীরথীর পূর্বভাগ নিয়ে গঠিত অঞ্চল যে মগধের অধীনস্থ ছিল তার কোন প্রমাণ নাই। ডঃ আর. আর. দিবাকরের মতে প্রাসী ও গঙ্গারিডই রাজ্য এক রাজার অধীনস্থ ছিল। মহাপদ্মনন্দ, ধননন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি মগধ নৃপতিগণ পরাক্রমশালী ছিলেন। গঙ্গারিডি রাজ্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন[৩৪]—

'The Gangaridae must have been derived from the river Ganga

and might originally have denoted the people living along the lower course of the Ganga. The Prasii is probably derived from some such word as Prachya (eastern). But classical writers often refer to the two as one nation having only one king ; and what is still more singular is that they call the united people simply Gangaridae. The only reasonably inference seems to be that at about the time of Alexander's invasion, the Gangaridae were a very powerful nation, and either formed a dual monerchy with the Prasii or were otherswise closely associated with them on equal terms in a common cause against the foreign invader. In any case it was reported to Alexander that the Kings of Gangaridae and Prasii were waiting for him with an army of 80,000 horse, 200, 000 foot, 8,000 war chariots and 6,000 fighting elephants'.

অশোকের সময়ে ভাগীরথীর পূর্বভাগ সম্ভবতঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল না, যা ডঃ দিবাকরের অপর একটি মন্তব্য[৩৫] হতে অনুমান করা যায়,—

'Kalinga was famous for its ivory goods and its elephants, which were of great military value. Pliny refers to the army of Kalinga which consisted of 60,000 foot soldiers, 1000 horsemen and 700 elephants. By the coquest of Bengal, including Tamralipti, and the Deccan. Kalinga was almost encircled by Mauryan possessions on all sides except the east.'

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে 'কলিঙ্গগণ' এই উক্তি হতে মন্তব্য করা যায় যে একাধিক কলিঙ্গের অস্তিত্ব ছিল। চেদীরাজ, কলচুরি বা হৈহয় বংশের প্রশস্তি-লিপিতে কালঞ্জরপুর ও ত্রিকলিঙ্গের অধিপতিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। ত্রিকলিঙ্গ প্রসঙ্গে কানিংহ্যাম বলেছেন[৩৬]—'The name of Tri-Kalinga is probably old, as Pliny mentions the Macco-Calingae, and the Gangarides-Calinge as seperate people from the Calingae, while the Mahabharata names of the Kalingas three seperate times, and each time in conjuction with different peoples.' তিনি আরও মন্তব্য করেছেন[৩৭]—'But the mention Macco-Calinga and Gangarides-Calingae by Pliny, would seem to show that the 'Three Kalingas' were known as early time of Megasthenes, form whom Pliny has chiefly copied his Indian Geography.'

অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক বর্ণিত গঙ্গা নদীর তীরে গঙ্গে বন্দর ও নগরের

অবস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। নন্দলাল দের মতে প্রাচীন গঙ্গা বা গঙ্গে বন্দর হল সপ্তগ্রাম[৩৮], যার খ্যাতি ষোড়শ শতক পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গঙ্গা নদী এই স্থানে ত্রিধারায় বিভক্ত হওয়ায় নদীপথে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে সপ্তগ্রামের যোগাযোগ ছিল। আবার দামোদর-বেহুলার খাত ধরে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত দামোদরের প্রবল জলধারা সপ্তগ্রামকে দক্ষিণে রেখে নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে মিলিত হত। দামোদরের অপর একটি জলধারা, কানা-কুন্তী নদীর (বর্তমান মগরা খাল) খাতে সপ্তগ্রাম অতিক্রম করে ভাগীরথীতে মিশেছে। এক কথায় সপ্তগ্রাম ছিল আদর্শস্থানীয় নদী-বন্দর।

উইলফ্রিডের মতে, তাম্রলিপ্তই প্রাচীন গঙ্গে বন্দরের নামান্তর। কিন্তু টলেমী গঙ্গে ও তাম্রলিপ্তকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তাম্রলিপ্তের বর্তমান অবস্থিতির সঙ্গে দেড়হাজার বছর পূর্বের অবস্থার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফা-হিয়েনের বিবরণে পাওয়া যায় যে, তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্র বন্দর এবং সপ্তম শতকে রচিত হিউয়েন-সাঙের বিবরণে জানা যায় সমুদ্রের খাড়িতে তাম্রলিপ্তের অবস্থিতি ছিল।[৩৯] ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের বিবরণ যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ সমুদ্রগর্ভে ছিল এবং কপিশা বা কাঁসাই নদী সোজাসুজি সাগরে মিলিত হত। তাম্রলিপ্তের অবস্থিতি নিয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও ম্যাক্রিণ্ডাল মন্তব্য করেছেন যে বর্তমান তমলুক ও প্রাচীন তাম্রলিপ্ত এক ও অভিন্ন[৪০]। রঘুবংশ হতে উদ্ধৃতি প্রকাশ করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন[৪১] যে, বর্তমান সাগরদ্বীপে গঙ্গে বন্দরের অবস্থিতি ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ফা-হিয়েনের মতে তাম্রলিপ্ত যদি সমুদ্র বন্দর হয়, তাহলে আরও পূর্বকালে সাগরদ্বীপের বা সাগর সঙ্গমের অবস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। উইলফ্রিডের অনুবাদে বা মন্তব্যে (The Periplus of the Erythrean Sea) কোথাও উল্লেখ নেই যে, গঙ্গার মোহনাতেই গঙ্গে নগরের অবস্থান ছিল। কালিদাস বা মল্লিনাথও উল্লেখ করেন নাই যে, বর্তমান সাগর দ্বীপেই ছিল সঙ্গমস্থল। অন্ততঃপক্ষে দু'হাজার বছর পূর্বের সঙ্গে বর্তমান বাংলার ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের কোন মিল নাই এবং ঐ সময়ে বদ্বীপের বিস্তার এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। নাবিকের বর্ণনায় আছে, গঙ্গানদীর তীরে গঙ্গে বন্দরের অবস্থিতি। এই অর্থে বলা যায় না যে, আলোচ্য নগর-বন্দরটি মোহনাতেই অবস্থিত ছিল। ২২°৩০´ উত্তর অক্ষাংশ রেখার দক্ষিণে ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা কার্য বিস্তারিতভাবে না হলে নিশ্চিতরূপে মন্তব্য করা যায় না যে, দু'হাজার বছর পূর্বে সাগর দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থায় কোন বন্দর গড়ে উঠতে পারে। বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ডি. এন. ওয়াদিয়া বলেছেন[৪২]—'Southern Bengal has been reclaimed from the sea at a late date in the history of India by the rapid southward advance of the Ganges and Brahmaputra delta

through the deposition of enormous load of silt. J. Fergusson has stated that only 5000 years ago the sea washed the Rajmahal hills and that the country round Sylhet was a lagoon of that sea, as was also a part of the province of Bengal at a later date. The cities of lower Bengal became established as the ground became desiccated enough to be habitable only about 1000 years ago.' অবশ্য ওয়াদিয়ার বক্তব্যই শেষ কথা নয়, এ বিষয়ে আরও ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে জনবসতি প্রসঙ্গে হেনরী বেভারিজ মন্তব্য করেছেন,[৬৩]— "I may also notice here that the copper plate inscription found at Idilpur in Bakirganj and described in the Asiatic Society's Journel for 1838, seems to imply that the inhabitant of that part of the country belonged to a degraded tribe called the Chandbhandas— a fact which is not favourable of the supposition of an early civilisation of the Sundarbans." । এছাড়া ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে রালফ্ ফিচের বর্ণনায় একই চিত্র পাওয়া যায়।

ইংরাজী ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, হরকরা পত্রিকার এক সংবাদে জানা যায়[৬৩ক] "ইংরেজী ৪৩০ সালে (কপিল মুনির) মন্দির গ্রথিত হলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হল।" ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'Friends of India' পত্রিকার সংবাদ ছিল যে, উক্ত মন্দির ঝড় ও জলোচ্ছাসের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৬৪] রেভারেণ্ড লঙের মতে, কপিলমুনির মন্দির ৪৩০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। উপরোক্ত কোন খবরই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। 'হরকরা পত্রিকা', 'সমাচার দর্পণ হতে সংবাদ সংগ্রহ করে উক্ত সংবাদ পরিবেশন করেছে। রেভারেণ্ড লঙ যা শুনেছেন সেটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ৪৩০ বা ৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে 'জয়পুরের গুরু সম্প্রদায়' কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনা মাত্র। কেউই শিলালিপি প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাছাড়া বঙ্গদেশের নোনা জল হাওয়া ও বিপদসঙ্কুল সমুদ্র উপকূলে কোন মন্দির (১৮৪২-৪৩০) ১৪১২ বছর ধরে যে স্থায়ী ছিল এটি বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে।

(৩)

টলেমীর বিবরণ, অন্যান্য বিদেশী লেখকগণ অপেক্ষা সর্বশেষে রচিত হলেও তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে গঙ্গারিডির বিস্তার প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বিতর্ক সূচিত হয়েছে। তাঁর মানচিত্র ও স্থানসমূহের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশসহ গ্রন্থোক্ত স্থানের অবস্থিতি অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ। ঐ গ্রন্থে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক-ভূগোলের বহু উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেলেও এদেশের আকৃতি (shape) ও স্থানসমূহের

অবস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না; তাঁর মানচিত্রখানি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, যেসকল সূত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। পেরিপ্লাসের নাবিক ও মেগাস্থিনিস ব্যতীত অপর কোন পর্যটক ঐতিহাসিক যুগে ভারতে আসেন নাই। অপর পক্ষে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ পাশ্চাত্যদেশে এত প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় ছিল যে, অধিকাংশ লেখকই 'ইণ্ডিকা'কে অবলম্বন করে প্রাচ্যদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন অথবা এছাড়া তাঁদের কোন গত্যন্তর ছিল না। স্পষ্টতই বলা যায় যে মেগাস্থিনিসই এ পথের প্রথম পথিকৃৎ। কিন্তু এদেশীয় ভাষ্যকারগণ মেগাস্থিনিস ও ডিয়াডোরাসকে বাদ দিয়ে সুকৌশলে গঙ্গারিডি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, কারণ ঐ লেখকদ্বয়ের বিবরণ অবলম্বনে গঙ্গারিডির পর্যালোচনা শুরু করলে তাঁদের নয়াতত্ত্বের বিরোধী সাক্ষী হিসাবে সেগুলি নস্যাৎ হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সে কারণে টলেমীর অস্পষ্ট ভৌগোলিক স্থান-নির্দেশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে গঙ্গারিডি প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা করেছেন।

স্বর্গত অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর সুবৃহৎ প্রবন্ধে[৬৫] (Ganga and the Gangaridae) বহু যুক্তির অবতারণা করেছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে মেগাস্থিনিস ও ডিয়োডোরাস একেবারেই বাদ পড়েছেন। তিনি একই বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধেও একইভাবে টলেমীকে প্রাধান্য দিয়ে গঙ্গারিডি জনপদের বিস্তৃতি পদ্মানদীর মোহনা পর্যন্ত ছিল বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু স্বর্গত অধ্যাপক ডঃ সরকার টলেমীর ত্রুটিগুলি নিয়ে সামান্যতম আলোচনাও করেন নাই, যা তাঁর করা উচিত ছিল। অন্যদিকে অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেনের আলোচনা যথেষ্ট সার্থকতার দাবী করতে পারে।[৬৬]

এ প্রসঙ্গে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম টলেমীর গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রামাণ্যতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তিনি পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করেছেন,—[৬৭] 'Ptolemy's longitudes are so manifestly in excess of the truth that various methods of rectification have been suggested by different geographers. That of M. Gossellin was to take five-sevenths of Ptolemy's measures, but his system was based upon the assumption that Prolemy had made an erroneous estimate of the value of the degree both of the equinoctial and Rhodian diaphragms, as detailed by Eratosthenes. But for the geography of Asia, Ptolemy seems to have depended altogether upon the authority of Marinus, the Tyrian geographer, and of Titianus or Maes, a Mecedonian merchant. M. Gossellin's method was probably founded upon the average of Ptolemy's errors, deduced from the longitudinal excess

of many well-known places. It is in fact an empirical correction of Ptolemy's errors of the cause of which his theory offers nothing more than a mere guess.'

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পাটনা হতে তক্ষশিলার প্রকৃত দূরত্ব ১২°২৪´ দ্রাঘিমাংশ, কিন্তু টলেমী স্থানদ্বয়ের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ১৮° দ্রাঘিমাংশ। কানিংহ্যামের ন্যায় সুনির্দিষ্টভাবে টলেমীর ত্রুটি নির্দেশ না করলেও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য হল,—[৪৮] 'Ptolemy wrote a geographical account of India in the second century A.D. on the scientific lines. His data being drived from secondary sources, he has fallen into numerous errors, and his general conception of the shape of India is also faulty in the extreme. Nevertheless the attempt was praise worthy and has supplied valuable information. The same may be said of Pliny's account of Indian animals, plants and minerals in the first century A.D.'। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—[৪৯] 'Most of these place names can not be indentified and his determination of the position of places is mostly inaccurate.'

টলেমী প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে তাঁর নক্সা ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্যও নয়[৫০]। কিন্তু গঙ্গারিডি ও গঙ্গার পাঁচ মোহনা প্রসঙ্গে তিনি নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মন্তব্যকে উল্লেখ করে যথাকর্তব্য শেষ করেছেন। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন গ্রীক রোমান লেখকগণের ভৌগোলিক বিবরণের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন এবং তিনিও টলেমীর দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করে গাঙ্গেয় অববাহিকার ভূগোল আলোচনা প্রসঙ্গে টলেমীর বর্ণনাকে সাবধানতাপূর্বক গ্রহণ করার জন্য মতামত প্রকাশ করেছেন। ডঃ সেনের ভাষায়,—[৫১] 'With these more or less known instances of error and confusion before us, we should be particularly cautious in our attempt to determine the bearing of Ptolemy's Transgangatic plan on the Geography of Bengal.'

টলেমী সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক মন্তব্য পাওয়া যায় 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য়। তাঁর ত্রুটিপূর্ণ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে,—[৫২] 'Moreover, as a whole, the Guide cannot be considered 'good geography', it does not mention anything about the climate, natural products, inhabitants or peculiar features of the countries with which it deals, and Ptolemy's treatment of the geografical importance of such factors as rivers and mountain ranges is careless

and of little use.' এরপর কি টলেমী বর্ণিত গঙ্গার পাঁচ মোহনা নিয়ে বাদানুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে? বাংলাদেশের নদী ও নদী মোহনা সম্পর্কে আলোচনা করলে জানা যাবে যে, টলেমী বর্ণিত গঙ্গার পাঁচ-মোহনাতত্ত্ব সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যাঁরা অত্যন্ত যত্নসহকারে গঙ্গার মোহনা ও গঙ্গে নগর-বন্দরের আলোচনার অবতারণা করেছেন, তাঁদের উচিত ছিল অগনগর, তাম্রলিপ্ত ও পাটলিপুত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিয়ে পর্যালোচনা করা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন।

টলেমী প্রদত্ত মানচিত্র ও স্থানসমূহের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ যে অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। Tamalite মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত এবং Palimbothra, প্রাচীন পাটালিপুত্রের গ্রীক নামান্তর, যা বর্তমানে পাটনা নামে প্রসিদ্ধ। টলেমীর মতে, গঙ্গারিডিদের রাজধানী গঙ্গেনগর তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্ত হতে পাটলিপুত্রের দূরত্ব ১° ৩০´ অক্ষাংশ এবং তাম্রলিপ্ত হতে ৫° ১৫´ অক্ষাংশ দূরে গঙ্গে নগরের অবস্থান। এক ইকিউটোরিয়াল ডিগ্রির দূরত্ব ৫০০ ষ্ট্যাডিয়া হলে (স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যামের মতে ৬০০ ষ্ট্যাডিয়া) তাম্রলিপ্ত হতে গঙ্গে নগরের দূরত্ব ২৬২৫ ষ্ট্যাডিয়া অর্থাৎ প্রায় ৩২৮ মাইল। টলেমীর বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করতে হলে গঙ্গেনগরের অবস্থিতি হওয়া উচিত বর্তমান বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি হতে অন্ততপক্ষে ২৯০ মাইল দূরে সমুদ্রগর্ভে। এটি একেবারেই অবাস্তব সিদ্ধান্ত। আবার তাম্রলিপ্ত হতে পাটনার দূরত্ব (crow fly distance) প্রায় ২৪০ মাইল, অথচ টলেমীর মতে এই দূরত্ব হওয়া উচিত ১২৫০ ষ্ট্যাডিয়া বা প্রায় ১৫৬ মাইল। কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে Salibothra (Palibothra) হতে Tamalite-র দূরত্ব অধিক নহে। ঐ মানচিত্রে সমুদ্রকূল বা গঙ্গার মোহনা হতে Tamalite বহুদূরে অবস্থিত, যা প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। অপর পক্ষে Mega নদীর মোহনা হতে গঙ্গে নগরের দূরত্ব ৩৭৫ ষ্ট্যাডিয়া বা ৪৭ মাইল হওয়ায় গঙ্গে নগরের অবস্থিতি গঙ্গার মোহনা হতে উত্তরে অর্থাৎ শ্রীরামপুরের উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় উচিত। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' ও চার্লস জোসেফের মানচিত্রে (প্লেট নং ৫) দেগঙ্গা বা DHEEGANGO-র অবস্থিতি হল শেওড়াফুলি-বৈদ্যবাটীর উত্তরে। সরস্বতী ও ভাগীরথী নদী বিধৌত আববাহিকায় পলির আস্তরণে দেগঙ্গার পুরাকীর্তি হয়ত চাপা পড়ে আছে।

টলেমীর তালিকায় দেখা যায় কামবেরিখোন ও অগনগর একই দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। ম্যাক্রিণ্ডাল ও উইলফোর্ডের মতে অগনগর বা অগ্রদ্বীপ ও বর্তমান অগ্রদ্বীপ, এক ও অভিন্ন। অগ্রদ্বীপ ৮৮° ১২´ দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত; তাহলে কামবেরিখোন নদীর মোহনা হওয়া উচিত ছিল আধুনিক হাওড়া শহরের সন্নিকটে অথবা হাওড়া শহর হতে একটি কল্পিত রেখাকে দক্ষিণে কল্পনা করলে আদিগঙ্গার

সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন স্থানে কামবেরিখোন বা তৃতীয় মোহনার অবস্থান হওয়া উচিত ছিল। অথচ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ রায়চৌধুরী, ডঃ সরকার ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, কুমার নদীর মোহনাকেই (প্রায় ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) কামবেরিখোন মোহনা বলে সনাক্ত করেছেন। তাহলে কামবেরিখোনকে কুমার নদীর মোহনা বলা যায় না অথবা সুদূর আলেকজেন্দ্রিয়ায় বসে লোকমুখে শুনে পূর্ব ভারতের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে টলেমী স্বয়ং এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

টলেমীর মতে গঙ্গারিডি জনপদ গঙ্গার পাঁচ মোহনা অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং এদেশীয় পণ্ডিতগণ পদ্মার মোহনাকে আন্তিবোলে মোহনা বলে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। তাহ'লে সুবর্ণরেখার মোহনা হতে পদ্মার মোহনা পর্যন্ত কি মাত্র পাঁচটি নদীর মোহনার সন্ধান পাওয়া যায়? চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পূর্বে পদ্মানদীর মোহনা কি আদৌ উল্লেখযোগ্য নদী-মোহনা ছিল? এ সকল প্রশ্নের সমাধান করতে হলে সমুদ্রোপকূলের সন্নিকটে গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদী মোহনাগুলির পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। অবিভক্ত বাংলাদেশের সংখ্যাতীত সাগরগামী নদীগুলির কথা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী হতে যমুনা নামক শাখাটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাভিমুখী হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে, যার একটি ধারা ইছামতী নামে আজও জলধারা বহন করছে। বর্তমানে নদীর ধারা লুপ্ত হলেও দ্বাদশ শতক পর্যন্ত যমুনা নদীর প্রসিদ্ধি ছিল, তা ধোয়ীর 'পবন দূতে' বর্ণিত আছে। অথচ টলেমীর ব্যাখ্যাকারগণের আলোচনায় যমুনা নদীর নাম অনুপস্থিত। পূর্বেই বলা হয়েছে সে যুগে তাম্রলিপ্ত সমুদ্র বন্দর ছিল, ঐ সময়ে কপিশা বা কাঁসাই নদী সম্ভবতঃ সোজাসুজি সাগরে মিলিত হত, এটা ভূগোল বা ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রের যুক্তি। যদি কামবেরিখোনকে কুমার নদীর মোহনারূপে সনাক্ত করা হয় (টলেমীর মতে ১৪৬° ৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমা), তা'হলে আন্তিবোলের (১৪৮° ৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমা) মোহনা হওয়া উচিত আরও ২° ডিগ্রি পূর্বে অর্থাৎ চট্টগ্রাম পেরিয়ে মিজোরাম অঞ্চলে। এছাড়া গঙ্গারিড়ি রাজ্যের বিস্তৃতি পদ্মা-মেঘনার মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত হলে অন্যান্য সামরিক শক্তির সঙ্গে নৌবলের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। অন্যথায় নৌশক্তির সাহায্য ব্যতীত নদীবহুল রাজ্যের সামরিক পরাক্রম অসম্ভব। কিন্তু কোন বিদেশী বিবরণেই এই রাজ্যের নৌবলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিদেশী বিবরণে জানা যায় যে হস্তী, রথ ও অশ্ব ছিল সামরিক শক্তির প্রধান সহায়ক। সে কারণে বলা যায় যে, গঙ্গার পাঁচ মোহনার অবস্থান ধরে গঙ্গারিডি রাজ্যের বিস্তৃতি বিষয়ে আলোচনা করা একদেশদর্শী; কারণ 'Treatise of Geography'-র রচনাকার এদেশের নদী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল ছিলেন।

গঙ্গারিডি জনপদকে ভাগীরথীর প্রবাহপথের পূর্বভাগে নির্দেশ করার জন্য অনেকে তাম্রলিপ্তকে প্রাচী বা প্রাচ্য জনপদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা

করেছেন। Oldenburg-এর মতে প্রাচীন ভারতে প্রাচ্য জনপদের বিস্তৃতি ছিল কাশী, কোশল, বিদেহ ও মগধ পর্যন্ত। তাহলে তাম্রলিপ্ত, প্রাসী বা প্রাচ্য জনপদের বহির্ভূত অংশ হিসাবে গণ্য করা যায়। ম্যাকডোনাল্ড ও কিথ এই উক্তির সমর্থনে মন্তব্য করেছেন,[৫৩]—'It is very probable that the Kashi, Kosalas. Videhas and perhaps Magadhad are meant, as Oldenburg supposes.'

তাম্রলিপ্তকে প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত অনুমান করলে মেগাস্থিনিসের বহুকাল পরে রচিত, বৃহৎসংহিতা (১৪শ অধ্যায়), পরাশর সংহিতা ও সমাস সংহিতার মতে কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষ পর্যন্ত সমস্ত জনপদই প্রাসী বা প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধরে নেওয়া উচিত এবং গঙ্গারিডি নামে কোন জনপদই ছিল না। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রাঢ়-বঙ্গ জনপদ বৈদিক আর্যদের নিকট অপাঙক্তেয় ছিল। দু-একজন বিদেশী লেখক ভুলক্রমে তাম্রলিপ্ত প্রাসীর মধ্যে অবস্থিত বলে উল্লেখ করলেও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র এর বিরোধী স্বাক্ষর বহন করছে।

প্রকৃতপক্ষে মহাপদ্মনন্দের পূর্বেই মগধ, অঙ্গ, রাঢ় পাটলিপুত্রের অধীনস্থ ছিল এবং বিম্বিসারের রাজত্বকাল হতে মহাপদ্মনন্দের সময় পর্যন্ত এই জনপদগুলি একই রাজার অধীনস্থ ছিল।[৫৪] সেজন্য বিদেশী লেখকগণ প্রাচ্য ও গঙ্গারিডিকে এক রাজার (নন্দ রাজার) অধীনস্থ দেশরূপে উল্লেখ করেছেন। অন্ততঃপক্ষে মেগাস্থিনিসের সময়েও এই জনপদগুলি চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্তি হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ মিলছে। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে—[৫৫] 'The Greeks call him the King of the Gangaridae and the Prasii, The former were the people occuping the delta of the Ganges.'। এই উক্তির দ্বারা কি ভাগীরথীর প্রবাহপথের ইঙ্গিত মিলছে না? খ্রীস্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ শতকে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনা অঞ্চল যে মগধের অধীনস্থ ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নাই, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

(৪)

গঙ্গারিডি জনপদের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশের ভূ-প্রকৃতি ও নদীগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। বঙ্গদেশের দক্ষিণ অঞ্চল নদীবহুল ও পলিগঠিত ভূ-ভাগ এবং এই ভূ-ভাগের মানদণ্ডস্বরূপ গঙ্গা-ভাগীরথী নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। গঙ্গানদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাঢ় জনপদ গঙ্গার প্রবাহপথের পশ্চিমে অবস্থিত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে—'সুহ্মাঃ রাঢ়ঃ'; অর্থাৎ এখন রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ দেশটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সুহ্ম দেশরূপে অভিহিত হয়েছে। পৌরাণিক বিবরণে জানা যায় যে, সরস্বতী-ভাগীরথীর প্রবাহপথেই গঙ্গানদী প্রবাহিত হত। মৎস্য পুরাণে আছে—

'পাঞ্চালান্ কৌশিকান্ মৎস্যান্ মাগধাঙ্গ স্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈব চ॥

এতান জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভা।
ততঃ প্রতিহতা বিন্ধ্যে প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্॥' ১২১।৫০-৫১

অনু: গঙ্গা নদী, পাঞ্চাল, কৌশিক, মৎস, মগধ, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি আর্য্যজনপদকে পবিত্র করেছেন এবং বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণ সাগরে মিলিত হয়েছে।

তা'হলে মৎস্য পুরাণের বর্ণানুসারে গঙ্গা নদী মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্ত জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। বঙ্গদেশের যে অংশে গঙ্গার প্রবাহপথের সৃষ্টি হয়েছে তা বঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্ত জনপদ হিসাবে পরিগণিত। ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্ত জনপদ হল রাঢ়ের অংশ অর্থাৎ গঙ্গানদীর প্রবাহপথের পশ্চিম অংশ রাঢ় এবং পূর্বাংশ হল বঙ্গ। উইলিয়ম উইলকক্স[৫৬] ব্যতীত প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে, ভাগীরথীর খাতই প্রাচীনতর এবং পদ্মানদীর খাত পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে (১১৪ অধ্যায়) ও রঘুবংশে (৪/৩৬) সাগরসঙ্গমরূপে যে স্থান বর্ণিত আছে তা নিঃসন্দেহে ভাগীরথীর খাতকেই নির্দেশ করে। এস. সি. মজুমদার-এর মতে ভাগীরথীর খাত, পদ্মার খাত অপেক্ষা প্রাচীনতর।[৫৭] স্টিভেনসন মুর কমিটির মতে,[৫৮]—"The main Bhagirathi Channel of the Ganges gradually deteriorated, and presumbly the branches which must have run to the eastward into the delta improved correspondingly, until it is surmised that about the beginning of the 16th century the main stream definitly took a south-eastern direction."

ড়: রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতেও ভাগীরথীর খাতই ছিল প্রধান এবং অন্ততঃ-পক্ষে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই খাতের তীরে তাম্রলিপ্ত প্রসিদ্ধ বন্দররূপে বহির্ভারতে পরিচিত ছিল।[৫৯] O.H.K. Spate-এর মতে ভাগীরথীর খাত ছিল প্রাচীন ও প্রধান এবং পরবর্তীকালে গঙ্গার জল পদ্মার খাতে প্রবাহিত হওয়ায় পদ্মা প্রবল আকার ধারণ করে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত মিনহাজ উদ্দিনের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে[৬০] যে, বঙ্গদেশ দু'ভাগে বিভক্ত, যথা-রাল ও বরিন্দ এবং দুটি জনপদের মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল। গুপ্তযুগে গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী বর্দ্ধমানভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমারেখা রচনা করেছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে জানা[৬১] যায় যে, তিনি কজঙ্গল হতে গঙ্গা অতিক্রম করে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং তথা হতে করোতোয়া নদী অতিক্রম করে কামরূপ গিয়েছিলেন এবং কামরূপ হতে সমতটের পথে কোন বড় নদী অতিক্রম করার বিষয় জানা যায় না। তাম্রলিপ্ত আগমনের জন্য তাঁকে গঙ্গা নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাহলে দেখা যায় যে, পঞ্চম শতক হতে অন্ততঃপক্ষে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল প্রধান এবং পদ্মা কোন উল্লেখযোগ্য নদী ছিল না।

সে কারণে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন[৬২]—'It may therefore, be presumed that from the earliest time within the historical period the Bhagirathi was regarded as the main branch of the Ganges.'

গঙ্গানদীর খাত যদি গঙ্গারিডি জনপদের পূর্ব সীমা হয়, তাহলে এটি গঙ্গার ভাগীরথী শাখার খাত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক হতে গঙ্গার প্রধান ধারা পূর্বমুখে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে সাগরে মিলিত হওয়ায় ভাগীরথীর খাত গৌণ নদীরূপে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনতার দিক থেকে বিচার করলে উভয় দিকে একই সময়ে দুটি খাতের সৃষ্টি হয় নাই। গঙ্গা বা ভাগীরথী ও পদ্মা বা পদ্মাবতী, একই ধারার দুটি নদী হলেও পবিত্রতার দিকে প্রাচীন-প্রধান ধারাটিই শ্রেষ্ঠ। এমন কি গার্ডেনরিচের নীচে (দক্ষিণে) সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত গঙ্গার জলকে স্থানীয় লোকে পবিত্র বলে গণ্য করত না, যেমনটি কালীঘাটের আদিগঙ্গা বা কলিকাতার গঙ্গার (ভাগীরথী) জল পবিত্র। পদ্মার জলধারাকে পবিত্র জল বলে গণ্য করা হয় না।[৬৩] এ প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণাও করা হয়েছে।

তাম্রশাসন, প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক বিবরণ হতে প্রমাণিত হয় যে গঙ্গা, জাহ্নবী বা ভাগীরথী নামে এবং পদ্মা স্বনামেই পরিচিত ছিল। মৎস্য পুরাণের উল্লেখ থেকে অনুমান করতে বাধা নেই যে, অন্ততঃপক্ষে মৎস্য পুরাণ রচনার সময়ে পদ্মাখাতের সৃষ্টি হয় নাই। সর্বপ্রথম দশম-একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর তাম্রশাসনে সতট-পদ্মাবতী বিষয়-এর উল্লেখ আছে।[৬৪] মহাভাগবত, বৃহদ্ধর্ম ও দেবীভাগবত নামক উপপুরাণগুলিতে এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণে পদ্মানদীর পরিচয় জানা যায়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থসমূহ ত্রয়োদশ হতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। কেবলমাত্র আবুল ফজল ও ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থ বা মানচিত্রে পদ্মার খাতকে গঙ্গানদী নামে উল্লেখ করেছেন। কারণ ঐ সময়ে পদ্মার খাত ছিল প্রধান খাত। বার্ণিয়ের বিবরণে এ কথার সমর্থন মেলে। অপর পক্ষে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কাহিনী ব্যতীত অন্যান্য বিবরণেও গঙ্গার পরিবর্তে জাহ্নবী বা ভাগীরথীর উল্লেখ আছে। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে আদিগঙ্গার খাত জাহ্নবী নামে উল্লিখিত[৬৫] এবং তৎপূর্বে তাঁর পিতৃদেব বল্লালসেনের আমলে সম্পাদিত নৈহাটী তাম্রশাসনে গঙ্গাকে 'সুরনদী' বলা হয়েছে।[৬৬] দ্বাদশ শতকে রচিত ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে বর্ণিত আছে যে, সুহ্ম জনপদে যমুনা নদী, গঙ্গা হতে নির্গত হয়েছে (শ্লোক-৩৩)। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভাগীরথীর খাত পদ্মার খাত অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং প্রাচীন বিবরণে প্রাপ্ত গঙ্গা নদী অর্থে ভাগীরথী খাতকেই নির্দেশ করছে।

ভাগীরথী বা গঙ্গা কি বরাবর একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল? উৎসস্থল হতে প্রয়াগ পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর সরযূ নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটি উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর গঙ্গা নদী পূর্বমুখে

প্রবাহিত হয়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তর অংশ অতিক্রম করে দক্ষিণমুখে সাগরে মিলিত হয়েছে। ফার্গুসনের মতে, প্রায় ৫০০০ হাজার বছর পূর্বে গঙ্গা রাজমহলের নিকট সাগরে মিলিত হত। পরবর্তীকালে গঙ্গা বিধৌত পলিরাশির দ্বারা গাঙ্গেয় বদ্বীপ গঠনের সময়ে রাঢ়ের পূর্বাঞ্চল ধরে দক্ষিণমুখে গঙ্গার প্রবাহপথের সৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গার প্রবাহপথের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রয়াগের দক্ষিণে এর প্রবাহপথ হওয়া উচিত ছিল অথবা বিহারের সুলতানপুরের নিকট জাহাঙ্গীরে জহ্নু সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই দক্ষিণ-পূর্বভাগে প্রবাহিত হতে পারত। কিন্তু এ পথে প্রবাহিত না হওয়ার ইঙ্গিত মৎস্য পুরাণে পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণ মতে 'ততঃ প্রতিহতা বিন্ধ্যে প্রবিষ্ঠা দক্ষিণোদধিম্'।

বর্তমানকালের মানচিত্রে দেখা যায় যে, গঙ্গার বামপার্শ্বে গৌড়নগর অবস্থিত। কিন্তু গ্যাস্টলডির মানচিত্রে দেখা যায় গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে গৌড় বা লক্ষণাবতী নগরী অবস্থিত।[৬৭] তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থেও এর সমর্থন মেলে। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে গঙ্গা কালিন্দীর খাতে এবং নিম্ন প্রবাহে সরস্বতীর খাতেই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবাহিত হত। বিশিষ্ট নদী-বিজ্ঞানী এস. সি. মজুমদার সরস্বতীকে গঙ্গার মূল শাখা বলেছেন,[৬৮]—'I found that this river, which now looks like a gutter, was originally a big river thus carroborating the view that the Saraswati was branch of the main Ganges, as there is no other delta builder on this side of the country which could thou of a branch of this side.'

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'The main current of the Ganges till the 16th century, streamed through Saraswati.'। বিদেশী লেখকগণের বিবরণীতেও প্রমাণিত হয় যে, আদিগঙ্গার খাত আরও পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছিল।

পৌরাণিক বিবরণ হতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে কৌশিকী বা কুশী নদী নেপাল হতে নির্গত হয়ে বিহার ও উত্তরবঙ্গ অতিক্রম করে ত্রিস্রোতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হত। এফ. এ. শিলিংফোডের মতে কৌশিকীর একটি ধারা বাংলাদেশের উর-সাগরের নিকট হতে দক্ষিণমুখী হয়ে মধুমতী নামে সাগরে মিলিত হয়েছে, যার শেষাংশের নাম হরিণঘাটা নদী। পরবর্তীকালে কৌশিকী লোৎনরহাঁরতে গঙ্গায় মিলিত হলে ঐ বিপুল জলধারা ভাগীরথীর খাতে বহনের অসমর্থতার জন্য পূর্ব-দক্ষিণমুখী পদ্মার খাত খুলে যায়। নন্দলাল দে-র মতে, সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের পর কোন এক সময়ে পদ্মার খাত কোন উল্লেখযোগ্য নদীখাত ছিল না।

উইলকক্সের মতে এক সময়ে দামোদর নদ বর্ধমান, রানাঘাট ও যশোহর হয়ে সাগরে মিলিত হত।[৬৯] তাহলে ভাগীরথীর পূর্বতীরের এই খাত পরবর্তীকালে

যমুনা নামে পরিচিত হয়েছিল এবং রামচন্দ্রপুরের নিকট হতে ইছামতী নামে অপর একটি দক্ষিণমুখী ধারা সাগরে মিলিত হয়েছে। যমুনা নদী গোবরডাঙ্গা, বসিরহাট, হাসনাবাদ, দেবহাটা (বাংলাদেশ) অতিক্রম করে বঙ্গালপাড়ায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পশ্চিমভাগ কালিন্দী ও পূর্বভাগ যমুনা নামে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। কালিন্দীর সঙ্গে রায়মঙ্গল নদী মিলিত হওয়ায় নিম্নাংশও রায়মঙ্গল নদী নামে পরিচিত। যমুনা নদী ঈশ্বরীপুরের উত্তরে পুনরায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমভাগের ধারাটি ধূমঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিশেছে এবং যমুনার মোহনাটি রায়মঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বমুখী ধারাটি মালঞ্চ নদী নামে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। যমুনা, ত্রিবেণী হতে নির্গত হয়ে যে স্রোতপথের সৃষ্টি করেছিল ঐ খাত বর্তমানে শুষ্ক এবং এটি বাঘের খাল নামে পরিচিত। যমুনার ধারা চৌবেড়িয়া, জলেশ্বর ও গোবরডাঙ্গা ঘুরে দক্ষিণদিকে পদ্মা (গঙ্গার শাখা হতে পৃথক একটি খাত) নামক শাখা বিস্তার করে চারঘাটের কাছে টিপির মোহনায় ইছামতীর সঙ্গে মিশেছিল।[৭০]

অনেকের মতে মহানন্দা যেখানে পদ্মায় মিশেছে তার অপর পারে পদ্মা হতে ভৈরব নামক এক প্রবল জলধারা নির্গত হয়েছে। এ ইঙ্গিত থেকে মনে করা যেতে পারে, যে সময়ে পদ্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল না সেই সময়ে মহানন্দা সোজাসুজি সাগরে মিলিত হত। ভৈরবের একটি শাখা কপোতাক্ষ নামে পরিচিত (রেনেল—কোবদুক) খাতে ভৈরবের অধিকাংশ জলপ্রবাহের ফলে মূল ভৈরবের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেছে। মাথাভাঙ্গা নদী হতে (আলমডাঙ্গার নিকট) নির্গত হয়ে কুমার নদী (স্থানীয় নাম পানগাসী) নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং একট স্রোতপথের দ্বারা গড়াই-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৭১] মাগুরা শহরের উত্তরাংশে মুচিখানা নামক একটি খালের জল নবগঙ্গাকে পুনর্জীবিত করেছে। কুমারের অধিকাংশ জল নবগঙ্গার খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়। আবার অনেকে অনুমান করেন যে হিমালয় হতে নির্গত হয়ে পুনর্ভবা নদী যশোহর-খুলনা জেলার পূর্বপার্শ্ব ধরে সাগরে পড়েছে। পদ্মা নদীর প্রবাহের ফলে পুনর্ভবা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিম্নাংশ মধুমতী নামে খুলনা ও বাখরগঞ্জের সীমারেখা রচনা করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। মধুমতীর ৩৭০ কি: মি: প্রবাহপথের পর মোহনাটি (২১°৫২´ উ: অ: ও ৮৯°৫৯´ পূ: দ্রা:) হরিণঘাটা নদী নামে পরিচিত। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, কূর্ম, বায়ু ও বরাহ পুরাণে কৌশিকী বা কুশী নদীর সঙ্গে ত্রিস্রোতা, করতোয়া ও লৌহিত্যের যোগাযোগের ফলে পদ্মাখাত সৃষ্টির পূর্বে কুশী বা কৌশিকী নদী গৌড়ের উত্তরভাগ বরাবর বরেন্দ্রভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত।[৭২] বর্তমান কুশী নদী নেপাল হতে উৎপন্ন হয়ে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় গঙ্গায় মিশেছে। পার্জিটার কৌশিকী-করতোয়া, কৌশিকী-ত্রিস্রোতার উল্লেখ করেছেন।[৭৩] ১৮৭৫

খ্রীস্টাব্দে এফ. এ. শিলিংফোর্ডের পর্যালোচনায় জানা যায় যে, কুশী বা কৌশিকী অতীতে কুশী নদী করতোয়া ও আত্রেয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রধান ধারাটি হরিণঘাটা মোহনা দিয়ে সাগরে মিলিত হোত এবং অপর একটি ধারা ব্রহ্মপুত্রের ধারার সঙ্গে মিশে যায়। এই সময়ে গঙ্গা বা ভাগীরথীর সঙ্গে কুশী নদীর কোন সম্পর্ক ছিল না।[৭৪] কিন্তু সপ্ত-কৌশিকীর বিপুল জলধারা বিহারের পুর্নিয়া জেলার জ্যোৎনরহরিতে মিলিত হলে গঙ্গার খাত সম্মিলিত জলধারা বহনে অক্ষম হওয়ায় ঐ সময়ে পূর্বমুখী একটি খাতের সৃষ্টি হয় যা বর্তমানে পদ্মা নামে পরিচিত। শিলিং-ফোর্ডের পর্যালোচনা মেনে নিলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে, অন্ততপক্ষে মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচনার সময়ে পদ্মার খাতের কোন অস্তিত্ব ছিল না। নন্দলাল দের মতে,[৭৫] খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের পরে কোন এক সময়ে পদ্মার সৃষ্টি হয়েছিল; একথা আগেই বলা হয়েছে। যে সময়ে পদ্মার সৃষ্টি হয় নাই, তখন হিমালয়ের পাদদেশ হতে উৎপন্ন নদীগুলি উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরও দক্ষিণে সাগরে মিলিত হত। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে অন্ততঃপক্ষে সেই পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলার নদনদীর আলোচনা প্রসঙ্গে সরস্বতীর খাতের পর্যালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ত্রিবেণী থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমভাগের ধারা সরস্বতী নামে পরিচিত এবং সরস্বতীর জলধারা হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বর্তমান ভাগীরথীর খাতেই প্রবাহিত হত এবং এই খাতের পশ্চিমতীরে ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। গঙ্গারিডি জনপদের আলোচনা প্রসঙ্গে সরস্বতীর খাত ও আদিগঙ্গার খাতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। অন্ততঃ-পক্ষে ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে, দুটি খাতের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তারও প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বিপ্রদাস পিপলাই-এর বিবরণে এ কথারও সমর্থন মেলে।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির প্রবাহপথ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্তমানে সুবর্ণরেখা নদীর সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগসূত্র নাই। অথচ সুবর্ণরেখা নদীর মোহনাকে অনেকে গঙ্গার প্রথম মোহনা হিসাবে নির্দেশ করেছেন। পঞ্চম শতক পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত যদি সমুদ্র-বন্দররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে থাকে তাহলে কাঁসাই বা কংসাবতী নদীর সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ এবং এই নদীর মোহনাকেও গঙ্গার অপর এক মোহনা হিসাবে সনাক্ত করা যায়। সরস্বতী নদীর প্রবাহপথ ভাগীরথীর খাতে পরিণত হয়েছে এবং এই খাতের ধারে ও সমুদ্রের সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গমস্থলেই ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। সরস্বতীর খাত নামে পরিচিত ধারাই ছিল গঙ্গার প্রধান খাত। দু'হাজার বছর পূর্বে দামোদরের দক্ষিণমুখী ধারার যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তাহলে ঐ ধারার সঙ্গে গঙ্গা বা সাগরের কি সম্পর্ক ছিল সেটা নির্ণয় করা সম্ভবপর হলে অপর একটি মোহনার সন্ধান মিলতে পারে।

আদি গঙ্গার প্রবাহপথের অস্তিত্ব একাদশ-দ্বাদশ শতকেও ছিল এবং তার প্রমাণ মেলে লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে। এছাড়া ইছামতী/কালিন্দী যমুনার মোহনা হতে আরও পূর্বদিকে অনেক বড় নদীর মোহনার সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্য দিয়ে জাহাজ প্রবেশ করার সম্ভাবনা ছিল। রেনেলের মানচিত্রের দিকে তাকালেই এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু দু'হাজার বছর ব্যবধানে নদীগুলির প্রাচীন প্রবাহপথের অস্তিত্ব খুঁজে বের করার যে প্রচেষ্টা হওয়া উচিত ছিল তা আদৌ হয় নাই। যমুনা, সরস্বতী, দামোদর, আদিগঙ্গা তাদের প্রাচীন স্রোতপথ হারিয়ে ফেলেছে। এই সকল স্রোত-পথের সন্ধান না করেই কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির চর্বিতচর্বণকে গলাধঃকরণ করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে নন্দলাল দে যেভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম মোহনার পর্যালোচনা করেছেন সেটা নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নহে।

সমগ্র নিম্নবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী সাগরে মিশেছিল এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের গঠন প্রণালী হতে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ লোকশ্রুতির উপর ভরসা করে টলেমী সুদূর আলেকজেন্ড্রিয়ায় বসে গঙ্গা নদীর পাঁচ মোহনার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন, আর এতদ্দেশীয়গণ অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় বাদানুবাদ সম্বল করে প্রকৃত তথ্য হতে দূরে সরে গেলেন!

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে সমগ্র নিম্নবঙ্গের কোন মানচিত্র পাওয়া যায় না এবং ঐ মানচিত্রে ভাগীরথীর মোহনা হতে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বহু সুনাব্য নদনদীর পরিচয় জানা যায়। তবে একথাও বলা যায় যে, রেনেলের সময়ে উল্লিখিত নদ-নদীগুলির সঙ্গে তার দেড় হাজার বছর পূর্বে বর্ণিত মোহনাগুলির সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অঞ্চলের কোন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সমগ্র নিম্নবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদী মোহনাগুলির মধ্যে সুবর্ণরেখা (২), কংসাবতী, দামোদর (২), আদিগঙ্গা, বড়তলা, সপ্তমুখী, জামিরা, মাতলা, গোসাবা, ইছামতী, হাড়িভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, যমুনা, মালঞ্চ, আড়পাঙ্গাসিয়া (কপতাক্ষ+শাক-বেড়িয়া), শিবসা, বাঙ্গড়া, শিলা, ভোলা, হরিণঘাটা (গড়াই+মধুমতী), বিশখালি, আড়িয়াল, তেঁতুলিয়া, মেঘনা (পদ্মা+ব্রহ্মপুত্র) প্রভৃতি নদীর মোহনাগুলি এক সময়ে প্রশস্ত ও সুনাব্য ছিল। তাহলে কেবলমাত্র টলেমীর বর্ণনার ওপর নির্ভর করে গঙ্গার পাঁচ মোহনাকে নির্দেশ করার অর্থ হল ঐতিহাসিক ভূগোল আলোচনার অপমৃত্যু ঘটানো।

(৫)

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন 'গঙ্গরিদই' নামের সঙ্গে গঙ্গাল বা বঙ্গাল নামের সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গঙ্গরিদই শব্দটিকে বঙ্গাল শব্দের সাদৃশ্যে আনুমানিকভাবে গঙ্গাল শব্দ

হতে বিদেশী তৈরী নাম বলে অনুমান করেছেন। আবার সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,[৭৬] "বঙ্গাল শব্দের সঙ্গে বঙ্গ শব্দের অর্থঘটিত যোগ আছে, আনুমানিক গঙ্গাল শব্দের সঙ্গে গঙ্গা শব্দের যোগও কতকটা সেই মত। বঙ্গাল মানে বঙ্গ-ঋদ্ধ অর্থাৎ প্রচুর কার্পাস পুষ্ট দেশ হলে, গঙ্গাল মানে গঙ্গা ঋদ্ধ অর্থাৎ গঙ্গাপুষ্ট দেশ হতে বাধা নাই।" বাধা নিশ্চয়ই আছে। গঙ্গা ঋদ্ধ অর্থে গঙ্গা পুষ্ট দেশ হলে হরিদ্বার হতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা-অববাহিকা অঞ্চলকে গঙ্গাল দেশ বলা উচিত এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও লেখমালায় 'গঙ্গাল' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (অধ্যক্ষ প্রচার, ২৯শ প্রকরণ, ২।১১), অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বাঙ্গক দেশে দুকুল বা ক্ষৌম বস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্র উৎপন্নের কথা বলা হয়েছে। কেবলমাত্র বঙ্গাল অর্থে বঙ্গ-ঋদ্ধ দেশকে বোঝালে কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনকারী সকল স্থানকেই বোঝান উচিত।

বঙ্গাল শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ৭২৭ শকাব্দে (৮০৫ খ্রীস্টাব্দ) রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেসরিক শাসনে এবং উক্ত শাসনে ধর্মপালকে বঙ্গাল রাজরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে কলচুড়ি-চেদীরাজ কর্ণের শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, দশম শতকের মধ্যভাগে লক্ষণরাজ বঙ্গাল দেশ জয় করেছিলেন।[৭৭] আবুল ফজলের মতে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' যোগ করে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি হয়েছে। এদেশের প্রাচীন রাজারা দশ হাত উচ্চ ও বিশ হাত চওড়া বাঁধ বা আল নির্মাণ করতেন।[৭৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গঙ্গার উপকূলবর্তী রাষ্ট্রকে গঙ্গারাষ্ট্র বলা যেতে পারে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে গঙ্গারাট বা গঙ্গারাঢ় হয়েছে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হয়ে রাট্ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত হয়ে থাকবে। গঙ্গারাঢ়ও সেজন্য রাঢ় শব্দে দাঁড়িয়েছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী গঙ্গারাঢ়ী সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, গঙ্গা তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীগণ এরূপ সংজ্ঞা লাভ করেছিল।[৭৯]

গঙ্গারিডি বা গঙ্গরিডি শব্দটি কি খ্রীস্টপূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল? প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ কোন শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। গ্রীক বা রোমান বিবরণীতে গঙ্গার তীরবর্তী ও সন্নিহিত অঞ্চলের স্থান-নাম প্রসঙ্গে গঙ্গা ও রিড দুটি শব্দের গঠিত একটি শব্দ পাওয়া যায়। ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিকের মতে,[৮০]— "গঙ্গারিডি বা গঙ্গরিডই কোন মৌলিক স্থান নাম নয়। গ্রীকদের দেওয়া একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্য তৈরী করা নাম। তাঁর মতে 'রিড' শব্দটি মূলত অষ্ট্রো-এশিয়াটিক কোল গোষ্ঠীর ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ও দক্ষিণ বিহারে এক সময়ে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল। যারা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী জাতির বংশধর বলে পরিচিত। কোল ভাষায় রোড় শব্দের অর্থ পাথরের নুড়ি। রোড়হাসা শব্দের অর্থ পাথুরে মাটি। রোড় দিশম্ অর্থে পাথরের মাটির দেশ এবং পাথুরে মাটির দ্বারা গঠিত অঞ্চল রোড় দিশমের অন্তর্ভুক্ত। রোড়

শব্দ হতে ঝাড়খণ্ডীদের রড়া বা লড়া শব্দের পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আরও পরে লাঢ় বা রাঢ় শব্দটি এসেছে। রাঢ় শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হতে জাত শব্দ নয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়া' নামে একটা শব্দ আছে, যার অর্থ পাথুরে জমি। 'রাঢ়া' শব্দটির পরিবর্তিত রূপ রাঢ়। অনুরূপভাবে, বাংলার আদিম নিবাসী কোন সাঁওতাল গোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা বঙ্গ এবং দেবীর নাম বঙ্গী হতে বঙ্গ শব্দটি এসেছে বলে অনুমিত হয়। সুকুমার সেন বলেছেন যে বঙ্গস্কন্ধ হতে বঙ্গাল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, বঙ্গ শব্দের অর্থ কার্পাস। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচনার বহু পূর্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে হীন জাতি হিসাবে, অর্থাৎ এই বঙ্গ জাতি ছিল আর্য সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত এবং স্বাধীন জাতি। সুতরাং কার্পাস অর্থে বঙ্গের ব্যবহার অপেক্ষা জাতি অর্থে বঙ্গের ব্যবহার প্রাচীন।

অনুরূপভাবে, রাঢ় বা রুঢ় শব্দ হতে প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ ছিল 'লাঢ়'। ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে কখন কখন 'রি' উচ্চারিত হয় 'রু' হিসাবে। রাঢ় বা রুঢ় শব্দ গ্রীকদের দ্বারা রিঢ>রিড উচ্চারিত হয়েছিল এবং রাঢ় বা লাঢ় শব্দ হতে জাত গ্রীক শব্দ রিড-এর পূর্বে গঙ্গা এই নদীবেষ্টিত ভূখণ্ডটি গঙ্গারিডি নামে উচ্চারিত হয়েছিল গ্রীক ও রোমানদের দ্বারা। ডঃ ভৌমিক আরও মন্তব্য করেছেন— "আসলে রাঢ়, রূঢ় বা লাঢ়া দেশ, বিদেশীদের দ্বারা কিভাবে উচ্চারিত হয়েছে তা ভারতীয় সাহিত্যিকরা জানতেন। এতবড একটা দুর্ধর্ষ জাতি ও দেশ, যার পূর্বসীমায় গঙ্গানদী প্রবাহিত, সেই রাঢ়দেশের ভাষা অর্থাৎ মাগধীর পূর্বাঞ্চলীয়রূপ, আর বাংলাভাষা প্রায় এক। ভাষাতত্ত্বের বিচারে রাঢ়-এর সঙ্গে গঙ্গা নদী সম্পর্কযুক্ত হয়ে গঙ্গরিডি হয়েছে।" কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদগণ সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে কৃত্রিম উপায়ে আর্যীকৃত করতে গিয়ে মূল অর্থ বা মেগাস্থিনিস ও ডিয়োডোরাসের বক্তব্য হতে দূরে সরে গিয়ে নূতন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। কেবলমাত্র টলেমীর অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে এই জনপদের বিস্তৃতিকে পদ্মার মোহনা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া কি ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা? "এক কথায় গঙ্গারিডই যে গঙ্গা রাঢ় অর্থাৎ রাঢ়ভূমি আর পশ্চিমবঙ্গ যে তার বৃহৎ অংশ, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

(৬)

গঙ্গারিডি জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হতে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত গ্রীক ও রোমান লেখকগণের বিবরণের ওপর যে সকল পর্যালোচনা হয়েছে তাতে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। ডিয়োডোরাসের বিবরণে পাওয়া যায় যে, গঙ্গা বা ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে গঙ্গারিডি জনপদের বিস্তৃতি ছিল। পরবর্তীকালে প্লিনি ও কার্টিয়াসের বর্ণনায় আছে যে, কলিঙ্গ ও গঙ্গারিডি জনপদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল এবং সমসাময়িক ইতিহাসে ভাগীরথীর পূর্বভাগের সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্কের বা যোগসূত্রের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পেরিপ্লাসের নাবিকের বর্ণনায় গঙ্গা অর্থে ভাগীরথীকেই নির্দেশ করছে। কেবলমাত্র টলেমীর বিবরণে গঙ্গার পাঁচ মোহনার উল্লেখ আছে এবং গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে গঙ্গারিডি রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। কিন্তু পাঁচ মোহনার অবস্থিতি বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। পণ্ডিতগণ সুবর্ণরেখার খাত হতে পদ্মা-মেঘনার খাত পর্যন্ত যে সকল অসংখ্য নদনদী প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে যেকোন পাঁচটি মোহনাকে বেছে নিয়ে স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরা সমগ্র নিম্নবঙ্গের অসংখ্য নদনদীর কোন পর্যালোচনা ব্যতীত পাঁচ মোহনার নির্দেশ করেছেন। অথচ যে বিবরণের উপর এই পর্যালোচনাগুলি হয়েছে তার অন্যতম প্রধান বর্ণনাকারী টলেমীর এ অঞ্চল সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না এবং প্রদত্ত বিবরণের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশগুলিও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ।

রাঢ়ের পশ্চিমাংশ ও বিহার রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জুড়ে এক বিশাল প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং প্রত্নক্ষেত্র হতে আবিষ্কৃত তামা, ব্রোঞ্জ ও লোহার ব্যবহারের নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে এই অঞ্চলে এক সংস্কৃতিবান জাতি বসবাস করত, যাদের অস্তিত্ব ভাগীরথীর পূর্বতীরে পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞের ভাষায়—"পূর্বকালে এই প্রদেশে (বঙ্গ) সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরবঙ্গ। যুগের পর যুগ তাম্রলিপ্ত, মহাস্থান, বর্দ্ধমান, কোটিবর্ষ, বিজয়নগর, ভূরিশ্রেষ্ঠ, কর্ণসুবর্ণ, গৌড় ও নবদ্বীপ বাংলার গৌরবের উত্তরাধিকারী।" তাঁর আরও মন্তব্য—"পূর্ববঙ্গে কর্মাণ্ড ও শ্রীবিক্রমপুর এই দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়িয়া দিলে সমতলভূমির অধিকাংশ মুসলমান যুগ পর্যন্ত জঙ্গল ও জলাভূমিতে সমাকীর্ণ ছিল।"[৮১]

পদ্মা নদীকে যাঁরা গঙ্গার শেষ মোহনা হিসাবে মত প্রচারে বদ্ধপরিকর তাঁরা কিন্তু একটা বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রাচীনকালে পদ্মার খাতে গঙ্গার জলপ্রবাহ এবং পদ্মার খাত সৃষ্টি সম্পর্কে আদৌ আলোকপাত করেন নাই। এমন কি কৌশিকী বা কুশী নদীর ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য সঙ্গমের বিষয়েও তাঁরা নীরব। যদিও পুরাণে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে কৌশিকী প্রবাহের বিষয় বর্ণিত আছে।

গঙ্গা নদীর মোহনার সন্নিকটে 'গঙ্গে বন্দর' এবং সন্নিহিত জনপদটি 'গঙ্গারিডি' রাজ্য হলে, এই রাজ্যের বিস্তৃতি ভাগীরথী-আদিগঙ্গার খাতের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলেই ছিল বলে অনুমান করা যায় এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শতকে যমুনা নদীর প্রবাহপথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এরূপ মনে করাই সঙ্গত। ভাগীরথীর প্রবাহপথ হতে যমুনা নদীর প্রবাহপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উত্তর হতে দক্ষিণে প্রবাহিত নদীসমূহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশকে গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত করার মানসে তাঁরা সরস্বতী, আদিগঙ্গা, মাতলা, ইছামতী, যমুনা প্রভৃতি নদীর মোহনাগুলি সম্পর্কে একেবারেই নীরব। আবার পদ্মাকে শেষ মোহনা হিসাবে গণ্য করেও ঐ অঞ্চলের জনবসতি ও ভূতাত্ত্বিক আলোচনা সম্পর্কে তাঁরা একেবারেই নিশ্চুপ।

W.B. Oldham গঙ্গারিডির অধিবাসীগণ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে জানা যায় যে, একালের বাগদীজাতিই ছিল গঙ্গারিডি অঞ্চলের মুখ্য অধিবাসী।[৮২] এই জাতির মূল বাসস্থান বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হুগলী ও হাওড়া জেলায় গড়ে উঠেছিল। তবে কি ঐতরেয় আরণ্যকে উল্লিখিত বগধ জাতি কি বাগদী জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল? বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় *Suria Maller* বা মাল পাহাড়ীগণ রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল হতে এসে এতদঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। মেগাস্থিনিসের বর্ণিত *ubrai* জাতি হল বাউরী সম্প্রদায়, যাদের প্রধান বাসস্থান রয়েছে বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়।

রমাপ্রসাদ চন্দের দ্বিতীয় মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, পার্থেলিসের অবস্থিতি বর্তমান বর্ধমান শহর বা সন্নিকটবর্তী স্থানে এবং গঙ্গারিডি-কলিঙ্গের মধ্য দিয়ে গঙ্গার প্রবাহপথ ছিল, তাহলে গঙ্গারিডি রাজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাঢ় অঞ্চলে। পরবর্তীকালে ভাগীরথী খাতের কিছুপূর্বে বিস্তার লাভ করা সম্ভাব্য মনে করা যেতে পারে। এ বিষয়ে স্বর্গত পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত 'The Gangaridae : A Forgotten Civilization' নামক সুবৃহৎ প্রবন্ধে মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে ডঃ রায়চৌধুরীর উক্তি দিয়ে আলোচনাটিকে বেড়াচাঁপার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক করে তুলে যথাকর্তব্য শেষ করেছেন। স্বর্গত অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী একদিকে মেগাস্থিনিস ও ডিয়োডোরসকে বাদ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তিনি সরস্বতী, আদিগঙ্গার খাত ও উইলকক্স বর্ণিত দামোদরের যশোহরমুখী খাত সম্পর্কে (যমুনা) একেবারেই নীরব।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থের রাজবৃত্ত অধ্যায়ে গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের বিবরণের উল্লেখ করেও মূল আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র টলেমীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে কামবেরীখোন ও কুমার নদী অভিন্ন এবং গঙ্গা নগর ও রাজধানী কুমার নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে কুমার বা হরিণঘাটা নদীর মোহনা অঞ্চল কি জনবসতিপূর্ণ ছিল অথবা পেরিপ্লাসের নাবিকের বর্ণনা কি ভাগীরথী বা আদিগঙ্গার তীরবর্তী কোন স্থানকে নির্দেশ করে না? ডিয়োডোরাসের বিবরণের তিনি যে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন, তার সঙ্গে মূল বক্তব্যের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এ প্রসঙ্গে যমুনা নদীর খাতের পূর্বসীমা হতে পদ্মা-মেঘনার পশ্চিম অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে কোন অনুসন্ধান না করেই তিনি ডঃ ভট্টশালী ও ডঃ রায়-চৌধুরীর তথ্য নিজের কথায় প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু পেরিপ্লাসের নাবিকের বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে, এ জনপদের মূলকেন্দ্র ছিল রাঢ় অঞ্চলে; এ দিক দিয়ে বিচার করলে—**The trend of these ethnological speculations seems to favour the theory that the modern districts of Burdwan, Hooghly and Bankura**

with considerable portions of Midnapore and the Santal Parganas, constituted the major part of the country of Gangraidae.'[৮৩]

অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীও, নন্দলাল দে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যার অনুসৃত পথেই গঙ্গারিডি রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে,[৮৪] 'Some have tried to equate the name with an Indian equivalent for Gangā-Rādha. The first part of the word undoubtedly stands for the Indian equivalent Gangā while the latter part of the word appear very close to Rādha, a name which stands for the area closely approximating the area indicated by the classical writers by the word Gangaridāi or which Parthalis i.e. Vardhamāna had been the capital'.

কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক এই সঙ্গে বাংলাদেশকে যোগ করায় বিতর্কটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। আবার অনেকে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুণ্ড্র জাতিকে (মহাভারত ও বিষ্ণু পুরাণ) ও ২৪-পরগণা জেলার বর্তমান পোদ জাতিকে এক ও অভিন্ন মনে করেছেন, যার পৌরাণিক বর্ণনার কোন সমর্থন মেলে না।

গঙ্গারিডি প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ কিছুটা আলোকপাত করেছেন এবং তাঁর মন্তব্যে জানা যায়,[৮৫]—"গঙ্গারিডই রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ কেবলমাত্র রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাঙ্গালার অপর দুইটি বিভাগ পুণ্ড্র এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গারিডই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্লিনি (মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া) লিখিয়া গিয়াছেন—গঙ্গানদীর শেষভাগ 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ' রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী পার্থলিস।" কিন্তু স্বর্গত চন্দের অভিমতকে পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। কারণ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রাঢ়ের অধিপতি যে মগধের মৌর্য রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, রাঢ় ও কলিঙ্গ খারবেলের পূর্ব পর্যন্ত মগধের অধীনস্থ ছিল। স্বর্গত হেমচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেন,[৮৬]—"Whatever may be the ethnic and cultural affinity of the people of Bengal and Bihar, it is certain that the political ralationship between them was sufficiently intimate. Thus when we enquire into the history of the different political and geographical division of this region, such as Magadha, Videha, Anga, Vanga, Smatata, Pundra, Gauda, Radha, Sumha etc., we find that from the beginning of imperialism in the 5th and 4th centuries BC. excepting periods of political disintegra-

tion they have been generally under the administration of one government. The absorption of Anga by Magadha in the reign of Bimbisara was the first important step in the the development which culminated in the establishment of the Nandas as rulers of the Prasii and the Gangaridae." তাহলে উপরিউক্ত এ মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসহ ওড়িশা ও বাংলাদেশের কিয়দংশ, কে বোঝাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়,[৮৭]—"The country called Gangā, was obviously on the coast of the Bay of Bengal through which the river Gangā flows, through different channels, into the sea. So the river was all around the country, which certainly included parts of littoral West Bengal contiguous to Orissa and perhaps some parts of coastal Bangladesh. The country had as if "the Ganga at its heart", which is also alluded to by the name Gangarid (ae) <Gangarida<Gangahrida. Thus the names "Gangaridai territory" and "Ganga Country" denoted essentially the same coastal land. The territory of the Gangaridai, like Ganges country, had within its limits a city called Gangā"

গঙ্গারিডি জনপদের বিস্তৃতি সম্ভবতঃ সকল সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। মগধ বা কলিঙ্গের রাজশক্তির ক্ষমতার উপর এ রাজ্যের বিস্তৃতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছিল। সে কারণে মৌর্য যুগ হতে কুষাণ আমল পর্যন্ত এ রাজ্যের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে নানা ধরনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে টলেমীর বর্ণনার প্রাধান্য দিয়ে ঐতিহাসিক-ভূগোলিক পর্যালোচনাকে বিকৃত করা হয়েছে। যদি গ্রীক বা রোমান লেখকগণের বিবরণে কোনরূপ সত্যতা থাকে, তাহলে ঐ সকল বিবরণ হতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, এই জনপদের বিস্তৃতি ছিল সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা হতে যমুনা নদীর মোহনা পর্যন্ত এবং সময়ে সময়ে ওড়িশা ও বিহার রাজ্যের কোন কোন অংশ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। গঙ্গার প্রবাহপথের পশ্চিম ভাগে গঙ্গারিডি রাজ্য, গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ সম্পর্কযুক্ত রাজ্য, তাম্রলিপ্ত বন্দর, অগনগর, কটদ্বীপ, গঙ্গে বন্দরের (সপ্তগ্রাম) অবস্থিতি হতে সহজেই বলা যায় যে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিংভূম, মানভূম, ২৪-পরগণা ও যশোহর-খুলনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে আদিতে গঙ্গারিডি রাজ্য গঠিত ছিল। পদ্মার খাতের সঙ্গে এ রাজ্যের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। আর এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হতে হলে টলেমী ব্যতীত অন্যান্য বিবরণসমূহকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর নহে; সে কারণে প্রাপ্ত বিবরণগুলির উদ্ধৃতিসহ একত্রে এই কালানুক্রমিক পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হ'ল।

পাদটীকা :

১। *H. C. I. P.* (*The Age of Imperial Unity*), p-60.
২। *The Early History of India*—Vincent A. Smith, p-118.
৩। পালপূর্বযুগের বংশানুচরিত—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃঃ ৭৯।
৪। *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*—J. W. MacCrindle, p-32; Indian Antiquary, 1921, p-34.
৫। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ (সাক্ষরতা প্রকাশন) পৃঃ ৪৩০-৩১।
৬। *The Classical Accounts of India*—Dr. R. C. Majumder, p-172-73.
৭। *Ibid*, p-128.
৮। *History of Ancient Bengal*—p 29.
৯। গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি—ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ, পৃঃ ২৩।
১০। *The Ganges Delta*—Kanan Gopal Bagchi, p. -7.
১০ক। *The Classical Accounts of India*—p. 198.
১১। *The Early History of India*, p. 66; অন্য মতে এটি 'Gandoris'.
১২। *The Periplus of the Erythraean* Sea—(Tr) H. Schoff, p. 47.
১৩। *The Classical Accounts of India*—p. 341-42.
১৪। *Ancient India as described by Meg. and Arrian*—p. 136-37.
১৫। গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃঃ ৩।
১৬। পালপূর্বযুগের বংশানুচরিত—পৃঃ ৭৫-৭৯; *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*—D. C. Sircar, p. 213-24.
১৭। *Cunningham's Ancient Geography of India*—Ed. S. N. Majumder Sastri, p. 66.
১৮। *Indian Antiquary*, 1884 (*Ptolemy's Geography of India and Southern Asia*)—p. 375-77.
১৯। গঙ্গারিডি-ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, নরোত্তম হালদার, পৃঃ ৪৬।
২০। *Landscape System*, Vol. 10, No. 2, p. 66.
২১। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৩০।
২২। *The Geo. Dict. of Ancient and Mediaeval India*—N. L. Dey, p. 164.
২৩। *Indian Historical Quarterly*, 1928, p. 45.
২৪। *Epigraphia Indica*, Vol-IV, p. 283,
২৫। *I.H Q*, 1927, p. 729.

২৬। *Some Hist. Aspects of the Insc. of Bengal*—B. C. Sen, p. 31.

২৭। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩।

২৮। গৌড় রাজমালা—পৃঃ ৪।

২৯। পালপূর্বযুগের বংশানুচরিত, পৃঃ ৭৫-৭৭।

৩০। *Landscape System*, Vol. 10, No. 2, p. 68.

৩১। *Ancient India as described by Meg. and Arrian*, p. 137.

৩২। *History of Orissa*, Vol. I, R. D. Banerji, p. 1-2.

৩৩। *J.B.O.R.S*, Vol. III, Part-IV, p. 45-58.

৩৪। *Bihar Through Ages*—Dr. R. R. Divakar, p. 108.

৩৫। *Ibid*, p. 191.

৩৬। *Cunningham's Ancient Geography of India*, p. 59[illegible].

৩৭। *Ibid*, p. 594.

৩৮। *Indian Antiquary*, Vol. L, p. 43.

৩৯। *Pilgrimage of Fahian*, p. 360 ; *On Yuan Chwang's Travels in India*—Thomas Watters, Vol. II, p. 190.

৪০। *Indian Antiquary*, Vol. XIII, p. 364.

৪১। *Studies in the Geo. of Ancient and Med. India*, p. 218-19.

৪২। *Geology of India*—D. N. Wadia, p. 395.

৪৩। *J.A.S.B*, 1876, p. 72-73.

৪৩ক। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫২০।

৪৪। *Quoted in I.H.Q.* Vol. XXII, p. 128-29

৪৫। *Ibid*, p. 213-24.

৪৬। *S.H A.I B*, p. 22-35.

৪৭। *Cunningham's Ancient Geography of India*, p. 662.

৪৮। *H.C.I.P. (Vedic Age)*, p. 66.

৪৯। *The Classical Accounts of India*, p. 351.

৫০। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১০৬।

৫১। *S.H.A.I B*, p. 35.

৫২। *Encyclopedia Britanica*, Vol. IX, p. 776.

৫৩। *Vedic Index*—Macdonell and Keith, Vol. I, p. 46.

৫৪। *History of India*, Vol. I, H. C. Roy, p. 272.

৫৫। *A Comp. History of India*—Ed. K. A. Nilkantha Sastri, p. 6.

৫৬। *Lectures on the Ancient System of Irrigation in Bengal*—Sir William Willcocks, p. 10.

৫৭। *Rivers of Bengal Delta*—S. C. Majumder, p. 65-68.
৫৮ *D. R. Bhanderkar Volume*—Ed. B. C. Law, p. 343.
৫৯ *Ibid* p. 345
৬০ *Tabkat-I-Nasiri*—J. Reverty, p. 584-5.
৬১ *Buddhist Record of the Western World*—S. Beal, p. 193-201.
৬২ *D. R. Bhanderkar*, Volume p-346.
৬৩ *Ibid*, p. 345.
৬৪ *Inscriptions of Bengal*, Vol-III—N. G. Majumdar, p. 167.
৬৫। *Ibid*, p. 97.
৬৬। *Ibid* p. 74-79.
৬৭। *J. A. S B.* 1908, p. 282.
৬৮। *Rivers of Bengal Delta*, p. 107.
৬৯। *Ibid*, p. 12.
৭০। যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড—সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ: ২৪।
৭১। *Imperial Gazetter of India, Provincial Series, Bengal*, p. 221.
৭২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯৩ সাল, পৃ: ৯ ('বঙ্গে সরস্বতীর প্রায় বিলুপ্ত প্রবাহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।
৭৩। *Geographical Essays Relating to Ancient Geography of India* —Dr. B. C. Law, p. 94-95.
৭৪। *J. A. S. B.* 1895, 72-3.
৭৫। *The Geo. Dict. of Ancient and Med. India*—p. 97.
৭৬। বঙ্গ ভূমিকা—সুকুমার সেন, পৃ: ১১-১২।
৭৭। *I. H. Q.* Vol-XXIII, p. 63.
৭৮। *Ain-I-Akbari*, Vol, 2, p. 132.
৭৯। পৃথিবীর ইতিহাস : ৪র্থ খণ্ড—দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ: ১৬৩।
৮০। কৌশিকী, ১৯৯৩ সাল, পৃ: ৭।
৮১। বাঙলা ও বাঙালী—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—পৃ: ৪২-৪৪।
৮২। *Some Hist. and Ethnical Aspect of the Burdwan Dist.* p. 2.
৮৩। *S. H. A. I. B.* p. 31.
৮৪। *Howrah in Perspective*—K. K. Ganguli, p. 12-13.
৮৫। গৌড় রাজমালা, পৃ: ২৬।
৮৬। *History of India*, Vol-I, p. 272.
৮৭। *Landscape System*, Vol-10, No. 2, p, 67.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

[ইংরাজী]

Abul Fazl-I-Allami. *Ain-I-Akbari*, Vol. I. Tr. H. Blochmann, Calcutta, 1927. Vol. II, Tr. H. S. Jarrett. Ed. Sir J. N. Sarkar, Calcutta, 1949,

Agarwala, V. S. *Matsya Puran. A Study*, Varanasi, 1963.

Ali, S. M. *The Geography of the Purans*, New Delhi, 1983.

Archaeological Survey of India *Epigraphia Indica*, New Delhi, Vols. I, IV, XI, XIX, XXII, XXIII, XXVI.

Bagchi, K. G. *Ed. Bhagirathi-Hooghly Basin*, Calcutta, 1972.

Beal, Samuel. *Buddhist Records of the Western World*, (in 2 Vols.), New Delhi, 1981.

Banerjee, R. D. *History of Orissa* (in 2 Vols.), Calcutta, 1930.

Barooah, Anundaram, *Ancient Geography of India*, Gauhati, 1971.

Bhatt, M. R. *Brihat Samhita* (in 2 Vols,) New Delhi.

Blochmann, H. *Contributions to the Geography and History of Bengal (Mohammadan Period)*, Calcutta, 1968.

Bose, S. C *The Astādhyāyi of Pānini* (Vol 2), New Delhi, 1980.

Chaudhuri, Dr. A. K. *Sibi King Vessantara, His Country and Cultural Heritage*, Calcutta, 1974.

Chakraborty, Monamahan. *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal* (1757-1916), 1918, Calcutta.

Chatterjee & Others, Ed. *West Bengal*, 1970, Calcutta.

Chunder, Bholanath. *The Travel of Hindoo*, Vol. I, 1868.

Cowell, E. B. *The Jatak*, Book-I, London, 1895.

Dani, A. *Prehistory and Protohistory of Eastern India*, 1981.

Dasgupta, P. C. *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi*, Calcutta, 1964.

Dey, N. L. *The Geographical Dictionnary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927.

Fahian, *Pilgrimage (Eng. Tr.) of Fahian*, Calcutta, 1912.

Fousboll, V. *The Jatak*, Vol. VI, London, 1896,

Ganapati Shastri, T. Ed. *Aryya Manjusrimulakalpa*, Trivandrum, 1920.

Ganguli, Dr. Kalyan Kr. *Howrah in Perspective*, Nabasan, 1981.

Geiger, Wilhelm *The Mahavamsa* (Eng. Tr.), Colombo, 1950.

Ghosh, A. *An Encyclopadia of Indian Archaeology* (in 2 Vols.) New Delhi, 1989.

Govt. of West Bengal. *Dist. Census Hand Book, Burdwan*, 1971.
" *Dist. Census Hand Book, Bardhaman* 1981.

Hamilton, B. *Geo. Statistical and Hist. Description of Hindoosthan* (in 3 Vols.) London, 1820.

Hamilton, Walter, *The East Indian Gazetter of Hindostan*, (Vol. I) London 1828

Harcourt, L. F. V, *Report on the River Hooghly*, Calcutta, 1897.

Hazra, R. C. *Studies in the Upapurans* (in 2 Vols), Calcutta.

Hill, K. A. L. *Final Report on the Survey and Settlement opperation in the District of Burdwan*, Vol-I, (1927-34) Calcutta.

Hunday & Banerjee, *Geology* and *Mineral Resources of West Bengal*, Calcutta, 1967.

Hinter, W. W. *Statistical Account of Bengal*, Vol-IV, London, 1876.
Imperial Gazetters of India, Vol-IX & XXVI, London, 1908.
The Annals of Rural Bengal, London, 1897.

Hussian, Dr. Shahanara, *Every Day Life in the Pala Empire*, Dacca, 1968.

Jayaswal, K. P. *Imperial History of India*, Lahore, 1934.

Law, B. C. *The Historical Geography of Ancient India*, Paris 19 8.
D. R. Bhandarkar Volume, 1940, Calcutta.

Levi, Sylvain and others. *Per-Aryan and Pre-Dravidian in India*, Calcutta.

Macdonell and Keith *Vedic Index of Names and Subjects*, (in 2 Vols.) New Delhi, 1982.

Majumder, N. G. *Inscriptions of Bengal*, Vol.3, Rajshahi, 1929.

Majumder Dr. R. C. *History of Aucient Bengal*, Calcutta, 1971.
The Classical Accounts of India, Calcutta, 1981.

Ed. History of Bengal, Vol. I, Dacca, 1943.
Ed. The History and Culture of the Indian People, in II Vols. Bombay.

Majumder Sastri, S. N. *Cunningham's Ancient Geography of India*, Calcutta, 1924.

McCrindle, J. W. *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*, Calcutta, 1960.
Ptolemy's Geography of India and Southern Asia, (Published in the Indian Antiquary, 1884).

Mitra, Asoke *Dist. Census Hand Book, Burdwan*, Calcutta, 1953.
An Account of Land Management in West Bengal, 1953.
West Bengal Dist. Records (New Series), Burdwan : Letter Received (1788-1800), Calcutta, 1955 ; *Letter Issued* (1788-1800), Calcutta, 1956.

Mitra, Debala *Buddhist Monuments*, Calcutta 1984.

Mookerji, Radha Kumud *The Changing Face of Bengal*, Cal. 1938.

Mukhopadhyay, S. C. *Ed. Geographical Mosaic*, Calcutta, 1985.

Mukherjee, S. N. *A Brief Agricultural Geography of W. B.*, 1956.

Oldham, W. B. *Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District*, Calcutta, Ed. 1891 & 1894.

Pandey, M. S. *The Historical Geography and Topography of Ancient Bihar*, Delhi, 1963.

Peterson, J. C. K. *Bengal District Gazetteers, Burdwan*, 1910.

Rajguru, S. N. *Inscriptions of Orissa*, (In 6 Vols.), Bhubaneshwar.

Raverty, H. G. *Tabkāt-I-Nāsiri* (In 2 Vols.), 1881.

Rennell, James *Memoir Map of Hindoostan*, Calcutta, 1976.

Ridley, Michael *The Seal of A E Γ E A and the Minoan Scripts*, Calcutta, 1963.

Roberts, Major Fred *Routes on the Grand Trank Road from Fort William to Peshawar*, Calcutta, 1862.

Roy, Parimal Kr. *Agricultural Economics of Bengal*, Part-I, Calcutta, 1947.

Roy Chaudhuri, G. C. *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1972.

Sarkar, Sir Jadunath *Military History of India*, Calcutta, 1970.

Sastri, Ajay, *India as seen in the Brihat Samhita of Baraha Mihir*, Delhi, 1969.

Sastri, Haraprasad *Ramcharitam of Sandhyākarnandi*, Calcutta, 1969.

Sen, Amulya Ch. *Asoka's Edicts*, Calcutta, 1956.

Sen, B. C. *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*, Calcutta, 1942.

Seton Karr, W. S. *Selections from Calcutta Gazettee*, Vol. 1, 1864.

Shamsud-din Ahmed *Inscriptions of Bengal*, Vol. 4, Rajshahi, 1960.

Sinha, B. P. *Decline of the Kingdom of Magadha*, Patna, 1954.

Sircar, Dr. D. C. *Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India*, Delhi, 1971.

Cosmography and Geography in Early Indian Literature, Calcutta, 1967.

Spate, and Learmonth *India and Pakisthan*, London, 1972.

Tawney, C. H. *The Ocean of Story*, New Delhi, 1968.

Thakur, Umakant *The Geographical Information in the Skandha Puran*, Darbhanga, 1979.

Toynbee, George *A Sketch of the Administration of the Hooghly District*, Calcutta, 1888.

Wadia, D. N. *Geology of India*, London, 1961.

Wattars, Thomas *On Yuan Chwang's Travels in India*, Delhi, 1973.

Willcocks, Sir William *Lectures on the Ancient System of Irrigation in Bengal*, Calcutta, 1930.

Yule and Burnell *Hobson-Jabson*, Calcutta, 1986.

[বাংলা]

কবিরাজ, কৃষ্ণদাস—চৈতন্যচরিতামৃত (সাঃ অকাঃ সং), ১৯৭৭ ।
গুপ্ত, অম্বিকাচরণ—জয়কৃষ্ণ চরিত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলী, ১৩০৮ ।
ঘোষ, ডঃ প্রভাতকুমার—গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, কলিকাতা, ১৯৮৮ ।
ঘোষ, শৈলেন—গৌড় কাহিনী (২ খণ্ড), কলিকাতা, ১৮৮৪ শকাব্দ ।
ঘোষ, বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১ম খণ্ড-১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৪ ।
চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত—গৌড়ের ইতিহাস (২ খণ্ড), ১৯০৯।
চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম—ধর্মমঙ্গল (কলিঃ বিশ্বঃ সং), কলিকাতা, ১৯৬২ ।
চক্রবর্ত্তী, মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য অকাঃ) ১৩৯২ ।
—ঐ (বসুমতী), কলিকাতা, ১৩৭০ ।
চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ—দুর্গাপুরের ইতিহাস, দুর্গাপুর, ১৯৮৪ ।
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—কল্পসূত্র (অনুঃ), কলিকাতা, ১৯৫৩ ।
চন্দ, রমাপ্রসাদ—গৌড রাজমালা, কলিকাতা, ১৯৭৫ ।
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ : প্রবন্ধ (সাক্ষরতা প্রকাশন), কলিকাতা
চৌধুরী, নারায়ণ ও সেন, অনুকূল—বর্ধমান পরিচিতি, কলিকাতা, ১৩৭৩ ।
দাস, হরিদাস—শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবদ্বীপ, ৪৭১ চৈতন্যাব্দ ।
দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র—প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, কালিকাতা, ১৯৮১ ।
—প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, কলিকাতা, ১৯৬৮।
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন—বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল, কলিকাতা, ১৩১৫ ।
—মধ্যযুগের বাঙ্গলা, কলিকাতা, ১৩৩০ ।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস—বাঙ্গালার ইতিহাস (২ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭১ ।
বসাক, রাধাগোবিন্দ—রামচরিত (মূলসহ অনুঃ) কলিকাতা, ১৩৬০ ।
—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড), কলিকাতা ১৯৬৪, ১৯৬৭ ।
বসু, আশীষ—বাংলায় ভ্রমণ (২ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৪০ ।
বোথরা, হীরাকুমারী—আচারঙ্গ সূত্র (অনুঃ), কলিকাতা, ২০০৯ বিক্রমাব্দ ।
বসু, নগেন্দ্রনাথ—বিশ্বকোষ (২২ খণ্ড) ১ম সং, কলিকাতা।
—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), কলিকাতা ১৩২১ ।
— ঐ (ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড), কলিকাতা ১৩০৫ ।
—বর্ধমানের পুরাকথা, কলিকাতা ১৩২১ ।
—কবি বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল, (সম্পাদিত) কলিকাতা, ১৩২২ ।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ—সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২ খণ্ড) কলিকাতা, ১৩৭৭ ।
ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য—সমাজ বিজ্ঞানীর ভূগোল, কলিকাতা, ১৯৭৭ ।
ভট্টাচার্য, কপিল—বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, কলিকাতা, ১৯৫৯ ।

মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস—বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, বর্ধমান, ১৩২১।
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল—বাঙলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৪৭।
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ—গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯০২।
মিত্র, অশোক—পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, (সম্পাদিত) ৫ম খণ্ড (বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা), নিউ দিল্লী, ১৯৮২।
মিত্র, সতীশচন্দ্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস (২ খণ্ড) ১৩৩৫, ১৩৭২।
মিনহাজ-ই-সিরাজ—তবকাত-ই-নাসিরী (বঙ্গানুবাদ), ঢাকা, ১৯৮৩।
মৈত্র, কালিদাস—বাষ্পীয়কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে, শ্রীরামপুর, ১৮৫৫।
রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা, ১৯৮০।
রায়, সঙ্কর্ষণ—ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৫।
সর্বাধিকারী, তিমিররঞ্জন—ভারতের শিলাস্তর ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস, কলিকাতা।
সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র—শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২।
—পালপূর্বযুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা ১৯৮৫।
সেন, দীনেশচন্দ্র—বৃহৎবঙ্গ (২ খণ্ড) কলিকাতা, ১৩৪২।
সেন, ডঃ সুকুমার—বঙ্গভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪।
—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৬২।
—বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, (সম্পাদিত) কলিকাতা, ১৯৫৩।
সেনগুপ্ত, শঙ্কর—বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয় (১ম খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৮৫।
সেনগুপ্ত, সুপ্রিয়—নদী, কলিকাতা, ১৯৮২।

[সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা]

Calcutta Review.
Journnl of Asiatic Society of Bengal.
Memoirs / Reports of the Geological Survey of India.
Ancient India (A. S. I.).
Indian Archaeology : A Review (A. S. I.).
Indian Historical Quarterly.
Indian Antiquary.
Bulletin of the Anthropological Survey of India.
Jain Journal, Calcutta.
Heritage of Burdwan, Burdwan.
Steel India, Durgapur.
Indian Bradshaw.
অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৩২১।
বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী সংখ্যা।
বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা।
সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা।
বর্ধমান পরিচিতি (স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৯৫৪।
'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'।
'প্রবাসী' পত্রিকা।
'ভারতবর্ষ' পত্রিকা।
'মাসিক বসুমতী' পত্রিকা।
'কৌশিকী'।
'ভ্রমণ'।
'অনুষ্টুপ'।
'অন্বেষা'।
'আনন্দ সাহিত্য পত্রিকা,' উত্তরপাড়া।
'শারদীয়া বিজয় তোরণ,' বর্ধমান।
'শারদীয়া বর্ধমান,' বর্ধমান।

নির্ঘণ্ট

অগ্রদ্বীপ ৪৬, ৫৭, ৭০, ১৭৪-৬, ১৯৯, ২০০, ২৬৯
অঙ্গদপুর ১৫১, ১৫৫
অঙ্গারপুর ২৩৭
অঙ্গারসোল ৫৭
অজয় নদ ৬০-৭৪, ৯৪-১০৩, ১১৯-৩৬, ২০৪-৭
অট্টহাস ১০৩
অণ্ডাল ১৪, ১৯৩, ২১০
অম্লিতপুর ১৭৪, ১৭৮
অপার মন্দার ১০৪, ১৬৮
অমশাল ২২৪
অম্বলগ্রাম ২২৩
অর্জুনবাড়ী ৭৯, ২০৫
অম্বিকগ্রাম ৯৭

আউসগ্রাম ১৩, ৪০-৪৬, ১২৬, ১৭৫
আউসা ১৫৫
আকনা ২৪১
আজমৎশাহী ৯, ১৩
আটঘরিয়া ১৮৪
আড়া ১০৪, ১৪৬
আড়া ১৩৮
আড়িয়াদহ ২৪২
আমাদপুর ২৪৮
আমারুণ ১৩৭
আমিরপুর ৮০
আমিল্যা ১৭২
আলকুশ ২২৪
আলমপুর ১৭৩-৫
আসানসোল ১৪-১৭, ৩৭-৪০, ১৮৮, ১৯৩, ২২৪
আহ্লাদী ১৭৩, ১৭৬

ইছাপুর ২৪১
ইন্দ্রাণী ৬৮-৯, ১৯৯-২০১, ২৩৩
ইলসরা ২২৬
ইলামপুর ২১৬

ঈশ্বরপুর ১০৮

উখরা ১৭৩, ১৭৬
উচকরণ ২২২
উচালন ১৮৭-৮
উচ্ছাল ১০৪
উজানী ৬৮-৯, ১০২-৩, ২৩০
উত্তররাঢ় ৯৩-৪, ১০৫
উদয়পুর ২৪৮
উদ্ধারণপুর ২২৩, ২৩৮

ঋজুপালিকা ৯৫-৬, ২০৭
ঋজুর বিল ৯৬

একলাকি ১৮৭
এনায়েৎপুর ১৮৫, ২২৩
এরুয়ার ১০৭, ১১৯, ১৪৭

ওকরসা ২১৩
ওরগাঁ ১৭৫
ওসমানপুর ১৭৮

কঙ্কগ্রামভুক্তি ৯৩
কংস নদী ৯৬
কজঙ্গল ১৬৭
কটক ১৭০-১
কড়ুই ১৭৫
কর্জনা ১৬৫, ১৭২, ১৮৮
কর্ণগড় ১৭৭
কর্ণসুবর্ণ ১০৩, ১৬৫-৭
করন্দা ২১১-৩
কলিকাতা ১৬, ৬৮, ৮২, ১৭৪, ১৮২, ২৩৪
কলিঙ্গ ২৬২-৪, ২৮০-৩
কলিঙ্গনগর ১৬৬
কল্যাণপুর ২১৯
কল্যাণেশ্বরী ৫৭, ২২৪
কাইতি ২১৯
কাকনা ২৩৭
কাগ্রাম ১৭৮
কাজলদিঘি ৭৯
কাজলাডিহি ২০৪
কাঞ্চননগর ১০৭, ১১১, ২৪৪
কাটোয়া ২-৫, ১০-১৪, ১৭৬-২০১, ২১০, ২২৩
কাটাসিন ১৬৯
কানা নদী ৬২, ২২১
কানা দামোদর ৬২, ২২৭
কান্তনগর পরগণা ৫৮
কামদেবপুর ২০২
কামনারা ১৭৩-৫
কামারডাঙ্গা ২১৬
কামালপুর ২১৪
কামালের খাল ২২৮
কাঙ্গলিয়া নদী ২১৩
কালনা ২-৫, ১২-১৪, ১৮৮-২০২
কালিকাপুর ১৪৭, ২২৪
কালিঘাট ২৪২
কালিডাঙ্গা ২২১
কালি-গর ২০২
কালিপাহাড়ী মঞ্জুলা ২২৪
কাশীজোড়া ১৭২
কাশীপুর ১৭৬
কাঠগোলাঘাট ১৮৭
কাষ্ঠশালী ২০০
কাঁকড়া ৬৯, ২৩৭
কাঁকসা ১৪, ৪৬, ১২২-৫, ১৪১, ১৪৮
কাঁকি ২১৯
কাঁকিনাড়া ২৪০
কাঁটাখাল ২২৬
কাঁটাটিকরী ১৫১
কাঁদড়া ১৯০
কুকড়াকুড়ি ২৯
কুকুয়াখাল ২২৫, ২৪৫
কুণ্ডরপুর ২৩৭
কুচুট ১৮৪
কুজি ২২৮
কুণ্ডিপুর ৯৫, ৯৮
কুমুর ৬২, ২১০
কুমারখালা ২৩৬
কুমারডিহি ২২৪
কুমারপুর ১৭৪
কুলগ্রাম ২২২
কুলটি ১৪, ৪১, ৫৮
কুলাই ২২৩
কুলিয়া ২৩৯
কুলীনগ্রাম ১০৭
কুলীনপাড়া ২৩৭
কুলুট ১০৭, ১৭০
কুসুমগ্রাম ১৮৮
কুসুমপুর ১০৮

কৃষ্ণনগর ৬০, ৭৭
কৃষ্ণপুর ৭৮
কৃষ্ণবাটী ১৭৪, ১৭৮
কেওড়া গ্রাম ১২২
কেতুগ্রাম ১০-১৬, ৫৭-৬২, ১০৩
কেতুমতী ১৬৫
কেদার ১৭১
কেদোখাল ২২১
কেশবগঞ্জ ২২৪
কৈচার ১৭৪, ১৯৩
কোটশিমূল ৮৯, ২৪৫
কোটা ১৭৫-৬
কোটালপুর ১৭১
কোড়াগ্রাম ১৯৭
কোতলপুর ১১-১৩, ১৭২
কোদালিয়া ২৪৩
কোন্নগর ২৪১
ক্ষীরগ্রাম ৩, ১০৩, ১৪৯, ১৭৫
ক্ষীরপাই ১৭৩, ১৮২

খটনগর ১২৭
খড়দহ ২৪১
খড়ি নদী ৫৬-৬৭, ১৩৬-৮, ২০৮-১০
খণ্ডঘোষ ৯-১৪, ৬৩-৪, ১০৭, ১৪৬
খাকসা ২৩৭
খাসপুর ২১৪
খুদিয়া ৬২, ২০৭
খেনাইবান্দা ২২৩

গঙ্গাডাঙ্গা ১০৭, ১৪৭
গঙ্গাধরপুর ২০১
গঙ্গানদী ৩৮, ৭৫, ৭৯, ২৫৫-৮২
গঙ্গারিডি ১০৮, ২৫১-৮৩
গঙ্গাসাগরসঙ্গম ১০১, ২৪৩, ২৬৫
গড়চুমুক ১৯৭
গড়পাড়া ২১৭, ২৩৭
গড়হরিপুর ১৭১
গড় মান্দারণ ১৭০-২, ১৭৬
গড়াগাছা ২১৩
গরুই ১০৭
গরিফা ২৪০
গর্জন ২২৯
গলসী ১৪-১৫, ১৫৩, ১৮১, ২০৮
গাঙ্গপুর ৬৯, ২১৩
গাঙ্গবাড়া ২৩৭
গাঙ্গুর ৬২, ৬৮, ৯১, ২১৫
গাঙ্গুরিয়া ১৩-৪
গাজীপুর ১৭১, ১৭৬
গারুলিয়া ২৪০
গিরিডি ৯৬
গুসকরা ৪৬, ১৪৭, ১৮৭-৮
গোকুলগঞ্জ ৭০
গোড়খালি ২০১
গোতান ৬৯
গোপালদাসপুর ২১৭
গোপালনগর ১৯৯
গোপালপাড়া ১৮১
গোপালপুর ১২৪-৫, ১৪৭
গোপীনাথপুর ২১৭
গোরাবাজার ৭৯, ২০৫
গোলাঘাট ১৭২
গোস্বামীখণ্ড ১০৭, ১১৯, ১৪৬
গোস্বামীডাঙ্গা ১৪৭
গোহগ্রাম ১৭৫-৬
গৌর নদী ৬২, ২২৮
গোরহাটা ১৮১-২
গৌরাঙ্গ নদী ৬২, ২২৮
গৌরাঙ্গপুর ১০৭, ১৭৫

গ্রামরক্ষীতলা ১৫৫
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ১৭৯-৮৩

ঘাটকুল ৫৮
ঘাটাল ১৭১
ঘিয়া ২১৩
ঘুঘুড়ি ২৪২
ঘোষহাট ২০২, ২১৪

চক কেশবগঞ্জ ২২৪
চকভুরা ২১৯
চক্রাতা ১৭৯
চণ্ডীগাছা ২৩৮
চণ্ডীতলা ১৭৪, ১৮২
চণ্ডীপুর ২২২
চন্দননগর ১৮১-২
চন্দ্রকোনা ১৭৭
চম্পাইনগরী ৫৭, ৭৯, ১৯৭, ২৩০
চর কালিডাঙ্গা ২০২
চর কাশিডাঙ্গা ২০০, ২০২
চরকি ৬৯, ২৩৭
চর চাকন্দি ২০০
চলবলপুর ১৮১
চাকদা ৬৯, ২৩৬
চাকলা বর্ধমান ৮-১১
চাণ্ডুলি ২১৪
চানক ২৪১
চালনা ২২৪
চাঁচাই ৭৯
চাঁদানদী ৬২
চাঁপদানী ২৪১
চিচুরবিল ৯৬, ২৪৫
চিত্তরঞ্জন ১৫, ৪১, ১৯৩
চিৎপুর ১৮১-২, ২৪২

চুরুলিয়া ৫৭, ১০৭, ১৭৬

ছত্রভোগ ২৪৩

জগদ্দল ২৪০
জঙ্গল মহল ১১
জঙ্গীপুর ১৭৬
জণ্ডিগাঁও ৯৫-৬, ১০৭
জয়রামপুর ৮০
জলসোথী ২২৩
জলেশ্বর ১৭৬
জাঙ্গীপাড়া ১৯৮, ২৪৫
জাজপুর ১৬৯, ১৭৭
জাড়গ্রাম ৬৮-৯, ২৪৫
জাড়া ১৭৭
জামগ্রাম ৯৬-৭
জামতাড়া ৯৭
জামদহ ৬৮, ২৪৫
জামনা ১৭৬
জামবন ১৭৩
জামবনী ১০৭
জামালপুর ১৫, ৬৩-৭৮, ৯৫-৬, ১৯৭, ২২০
জামুরিয়া ২১০
জালুইডাঙ্গা ২০১-২
জাহাঙ্গীরাবাদ ১৭০-৩
জাহাননগর ১৭৬
জিৎপুর ২০৪
জুজুটি ৬৭, ২১১
জুরাইপুর ২২২
জেতুওর ১৬৫
জোগ্রাম ৯৬, ১০৭, ২১১

ঝানজিরা ২১১
ঝাপানতলা ২১৪

ঝামটে ২৪৬

টিকর খাজি ২০২, ২১৪

ডাকাতী নদী ২২৭
ডাহুক ২১১
ডিঙ্গলহাট ২৪৫
ডিহর ১১৯, ১৫৪
ডিহিভুরশুট ১৯৭
ডুবি ২২৮

ঢাকচর ২১৬
ঢেকুর ৬৯, ১০৪-৫, ১৬৮

তকিপুর ১৭৬
তমলা নদী ২২৪-৫
তাম্রলিপ্ত ১০৩, ১১৯, ১৬৫-৭৬, ১৯৯, ২০৩ ২৭১
তুমুনি নদী ২২৫
তুর্কা কসবা ১৭১
তুলসীপুর ১১৯, ১৪০
তেঘরা ৬৯, ২৪৫
তেলিয়াগড়ি ১৬৫
তৈলকম্প ১৬৮

দক্ষিণখণ্ড ২২৪
দক্ষিণডিহি ২২৩
দক্ষিণ মোহনপুর ১৯৭
দক্ষিণ রাঢ় ৭, ৯২-৯৪
দধিয়া ২২২
দণ্ডভুক্তি ১০৫
দস্তপুর ১৬৬
দমদম ১৮১
দলুই বাজার ১৮১
দশঘরা ১৯৭, ২৪৫
দাউদপুর ১৭৫
দাদখানিদহ ২৪৬
দাদপুর ১৯৭
দামপাল ২০০
দামাগড়িয়া ৩৯
দামিন্যা ৩
দামোদর নদ ৫২-৮১, ১২৩-৪, ১৪৪, ১৬৫-৬৯, ১৯৭-৯, ২৪৪-৬, ২৬৫
দামোদরপুর ৭
দাঁইহাট ১৪, ৫৭-৭০, ১০৭, ১৮৭, ২০১
দাঁতন ১৭১
দ্বারকেশ্বর নদ ২২২
দিগনগর ৫৭, ১৬৯-৭৭, ১৮৭
দ্বীপা-দ্বারহাট্টা ১৯৭, ২৪৫
দুবরাজপুর ১৮৭, ২৪৭
দুয়ারী ৭৪
দুর্গাপুর ১৪-৭, ৩৫-৩৭, ৪৬, ৬২, ১০৪-৬, ১২৩, ১৪৭, ১৮৮-৯৭, ২১০, ২২৪
দেওয়ানগঞ্জ ৭০
দেওলহরি ৭১
দেখীড় ২৪৫
দেগঙ্গা ২৪০
দেনুড় ৫৭
দেপাড়া ২০২, ২১৪
দেপুর ৬৯, ১১৯, ১৫০
দেবখাল ৬২, ২২৬
দেবগ্রাম ১৬৮
দেবপুর ২১৫
দৌলতপুর ৬৭, ২৩৭
ধনটিকরী ১৪৭
ধনগু ২৪২
ধনিয়াখালি ১৭৪-৬, ২২১
ধর্মনগর ১০৫
ধানবাদ ১৭৯-৮১

ধেঞ্চা ৯, ১৩

নওয়াপাড়া ২০৮, ২১৯
নড়িহা ১২৩, ১৭৫-৬
নপাড়া ১৭৫, ২১৭
নপাড়া (২৪-পরগণা) ২৪১
নন্দনপুর ১৭৬
নন্দীগ্রাম ১৭৫
নবখণ্ড ৬৮, ২৪৭
নবদ্বীপ ১০, ৩৮, ৫৭-৯, ১৬৮-৭০, ১৮৬, ২৩৩, ২৩৮
নবাববেড় ১৮৭
নবাবহাট ৪
নয়াসরাই ৭৭, ১৭৪-৮, ২২১
নরেঙ্গা ২২৩
নাগরাকোন্দা ১৭৬
নাচনগাছা ২৪৬
নাদনঘাট ৬৭, ৭৩, ২০৮
নাদাই ২০৮
নান্নুর ১১৯, ১৫৩
নান্না ২১১, ২১৩
নারায়ণগড় ১৭৩
নারায়ণপুর ২২৪
নালিকুলি ১৭৪, ১৯৮, ২২২
নাহানজোড় ১৭১
নিগন ১৭৪-৫, ১৯৩
নুনিয়াখাল ৬২, ২২৪
নুনিয়াজোড় ২২৪
নিভুজি বাজার ২০১
নিমদহ ২০১, ২১৭
নিমাইতীর্থ ২৪১
নূতনগ্রাম ২০৯, ২২৪
নূতনপানপাড়া ২০১
নূতনহাট ৬৭, ১৪৮, ১৭০, ২০৪
নৃসিংহপুর ২২৪
নেড়াদেউল ১৭০, ১৭৩
নৈহাটি ৫৭, ৯৩, ১৭৩, ১৮৫, ২৩৪

পঞ্চাননতলা ২১৩
পদ্দিমপুর ১৪৮
পদ্মা নদী ৩৩, ২৫৯-৮০
পয়গাছি ২১৬
পরব্রতপুর ২২৪
পলশোনা ১৭৫
পলাশপুর ১৭১
পলাশী ১৭৭-৮
পাইকপাড়া ২৪০
পাটলিপুত্র ১৬৬-৬৬
পাটুলী ৫৭, ১৭৪-৮, ২০০-১
পাঠাননালা ৬২, ২০০
পাড়পুর ৬৯, ২৩৩
পাণ্ডবেশ্বর ৫৭
পাণ্ডুগ্রাম ২২৩
পাণ্ডুরাজার ঢিবি ৫৫-৬২, ৮৮, ১১৯-৩০, ১৩৮-৪০, ১৪৬-৪৯
পানশিউলী ২২০
পানাগড় ৩৮, ৭৬, ১০৬, ১৪৭, ১৮১, ১৯২
পাবা ৯৬-৭
পারহাটি ২১৩
পারুলিয়া ১৫৫
পার্থেলিস ১০৮, ২৮২
পালশিট ২১১-১৩
পাল্লারোড ১৭৪, ১৭৬
পাঁচড়া ৬৯
পাঁচপাড়া ১৭২
পাঁচলাকি ২১১
পাঁচুন্দি ১০৭, ১৪৬, ১৯৩
পাঁচেৎ ৯, ৭১, ৭২

পিলে ১৭৬
পীরাগ্রাম ২১৭
পুনতাল ২২৪
পুরগুণ ২১৩
পুরন্দরপুর ১৮৭
পুরস্বরা ১৭৫
পুরী ১৭০, ১৭৬-৭৭
পূর্বগ্রাম ৯৪
পূর্বস্থলী ৩৮-৪৭, ৫৭-৬৭, ১০৮, ২৩৮
প্রদ্যুম্ন ৯০-৯৪
পোষ্টগ্রাম ২১০
পৈটা ২১৯

ফ:ড়খাল ২১৩
ফরিদপুর ৫, ৪৬, ১৬৭, ২১০
ফুলঝুড়ি ১৭৫
ফুলুন ২২৩
ফুলিয়া ২৩৯

বকুলা ৬৮
বক্তার ঘাট ১৬৮
বজ্রভূমি ৮৮
বড়বাজার ১৪৮
বড় বাহারকুল ২১৭
বড় বেলুন ১৩৬
বড়শুল ৬৮, ৭৫, ২৪৪
বড়োয়াঁ ১০৯-১১
বন আগুড়িয়া ১২২
বনওয়াড়িবাদ ১২৩
বনকাটি ১০৭, ১০৯, ১২২
বনপাস ১৭৩
বনমালিপুর ৫৮
বন্দিপুর ১৯৯
বরাকপুর ১৭২
বরাকপুরের খাল ৬২
বরাকর ১০৭, ১৮৮-৯৩
বরাকর নদ ৪০-৪৬, ৫৮, ৬২, ২০৭-৮, ২২৪
বরাবনী ৫
বরেঞ্চা ১১০
বর্ধমান কোর্ট ১০০
বর্ধমানপুর ৮৭, ৯৯, ১০০, ১০৫
বর্ধমানভুক্তি ৭, ৯৩, ১০৪-৬, ২৭২
বর্ধমান (শহর) ১৪, ৯৭-৮, ১০০, ১০৮-১১, ১২৭, ১৭০-৯৩, ২৪৪, ২৪৭
বল্লুকা ৬২-৭৪, ১০৯-১০, ২১৪-১৬
বসন্তপুর ১৪৭, ১৫১
বাইতিপাড়া ২১৪
বাকসা ১৭৪-৫, ১৯০
বাকুলিয়া ২৩৭
বাগিলা ২১৭
বাঘাগুা ২৪৬
বাঘনাপাড়া ৫৭, ২১৪
বাণেশ্বরডাঙ্গা ১১৯, ১৩৬-৩৭
বাবলানদী ২২৪
বাবলাডিহি (শঙ্করপুর) ১৪৯
বামুনিয়া ৭৯
বারকোনা ২১৯
বারাসত ৮০, ১২৭
বারুইপুর ২৪৩
বালসিডাঙ্গা ১৭৫
বালিঘাটা ২৪২
বালিডাঙ্গা ১৭৪
বালুটিয়া ১৪৯, ২২৩
বাসুদেবপুর ১৭১
বাঁকা নদী ৬২, ৭৪, ৮১, ২১১-১৩
বাঁকি বাজার ২৪১
বিকিহাট ২০১
বীরভানপুর ৩৭-৮, ১০৬, ১১৯-২৫, ১৪৬

বুড়নিয়া ২৪১
বুদবুদ ৫, ১৮১, ১৮৭-৮
বেগুনকোলা ২৩৭
বেগুনিয়া ৩৯
বেগুয়া ৭৮
বেড়ুগ্রাম ৬৮, ২৪৫
বেতেডড্ চতুরক ১০৫, ১১৬, ২৪২
বেত্তাবগ্রাম ২১৯
বেনাড়ী ১৮১
বেরেণ্ডা ১৫১
বেলকাশ ১৭৫, ২১২
বেলনপুর ৬৯, ২৩৮
বেলপাহাড়ী ৭১
বেলুট ২১৭
বেলুনগ্রাম ২২৩
বেলেড়া ৬৯, ২৩৭
বেলেরহাট ১৭৪-৬
বেহুলা নদী ৬২, ৬৮, ৭৭-৮০, ২১৬-১৯
বোড়োবলরাম ৫৭, ২৪০
বোয়ালিয়া ২৪৮
বৈদ্যপুর ৬৯, ২১৭, ২৪৫
বৈষ্ণবঘাটা ২৪৩, ২৪৮
ব্রাহ্মণী নদী ৬২, ৭৪, ২০২, ২১৩-১৪

ভক্তনগর ১৮১
ভদ্রেশ্বর ২৪১
ভনওয়ারখাল ২০০
ভরতপুর ১০৬, ১১৯, ১৪৩-৪৫
ভাগীরথী ৩২-৪৪, ৫৭-৮২, ১০২, ১৯৭-২০৪
ভাণ্ডসিংহ ৬৯, ২৩৮
ভাটপাড়া ২৪০
ভাতাড় ৪
ভাতকুণ্ডা ১৭৫
ভাতুরিয়া ১৩
ভাল্কি ৫৭
ভেদিয়া ৭৩, ১২৬
ভৈটা ২১১
ভ্রমরকোলা ২২৩
ভ্রমরাদহ ২৩২, ২৩৬

মঙ্গলকোট ১৩-১৫, ৫২-৬২, ১০২, ১৪৭-৫৫ ১৬৫-৭০
মঙ্গলপুর ১৮১
মগধ ২৭১-৮৩
মগরা ৭৭, ১৭৯
মজলিসপুর ১৭২
মণ্ডলগ্রাম ১৪৬, ১৫৫
মণ্ডলঘাট ২৩৮
মতিবাগ ১১১
মতিসর ২১৫
মদনমোহনপুর ২২৪
মনোহরশাহী ৯-১৩
মন্তেশ্বর ৭৪, ১৭৪, ২০৮
ময়নাগড় ১৭৩, ২১৫
মরাইপিড়ি ১৭৪, ১৭৮
মলনদীঘি ১২৪
মল্লসারুল ৭, ১০৪, ১৬৭
মহব্বৎপুর ২২৩
মহানাদ ১৭০
মহিষদল ১২১-৩০, ১৩৯-৪০, ১৫৩-৫৪
মহিষমারা ২২৪
মহেশপুর ২৩৯
মাইথন ৭০, ৭২, ২০৮
মাঃনগর ১০৫, ২৪৩
মাড়ো ২০৮-৯
মাদপুকুর ২১৪
মাথরুণ ২১৩

মানকর ৬৮, ১৮৭, ২০৮-৯
মানকৌর ২৪৬
মানভূম ২৪, ১৩৯-৪০, ১৯৯
মায়া নদী ২১৯
মালগড়িয়া ১৭৮
মালিপাড়া ১৭৮
মালিয়াড়ী ২০৫
মাসির সাঁকো ১৮৫
মাস্থন্দি ২২৩
মাহেশ ২৪১
মির্জাপুর ১৭৩, ২০২, ২১১
মুণ্ডেশ্বরী নদী ৬৩, ৬৮, ১০৮, ২১৯-২১
মুণ্ডেশ্বরী খাল ৬৮, ২১৯
মেদগাছী ২১১
মেমারী ৩-৫, ৩৭-৪৫, ৬৩-৮৮, ১৭৩ ১৮১-৯২
মোগলমারী ১৭১-৭৬
মোরগ্রাম ১৮৭
মোরাদপুর ২১৩
মোলাড়ন্দি ২২৩
মোহনপুর ৫৮
মৌগ্রাম ২২৪
যমুনা নদী ২৭৫
রঘুনাথপুর ১৭৬
রাগুিয়া ৭৬
রতিকাটি ২২৪
রমাবতী ১৬৮, ১৭২-৩
রসুই ৬৯, ২৩৭
রসুলপুর ১৮১, ২১৭
রাইপুর ১৪৬, ১৫৫, ১৮৪
রাঙামেটে ২২৪
রাজনগর ১৬৮, ১৭৫
রাজবাঁধ ১৮৮
রাজারডাঙা ১০৭, ১৫৭
রাজারপোতা ১৫১ ১৫৫
রাঢ় ৩২-৩৩, ৮৭-১০৬, ১১৯-২৩; ১৪১, ১৫৪, ১৬৪, ২৫১-৮৩
রাঢ়াপুরী ১০৪
রানাবাঁধ খাল ২২১, ২২৬
রানীগঞ্জ ১২-১৪, ২৯-৩০, ৩৪-৪১, ৭৬, ১০৭, ১১৯, ১২২, ১৮১-৯৭, ২১০, ২১৪
রামগঞ্জ ১০৫
রামগোপালপুর ২১১-১২
রামনগর ১৮১
রায়না ৩-৫, ৬৩-৬৬, ১৬৯
রিসড়া ২৪১
রূপনারায়ণপুর ২২৪
ললিতপুর ২৩৮
লস্করপুর ১৭৪, ১৭৮
লালজল ১১৯-২৩
শক্তিগড় ১৯২, ২১৩
শাঁকাই ৬৮, ১৭৮, ১৯৯, ২২৩
শিউলীবুড়ির ডাঙ্গা ১৪৭
শিকারপুর ২১৩
শিখরভূম ১০৪, ১৭৬
শিবা নদী ৬২, ২২২, ২৩৭
শিয়ালডাঙ্গা ২০৭
শিয়ালীগ্রাম ১৯৮
শিলাগ্রাম ২০৮
শিলামপুর ১৯৭
শুঁড়ে কালনা ১৯৭
শুশুনডিহি ১৮৭
শুশুনিয়া ১১৯-২২
শ্যামসুন্দরপুর ২০৫
শ্রীকৃষ্ণপুর ১৭৬

শ্রীখণ্ড ১৭৫, ১৮৮
শ্রীপুর ১৫০
শ্রীবাটী ৭০, ১৭৪

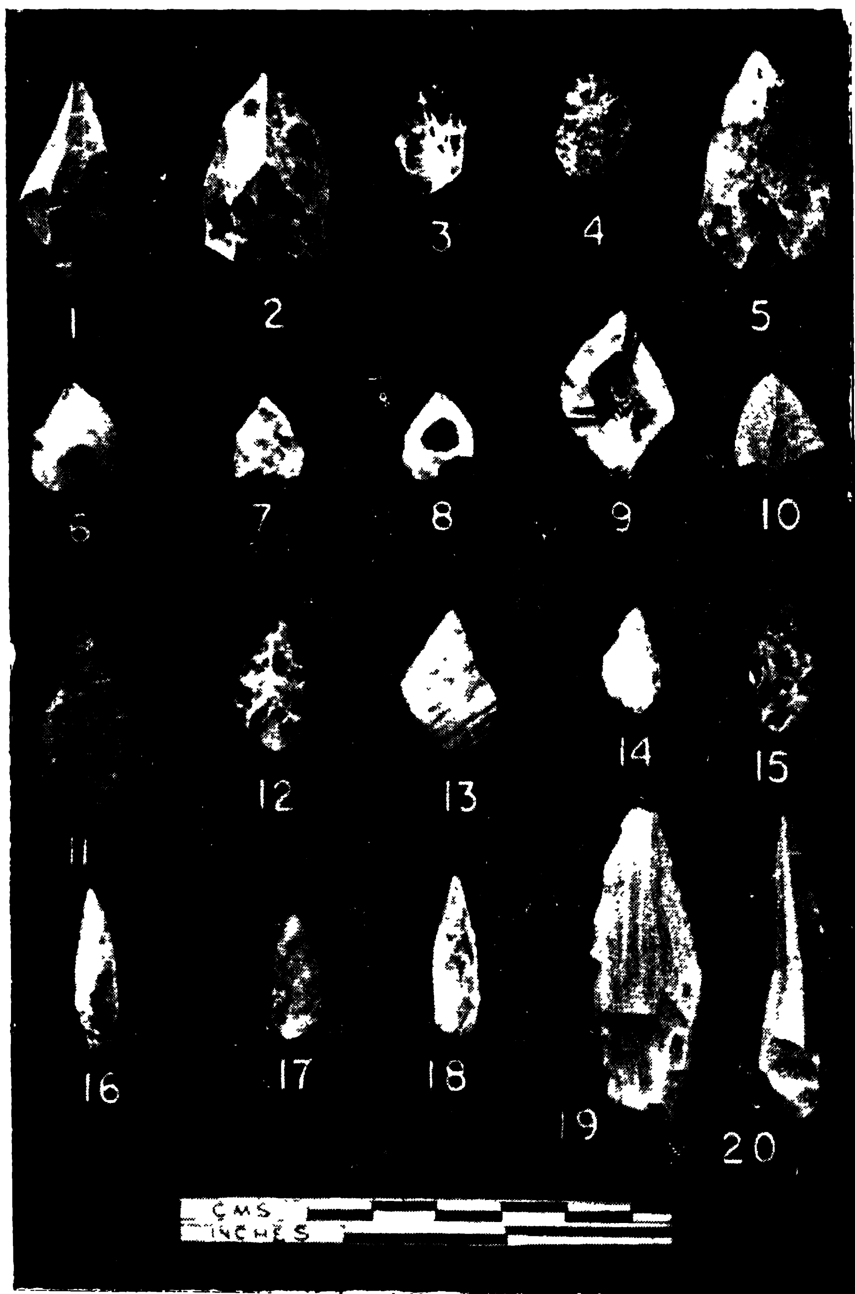
সঙ্কট গ্রাম ১০৪, ১৬৮
সঙ্কেত মাধব ২৪৩
সমুদ্রগড় ২০০, ২৩৩
সপ্তগ্রাম ৭০, ১৭৪-৭৬, ২৪০, ২৬৫
সরিফাবাদ ৬৫, ১০৭, ১০৯
সাইনী খাল ২১৭
সাকটি গড় ১৯২
সাগরডাঙ্গা ১২২, ১২৫
সাগরপোতা ২০৫
সাত কাহনিয়া ১২২, ১৪১
সাতগাছিয়া ১৮৪-৮৮
সাতদেউলিয়া ১০৭ ১৫৬
সাতসৈকা ২০০
সাদিপুর ৭৮, ১৭৬
সারগড়িয়া ১৭৪, ১৭৮
সারুল ১৭৫-৭৭
সালকিয়া ১৭৪
সালানপুর ১৪, ৪১, ২২৪
সাহজালালপুর ২২২
সাহহোসেনপুর ২২১
সাঁওতাল ডাঙ্গা ১৩৮
সাঁকো ৬৯
সিঙ্গুটিয়া ১৮৫, ২২৩
সিঙ্গারণ ২২৫
সিজুয়া ১১৯, ১২২
সিমুলিয়া ১৭২
সিলামপুর ১৭৫
সিলুট ১৪১
সিংভূম ৮৮, ১০৯
সিংহপুর ১০৩
সীতারামপুর ১২২
সীমাজুড়ী ২০৪
সুখচর ২৪২
সুগনা ১৮১
সুগাচী ২১৩
সুজাপুর ২২৩
সুনিয়া ২০৩
সুপুর ১৭৫-৬
সুবর্ণগিরিতাল ১৬৫
সুয়াতা ৫৭ ১০৭ ১৩৯ ১৭০
সুলতানপুর ২১৭ ২২৩
সুহ্ম ৮৮-৯৪
সেনপুর ১৭৩
সেড়গড় ৯-১২ ৫৭-৮, ৯১, ১৭৬
সেনপাহাড়ী ৯-১৩, ১৭৫
সেবানডিহি ২২২
সেলিমাবাদ ৮, ১৪ ১৭০-৭৬ ১৯৭-৮ ২২০
সেহারাবাজার ১৭৬, ১৯৩
সোনাডাঙ্গা ২০৮
সোনালিয়া ২৩৭

হরকলা ২১৪
হরগোবিন্দপুর ২২০
হরিণখালি ২২২
হরিনাদি ২৩৭
হরিহরপুর ২১৭
হাজীপুর ১৭৭
হাটনগর ২০০
হাড়িয়া ২৩৭
হাতিকান্দা ২৩৯
হাপানি ২০২
হায়াৎপুর ২১৯
হারাইপুর ১৫৩
হালিশহর ২৪০

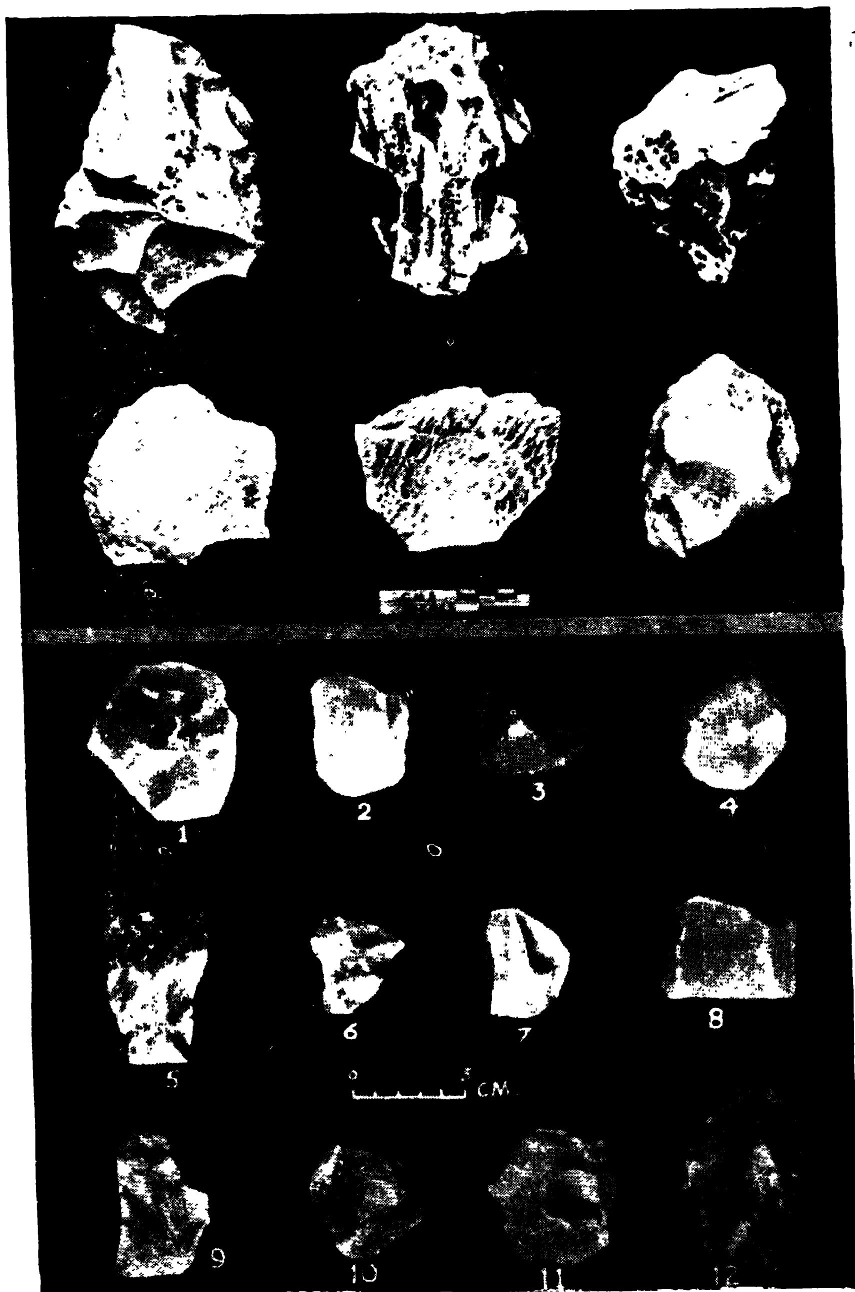
হাসানহাটি ২১৭, ২৪৮
হিজলগাড়া ১৭৬
হিজুলী ২৪৩
হিরণ্যগ্রাম ৬৮, ২৪৫
হেতেগড় ২৪৩
হোমজানপুর ২১৬
হোসেনপুর ২২৩
হোসেনাবাদ ১৮১

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	শেষ	গলাশী	গলসী
৮২	২৭	ন	প্রাচীন
৮৩	৮	India	Indica
৯২	৩১	বা হক খজুর	খজুর বাহক
৯৪	২	মাঠে	মঠ
৯৯	৩	কাটিয়া	কাটোয়া
১২৬	১৭	Ferrow	Ferro
১২৮	২০	৩৫০০০	৩৫০০
১৪৯	৩১	পার্শ্বনাথ	শান্তিনাথ



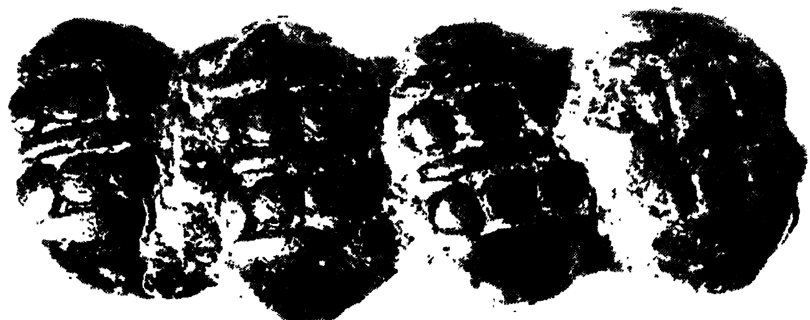
১. বীরভানপুরের প্রস্তরায়ুধ



২. প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ ঃ বনকাটি।

৩. ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ ঃ পাণ্ডুরাজার ঢিবি

৪. প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু : পাণ্ডুরাজার ঢিবি।



৫. টেরাকোটা ফলক।



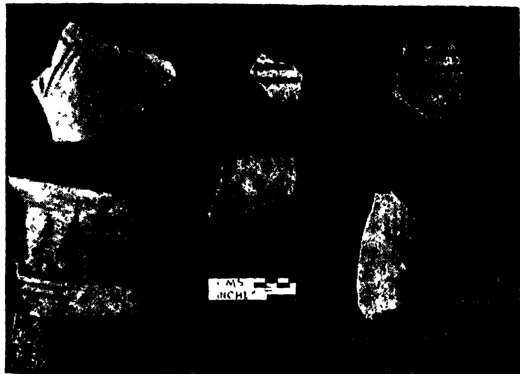
৬. অজয়-কুনুর নদের সঙ্গমস্থল।



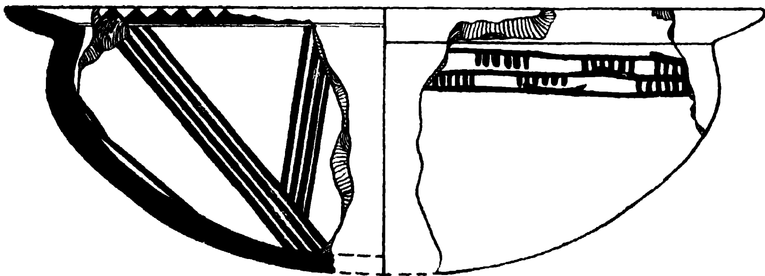
৭. পোড়ামাটির মূর্তি : পাণ্ডুরাজার ঢিবি।



৮. শীলমোহর : পাণ্ডুরাজার ঢিবি।



৯. প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু : ঐ



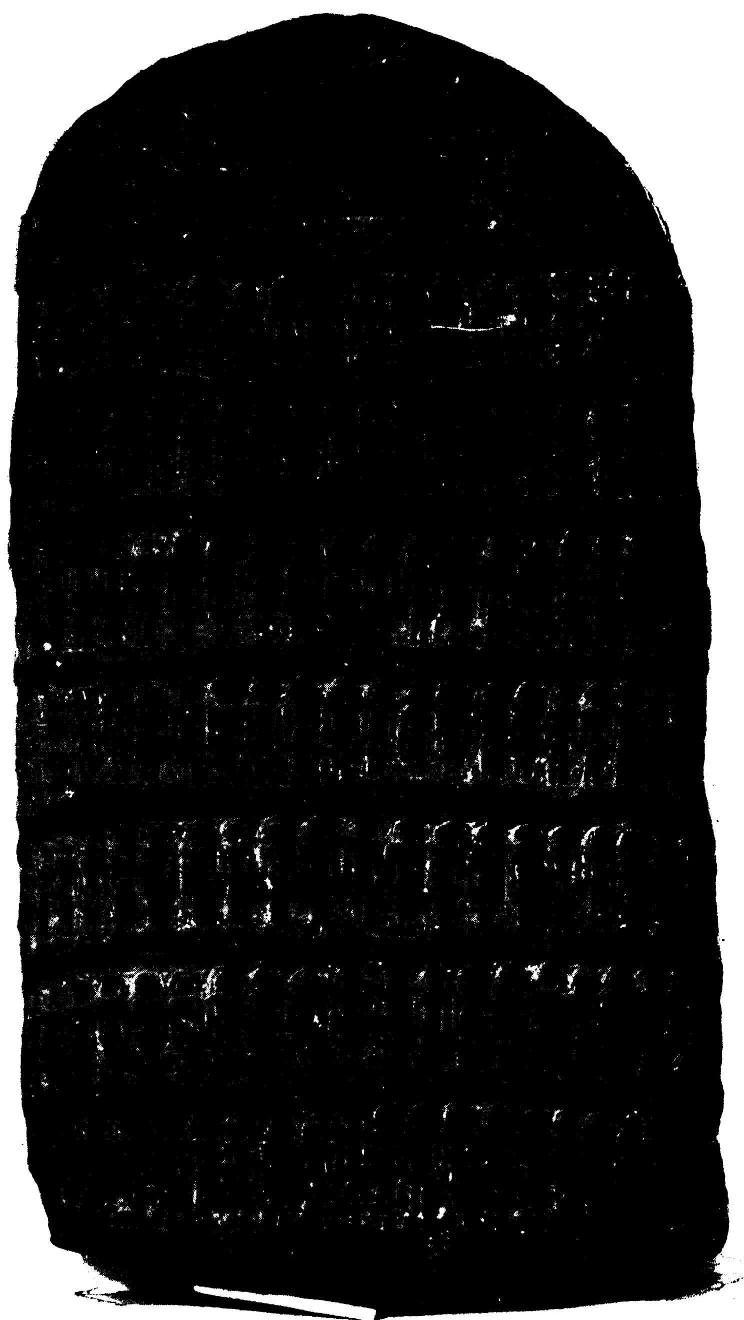
মৃৎপাত্রের গঠন ভঙ্গিমা : ঐ



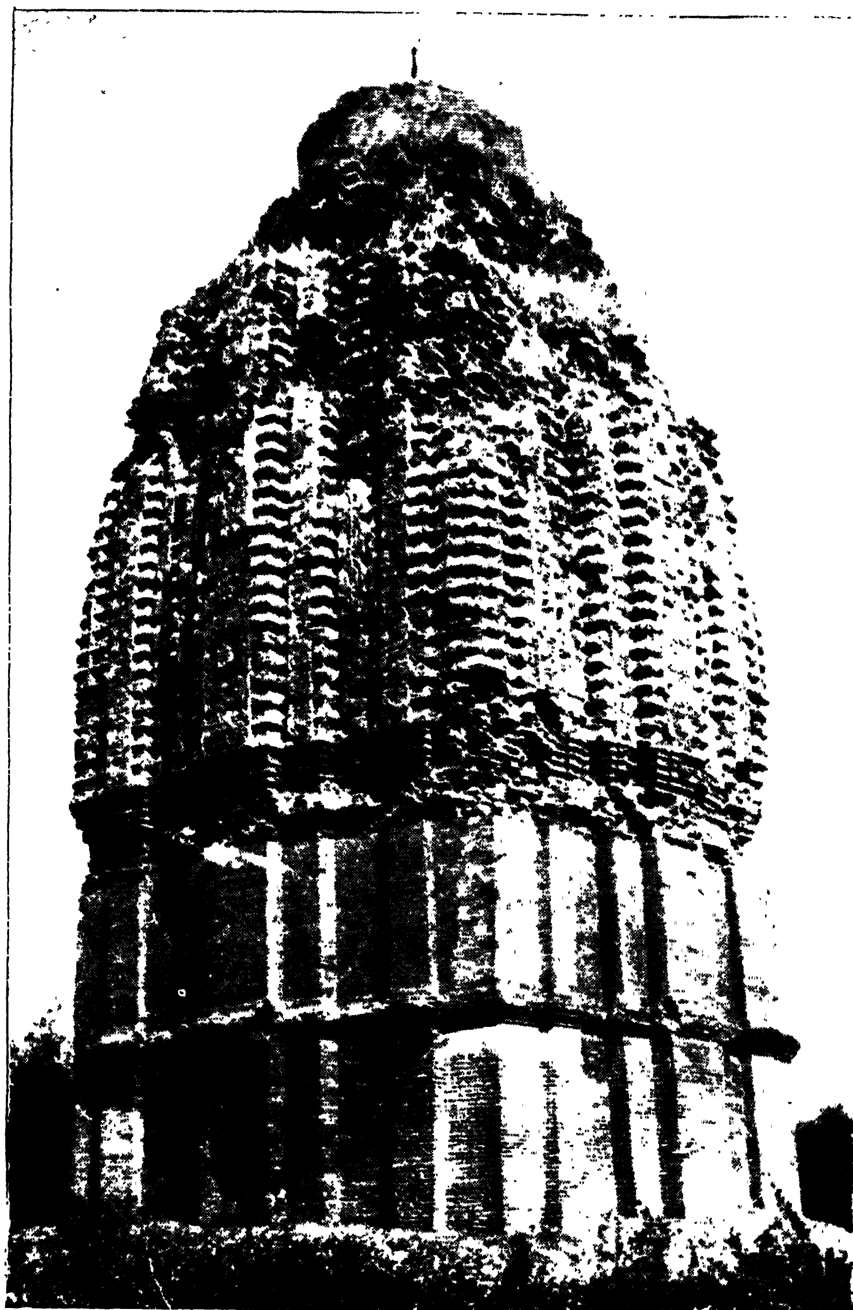
১১. বৌদ্ধস্তূপ : ভরতপুর



১২. ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবায়তন : গোস্বামীখণ্ড



১৩. তীর্থঙ্কর মূর্তি : সাতদেউলিয়া।



১৪. প্রাচীন শিখর-দেউল : সাতদেউলিয়া



১৫ ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ : দাঁইহাট।



১৬. জামগ্রামের সিংহলাঞ্ছন মূর্তি।



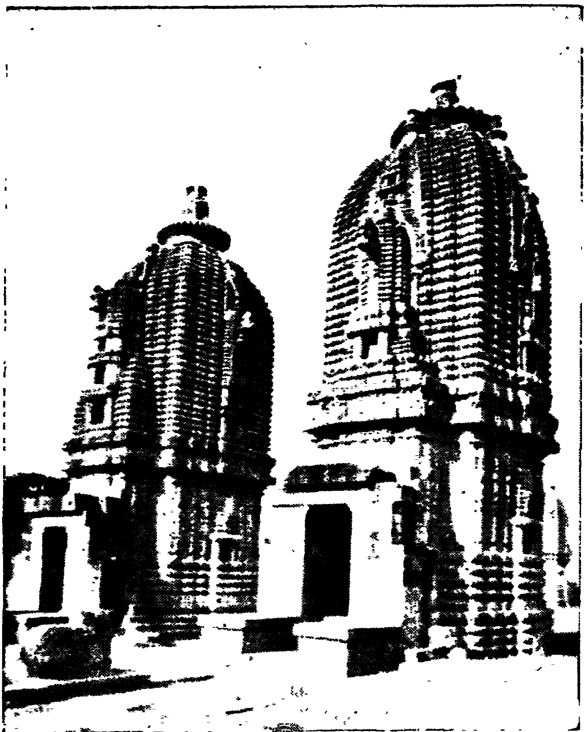
১৭. যুগল তীর্থঙ্কর মূর্তি : রায়না।



১৮. অভিচারবিষ্ণু : চৈতন্যপুর।



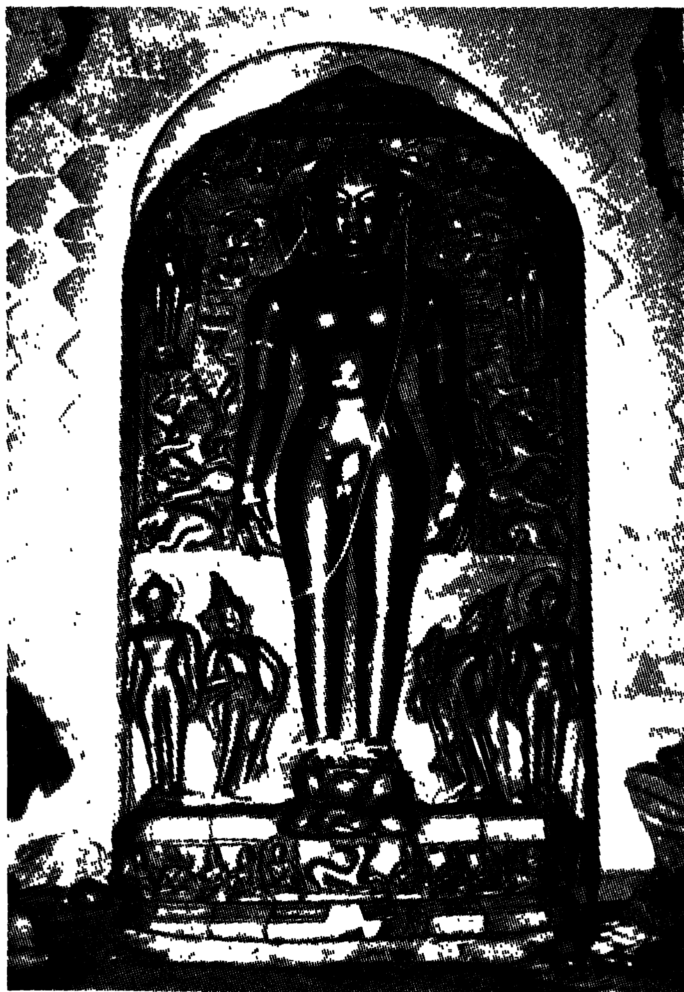
১৯. মাতৃকামূর্তি : পাণ্ডুরাজার ঢিবি।



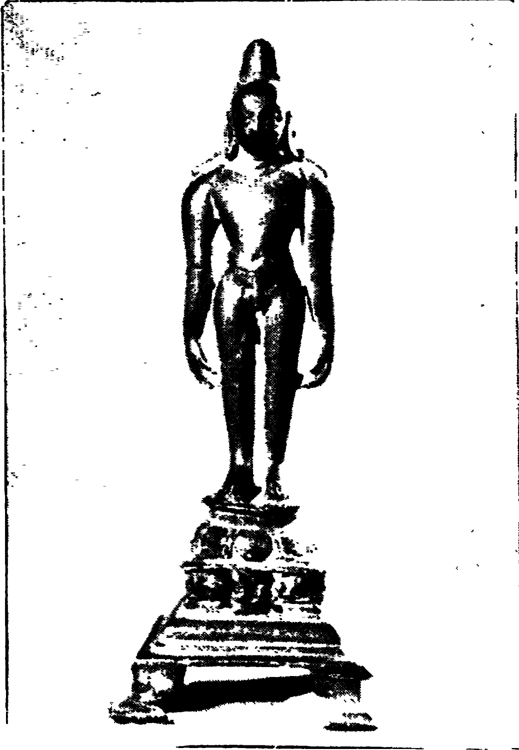
২০. প্রস্তর নির্মিত শিখর দেউল : বরাকর।



২১. দশাবতার মূর্তি খোদিত দ্বারপার্শ্ব : দামুন্যা



২২. জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ : বাবলাডিহি (শঙ্করপুর)।



২৩. ব্রোঞ্জ নির্মিত ঋষভনাথ মূর্তি : কেলেজোড়া।



২৪. বুদ্ধমূর্তি : ভরতপুর।



২৫. ত্রিভঙ্গবিষ্ণু : সিজনা (মন্তেশ্বর



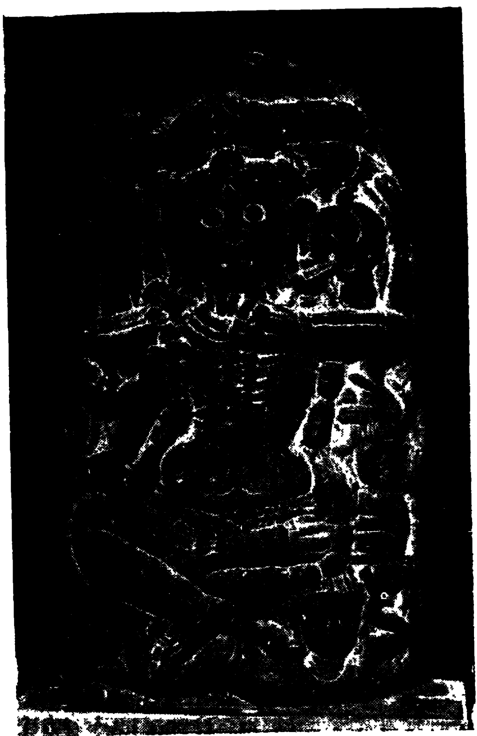
২৬. বৈশ্রবণ মূর্তি ঃ কাঞ্চননগর।



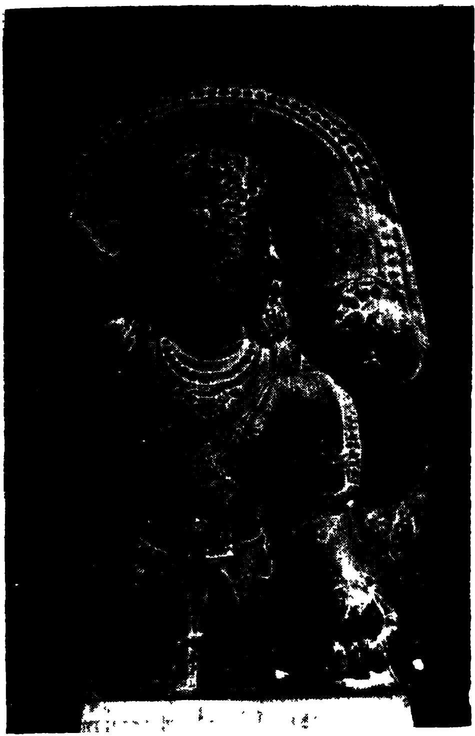
২৭. শিবমূর্তি ঃ আদ্রাহাটী।



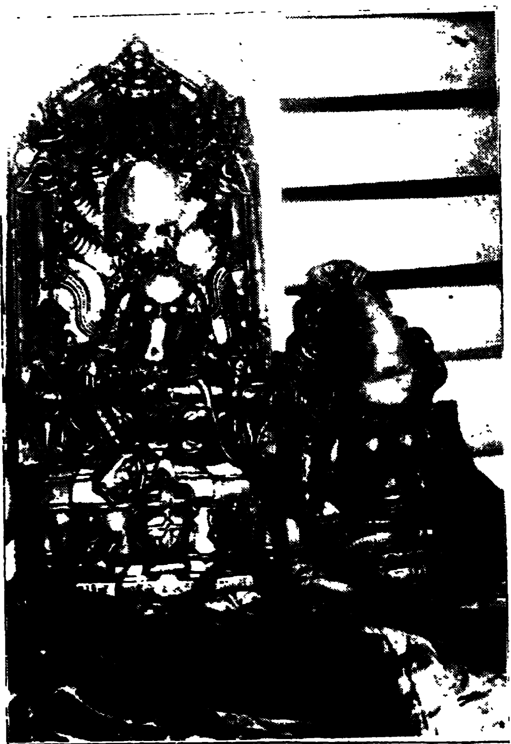
২৮. বিষ্ণু লোকেশ্বর ঃ আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত।



২৯. চামুণ্ডা মূর্তি : আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত।



৩০. হরিহর মূর্তি : আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত।



৩১. জগৎগৌরী মূর্তি : মণ্ডল গ্রাম।



৩২. গণেশ মূর্তি : কেতুগ্রাম।



৩৩ বহুলা দেবী ঃ কেতুগ্রাম।



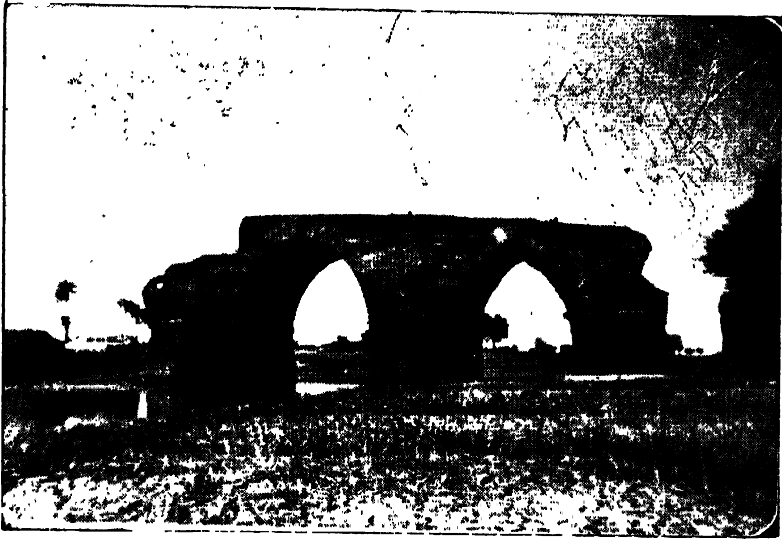
৩৪. কঙ্কালেশ্বরী মূর্তি ঃ কাঞ্চননগর



৩৫. মনসা মূর্তি : মণ্ডলগ্রাম।



৩৬. ইন্দ্রাণী মূর্তি : কুড়মুন।



৩৭. মাসির সেতু ঃ নৈহাটী-সীতাহাটী।



৩৮. শিল্পীর তুলিতে বর্ধমান রেলষ্টেশন উদ্বোধনের দৃশ্য।



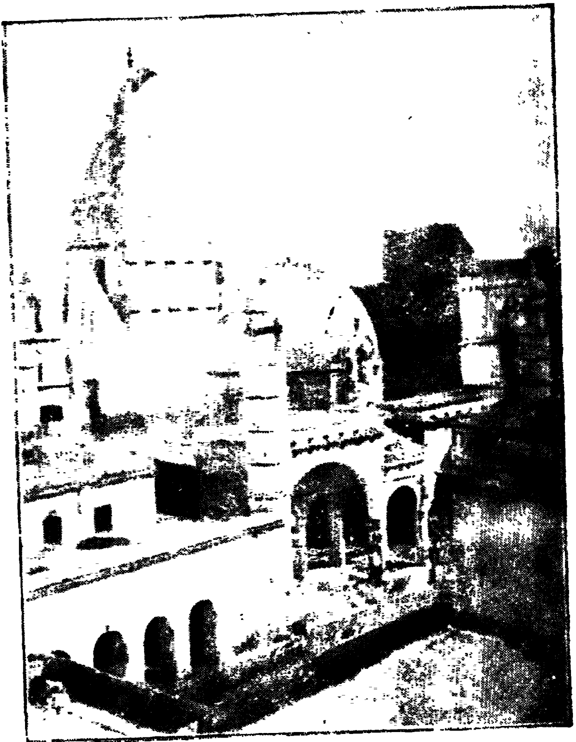


৩৯. নবরত্ন মন্দির ঃ কাঞ্চননগর।

৪০. হোসেনশাহী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ঃ নূতনহাট।



৪১. পীড়া-দেউল ঃ বোড়ো বলরাম।



৪২. রাজগঞ্জ অস্থল ঃ বর্দ্ধমান।





৪৩. 'টেরাকোটা' ফলক : বৈদ্যপুর

৪৪. সর্বমঙ্গলা মন্দিরে 'টেরাকোটা'-ফলক : বর্ধমান।



৪৫. যোগাদ্যাদেবীর মন্দির : ক্ষীরগ্রাম।



৮৬ শিখর মন্দির ঃ আমাদপুর।